রবিজীবনী

প্রশান্তকুমার পাল

রবিজীবনী
প্রশান্তকুমার পাল

রবিজীবনী

দ্বিতীয় খণ্ড

১২৮৫-১২৯১

প্রশান্তকুমার পাল

প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৯০
প্রথম ই-বুক সংস্করণ: ২০২০

ISBN 978-81-7066-239-6 (print)
ISBN 978-93-90440-69-6 (e-book)

প্রকাশক: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
হেড অফিস: ৯৫ শরৎ বোস রোড, কলকাতা ৭০০ ০২৬
রেজিস্টার্ড অফিস: ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

CIN: U22121WB1957PTC023534

প্রচ্ছদ: প্রবীর সেন

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন
শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমাদের প্রকাশিত
এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

রবিজীবনী (১ম-৯ম)

মুখবন্ধ

রবিজীবনী দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল। ১২৮৫ থেকে ১২৯১ বঙ্গাব্দ—রবীন্দ্রজীবনের অষ্টাদশ থেকে চতুর্বিংশ বৎসর পর্যন্ত সাতটি বছর এই খণ্ডের উপজীব্য।

রবীন্দ্রনাথ কড়ি ও কোমল [১২৯৩]-এর প্রকাশ-কাল পর্যন্ত জীবনের স্মৃতিচারণ করেছিলেন তাঁর জীবনস্মৃতি-তে, সুতরাং ওই দুটি বৎসরকে বর্তমান খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করতে পারলে খুশি হতাম—পাণ্ডুলিপিও প্রস্তুত ছিল—কিন্তু গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে সংযত থাকতে হয়েছে।

অবশ্য এই খণ্ড যেখানে শেষ হয়েছে, তাকেও একটি অসংগত সমাপ্তি বলে মনে করি না। ১২৯১ বঙ্গাব্দে কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই নারীর প্রভাবের কথা রবীন্দ্র-জীবন ও সাহিত্যের পাঠকমাত্রেরই জানা। তাঁর জীবৎকালে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ রচনার প্রথম পাঠক ছিলেন কাদম্বরী দেবী—এই সময়ে তাঁর রুচির আনুগত্য তরুণ কবির পক্ষে প্রায় আবশ্যিক ছিল। অথচ তাঁর বন্ধনভীরু মন ক্রমেই এই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার প্রয়াস করেছে, সন্ধ্যাসংগীত প্রভাতসংগীত এবং ছবি ও গান-এর কবিতাগুলিতে লিখিত রয়েছে সেই সংগ্রামের ইতিহাস—যাকে বলা চলে কাব্যরচনার একটি সংস্কারের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম। মনে হয়, কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু—যত দুঃসহই হোক-না কেন—এই সংগ্রামে জয়ী হতে রবীন্দ্রনাথকে সাহায্য করেছে। তাঁর স্নেহ-মমতা আদর-যত্ন রবীন্দ্রনাথের মনে যেন একটি শৈশবাবস্থাকেই স্থায়ী করে রেখেছিল, এই মৃত্যুর অভিঘাত তাঁকে উত্তীর্ণ করে দিল যৌবনের দ্বারপ্রান্তে। সুতরাং এই বৎসরে তাঁর জীবনের একটি পর্বের সমাপ্তি টানা খুব একটা অযৌক্তিক বলে বোধ হয় না। তাছাড়া বর্তমান বৎসরে [১৩৯১] কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর একশো বছর পূর্ণ হল, তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের এই সুযোগটি আকস্মিক হলেও অনাকাঙিক্ষত নয়।

রবিজীবনী প্রথম খণ্ডটি প্রকাশের পর অনেকের সমাদর ও উৎসাহ লাভ করেছি, অর্জন করেছি বেশ কয়েকজনের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব। প্রথমেই মনে পড়ছে আমার তরুণ বন্ধু অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়ের কথা। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে গবেষণা করতে গেলে শান্তিনিকেতনে দীর্ঘকাল বাস করতেই হয়, অথচ সেই সুযোগ খুবই দুর্লভ। প্রথম খণ্ডটি রচনার সময়ে কেবলমাত্র এই কারণেই যে দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করতে হয়েছিল, শ্রীমান্ বিশ্বনাথের স্বতঃপ্রবৃত্ত প্রয়াসে তা প্রায় দূরীভূত। সহযোগিতা, পরামর্শ ও সঙ্গদানেও তিনি অকুণ্ঠ। ড প্রদীপ চক্রবর্তী ও অধ্যাপক পরমেশ্বর মাহাতা-র কথাও এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। আর এক তরুণ বন্ধু স্বপনকুমার ঘোষ বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ আমার কাছে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। এঁদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করি।

শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে কাজ করা সমস্ত গবেষকদের কাছেই এক আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা। অবেক্ষক শ্রীসনৎ বাগচী, গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী সুপ্রিয়া রায় এবং অন্যান্যদের মধ্যে শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব, শ্রীঅবনী চন্দ্র, শ্রীদিলীপ হাজরা, শ্রীতুষারকান্তি সিংহ, শ্রীআশিস্ হাজরা ও শ্রীরামগোপাল চক্রবর্তী প্রতিমুহূর্তে সেই

অভিজ্ঞতালাভের আনন্দ দিয়েছেন। শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় সবসময়ে আমার কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছেন, অনেক সংশয়ের গ্রন্থিমোচন করেছেন, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বিভিন্ন অজ্ঞাত তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন। প্রাক্তন প্রাধিকারিক ড উমা দাশগুপ্তা যে-কোনো সমস্যার সমাধানে সদাতৎপর ছিলেন। বিশ্বভারতীর মাননীয় উপাচার্য শ্রীঅম্লান দত্ত রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি ও তথ্য প্রকাশে অনুমতি দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন। এঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এছাড়াও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ, জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, চাংড়িপোতা বিদ্যাভূষণ পাঠাগার, স্টেট আর্কাইভ্স্ প্রভৃতি স্থানে দীর্ঘদিন কাজ করেছি। প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের সাহায্য কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

ড কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় সঞ্জীবনী পত্রিকার কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য ফাইল ও শ্রীঅনাথনাথ দাস ঠাকুর-পরিবারের কয়েকটি অপ্রকাশিত চিঠি আমাকে দেখতে দিয়েছেন। অধ্যাপক প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীতারাপদ আচার্য কিছু তথ্য সংগ্রহে সহায়তা করেছেন। আনন্দমোহন কলেজের কর্তৃপক্ষ ও সহকর্মী বন্ধুগণ সাহায্য প্রদানে অকুণ্ঠ ছিলেন। এঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

মুদ্রণের প্রতিটি পর্যায়ে শ্রীসুবিমল লাহিড়ী পূর্বের মতোই সহায়তা করেছেন। প্রিণ্টেক-এর কর্মীদের সহযোগিতার কথাও উল্লেখ্য।

২২ শ্রাবণ ১৩৯১

প্রশান্তকুমার পাল

৩৬/১ পদ্মপুকুর রোড
ফিঙাপাড়া ২৪ পরগনা ৭৪৩১২৬

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

রবিজীবনী দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। পরিমার্জনা ও কিছু নূতন তথ্যের সংযোজন হওয়াতে একে পুনর্মুদ্রণ না বলে সংস্করণ নামে অভিহিত করাই যুক্তিযুক্ত। রাজনারায়ণ বসুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সৌজন্যে প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছি। অধ্যাপক ড প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বন্ধুবর অমল সেনগুপ্ত ও শ্রদ্ধেয় গোপালচন্দ্র রায় কতকগুলি তথ্য জানিয়েছেন, সেগুলি যথাস্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। অশোককুমার মুখোপাধ্যায় ২০ শ্রাবণ ১৩৯৬-সংখ্যা দেশ পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে চিত্রকর রবীন্দ্রনাথের একটি প্রাথমিক পরিচয় উদ্ধার করে দিয়েছেন। এই প্রবন্ধটি অবলম্বনে একটি নূতন প্রাসঙ্গিক তথ্য [পৃ ৬২] সংযোজিত হয়েছে। ইন্দ্রকিশোর কেজ্‌রিওয়াল ও রবীন্দ্রভবনের সৌজন্যে রবীন্দ্রনাথের আঁকা দুটি ছবির প্রতিলিপি দেওয়া গেল। সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আধুনিক মুদ্রণব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার উদ্দেশ্যে উল্লেখ-সূত্রগুলি পৃষ্ঠার নিম্নে বিন্যস্ত না করে ধারাবাহিক সংখ্যানুক্রমে প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে 'উল্লেখপঞ্জী'তে সমাহৃত হল। তা সত্ত্বেও পাঠ্যবস্তুর সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত টীকাগুলি তারকা [*]-চিহ্নযোগে পাদটীকা রূপেই সন্নিবেশিত হয়েছে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য খণ্ডটির প্রথম মুদ্রণের কিছু কপি বিনষ্ট হওয়ায় বইটি অনেকদিন আগ্রহী ক্রেতাদের সরবরাহ করা যায়নি। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

খণ্ডটির পূর্বতন প্রকাশক ভূর্জপত্র-এর স্বত্বাধিকারিণী শর্মিলা পাল এবং অরিজিৎ কুমার ও অধ্যাপক স্বপন মজুমদারকে তাঁদের আনুকূল্যের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

১ মাঘ ১৩৯৬ প্রশান্তকুমার পাল

বিষয়সূচী

পাঠ নির্দেশ

এই গ্রন্থ-রচনায় রবীন্দ্রনাথ-লিখিত পুস্তকের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী-র বিভিন্ন খণ্ড ব্যবহৃত হয়েছে। বিভিন্ন সংস্করণে পৃষ্ঠাঙ্কের সামান্য ব্যতিক্রম হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও পাঠকের পক্ষে উদ্ধৃতি বা উল্লেখের মূল খুঁজে পেতে খুব বেশি অসুবিধা হবে না ভেবে সংস্করণ বা মুদ্রণ-তারিখ নির্দেশিত হয় নি। অন্যান্য গ্রন্থের ক্ষেত্রে পাদটীকায় প্রথম উল্লেখের স্থানে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে প্রকাশ-সন দেওয়া হয়েছে। দণ্ড চিহ্নের পরের সংখ্যাটি পৃষ্ঠাঙ্ক-সূচক।

গ্রন্থের মূল পাঠে তৃতীয় বন্ধনীর অন্তর্গত তারিখগুলি সাধারণত পুরোনো পঞ্জিকা বা Ephimeris অবলম্বনে নির্ধারিত। উদ্ধৃতির মধ্যে এইরূপ বন্ধনী-মধ্যস্থ শব্দ বা শব্দগুলি আমরা যোগ করেছি। মূলের বানান সাধারণত অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। [?]-চিহ্ন সংশয়-সূচক। উদ্ধৃতি ছাড়া অন্যত্র খৃস্টাব্দ সর্বদাই ইন্দো-আরবীয় হরফে [1, 2, 3...ইত্যাদি] লিখিত, 'শক' শব্দটির ব্যবহার না থাকলে বাংলা হরফে লেখা অব্দগুলিকে বঙ্গাব্দ বুঝতে হবে।

শব্দ-সংক্ষেপণ

জীবনস্মৃতি ১৭।২৭৩ : রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৭শ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থ, পৃ ২৭৩।

'পিতৃস্মৃতি', মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। [১৩৭৫]। ১৫২ : ১৩৭৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'পিতৃস্মৃতি' প্রবন্ধ, পৃ ১৫২।

কবি-কাহিনী অ-১। ১৩-২৮ : রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ ১ম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত 'কবি-কাহিনী' গ্রন্থ পৃ ১৩ থেকে ২৮।

র°র° ১৫ [শতবার্ষিক সং]। ১৩৮-৪৫ : রবীন্দ্র-রচনাবলী জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ ১৫শ খণ্ডের পৃ ১৩৮ থেকে ১৪৫।

র°র° ১ [প. ব.]। ১০৮-১০ পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী-র আধুনিক সংস্করণের ১ম খণ্ডের পৃ ১০৮ থেকে ১১০।

বি. ভা. প. ১৮।৪।৩৮৯ : বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৮শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ ৩৮৯।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সা-সা-চ ৩।৪৫।১০ : সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৩য় খণ্ড ৪৫ সংখ্যক 'দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' গ্রন্থের পৃ ১০।

অগ্র° : অগ্রহায়ণ।

তত্ত্ব° : তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

রবিজীবনী

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কৃত পেন্সিল স্কেচ। ১৮৮১

অষ্টাদশ অধ্যায়

১২৮৫ [1878-79] ১৮০০ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের অষ্টাদশ বৎসর

১২৮৪ বঙ্গাব্দে ভারতী-র মাত্র ন'টি সংখ্যা প্রকাশিত হলেও বৈশাখ ১২৮৫ থেকে সম্ভবত বর্ষগণনার সুবিধার জন্য পত্রিকাটির দ্বিতীয় বর্ষের সূচনা করা হল। বর্তমান পর্বে এইটিই শেষ সংখ্যা যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম হিসেবে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা [জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫] যখন প্রকাশিত হয় তখন তিনি বিলাত যাত্রার ভূমিকা-স্বরূপ আমেদাবাদে অবস্থান করছেন। এই সংখ্যার রচনাদি সংগ্রহ ও নির্বাচনের সঙ্গে কিছুটা জড়িত থাকলেও মুদ্রণ ও প্রকাশনার যে উৎসাহ-উত্তেজনার এতদিন অংশীদার ছিলেন, তার থেকে তিনি অনেকটা দূরে পড়ে গেলেন। সুতরাং পূর্ববর্তী বৎসরে আমরা যেমন ভারতী-র প্রতিটি সংখ্যায় প্রকাশিত রচনাদির আনুপূর্বিক বিবরণ দিয়েছি, বর্তমান বৎসরে ঠিক সেভাবে দেবার প্রয়োজনীয়তা অনেক কম। সেইজন্য আমরা 'প্রথম' সংখ্যাটি বাদে অন্য সংখ্যার ক্ষেত্রে কেবল রবীন্দ্র-রচনার পরিচয়ই উদ্ধার করব, প্রয়োজনবোধে শুধু অন্যদের রচনা উল্লিখিত হবে।

প্রথমে আমরা বৈশাখ ১২৮৫ [২।১] সংখ্যার সম্পূর্ণ সূচীটি উদ্ধার করছি :

পৃ ১-৭ 'বোম্বাই রায়ৎ' : 'শ্রীস—' [সত্যেন্দ্রনাথ]

৭-১৫ 'পূর্ব্বতন গ্রীকদিগের সামাজিক অবস্থা' : 'সূঃ—' [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ]

১৫-২০ 'অভিমান' : 'চ' [অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী]

২১ 'ভানুসিংহের কবিতা' ['বার বার সখি বারণ করনু']

দ্র ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ২।২২-২৩ [১৭ সংখ্যক]

২২-২৮ 'তুকারাম' : 'শ্রীস—' [সত্যেন্দ্রনাথ]

২৮-৩১ 'তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক' : [দ্বিজেন্দ্রনাথ]

৩১-৩৮ 'সামুদ্রিক জীব/(প্রথম প্রস্তাব)/কীটাণু' : 'ভ' [রবীন্দ্রনাথ]

৩৯-৪২ 'করুণা'/১৫শ-১৬শ পরিচ্ছেদ দ্র করুণা ২৭।১৫৩-৫৭

৪২-৪৮ 'বঙ্গসাহিত্য' : 'চ' [অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী]

'ভানুসিংহের কবিতা'-য় সুরের উল্লেখ আছে—'ইমন কল্যাণ', কিন্তু সুরটি সম্ভবত হারিয়ে গেছে। ভারতী ও প্রথম সংস্করণে কবিতাটি আরও দীর্ঘ ছিল, পরে অনেকগুলি ছত্র বর্জিত ও কয়েকটি ছত্র পুনর্লিখিত হয়। কাব্যগ্রন্থাবলী-তে কবিতাটির শিরোনাম : 'দূতীর প্রতি'।

সামুদ্রিক জীব/কীটাণু' প্রবন্ধটির নীচে 'ভ' স্বাক্ষর দেখে রচনাটিকে রবীন্দ্রনাথের বলে গ্রহণ করায় কোনো বাধা নেই। হয়তো আসন্ন সমুদ্র-যাত্রার আনন্দে অজানা অদেখা সমুদ্রকে ভালো করে জানবার আগ্রহে তিনি

এ-বিষয়ে কোনো ইংরেজি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ পড়তে শুরু করেছিলেন—রচনাটি সেই গ্রন্থপাঠেরই ফল। প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি বিহারীলাল চক্রবর্তীর নিসর্গ-সন্দর্শন [10 Mar 1870] কাব্যের দ্বিতীয় সর্গ 'সমুদ্র-দর্শন' থেকে আটটি স্তবক [৪১-৪৮] উদ্ধৃত করেন। সংস্কৃত শ্লোকের উদ্ধৃতিও এই প্রবন্ধে প্রথম দেখা যায় : 'অবশেষে ক্রমশঃ ঐ কীট একেবারে দুইভাগে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, এবং এইরূপে দুইটি কীটের জন্ম হয়।...ইহাদের মধ্যে যেমন "আত্মাবৈ জায়তে পুত্রঃ" এমন মনুষ্যের মধ্যে নহে।' [পৃ ৩৭] প্রবন্ধটি এ-পর্যন্ত কোনো গ্রন্থ-ভুক্ত হয় নি। সাধারণভাবে রচনাটি বিশেষত্ব-বর্জিত, কিন্তু যেটি লক্ষণীয় সেটি হল রবীন্দ্রনাথের প্রকাশমুখী স্বভাব-বৈশিষ্ট্য—নিতান্ত ভাষা-চর্চা বা জ্ঞান-চর্চার জন্য বিজ্ঞান-গ্রন্থটি পাঠ করলেও যতক্ষণ সেটিকে নিজের মতো করে প্রকাশ করতে না পেরেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত বিষয়টি আত্মস্থ হয় নি। বস্তুত ভারতী-র দ্বিতীয় বর্ষে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি প্রবন্ধ শুধু এই কারণেই লিখিত হয়েছিল।

ক্রমশঃ-প্রকাশিত উপন্যাস 'করুণা' সম্বন্ধে আগের অধ্যায়েই আলোচনা করা হয়েছে।

বর্তমান সংখ্যায় 'শ্রীসঃ—' [সত্যেন্দ্রনাথ] লিখিত 'তুকারাম' প্রবন্ধটির ক্রমানুসরণ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যাতেও দেখা যায় এবং বহুদিন পরে বোম্বাই চিত্র [১২৯৫] ও নবরত্নমালা [১৩১৪] গ্রন্থে সংকলিত হয়। প্রবন্ধটিতে মহারাষ্ট্রীয় সাধক ও কবি তুকারামের অনেকগুলি 'অভঙ্গ' কবিতার অনুবাদ রয়েছে, যার কতকগুলির প্রাথমিক রূপের সন্ধান পাওয়া যায় মালতী-পুঁথি-র বিভিন্ন পৃষ্ঠায় [11/৬ক, 12/৬খ, 17/৯ক, 18/৯খ]। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'সত্যেন্দ্রনাথ তুকারামের অভঙ্গ মারাঠা হইতে বুঝাইয়া দেন, রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেন'[১]; 'রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা : কালানুক্রমিক সূচী' প্রবন্ধেও তিনি একই ধরনের মন্তব্য করেছেন, 'তুকারাম : সত্যেন্দ্রনাথ-কৃত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ অভঙ্গের অনুবাদ করিয়াছেন।...আহমদাবাদে বাসকালে বোধহয় এই অনুবাদগুলি সত্যেন্দ্রনাথের সাহায্যে কৃত; মূল মারাঠির অর্থ সত্যেন্দ্রনাথ করিয়া দেওয়াতেই অনুবাদ করা সম্ভব হইয়াছিল।'[২] এ-বিষয়ে প্রবোধচন্দ্র সেনের বক্তব্য : 'এই অনুবাদগুলি আসলে রবীন্দ্রনাথের কৃত না হতেও পারে। 'বিলাতে পালাতে' ইত্যাদি দ্বিজেন্দ্রকৃত কৌতুকরচনাটি তিনি যেভাবে মালতীপুঁথিতে নকল করে রেখেছিলেন, সত্যেন্দ্রকৃত অভঙ্গ-অনুবাদগুলিও হয়তো সেভাবেই নকল করে নিয়েছিলেন। স্বকৃত অনুবাদই হক আর নকলই হক, সেগুলি যে ১৮৭৮ সালে আমেদাবাদে বাসকালে লেখা হয়েছিল, তাতে বোধ করি সন্দেহ নেই।'[৩] আমরা অবশ্য এ-সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্য ধারণা পোষণ করি। 'বিলাতে পালাতে ছটফট করে নব্য গউরে'—শিখরিণী ছন্দে লেখা দ্বিজেন্দ্রনাথের এই হাস্যরসাত্মক কবিতাটি ইংলণ্ডে অবস্থান-রত কনিষ্ঠ ভ্রাতার উদ্দেশ্যেই রচিত ও প্রেরিত হয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথ এটিকে ভারতী-র আশ্বিন ১২৮৬-সংখ্যায় প্রকাশিত 'য়ুরোপযাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র'-তে 'দেশ থেকে আমার কোনো মান্য বন্ধু শিখরিণীচ্ছন্দে একটা কবিতা পাঠিয়ে দিয়েছেন' মন্তব্য-সহ উদ্ধৃত করেন, সুতরাং কবিতাটি মালতীপুঁথি-তে নকল করে রাখার একটি কারণ দেখা যায়। কিন্তু 'তুকারাম' প্রবন্ধে ব্যবহৃত অভঙ্গের অনুবাদগুলির এমন কোনো কাব্যমূল্য বা অন্য কোনো উপযোগিতা নেই, যার জন্য রবীন্দ্রনাথ চারটি পৃষ্ঠায় মোট পনেরোটি অনুবাদ নকল করে নিতে উৎসাহিত হবেন। তাছাড়া মালতীপুঁথি-র 11/৬ক পৃষ্ঠায় 'ধরায় পাগুরি আছে লোকেদের তরে' ও 'বন্ধুগণ শুন—রামনাম কর সবে' [দ্র রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা ১।২৩] অনুবাদ-দুটি ভারতী-র প্রবন্ধে সংক্ষিপ্ত আকারে মুদ্রিত হয়, তাই সেখানে থেকে খাতায় ভিন্নরূপে নকল করার প্রশ্ন ওঠে না। সজনীকান্ত দাস রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে পেনসিলে লেখা আরও একটি অভঙ্গ-অনুবাদের—'সেদিন হেরিবে

কবে এ মোর নয়ান'—সন্ধান পেয়েছিলেন বলে লিখেছেন,*[১] এটিও 'তুকারাম' প্রবন্ধে স্থান পায় নি। সুতরাং অন্তত মালতীপুঁথি-তে প্রাপ্ত অনুবাদগুলি রবীন্দ্রনাথেরই কৃত, এ-সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশের কোনো কারণ নেই।*[২] দ্বিতীয়ত, সবগুলি না হলেও অন্তত বৈশাখ-সংখ্যায় প্রকাশিত অভঙ্গগুলি কলকাতায় অবস্থান-কালেই অনূদিত হয়েছিল, কারণ ২৬ বৈশাখ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যে কলকাতায় ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় ক্যাশবহি-র ২৫ শ্রাবণের একটি হিসাব থেকে : 'রবীবাবু মহাশয় পটলডাঙ্গায় ও অক্ষয়বাবুর বাটী জাতাতের ২২।২৬ বৈশাখের গাড়ী ভাড়া...২॥০'—যার পূর্বেই ভারতীর বৈশাখ সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল। অনুবাদগুলি হল *[৩]:

[১] 'আমারি বেলায় উনি সংসারে বিরাগী'	[মালতীপুঁথি	18/৯খ] দ্র	রূপান্তর	। ১১৫
[২] 'বোধ হয় এ পাষণ্ড'	[ঐ	18/৯খ] দ্র	ঐ	। ১১৭
[৩] 'ঘরে দুটা অন্ন এলে'	[ঐ	18/৯খ] দ্র	ঐ	। ১১৭
[৪] 'খাবার কোথায় পাবি বাছা'	[ঐ	17/৯ক] দ্র	ঐ	। ১১৯
[৫] 'গেছে সে আপদ গেছে'	[ঐ	17/৯ক] দ্র	ঐ	। ১১৯
[৬] 'ঘরে আর আসে না সে'	[ঐ	17/৯ক] দ্র	ঐ	। ১২১
[৭] 'হেথা কেন আসে লোকগুলা'	[ঐ	12/৬খ] দ্র	ঐ	। ১২১
[৮] 'শুন দেব মনে যাহা করেছি নিশ্চয়'	[ঐ	12/৬খ] দ্র	ঐ	। ১১৩
[৯] 'নামদেব পাণ্ডুরঙ্গে লয়ে সঙ্গে করে'	[ঐ	12/৬খ] দ্র	ঐ	। ১১৩
[১০] যদি মোরে স্থান দেও তব পদছায়'	[ঐ	12/৬খ] দ্র	ঐ	। ১১৫

—অবশ্য আমাদের ধারণা, বাকি অভঙ্গগুলিও কলকাতায় থাকার সময়েই রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছিলেন, এর সঙ্গে আমেদাবাদ-বাসের কোনো সম্পর্ক নেই। তৃতীয়ত, যদিও সত্যেন্দ্রনাথ ১০ বৈশাখ নাগাদ আমেদাবাদ থেকে কলকাতায় এসেছিলেন, কিন্তু 'মূল মারাঠির অর্থ সত্যেন্দ্রনাথ করিয়া দেওয়াতেই অনুবাদ করা সম্ভব হইয়াছিল'—প্রভাতবাবুর এই উক্তি সম্ভবত ঠিক নয়। কারণ ১০ বৈশাখ কলকাতায় এসে মূল মারাঠি থেকে অর্থ বোঝানো, পদ্যানুবাদ, প্রবন্ধটির বৈশাখ কিস্তির সম্পূর্ণ রূপ দেওয়া, কম্পোজ করা, প্রুফ দেখা, ছাপানো, বাঁধানো ইত্যাদির পর ১৫ বৈশাখ পত্রিকা প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং সত্যেন্দ্রনাথের নির্দেশেই অভঙ্গগুলি অনূদিত হলেও, সম্ভবত কার্যটি নিষ্পন্ন হয়েছিল তাঁর সাহায্য ছাড়াই [অবশ্য আমেদাবাদ থেকে তিনি অভঙ্গগুলি গদ্যানুবাদ করে পাঠিয়ে থাকতে পারেন]। সত্যেন্দ্রনাথ যে ১০ বৈশাখ [সোম 22 Apr] নাগাদ কলকাতায় এসে ২ জ্যৈষ্ঠ [বুধ 15 May] পর্যন্ত এখানে ছিলেন, এই সংবাদটি পাওয়া যায় ক্যাশবহি-র ২৫ জ্যৈষ্ঠের একটি হিসাব থেকে : দ° শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের/আহারাদির ব্যয় ও চাকর খানসামা বাবুরচি/দিগের বেতন সমেত ই° ১০ বৈশাখ না° ২ জ্যৈষ্ঠ'।

উপরের হিসাবটি থেকে আমরা রবীন্দ্রনাথের আমেদাবাদ যাত্রার দিনটিও নির্ধারণ করতে পারি। সম্ভবত তাঁর আমেদাবাদ ও বিলাত যাত্রার প্রাথমিক আয়োজন করার জন্যই সত্যেন্দ্রনাথ বৈশাখ মাসে কলকাতায় এসেছিলেন। এই আয়োজনের কিছু কিছু নিদর্শন ক্যাশবহি-তে পাওয়া যায়; ১৩ বৈশাখের হিসাব : 'ব° বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/দ° উহার পুস্তক ক্রয় জন্য লয়েন...১১ল°', আবার ২৫ বৈশাখ [মঙ্গল 7 May 1878]*-

এর হিসাবে দেখি, 'দ° রবীবাবুর সাদা জোব্বা ৬টা ও চাপকান একটা/ও কাশমিয়ারি পেনটুলেন একটা ও সাদা পেনটুলেন/৪টা তৈয়ারির ব্যয় (সাদা পেনটুলেন ৪টার কেবল সেলাই মজুরি)/এক বৌচর ২৯ল', ৯'। বোঝাই যায়, বিদেশ যাত্রার জন্যই নতুন পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরি করানোর প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। ১২ শ্রাবণের একটি হিসাবে দেখা যায়: 'ব° বাবু সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়/দ° রবিবাবুর দুই কপি ফটোগ্রাফীর মূল্য Humfridge কো°কে/দিবার জন্য দেওয়া যায়... ১॥০'—সম্ভবত বিদেশ-যাত্রার পূর্বেই ফোটোগ্রাফটি তোলা হয় [রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ প্রথম খণ্ডের ৫১ পৃষ্ঠার সম্মুখবর্তী 'রবীন্দ্রনাথ সতেরো বৎসর বয়সে'-লেখা যে-ছবিটি দেখা যায়, এটি কি সেই ছবি?]। ২৮ বৈশাখ 'রবিবাবুর এক পত্র বম্বে পাঠাইবার টিকিট ব্যয়'-এর হিসাব পাওয়া যায় [ক্যাশবহি-তে 'আমেদাবাদ' বোঝাতেও অনেক জায়গায় 'বম্বে' লেখা হত], এই চিঠি রবীন্দ্রনাথ কাকে লিখেছিলেন অনুমান করা শক্ত, কারণ সত্যেন্দ্রনাথ এই সময়ে কলকাতায় অবস্থান করছেন ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তখন ব্রাইটনে। এর পরের হিসাব ১ জ্যৈষ্ঠ [মঙ্গল 14 May] তারিখের : ব° বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর/দ° উহার বম্বে গমন জন্য দেওয়া যায়/...গুঃ বেণীমাধব রায়...৩০০্'। পরের দিনই রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তিনি আমেদাবাদ যাত্রা করেন।

এই আমেদাবাদেই সত্যেন্দ্রনাথ 27 Apr 1865 তারিখে অ্যাসিস্ট্যান্ট কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট রূপে কর্মজীবন শুরু করেন। বিভিন্ন স্থানে বদলি হয়ে আবার 19 Apr 1876 [৮ বৈশাখ ১২৮৩] থেকে তিনি এখানে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাণ্ড সেশন্‌স্ জজ [অস্থায়ী] হিসেবে নিযুক্ত হন। তাঁর সরকারি বাসস্থান ছিল শাহিবাগে। রবীন্দ্রনাথ স্থানটির কর্ণনায় লিখেছেন : 'ইহা বাদশাহি আমলের প্রাসাদ, বাদশাহের জন্যই নির্মিত। এই প্রাসাদের প্রাকারপাদমূলে গ্রীষ্মকালের ক্ষীণস্বচ্ছস্রোতা সাবরমতী নদী তাহার বালুশয্যার একপ্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। সেই নদীতীরের দিকে প্রাসাদের সম্মুখভাগে একটি প্রকাণ্ড খোলা ছাদ।'[৪] প্রাচীন স্মৃতি-বিজড়িত এই বাড়িটি সম্বন্ধে তিনি অন্যত্র লিখছেন, 'কলকাতায় আমরা মানুষ, সেখানে ইতিহাসের মাথাতোলা চেহারা কোথাও দেখি নি।... আমেদাবাদে এসে এই প্রথম দেখলুম চলতি ইতিহাস থেমে গিয়েছে, দেখা যাচ্ছে তার পিছনফেরা বড়ো ঘরোয়ানা। তার সাবেক দিনগুলো যেন যক্ষের ধনের মতো মাটির নীচে পোঁতা।'[৫] বহুকাল পরে 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে [সাধনা, শ্রাবণ ১৩০২। ২১৯-৩৭; গল্পগুচ্ছ ২০।২৩১-৪৩] শাহিবাগের পরিবেশটি সাহিত্যরূপ লাভ করেছিল।

আমেদাবাদে অবস্থিতি রবীন্দ্রনাথের কৈশোর-জীবনের একটি বড় ঘটনা। 'বাহিরে যাত্রা' 'হিমালয়যাত্রা' প্রভৃতির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রজীবনের দিগন্ত ক্রমশ বিস্তারলাভ করছিল। কিন্তু এগুলি ছিল মোটামুটি নির্জনবাস, জনতা যেটুকু ছিল সেটি আত্মীয়স্বজনের বেড়া দিয়ে ঘেরা—সেখানে লাজুক মুখচোরা বালকের অস্বস্তির কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু কর্মব্যস্ত মেজদাদার সঙ্গে আমেদাবাদে এসে সেই আড়ালটুকু ঘুচে গেল, অপরিচিত জনসমাজের সঙ্গে অনভ্যস্ত ভাষায় বাক্যালাপ তাঁর পক্ষে খুব সহজ না হলেও মানিয়ে না নিয়ে কোনো উপায়ও ছিল না। তিনি লিখেছেন, 'শিকড়সুদ্ধ আমাকে উপড়ে নিয়ে আসা হল এক খেত থেকে আর-এক খেতে। নতুন আবহাওয়ার সঙ্গে বোঝাপড়া শুরু হল। গোড়াতে সব-তাতেই খটকা দিতে লাগল লজ্জা। নতুন লোকের সঙ্গে আলাপে নিজের মানরক্ষা করব কী করে এই ছিল ভাবনা। যে অচেনা সংসারের সঙ্গে মাখামাখিও সহজ ছিল না, আর পথ ছিল না যাকে এড়িয়ে যাওয়ার, আমার মতো ছেলের মন সেখানে

কেবলই হুঁচট খেয়ে মরত।'[৫] অভিভাবকেরাও হয়তো এইটিই চেয়েছিলেন, যে-ছেলে বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল তাকে ছেড়ে দিলেন জীবনের পাঠশালায়—নিজের শিক্ষার ও জগতের সঙ্গে যোগাযোগের পথ সে নিজেই গড়ে তুলুক, হয়তো এই ছিল তাঁদের আকাঙক্ষা। নইলে বিলাতযাত্রার এতদিন আগে তাঁকে আমেদাবাদে নিয়ে গিয়ে একা রেখে দেবার কোনো যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। আত্মীয়স্বজনের সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ তাঁর যে মন কেবলই ভগ্নহৃদয়ের নৈরাশ্য ও বিষাদের আবিলতায় পাক খেয়ে বেড়াচ্ছিল, তাকে যেন একটি নূতন প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হল। উপরের উদ্ধৃতিতে 'শিকড়সুদ্ধ...উপড়ে নিয়ে আসা হল' কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ, অন্য মাটি থেকে রস আহরণের সুযোগ করে দেওয়া তাঁর মনের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয় ছিল—রবীন্দ্রজীবনে আমেদাবাদ-প্রবাসের মূল্য এইদিক থেকে বিচার্য।

অবশ্য 'জাহাজে চড়বার আগে...বিলিতি চালচলনের গোড়াপত্তন করে' নেওয়া আমেদাবাদে যাওয়ার একটি প্রধান কারণ ছিল। এই চালচলন রপ্ত করতে গিয়ে যে-সব বই পড়তে বা উপদেশ শুনতে হল, তার প্রথম ফসল ফলল জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা ভারতী-তে প্রকাশিত [পৃ ৫৮-৬৩] 'ইংরাজদিগের আদব্-কায়দা' প্রবন্ধে। এই সংখ্যায় ধারাবাহিক 'করুণা' ছাড়া রবীন্দ্রনাথের এই একটি মাত্র রচনাই মুদ্রিত হয়।

আমেদাবাদের প্রবাস-জীবন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যতটুকু উল্লেখ করেছেন, তার বেশি অনেকেরই কিছু জানা নেই। এইরূপ একটি অপ্রচারিত তথ্যের পরিচয় পাওয়া যায় সত্যেন্দ্রনাথের লেখা থেকে। বোম্বাই প্রদেশে ব্রাহ্মসমাজের অনুরূপ সংগঠন 'প্রার্থনা সমাজ'-এর শাখা নানা অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল। আমেদাবাদ শাখার অধ্যক্ষ ছিলেন ভোলানাথ সারাভাই। সত্যেন্দ্রনাথ এখানকার উপাসনায় সোৎসাহে যোগ দিতেন। তিনি লিখেছেন, 'উপাসনার সময় ভোলানাথ প্রণীত প্রার্থনামালা ব্যবহারে আসিত ও তাঁহার রচিত ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হইত, আর আমাদের বাঙ্গলা সঙ্গীত অনুবাদ করিয়া গাওয়া হইত। আমার মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথ এক সময় আমার ওখানে গিয়া দিন কতক ছিলেন। সমাজে আমরা দুই ভায়ে মিলিয়া সমস্বরে গান করিতাম।'[৬]

শাহিবাগের বিরাট প্রাসাদে রবীন্দ্রনাথকে দীর্ঘ সময় একাই কাটাতে হত। সত্যেন্দ্রনাথ আদালতে চলে গেলে কপোতের মধ্যাহ্নকূজনে মুখরিত সেই শূন্য বাড়ির ঘরে ঘরে তিনি অকারণ কৌতূহলে ঘুরে বেড়াতেন। একটি বড় ঘরের দেয়ালের খোপে সত্যেন্দ্রনাথের বইগুলি সাজানো ছিল। তার মধ্যে বড়ো বড়ো অক্ষরে ছাপা অনেক-ছবিওয়ালা টেনিসনের একটি কাব্যগ্রন্থ* ছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'সেই গ্রন্থটিও তখন আমার পক্ষে এই রাজপ্রাসাদেরই মতো নীরব ছিল। আমি কেবল তাহার ছবিগুলির মধ্যে বারবার করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতাম। বাক্যগুলি যে একেবারেই বুঝিতাম না তাহা নহে—কিন্তু তাহা বাক্যের অপেক্ষা আমার পক্ষে অনেকটা কূজনের মতোই ছিল।'[৭] এই গ্রন্থটিই সম্ভবত টেনিসনের প্রতি তাঁর আগ্রহ সৃষ্টি করে। পরবর্তীকালে তিনি টেনিসনের কবিতা অনুবাদ করেছেন, তাঁর কাব্য ও জীবনী অবলম্বনে প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

সত্যেন্দ্রনাথের লাইব্রেরিতে ডাঃ হেবর্লিন কর্তৃক সংকলিত দেবনাগরী অক্ষরে ছাপা 'কাব্যসংগ্রহ' নামে একটি গ্রন্থ ছিল।* বইটি বর্তমানে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রভবনের অভিলেখাগারে সংরক্ষিত আছে। ৫৩২ পৃষ্ঠার এই বিরাট গ্রন্থটির অধিকাংশ পৃষ্ঠায় পেনসিলের নানারকম দাগ দেখে মনে হয় বইটি মনোযোগ দিয়ে পড়া হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'এই সংস্কৃত কবিতাগুলি বুঝিতে পারা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। কিন্তু

সংস্কৃত বাক্যের ধ্বনি এবং ছন্দের গতি আমাকে কতদিন মধ্যাহ্নে অমরুশতকের মৃদঙ্গঘাতগম্ভীর শ্লোকগুলির মধ্যে ঘুরাইয়া ফিরিয়াছে।'[৭]

শাহিবাগ-প্রাসাদের চূড়ার উপরের একটি ছোটো ঘরে রবীন্দ্রনাথ বাস করতেন। বিদেশে এসেও কবিত্বের খ্যাপামি তাঁকে ত্যাগ করে নি, শুক্লপক্ষের গভীর রাত্রে নদীর ধারের প্রকাণ্ড ছাদটিতে একলা ঘুরে বেড়ানো তারই একটি নিদর্শন। অবশ্য ছাদের উপর এই নিশাচর্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নি, এই সময়েই তিনি 'নিজের সুর দেওয়া সর্বপ্রথম গানগুলি' রচনা করেন। জীবনস্মৃতি-র প্রথম পাণ্ডুলিপিতে তিনি বিষয়টি একটু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছিলেন : 'এইরূপ একটা [শুক্লপক্ষের] রাত্রে আমি যেমন খুসি ভাঙা ছন্দে একটা গান তৈরি করিয়াছিলাম—তাহার প্রথম চারটে লাইন উদ্ধৃতি করিতেছি।

"নীরব রজনী দেখ মগ্ন জোছনায়,/ ধীরে ধীরে অতি ধীরে অতি ধীরে গাও গো!

ঘুমঘোরভরা গান বিভাবরী গায়,/ রজনীর কণ্ঠসাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো!"

ইহার বাকি অংশ পরে ভদ্রছন্দে বাঁধিয়া পরিবর্তিত করিয়া তখনকার গানের বহিতে ছাপাইয়াছিলাম—কিন্তু সেই পরিবর্তনের মধ্যে, সেই সাবরমতী নদীতীরের, সেই ক্ষিপ্ত বালকের নিদ্রাহারা গ্রীষ্মরজনীর কিছুই ছিল না। "বলি ও আমার গোলাপবালা" গানটা এম্‌নি আর একরাত্রে লিখিয়া বেহাগসুরে বসাইয়া গুণগুণ করিয়া গাহিয়া বেড়াইয়াছিলাম। "শুন, নলিনী খোলো গো আঁখি" "আঁধার শাখা উজল করি" প্রভৃতি আমার ছেলেবেলাকার অনেকগুলি গান এইখানেই লেখা।'[৮]

'নীরব রজনী দেখ মগ্ন জোছনায়' গানটি ভগ্নহৃদয় কাব্যের ষষ্ঠ সর্গের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ভারতী, ফাল্গুন ১২৮৭ [পৃ ৫০৮] সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। রবিচ্ছায়া [১২৯২] গ্রন্থে 'মিশ্রআড়াঠেকা' সুর-তাল-নির্দেশ-সহ প্রথম গান হিসেবে মুদ্রিত, এখানে চারটি ছত্র বর্জিত হয়েছে, দ্র গীতবিতান ৩।৭৬৮। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বরলিপি-গীতি-মালা [১৩০৪] গ্রন্থে গানটির প্রথম স্বরলিপি প্রকাশিত হয়, দ্র স্বরবিতান ২০।

'বলি ও আমার গোলাপবালা' গানটি ভারতী, অগ্রহায়ণ [পৃ ৩৯৮] সংখ্যায় 'গোলাপবালা।/(গোলাপের প্রতি বুলবুল)' শিরোনামে 'রাগিণী-বেহাগ' সুর-নির্দেশ-সহ প্রকাশিত হয়, দ্র শৈশবসঙ্গীত অ-১। ৪৯৫-৯৬। রবিচ্ছায়া- তে 'বেহাগ-খেমটা' নির্দেশ আছে। স্বরলিপি-গীতি-মালা-য়, শেষের দিকে অনেকগুলি ছত্র বর্জিত। দ্র গীতবিতান ৩।৮৭২-৭৩, স্বরবিতান ২০।

'শুন নলিনী, খোল গো আঁখি' শৈশবসঙ্গীত গ্রন্থে 'প্রভাতী' নামে সংকলিত হয়, দ্র অ-১।৪৯১-৯২। রবিচ্ছায়া-তে সুর-তাল-নির্দেশ 'ললিত-খেমটা'। রবীন্দ্রনাথ গানটি আমেদাবাদে লেখা বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আমাদের ধারণা এটি আরও কয়েকমাস পরে বোম্বাইতে অবস্থানকালে রচিত হয়—এ-সম্পর্কে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব। এখানে উল্লেখযোগ্য, গীতবিতান-এ [৩।৮৭৪-৭৫] ও ইন্দিরা দেবী-কৃত স্বরলিপিতে [স্বরবিতান ২০] গানটির কয়েকটি ছত্র বর্জিত হয়েছে।

'আঁধার শাখা উজল করি' ভারতী, মাঘ ১২৮৭ [পৃ ৪৭৬] সংখ্যায় ভগ্নহৃদয় কাব্যের পঞ্চম সর্গে প্রমোদের গান রূপে প্রকাশিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বপ্নময়ী [24 Mar 1882] নাটকে 'গৌড়সারং—কাওয়ালি' সুর-তাল-নির্দেশ দেখা যায়, কিন্তু রবিচ্ছায়া-র নির্দেশ 'গৌড়সারং—যৎ', আবার স্বরলিপি গীতি-মালা-য় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গানটির স্বরলিপি করেছেন 'ঝাঁপতাল' ছন্দে। এই প্রসঙ্গে আর একটি গান আমাদের কৌতূহল উদ্রিক্ত করে। স্বপ্নময়ী-তে উপরোক্ত গানটির পরেই 'গৌড়সারং। কাওয়ালি' নির্দেশ-সহ 'হৃদয় মোর

কোমল অতি' [দ্র গীতবিতান । ৮৭৬] গানটি আছে। রবিচ্ছায়া-য় এই গানটি পূর্বোক্ত 'আঁধার শাখা...' গানটির অব্যবহিত পূর্বে একই সুর-তাল-নির্দেশ-সহ মুদ্রিত হয়েছে। স্বরবিতান ৩৫-এ ইন্দিরা দেবী গানটির স্বরলিপি করেছেন 'মিশ্র গৌড়সারং। ঝাঁপতাল'-এ, যার সঙ্গে পূর্বোক্ত গানটির সুরের দিক দিয়ে যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় গীতবিতান : কালানুক্রমিক সূচী ১ম খণ্ডে স্বপ্নময়ী নাটকের অন্তর্ভুক্ত করে গানটির কাল নিরূপণ ['বয়স ২০।১২৮৮।১৮৮২'][*] করেছেন। কিন্তু গানটির শেষ চারটি ছত্র 'আঁধার বনে রূপের হাসি...মরিব শেষে শুকায়ে' ভগ্নহৃদয় কাব্যে 'আঁধার শাখা...' গানটির পরে নলিনীর উক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাই আমাদের মনে হয়, দুটি গানই আমেদাবাদ বাসকালে রচিত, ভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে স্বতন্ত্র রূপ লাভ করেছে।

আমেদাবাদে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত আরও কতকগুলি গান রচনা করেছিলেন, কিন্তু সেগুলির যথার্থ কাল-নিরূপণ করা শক্ত বলে অনুল্লিখিত রইল।

প্রবাসী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ও ২১ জ্যৈষ্ঠ তারিখের হিসাবে দেখা যায় 'রবিবাবুর নিকট ছোটবাবু মহাশয়ের এক পত্র ৴০ উহার নিকট উক্ত মহাশয়ের এক পুস্তক বুক পোষ্টল০ও 'শ্রীযুক্ত রবিবাবু ও মেজবাবু মহাশয়ের নিকট/ ছোটবাবু মহাশয়ের পত্র ও পুস্তক পাঠাইবার টিকিট ব্যয় ল০'। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কোন্ বই রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রেরিত হয়েছিল তা বলা শক্ত, কারণ তাঁর নতুন কোনো বই বা পুরোনো বইয়ের কোনো সংস্করণ এ-সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায় না, [অবশ্য বইটি ভারতী-র জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা হতে পারে], কিন্তু ২৬ জ্যৈষ্ঠের হিসাবে 'রাজনারায়ণ বসুর দেওয়া বাঙ্গলাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে বক্তৃতা পুস্তক পাঠানর' কথা স্পষ্টই উল্লিখিত হয়েছে।[*] চিঠিপত্রের হিসাব একতরফা মাত্র, রবীন্দ্রনাথ কাকে কত চিঠি লিখেছিলেন জানার উপায় নেই।

কাব্য ও সংগীত-চর্চার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে বিলেতের উপযোগী করে নেওয়ার জন্যও চেষ্টা করেছেন। এইটিই ছিল তাঁর স্বভাব-বৈশিষ্ট্য—বাইরে থেকে যখন জবরদস্তি নেই, তখন অন্তর থেকেই তাগিদ দেখা দিয়েছে। তিনি লিখেছেন, 'ইংরেজিতে নিতান্তই কাঁচা ছিলাম বলিয়া সমস্তদিন ডিক্‌শনারি লইয়া নানা ইংরেজি বই পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিলাম। বাল্যকাল হইতে আমার একটা অভ্যাস ছিল, সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিলেও তাহাতে আমার পড়ার বাধা ঘটিত না। অল্পস্বল্প যাহা বুঝিতাম তাহা লইয়া আপনার মনে একটা কিছু খাড়া করিয়া আমার বেশ একরকম চলিয়া যাইত।'[৯] পড়াশুনো আরম্ভ হয়েছিল কলকাতায় থাকতেই। ১৩ বৈশাখের হিসাবে দেখা যায় : 'ব০ বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ দ০ উহার পুস্তক ক্রয় জন্য লয়েন...১১ল০'; আবার ২৬ জ্যৈষ্ঠের হিসাব : 'ব০ Messers Thacker Spink & Co./দ০ রবিবাবুর জন্য ইংরাজি কেতাপ এক সেট...২৭'—বইগুলি সম্ভবত আমেদাবাদ যাত্রার আগেই কেনা হয়েছিল, বিল মেটানো হয়েছে পরে। বই কেনার হিসাব ক্যাশবহি-তে আরও পাওয়া যায় : ৪ শ্রাবণ 'রবিবাবুর জন্য পুস্তক ক্রয় ও ঐ পুস্তক সকল বম্বে পাঠানর ব্যয়...১৪ ল০ আবার ২৫ শ্রাবণ 'রবিবাবুর জন্য বম্বে পাঠানর নিমিত্তে/ কয়েকখণ্ড পুস্তক ক্রয়'... ৪ল০' ও 'রবিবাবুর নিকট বম্বে। পুস্তক পাঠাইবার বুক পোষ্ট মাশুল/ ও পত্র একখানা পাঠাইবার টিকিট... ।ল৬'—বোঝা যায় বইগুলি আমেদাবাদ থেকে সত্যেন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে কিনে পাঠানো হয়। বইগুলির নাম এখানে উল্লিখিত হয় নি, ফলে কি ধরনের বই রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে পড়তেন তা জানার

সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি। কিন্তু জীবনস্মৃতি-র প্রথম পাণ্ডুলিপিতে এ সম্বন্ধে কিছুটা আভাস পাওয়া যায় : "ইংরাজিতে আমি যে নিতান্তই কাঁচা ছিলাম বিলাত যাইবার পূর্বে সেটা আমার একটা বিশেষ ভাবনার বিষয় হইল। মেজদাদাকে বলিলাম, 'আমি ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাস বাংলায় লিখিব, আমাকে বই আনিয়া দিন।' তিনি আমার সম্মুখে টেন্ প্রভৃতি গ্রন্থকার রচিত ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসসংক্রান্ত রাশি রাশি গ্রন্থ উপস্থিত করিলেন। আমি তাহার দুরূহতা বিচারমাত্র না করিয়া অভিধান খুলিয়া পড়িতে বসিয়া গেলাম। সেই সঙ্গে আমার লেখাও চলিতে লাগিল। এমন কি, অ্যাংলো স্যাক্সন ও অ্যাংলো নর্মান সাহিত্য-সম্বন্ধীয় আমার সেই প্রবন্ধগুলাও ভারতীতে বাহির হইয়াছিল। এইরূপ লেখার উপলক্ষ্যে আমি সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মেজদাদার কাছারি হইতে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত একান্ত চেষ্টায় ইংরেজি গ্রন্থের অর্থ সংগ্রহ করিয়াছি।"[১০] ৮ ভাদ্র তারিখের একটি হিসাবে দেখা যায় : 'ব° Messrs Thacker Spink & Co./ দ° রবীবাবুর পুস্তকের এক বিল/ (মেজবাবুর প্রেরিত) শোধ দেওয়া যায়...৩৬ল°—রবীন্দ্রনাথ যে বইগুলির কথা লিখেছিলেন, এগুলি সম্ভবত সেই বই। যদিও হিসাবটি ভাদ্র মাসের, তবু আমরা স্বচ্ছন্দে অনুমান করতে পারি যে বইগুলি তিনি আষাঢ়ের শেষে বা শ্রাবণের গোড়াতেই পেয়ে গিয়েছিলেন, নতুবা শ্রাবণ-সংখ্যা ভারতী-তে 'স্যাকসন জাতি ও অ্যাঙ্গলো স্যাকসন সাহিত্য' প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়া সম্ভব হত না।

এই সময়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য ক্যাশবহি থেকে পাওয়া যায়। আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথ আই. সি. এস. পরীক্ষার নিয়মানুযায়ী তাঁর বয়সের প্রমাণপত্র ['certificate of my age'] পাবার জন্য বেঙ্গল গবর্মেন্টের সেক্রেটারির কাছে 12 Mar 1878 তারিখে একটি আবেদনপত্র পেশ করেন। মাত্র সাত দিনের মধ্যে 20 Mar সরকারি দপ্তর থেকে তাঁর জন্যে একটি সার্টিফিকেট মঞ্জুর করা হয়, রবীন্দ্রনাথ তখন কলকাতাতেই ছিলেন। অথচ ২৯ আষাঢ় [শুক্র 12 Jul 1878] তারিখের হিসাবে দেখা যায় : 'বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিনের সার্টিফিকেট/বম্বে আমেদাবাদে মেজবাবু মহাশয়ের নিকট মেজবাবু মহাশয়ের নামের এনভেলোপ মধ্যে রেজেষ্টারি করিয়া পাঠাইবার ব্যয় ।ল°'। কিন্তু যে সার্টিফিকেট চৈত্র মাসের মধ্যেই জোড়াসাঁকোয় পৌঁছে গিয়েছিল, সেটি এত দেরি করে আমেদাবাদে কেন প্রেরিত হল, তার কারণ বোঝা শক্ত।

আষাঢ়-সংখ্যা ভারতী [২।৩]-তে রবীন্দ্রনাথের 'দিক্-বালা' কবিতাটি প্রকাশিত হয় [পৃ ১০৩-০৫], পরে ভারতী-র পাঠ থেকে প্রথম ষোলোটি ছত্র বর্জন করে সংকলিত হয় শৈশব সঙ্গীত কাব্যগ্রন্থে [দ্র অ-১। ৪৫৩-৫৫]। কবিতাটির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি, রচনাকালও অজ্ঞাত। তবে মনে হয় প্রকাশের বেশ কিছুকাল আগে কবিতাটি রচিত হয়েছিল।

সত্যেন্দ্রনাথ-লিখিত 'তুকারাম' প্রবন্ধের তৃতীয় ও শেষ কিস্তি এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এটির মধ্যেও তুকারামের অভঙ্গের অনেকগুলি অনুবাদ আছে, যার মধ্যে নিম্নোদ্ধৃত তিনটির পাণ্ডুলিপি মালতীপুঁথি-তে দেখা যায়:

[১] 'দাও গো বিদায় এবে যাই নিজ ধামে' [মালতীপুঁথি 11/৬ক] দ্র রূপান্তর । ১২৩
[২] 'বাহিরে ও ঘরে মোর আছ যারা যারা' [ঐ 11/৬ক] দ্র ঐ । ১২৩
[৩] 'তুকার পরীক্ষা শেষ হয়' [ঐ 11/৬ক] দ্র ঐ । ১২৭

তৃতীয় পদটির পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মুদ্রিত পাঠের যথেষ্ট প্রভেদ আছে। এই পরিবর্তন সম্ভবত সত্যেন্দ্রনাথের করা। পাণ্ডুলিপিতে একই পৃষ্ঠায় উপরোক্ত তিনটি পদ ছাড়া আরও দুটি অনুবাদ আছে, যেগুলির মাত্র ৮টি ছত্র 'শঙ্খচক্র ধরি আইলেন হরি' প্রথম ছত্র-যুক্ত পদটিতে গৃহীত হয়েছে। সেগুলি হল :

'ধরায় পাণ্ডরি আছে লোকদের তরে' [মালতীপুঁথি 11/৬ক, র-জি ১।২৩] দ্র রূপান্তর । ১২৫
'বন্ধুগণ শুন—রামনাম কর সবে—' [ঐ 11/৬ক, ঐ ১।২৩] দ্র ঐ ।১২৫

এগুলি সম্পর্কে আমরা আগেই বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

এই সংখ্যায় 'সম্পাদকের বৈঠক' [পৃ ১৪০-৪৩] বিভাগে তিনটি অনুবাদ-কবিতা প্রকাশিত হয়

[১] 'গভীর গভীরতম হৃদয় প্রদেশে' [বায়রন]

[২] যাও তবে প্রিয়তম সুদূর সেথায়' [মূর]*

[৩] 'আবার আবার কেন রে আমার' [বায়রন]

অনুবাদগুলি রবীন্দ্রনাথ-কৃত কিনা নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই, তবে অনুবাদের ধরন তাঁরই মতো।

মালতীপুঁথির 56/২৯খ পৃষ্ঠায় শিরোনাম-হীন একটি কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়, যার নীচে রচনার স্থান-কাল নির্দেশিত হয়েছে : 'Ahmedabad/1878—July 6th/আষাঢ় ২৩শে শনিবার।' কবিতাটি শুরু হয়েছে এইভাবে:

> 'হে কবিতা—হে কল্পনা—
> জাগাও—জাগাও দেবি উঠাও আমারে দীন হীন—
> ঢাল এ হৃদয় মাঝে জ্বলন্ত-অনলময় বল—
> দিনে দিনে অবসাদে হইতেছি অবশ মলিন
> নির্জীব এ হৃদয়ের দাঁড়াবার নাই যেন বল!...'

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'আমার মনে হয় ইহাও ইংরেজি হইতে অনুবাদ।'[১১] অবশ্য এটি তাঁর অনুমান মাত্র, অনুমানের সপক্ষে তিনি কোনো যুক্তি দেখান নি। কবিতাটি বহুকাল পরে বালক পত্রিকার চৈত্র ১২৯২ সংখ্যায় [পৃ ৫৮৫-৮৬] 'অবসাদ। (বাল্যকালের লেখা)' শিরোনামায় কিছু-কিছু পরিবর্তন-সহ প্রকাশিত হয়। সজনীকান্ত দাস লিখেছেন, 'আমার অনুমান এই কবিতার রচনাকাল আরও অন্ততঃ চার-পাঁচ বৎসর পূর্বে, কবিতাটি "অভিলাষ" কবিতার সমসাময়িক হওয়াই সম্ভব।'[১২] তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তিনি মালতীপুঁথি দেখেন নি। কিন্তু আমরা উক্ত পাণ্ডুলিপি দেখেছি এবং অনেক পাঠকও হয়তো এই পৃষ্ঠাটির আলোকচিত্রলিপি দেখেছেন, সুতরাং সজনীকান্তের অনুমানের বিরুদ্ধে যুক্তি সাজানোর কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই।

প্রবোধচন্দ্র সেন রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা প্রথম খণ্ডে 'মালতীপুঁথি পাণ্ডুলিপি-পরিচয়' প্রবন্ধে কবিতাটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে Oct 1877-এ রচিত 'শৈশবসঙ্গীত' ও কবিকাহিনী রচনা-দুটির সঙ্গে 'অবসাদ' কবিতা একই ভাবসূত্রে গ্রথিত—তিনটিতেই 'কল্পনাবালা'কে সম্বোধন করে কবিচিত্তের বেদনা ও বিক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে। কবিকাহিনীর মধ্যে আখ্যায়িকার অন্তরালে এই নৈরাশ্য ও বেদনা অনেকটা প্রচ্ছন্ন, সুতরাং ভারতী-তে প্রকাশিত হবার বিশেষ কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু 'শৈশবসঙ্গীত' ও 'অবসাদ' কবিতায়

ব্যক্তিগত দুঃখবেদনা এত প্রত্যক্ষ যে কিশোর-কবি সাহস পান নি কবিতা দুটি পত্রিকায় প্রকাশ করতে। অনেক পরে শৈশবসঙ্গীত কাব্যগ্রন্থে [১২৯১] প্রথম কবিতাটি 'অতীত ও ভবিষ্যৎ' নামে প্রকাশিত হয় [প্রবোধবাবু অবশ্য বলেছেন যে পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত কবিতার শেষাংশটি মুদ্রিত কবিতায় বাদ গেছে—সেটি ঠিক নয়, তিনি শেষাংশ বলতে যা বুঝেছেন সেটি একটি স্বতন্ত্র কবিতা]। পরের বৎসর দ্বিতীয় কবিতাটি বালক পত্রিকায় মুদ্রিত হয়—'বাল্যকালের লেখা' বলে কবিতায় প্রকাশিত মনোভাবকে একটু লঘু করে দেওয়ার প্রয়াসও লক্ষণীয়—কিন্তু কবিতাটি কোনো কাব্যগ্রন্থে স্থান লাভ করে নি, শতবার্ষিক সংস্করণ রবীন্দ্র-রচনাবলী-র চতুর্থ খণ্ডে শৈশবসঙ্গীত-এর পরিশিষ্ট-রূপে গ্রন্থভুক্ত হয়।

বালক-এ প্রকাশের সময় রবীন্দ্রনাথ কবিতাটির নামকরণ করেন 'অবসাদ', কিন্তু এটিও 'অতীত ও ভবিষ্যৎ' নামে—কিংবা প্রবোধচন্দ্র-কথিত 'সংকল্প' নামে—অভিহিত হতে পারত। কবিতাটির প্রথমাংশে যদিও অবসাদ ও হতাশার সুরই প্রবল, কিন্তু এর শেষাংশে কবি গভীর আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ—

পৃথিবীর কর্ম্মক্ষেত্রে যুঝিব, যুঝিব দিনরাত,
কালের প্রস্তর পটে লিখিব অক্ষয় নিজ নাম
অবশ নিদ্রায় পড়ি করিব না এ শরীর পাত,
মানুষ জন্মেছি যবে করিব কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান,
অগম্য উন্নতিপথে পৃথ্বিতরে গঠিব সোপান।

—পৃথিবীর অন্য এক প্রান্তে ভিন্ন পরিবেশের মধ্যে নিজের যোগ্যতা প্রতিপন্ন করার সুযোগ উপস্থিত হয়েছে, নিজের চেষ্টায় বিভিন্ন দুরূহ ইংরেজি গ্রন্থ পাঠের ফলে ইংরেজি ভাষাও অনেকটা আয়ত্তের মধ্যে, সুতরাং সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন দেখায় কোনো বাধা নেই। এইসব বিচিত্র মনোভাবের সংমিশ্রণে কবিতাটি রবীন্দ্র-জীবনে ও সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দাবি করতে পারে।

কবিতাটির আর-একটি লক্ষণীয় বিষয়, পাণ্ডুলিপিতে এর শেষ ছত্রটি 'কর গো জীবন দান তোমার ও অমৃত-নিষেকে ॥ ১ ॥'—এইভাবে লেখা। এখানে কবিতাটিকে '॥ ১ ॥'-চিহ্নিত করার একটিই অর্থ হতে পারে যে, এটিকে হয়তো আরও দীর্ঘ আকারে লেখার ভাবনা তাঁর মনে ছিল, কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁর সেই সংকল্প কার্যে পরিণত হয় নি। একই পাণ্ডুলিপিতে লিখিত 'প্রথম সর্গ'-চিহ্নিত কবিতাটির মতোই মাঝপথে পরিত্যক্ত হলেও এর মধ্যে একটি গীতিকাব্যিক সম্পূর্ণতার জন্য পরবর্তীকালে প্রকাশ-সৌভাগ্য লাভ করেছে, কিন্তু 'প্রথম সর্গ' পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাতেই আবদ্ধ থেকে গেছে তার মধ্যে একটি কাহিনীর আভাস ছিল বলে।

ভারতী-র শ্রাবণ সংখ্যায় [২।৪] রবীন্দ্রনাথের তিনটি রচনা প্রকাশিত হয় :

পৃ ১৫৩-৬৫ 'করুণা' ১৯-২২ পরিচ্ছেদ দ্র করুণা ২৭।১৬১-৭৫

১৬৫-৭০ 'প্রতিশোধ' দ্র শৈশবসঙ্গীত। অ-১।৪৫৫-৬৪

১৭১-৮৪ 'স্যাক্সন জাতি ও অ্যাঙ্গলো স্যাক্সন সাহিত্য'

শৈশবসঙ্গীত কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ নিজে 'ফুলবালা'কে 'গাথা' বলে চিহ্নিত করলেও 'প্রতিশোধ'-ই প্রকৃত অর্থে তাঁর প্রথম গাথা-কবিতা [Ballad]। আর্য্যদর্শন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশের সময় 'ফুলবালা' 'গীতিকা' নামে অভিহিত হয়েছিল, কার্তিক সংখ্যা ভারতী-তে প্রকাশিত এর দ্বিতীয় অংশ মিলিয়ে শৈশবসঙ্গীত-এ কবিতাটির

যে সম্পূর্ণ রূপ দেখা যায়, তাকেও একই নামে চিহ্নিত করলে ভুল হবে না। এর কাহিনীর সূত্রটি এত ক্ষীণ ও নাটকীয়তা-বিবর্জিত যে এই জাতীয় রচনাকে গাথা বলা ঠিক নয়, বরং পূর্ব-প্রদত্ত 'গীতিকা' নামটিই যথাযথ, আষাঢ় সংখ্যার 'দিক্‌বালা'ও এই শ্রেণীর রচনা। অপরপক্ষে 'প্রতিশোধ'-এর কাহিনী নাটকীয় সংঘাতে পূর্ণ—ভারতী-র পাঠে গল্প-উপন্যাসের মতো তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত, যদিও শৈশবসঙ্গীত-এ পরিচ্ছেদ ভাগগুলি তুলে দেওয়া হয়েছে। মালতীপুঁথির তিনটি পৃষ্ঠায়—63/৩৩ক, 64/৩৩খ এবং 65/৩৪ক—'প্রতিশোধ' গাথাটির সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়, পাণ্ডুলিপির পাঠ সামান্য বর্জিত ও পরিবর্তিত হয়ে ভারতী ও শৈশবসঙ্গীত-এ স্থান লাভ করেছে। গাথাটির রচনা-কাল নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করা কঠিন হলেও, আমাদের অনুমান, কবি-কাহিনী রচনা শেষ হওয়ার [১২ কার্তিক ১২৮৪ : 27 Oct 1877] অব্যবহিত পরেই এটি রচিত হয়েছিল, হয়তো ঐ বৎসরের অগ্রহায়ণ-পৌষ মাস [Dec 1877] 'প্রতিশোধ'-এর রচনাকাল। এরূপ অনুমানের কারণ, মালতীপুঁথির 60/৩১খ পৃষ্ঠায় কবি-কাহিনী যেখানে শেষ হয়েছে, তার পরেই 'শনিবার/ অগ্রহায়ণ/১৮৭৭' তারিখ দিয়ে 'পাষাণ হৃদয়ে কেন সঁপিনু হৃদয়?' ও আরও দুটি ছোটো কবিতা ঐ পৃষ্ঠায় লেখা। পরের পৃষ্ঠা দুটিতে [61/৩২ক ও 62/৩২খ] জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭ সংখ্যা ভারতী-তে প্রকাশিত 'দুদিন' কবিতার খসড়া, যা সম্ভবত বিলাত-প্রবাসকালে রচিত—সুতরাং স্পষ্টতই পাতাটি স্খলিত হয়ে অস্থানে প্রবিষ্ট হয়েছে। এর পরের পৃষ্ঠাতে আরম্ভ হয়েছে উক্ত 'প্রতিশোধ' গাথাটি। আরও লক্ষণীয়, এই সময়টি রবীন্দ্রনাথের গাথা-রচনার পর্ব হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। কারণ আমাদের ধারণা, 'প্রতিশোধ' 'লীলা' ও 'অপ্সরা প্রেম' এই তিনটি গাথা এই সময়ে পর পর লিখিত হয়েছে। এ ব্যাপারেও মালতীপুঁথি-র সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য। 65/৩৪ক পৃষ্ঠায় 'প্রতিশোধ' গাথাটি শেষ হয়েছে, পরের পৃষ্ঠা 66/৩৪খ-তে 'লীলা'র সূত্রপাত, যার শেষটুকু পাওয়া যায় 33/১৮ক ও 34/১৮খ পৃষ্ঠায়—এ পাতাটিও স্খলিত হয়েছিল এমন অনুমান অযৌক্তিক নয়—এর পরের পাতায় 67/৩৫ক ও 68/৩৬খ পৃষ্ঠায় 'অপ্সরাপ্রেম' গাথাটির খসড়া রূপটি পাওয়া যায়, অর্থাৎ আমাদের অনুমান অনুযায়ী মালতীপুঁথি-র উক্ত পৃষ্ঠাগুলির পৌর্বাপর্য হবে—60/৩১খ [কবি-কাহিনী-র শেষাংশ ও অন্যান্য কবিতা], 63/৩৩ক, 64/৩৩খ, 65/৩৪ক [প্রতিশোধ' গাথা], 66/৩৪খ, 33/১৮ক, 34/১৮খ ['লীলা' গাথা], 67/৩৫ক এবং 68/৩৬খ ['অপ্সরা প্রেম' গাথা]। অবশ্য মনে রাখা দরকার, মালতীপুঁথি-র খসড়া থেকে প্রেস-কপি তৈরি করার সময়ে [এবং হয়তো-বা প্রুফেও] কবিতাগুলির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। শৈশবসঙ্গীত কাব্যগ্রন্থে সংকলন করার সময়ে আর এক দফা পরিবর্তন করা হয়—যার বেশিরভাগই সংশোধন ও পরিবর্জন, 'অপ্সরা-প্রেম' ছাড়া অন্যগুলিতে সংযোজন হয় নি বললেই চলে। আগ্রহী পাঠক 'রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা' দ্বিতীয় খণ্ডে [১৩৭৫] চিত্তরঞ্জন দেব-কৃত 'তথ্য-সংকলন' [পৃ ১০৬-৩১] অংশে এ-বিষয়ে প্রচুর তথ্য পাবেন।

'স্যাক্সন জাতি ও অ্যাঙ্গলো স্যাক্সন সাহিত্য' প্রবন্ধটি রচনার পটভূমি আগে রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বর্ণিত হয়েছে। সূচনাতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনার উদ্দেশ্যটি ব্যক্ত করেছেন; 'এই প্রবন্ধে স্যাক্সন জাতির আচার ও ব্যবহার, ভাষা ও সাহিত্য বিস্তৃত-রূপে বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যে ভিত্তির উপর আধুনিক ইংরাজি মহা-সাহিত্য স্থাপিত আছে সেই অ্যাঙ্গলো স্যাক্সন ভাষা ও সাহিত্য পরীক্ষা করিয়া দেখিতে এবং যে ভিত্তির উপর সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর স্বরূপ ইংরাজ জাতি আদৌ স্থাপিত, সেই স্যাক্সনদের রীতিনীতি সমালোচনা করিয়া দেখিতে আজ আমরা প্রবৃত্ত হইলাম। কিড্‌মন, বিউল্ফ্ [যদ্দৃষ্টং], মাস [?] টেন* প্রভৃতির সার সংগ্রহ করিয়া আজ আমরা পাঠকদিগকে উপহার দিতেছি।' এরপরে তিনি ইংলণ্ডের ইতিহাসে রোমান

বিজয়, অ্যাংলো-স্যাক্সনদের আগমন ইত্যাদি বর্ণনা করে *Beowulf* মহাকাব্যের সংক্ষিপ্তসার ও কয়েকটি অংশের গদ্যানুবাদ এবং কিডমনের [Cædmon]*Genesis* ও *Exodus* কাব্যের কয়েকটি অংশের পদ্যানুবাদ করেছেন। পদ্যানুবাদগুলির একটি ছাড়া বাকিগুলির খসড়া মালতীপুঁথি-র 23/১৩ক পৃষ্ঠাতে দেখা যায়; মালতীপুঁথি-র পাঠের সঙ্গে ভারতী-র পাঠের সামান্য পার্থক্য আছে। বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ পদ্যানুবাদের খসড়াগুলি প্রথমে মালতীপুঁথি-তেই করেছিলেন, পরে প্রবন্ধের মধ্যে ব্যবহার করার সময় কিছু কিছু পরিবর্তন করেন। প্রবন্ধটি পড়লে বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ Taine বা অন্য কারো গ্রন্থ থেকে এটি অনুবাদ করেন নি—আগে বিষয়টিকে আয়ত্ত করে নিয়েছেন, পরে নিজের মতো করে তাকে পরিবেশন করেছেন—অল্প ইংরেজি-জানা সতেরো বছরের কিশোরের পক্ষে এটি কম কৃতিত্বের ব্যাপার নয়। প্রবন্ধটি এখনও পর্যন্ত কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয় নি।

সম্ভবত এই শ্রাবণ মাসেই রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন ইংরেজি গ্রন্থ-অবলম্বনে 'বিয়াত্রীচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য', এবং 'পিত্রার্কা ও লরা' প্রবন্ধগুলি রচনা করেছিলেন, পরে ভারতী-র বিভিন্ন সংখ্যায় সেগুলি প্রকাশিত হয়। 'ফুলবালা' গীতিকার দ্বিতীয়ার্ধের অন্তত একটি গান—'দেখে যা দেখে যা দেখে যা লো তোরা সাধের কাননে মোর'—এবং ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী-র একটি কবিতা—'গহির নীদমে অবশ শ্যাম মম'—সম্ভবত এই সময়ে লেখা, কারণ 23/১৩ক পৃষ্ঠায় কিডমনের কবিতার অনুবাদ করার পর উল্‌টো দিকের 24/১৩খ পৃষ্ঠায় এই রচনা দুটি দেখা যায়; এর পরেই শুরু হয়েছে 'পিত্রার্কা ও লরা' প্রবন্ধের জন্য পেত্রার্কার অনেকগুলি কবিতার অনুবাদ [যদিও মালতীপুঁথি-তে পৃষ্ঠাগুলির পৌর্বাপর্য রক্ষিত না হওয়ায় অনুবাদগুলি বিক্ষিপ্ত পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়], সুতরাং অনুমান করা যায় এদেরই অন্তর্বর্তীকালে উক্ত গান দুটি রচিত হয়েছিল। 'গহির নীদমে...' পদটি ভারতী-তে প্রকাশিত হয় নি, একেবারেই গ্রন্থে [১২৯১] সংকলিত হয়।

আমাদের বিশ্বাস, 'ফুলবালা' গীতিকার পুরো দ্বিতীয়ার্ধটি এই সময়ে লেখা। এরূপ সিদ্ধান্তের কারণ, মালতীপুঁথি-র 10/৫খ পৃষ্ঠায় পোত্রার্কার কাব্যানুবাদের পাশে 'আজি পূরণিমা! নিশি/ তারকা কাননে বসি' প্রভৃতি ১৯টি ছত্রের একটি কবিতার খসড়া [দ্র রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা ১।২৮২] দেখা যায় যেটি উক্ত 'ফুলবালা' গীতিকার দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই কিছু পরিবর্তিত আকারে ব্যবহৃত হয়েছে । খসড়া কবিতাটি যদিও উপর থেকে নীচের দিকে দুটি লাইন টেনে কেটে দেওয়া হয়েছে, তবু মনে হয় মালতীপুঁথি-রই কোনো হারানো পৃষ্ঠায় বা অন্যত্র এই ছত্রগুলি নকল করে রবীন্দ্রনাথ বাকি অংশটি সম্পূর্ণ করেছিলেন এবং শেষে পূর্ব-রচিত 'দেখে যা দেখে যা' গানটি যোগ করে দিয়েছিলেন। উল্লেখযোগ্য, এই অংশের মধ্যেই 'গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে মধুপ হোতা যাস নে' গানটি রয়েছে—এটির কোনো পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি।

ভাদ্র ১২৮৫ সংখ্যা [২।৫] ভারতী-তে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি প্রকাশিত হয় :

পৃ ২০১-১২ 'বিয়াত্রীচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য' দ্র বি. ভা. প. মাঘ-চৈত্র ১৩৭২।১৯৩-২০৫

২২৬-৩৪ 'করুণা' ২৩-২৭শ পরিচ্ছেদ [শেষ কিস্তি] দ্র করুণা ২৭।১৭৫-৮৪

এই সংখ্যার ২৩৪-৪০ পৃষ্ঠায় 'কবিতা-পুস্তক।/ শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।' শিরোনামে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্ত কাব্যগ্রন্থের একটি সমালোচনা রবীন্দ্রনাথের লেখা বলে অনুমান করা হয়েছে। [দ্র রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য। ২২৫], আমাদের ধারণা, অনুমানটি যথার্থ নয়। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী গ্রন্থটি প্রকাশের তারিখ 18 Aug 1878 [৩ ভাদ্র ১২৮৫]। যদি এই তারিখ ঠিক হয়, তবে রবীন্দ্রনাথের কাছে বইটি প্রেরণ

করা ও তাঁর দ্বারা সমালোচিত হয়ে ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি পত্রিকায় প্রকাশ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাছাড়া স্কট, বায়রন, শেক্সপীয়র এবং রাম বসু, হরু ঠাকুর প্রভৃতি কবিওয়ালাদের রচনার সঙ্গে যেরূপ স্বাচ্ছন্দ্য-সহকারে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে, এই ক্ষমতা রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত তখনও আয়ত্ত করতে পারেন নি। মনে রাখা দরকার এই সময়ে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী তাঁর সঙ্গে ছিলেন না।

'বিয়াত্রীচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের পাঠরুচির একটি নিদর্শন। ইংরেজি ভাষা-চর্চার প্রয়োজনে কেবল ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসই নয়, ইংরেজি অনুবাদে য়ুরোপীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি ও তাঁদের কাব্যের সঙ্গে তিনি পরিচিত হবার চেষ্টা করেছেন। এখানেও একটি ব্যাপার লক্ষণীয়। দান্তে, পোত্রার্কা ইত্যাদি মহাকবিদের প্রেমকাব্য ও তাঁদের প্রেমের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতেই তিনি বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া অজস্র গদ্য ও পদ্যানুবাদের মাধ্যমে কেবল দান্তের প্রেমকেই তিনি পাঠকের কাছে বর্ণনা করেন নি, এই অনুবাদগুলি কাব্যভাষা আয়ত্ত করার দিক থেকেও তাঁকে সাহায্য করেছে। কোনো কোনো সনেটের অনুবাদে মিলের যে বৈচিত্র্য তিনি দেখিয়েছেন, তা তাঁর নিজের লেখা সনেটেও দেখা যায় না। আর একটি জিনিস তথ্যের দিক দিয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—এই সময়ে রচিত প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথ যে কাব্যানুবাদগুলি করেছেন তার বেশির ভাগ প্রথমে মালতীপুঁথি-র পৃষ্ঠাতেই করা হয়েছিল, কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে ব্যবহৃত তেরোটি অনুবাদের একটিরও সাক্ষাৎ মালতীপুঁথি-তে পাওয়া যায় না। ব্যাপারটি একটু বিস্ময়কর। সুতরাং সিদ্ধান্ত করতে হয়, হয় পাণ্ডুলিপির উক্ত অনুবাদ-সংকলিত পৃষ্ঠাগুলি হারিয়ে গেছে, নতুবা রবীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে আরও একটি খাতা রচনা-কার্যে ব্যবহার করতেন। এই প্রবন্ধটিও বিশ্বভারতী পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হওয়া ছাড়া কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয়নি।*

করুণা উপন্যাস ভারতী-র বর্তমান সংখ্যাতেই মোট সাতাশটি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত হয়। উপন্যাসটির পুস্তকাকারে প্রকাশ করার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ প্রায় ছ-বছর পরে [আশ্বিন ১২৯১] চন্দ্রনাথ বসুর পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবৎকালে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। বহুকাল পরে গল্পগুচ্ছ চতুর্থ খণ্ড [১৩৭০]-এর পরিশিষ্টে উপন্যাসটি পুনর্মুদ্রিত হয়। বর্তমানে এটি রবীন্দ্র-রচনাবলী-র সপ্তবিংশ খণ্ড [প্রথম প্রকাশ : ২৫ বৈশাখ ১৩৭২। পৃ ১১৭-৮৪]-এর অন্তর্ভুক্ত।

রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত ভাদ্র মাসের গোড়াতেই [Aug 1878] আমেদাবাদ ত্যাগ করে বোম্বাইতে ডাঃ আত্মারাম পাণ্ডুরঙ-এর পরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ২৬ শ্রাবণ [10 Aug] 'রবিবাবুর নিকট Ahmedabad প্রসন্নকুমার বিশ্বাসের একপত্র লেখার টিকিট ব্যয়'-এর হিসাব পাওয়া যায়, সুতরাং এই সময় রবীন্দ্রনাথ আমেদাবাদেই ছিলেন বলে মনে হয়। এর পরেই তিনি বোম্বাই যাত্রা করেন। জীবনীস্মৃতি-তে তিনি বোম্বাই-বাস সম্পর্কে বিশেষ কিছু লেখেন নি, বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন ছেলেবেলা-তে : 'এখানে, [আমেদাবাদ] কিছুদিন থাকার পর মেজদাদা মনে করলেন, বিদেশকে যারা দেশের রস দিতে পারে সেইরকম মেয়েদের সঙ্গে আমাকে মিলিয়ে দিতে পারলে হয়তো ঘরছাড়া মন আরাম পাবে। ইংরেজি ভাষা শেখবারও সেই হবে সহজ উপায়। তাই কিছুদিনের জন্য বোম্বাইয়ের কোনো গৃহস্থঘরে আমি বাসা নিয়েছিলুম।'[১৩] পাণ্ডুরঙ-পরিবার বোম্বাই অঞ্চলে ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ডাঃ আত্মারামের ভ্রাতা দাদোবা পাণ্ডুরঙ 1849-এ 'জাতিভেদ প্রথা ও তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য কুরীতির উচ্ছেদ সাধন উদ্দেশ্যে' 'পরমহংস সভা' স্থাপন করেন। এই সভা ভেঙে গেলে ডাঃ আত্মারাম ও তাঁর অনুগামীরা 1867-এ 'প্রার্থনা সমাজ' প্রতিষ্ঠা

করেন। সত্যেন্দ্রনাথ 1864-এ যখন সস্ত্রীক প্রথম বোম্বাইতে যান, তিনি মানকজী করসদজী নামক এক সম্ভ্রান্ত পারসী ভদ্রলোকের গৃহে আশ্রয় নেন। এইখানেই ডাঃ আত্মারাম পাণ্ডুরঙের ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা হয়। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীও তাঁর 'স্মৃতিকথা'য় এঁদের সম্পর্কে বলেছেন, 'ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরং বলে আর এক মারহাট্টি পরিবারের সঙ্গেও আমাদের খুব ভাব হয়েছিল। আনা, দুর্গা ও মানিক বলে তাঁর তিনটি মেয়ে ছিল।'[১৪] ডাঃ আত্মারাম তাঁর তিন মেয়েকেই ইংলণ্ড থেকে বিদ্যাশিক্ষা করিয়ে এনেছিলেন। এঁদের মধ্যে আনা তড়খড়-এর[১৫] উপরে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। তিনি লিখেছেন, 'সেই বাড়ির কোনো একটি এখনকার কালের পড়াশুনোওয়ালা মেয়ে ঝক্‌ঝকে করে মেজে এনেছিলেন তাঁর শিক্ষা বিলেত থেকে।[*] আমার বিদ্যে সামান্যই, আমাকে হেলা করলে দোষ দেওয়া যেতে পারত না। তা করেন নি। পুঁথিগত বিদ্যা ফলাবার মতো পুঁজি ছিল না, তাই সুবিধে পেলেই জানিয়ে দিতুম যে কবিতা লেখবার হাত আমার আছে। আদর আদায় করবার ঐ ছিল আমার সবচেয়ে বড়ো মূলধন। যাঁর কাছে নিজের এই কবিআনার জানান দিয়েছিলেন, তিনি সেটাকে মেপেজুখে নেন নি, মেনে নিয়েছিলেন।'[১৬] রবীন্দ্রনাথের এই কথার সমর্থন পাওয়া যায় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত কবিকাহিনী উপহার পেয়ে 26 Nov 1878 [মঙ্গল ১১ অগ্র°] তারিখে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে লেখা আনা-র একটি পত্রে। এই পত্রে তিনি জানান, রবীন্দ্রনাথ ভারতী-র পৃষ্ঠা থেকে কবি-কাহিনী কাব্যটি আনাকে পাঠ করে শোনাতেন ও অনুবাদ করে বুঝিয়ে দিতেন; রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর বাংলা-শিক্ষার সূচনাও হয়েছিল এবং বিলেতযাত্রার পূর্বে ভারতী-র ঐ বিশেষ সংখ্যাগুলি তিনি আমাকে উপহার দিয়ে যান। কালানুক্রমিকতার একটু ত্রুটি হলেও আমরা সমগ্র পত্রটি এখানে উদ্ধৃত করছি :

Bombay
65, Kandevadi
Novr. 26th [1878]

Dear Sir,

I have to apologise to you for having kept your kind letter of the 11th inst., with the copy of "কবিকাহিণী" unacknowledged so long; but various causes, in the shape of illness, have combined to hinder me from doing so till the present moment, and even as I write this, I have fever upon me.

Thank you very much indeed for sending me the entire publication of "কবিকাহিণী" though I have the poem myself in the numbers of "ভারতী", in which it was first published, and which Mr. Tagore was good enough to give me before going away: and have had it read and translated to me, till I know the poem almost by heart.

You are under a misapprehension when you suppose that I have "learnt" Bengali. I was only a beginner, for ill-health has come in the way of my studies, and I have had to cease continuing them.

Believe me

Yours sincerely

Ana Turkhud.*

—মূল পত্রটি আমরা দেখি নি, সুতরাং আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয় 'কবিকাহিণী' 'ভারতী' এই শব্দগুলি বঙ্গাক্ষরেই লিখিত কিনা, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বোম্বাইয়ের প্রবাস-জীবন এবং আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটি বোঝার পক্ষে পত্রটি অমূল্য।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "কবির কাছ থেকে একটা ডাকনাম চাইলেন, দিলেম যুগিয়ে—সেটা ভালো লাগল তাঁর কানে। ইচ্ছে করেছিলেম সেই নামটি আমার কবিতার ছন্দে জড়িয়ে দিতে। বেঁধে দিলুম সেটাকে কাব্যের গাঁথুনিতে; শুনলেন সেটা ভোরবেলাকার ভৈরবী সুরে; বললেন, 'কবি, তোমার গান শুনলে আমি বোধ হয় আমার মরণদিনের থেকেও প্রাণ পেয়ে জেগে উঠতে পারি।"[১৭] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অনুমান করেছেন, রবীন্দ্রনাথের দেওয়া ডাক-নামটি হল 'নলিনী'। এটি তাঁর একটি অত্যন্ত প্রিয় নাম, প্রথম জীবনে রচিত বহু কাব্য-কবিতায় ও নাটকে নামটি ব্যবহৃত হয়েছে [কাব্য-নাটকে 'নলিনী' চরিত্রটি প্রায়শই একটি চপল-স্বভাবা আপাত-নিষ্ঠুরা, অথচ প্রেমময়ী নারী—বাস্তবের এই 'নলিনী' সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের কি এই ধারণাই ছিল?]। রবীন্দ্রনাথের যে-গানটির কথা উল্লেখ করেছেন, আমাদের ধারণা, সেটি হল পূর্বোক্ত 'শুন নলিনী খোল গো আঁখি' গানটি। যদিও তিনি নিজেই এটিকে আমেদাবাদ-বাসকালে রচিত বলেছেন এবং গানটির প্রচলিত সুর 'ললিত-খেমটা', তবু 'দেখ, তোমারি দুয়ার-'পরে/ সখি এসেছে তোমারি রবি' 'আমি যে তোমারি কবি' প্রভৃতি পংক্তিতে যে ব্যক্তিগত সুরটি ধ্বনিত হয়েছে সেটি আনা-র সঙ্গে জড়িত বলেই মনে হয়। মনে রাখা দরকার, ললিত রাগটিও রাত্রির শেষ প্রহরে গেয়।

আগের অধ্যায়ে আমরা প্রসঙ্গত গানটি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে জানিয়েছি যে, মালতীপুঁথির 54/২৮খ পৃষ্ঠায় 'শৈশব সঙ্গীত' কবিতার পাণ্ডুলিপির শীর্ষে পেন্সিলে লেখা চারটি ছত্রের মধ্যে পাঠযোগ্য তৃতীয় ছত্রটি হল—'শ্যামল সলিল আরসী মাঝারে', যার সঙ্গে এই গানটির 'দেখো বিমল সরসী-আরশির 'পরে' ছত্রটির সাদৃশ্য খুবই স্পষ্ট। শেষ ছত্রে 'নলিনী' শব্দটিও লক্ষণীয়। এরই পাশে অস্পষ্টভাবে 'Turkhud' শব্দটি আনা-র সঙ্গে গানটির যোগাযোগের ইতিবৃত্তটিকে তাৎপর্যবহ করে তোলে [দ্র পাণ্ডুলিপি-চিত্র, রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা ১।৮০]। বহুকাল পরে [1 Jan 1927 শনি ১৭ পৌষ ১৩৩৩] কবি অতুলপ্রসাদ সেন ও দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে আলাপে রবীন্দ্রনাথ এই তরুণীর কথা স্মরণ করেছেন :

তখন আমার বয়স বছর যোলো। আমাকে ইংরাজি কথা বলা শেখানোর জন্যে পাঠানো হ'ল বম্বেতে একটি মারাঠি পরিবারে।...সে-পরিবারের নায়িকা একটি মারাঠি ষোড়শী। যেমন শিক্ষিতা, তেমনি চালাক-চতুর, তেম্‌নি মিশুক।...বলাই বেশি, তার স্তাবক-সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না—বিশেষ আরো এই জন্যে যে ঐ বয়সেই সে একবার বিলেত চক্র দিয়ে এসেছিল। সেসময়ে মেয়েদের বিলেত-যাওয়া আজকের মতন পাড়া-বেড়ানো গোছের ছিল না, মনে রেখো।

আমার সঙ্গে সে প্রায়ই যেচে মিশতে আসত। কত ছুতো ক'রেই সে ঘুরত আমার আঁনাচে কানাচে।—আমাকে বিমর্ষ দেখলে দিত সান্ত্বনা, প্রফুল্ল দেখলে পিছন থেকে ধরত চোখ টিপে।

একথা আমি মান্‌ব যে আমি বেশ টের পেতাম যে ঘটবার মতন একটা কিছু ঘটছে, কিন্তু হায় রে, সে-হওয়াটাকে উস্কে দেওয়ার দিকে আমার না ছিল কোনোরকম তৎপরতা, না কোনো প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব।

একদিন সন্ধ্যাবেলা,... সে আচম্‌কা এসে হাজির আমার ঘরে। চাঁদনি রাত। চার দিকে সে যে কী অপরূপ আলো হাওয়া!... কিন্তু আমি তখন কেবলই ভাবছি বাড়ির কথা। ভালো লাগছে না কিছুই। মন কেমন করছে বাংলাদেশের জন্যে, আমাদের বাড়ির জন্যে, কলকাতার গঙ্গার জন্যে।

হোমসিক্নেস যাকে বলে।

সে ব'লে বসল : 'আহা, কী এত ভাবো আকাশপাতাল!'

তার ধরণধারণ জানা সত্ত্বেও আমার একটু যেন কেমন কেমন লাগল। কারণ সে প্রশ্নটা করতে না করতে একেবারে আমার নেয়ারের খাটের উপরেই এসে বসল।

কিন্তু কী করি—যা হোক হুঁ হাঁ ক'রে কাজ সেরে দিই। সে কথাবার্তায় বোধহয় জুৎ পাচ্ছিল না, হঠাৎ বলল : 'আচ্ছা আমার হাত ধ'রে টানো তো—টাগ্-অফ্-ওয়ারে দেখি কে জেতে?'

আমি সত্যিই ধরতে পারি নি, কেন হঠাৎ তার এতরকম খেলা থাকতে টাগ্-অফ্-ওয়ারের কথাই মনে প'ড়ে গেল। এমন কি আমি এ শক্তি পরীক্ষায় সম্মত হ'তে না হ'তে সে হঠাৎ শ্লথভাবে হার মানা সত্ত্বেও আমার না হ'ল পুলক-রোমাঞ্চ না খুলল রসজ্ঞ দৃষ্টিশক্তি। এতে সে নিশ্চয়ই আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ রকম সন্দিহান হ'য়ে পড়েছিল।

শেষে একদিন বলল তেমনি আচম্‌কা : 'জানো কোনো মেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে যদি তার দস্তানা কেউ চুরি করতে পারে তবে তার অধিকার জন্মায় মেয়েটিকে চুমো খাওয়ার?'

ব'লে খানিক বাদে আমার আরাম কেদারায় নেতিয়ে পড়ল নিদ্রাবেশে। ঘুম ভাঙতেই সে চাইল পাশে তার দস্তানার দিকে। একটিও কেউ চুরি করে নি।[১৮]

বউঠাকরুন কাদম্বরী দেবী রবীন্দ্রনাথের সুপুরি-কাটা হাতের গুণ ছাড়া অন্য-কিছুরই প্রশংসা করতেন না, 'এমন-কি চেহারারও খুঁত ধরে বিধাতার উপর রাগ ধরিয়ে দিতেন।' কিন্তু এই তরুণীর মুখেই তিনি প্রথম শুনেছিলেন তাঁর চেহারার প্রশংসা; আনা তাঁকে বলেছিলেন, 'একটা কথা আমার রাখতেই হবে, তুমি কোনো দিন দাড়ি রেখো না, তোমার মুখের সীমানা যেন কিছুতেই ঢাকা না পড়ে।' রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই কথা অবশ্য রাখেন নি,* কিন্তু আনার প্রেমমুগ্ধ অন্তরের রূপটি এই অনুরোধের মধ্যেই ধরা পড়েছে। রসশাস্ত্রের বিচারে আনা-কে অনেকটা প্রগল্‌ভা নায়িকার পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে, কিন্তু তরুণ রবীন্দ্রনাথের কাছে না হলেও পরিণত রবীন্দ্রনাথের কাছে সে প্রেম যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করেছে। উপরোক্ত কথোপকথনের সূত্রেই তিনি বলেছিলেন, 'কিন্তু সে মেয়েটিকে আমি ভুলি নি বা তার সে আকর্ষণকে কোনো লঘু লেবেল মেরে খাটো ক'রে দেখি নি কোনো দিন। আমার জীবনে তারপরে নানান্ অভিজ্ঞতার আলোছায়া খেলে গেছে—বিধাতা ঘটিয়েছেন কত যে অঘটন—কিন্তু আমি একটা কথা বলতে পারি গৌরব ক'রে : যে, কোনো মেয়ের ভালোবাসাকে আমি কখনো ভুলেও অবজ্ঞার চোখে দেখি নি—তা সে-ভালোবাসা যে-রকমই হোক না কেন। প্রতি মেয়ের স্নেহ বলো, প্রীতি বলো, প্রেম বলো, আমার মনে হয়েছে একটা প্রসাদ—favour : কারণ আমি এটা বারবারই উপলব্ধি করেছি যে প্রতি মেয়ের ভালোবাসা তা সে যে-রকমের ভালোবাসাই হোক না কেন—আমাদের মনের বনে কিছু না কিছু আফোটা ফুল ফুটিয়ে রেখে যায়—সে-ফুল হয়ত পরে ঝ'রে যায় কিন্তু তার গন্ধ যায় না মিলিয়ে।'[১৯] আনা-র প্রেমকে রবীন্দ্রনাথ সর্বশ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি দিয়েছেন শেষ বয়সে : 'জীবনযাত্রার মাঝে মাঝে জগতর অচেনা মহল থেকে আসে আপন-মানুষের দূতী, হৃদয়ের দখলের সীমানা বড়ো করে দিয়ে যায়। না ডাকতেই আসে, শেষকালে একদিন ডেকে আর পাওয়া যায় না। চলে যেতে যেতে বেঁচে-থাকার চাদরটার উপরে ফুলকাটা কাজের পাড় বসিয়ে দেয়, বরাবরের মতো দিনরাত্রির দাম দিয়ে যায় বাড়িয়ে।'[২০]

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অনুমান করেছেন, শৈশবসঙ্গীত কাব্যগ্রন্থের 'ফুলের ধ্যান' [অ-১।৪৭৫-৭৬] ও 'অপ্সরা-প্রেম' কবিতা-দুটিতে এই তরুণীর মর্মবেদনা কবির ভাষায় রূপ পেয়েছে এবং 'আমি স্বপনে রয়েছি ভোর, সখী, আমারে জাগায়ো না' গানটির মধ্যে দস্তানা চুরির কৌতুককর কাহিনীর স্মৃতি জড়িয়ে আছে।[২১] মালতীপুঁথি-তে পাওয়া না গেলেও আমাদের ধারণা 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যের চতুর্থ সর্গে কবির অষ্টম গানটি

—'শুনেছি—শুনেছি কি নাম তাহার—/ শুনেছি—শুনেছি তাহা!/ নলিনী-নলিনী—নলিনী—নলিনী—/ কেমন মধুর আহা!' ইত্যাদি [দ্র অ-১।৫৬-৫৭]—আনা-কে লক্ষ্য করেই রচিত। কিন্তু যথেষ্ট তথ্যের দ্বারা সমর্থিত না হলে এ-ধরনের অনুমানকে প্রশ্রয় দেওয়া বিপজ্জনক। বিশেষত্ 'অপ্সরা প্রেম' গাথাটি অনেক আগে লেখা শুরু হয়েছিল, এমন সম্ভাবনার কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

পূর্বোক্ত প্রবন্ধগুলি ছাড়া 'গেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ', 'নর্ম্ম্যান্ জাতি ও আঙ্গলো-নর্ম্ম্যান্ সাহিত্য' প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব প্রবন্ধগুলিও আমেদাবাদ-বোম্বাই অবস্থান-কালে রচিত, সম্ভবত বোম্বাইতেই এগুলি লেখা। [প্রথমোক্ত প্রবন্ধটিতে এক জায়গায় আছে, 'এক প্রকার তাস খেলা আছে, হারিলে চুম্বন দণ্ড দিতে হয়—গেটে এই চুম্বনের পরিবর্তে কবিতা উপহার দিতেন—কিন্তু যে মহিলার তাঁহার নিকট হইতে চুম্বন প্রাপ্য থাকিত তাঁহার যে মর্ম্মে আঘাত লাগিত তাহা বলা বাহুল্য।'—এই বর্ণনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কোনো যোগ আছে কিনা রসজ্ঞ পাঠককে বিচার করে দেখতে অনুরোধ করি।] শেষোক্ত প্রবন্ধ-দুটিতে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-জ্ঞান অনেক পরিণত হয়েছে এবং তিনি Taine-এর পরিবর্তে অন্য কোনো লেখকের লেখা সাহিত্যের ইতিহাসের উপর বেশি নির্ভর করেছেন। যথাস্থানে এগুলি সম্পর্কে আমরা আরও কিছু আলোচনা করব।

বোম্বাই থেকে রবীন্দ্রনাথ 20 Sep 1878 [শুক্র ৫ আশ্বিন] তারিখে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। এর কয়েক দিন পূর্বে সত্যেন্দ্রনাথ আমেদাবাদ থেকে এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। 13 Sep [শুক্র ২৯ ভাদ্র] রাত্রে আমেদাবাদের মেয়র প্রেমাভাই-এর বাংলোতে তাঁকে বিদায়-সংবর্ধনা জানানো হয়।* সুতরাং অনুমান করা যায়, এর দু-এক দিনের মধ্যেই তিনি বোম্বাই পৌঁছন। ৩০ ভাদ্র [শনি 14 Sep] তারিখে ক্যাশবহি-তে একটি বিস্তৃত হিসাব দেখা যায় : 'বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলাত গমন খাতে/ খরচ-১০০০্/ ব° বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর/ আমেদাবাদ/ বম্বে/ দ° আগামী ২০ সে সেপ্টেম্বর তারিখে/ বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বম্বে হইতে মেজবাবু/ মহাশয়ের সঙ্গে বিলাত গমন করিবেন/ শ্রীযুক্ত মেজবাবু মহাশয় রবীবাবুর পাথেয়/ এক হাজার টাকা বম্বে পাঠাইয়া দিবার জন্য/ পত্র লেখায় নিজ রোজ এক হাজার টাকার/ পূর্ণ নোট রেজেষ্টরি ও Insure করিয়া/ আমেদাবাদে মেজবাবু মহাশয়ের নিকট/ রবীবাবুর বিলাত গমনের পাথেয় পাঠাইয়া দেওয়া যায়/ নোট এক কেতা-১০০০্'। এই টাকা যখন আমেদাবাদে পৌঁছয়, তখন সত্যেন্দ্রনাথ বোম্বাইতে বা জাহাজে, তাই প্রাপককে না পেয়ে ১১ আশ্বিন পুনরায় জোড়াসাঁকোতে ফিরে আসে। নিরুপায় সত্যেন্দ্রনাথ ডাঃ আত্মারাম পাণ্ডুরঙের কাছ থেকে এক হাজার টাকা ধার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ-সহ বিলাত যাত্রা করেন। এই তথ্যটিও জানা যায় ক্যাশবহি-র ৫ অগ্র° [বুধ 20 Nov] তারিখের হিসাব বিশ্লেষণ করে : 'ব° Dr. Atmaram Pandurang/ 65, Kandewadi/ Bombay./দ° গত ২০ সেপ্টেম্বর তারিখে/ বম্বে হইতে মেজবাবু মহাশয়ের সঙ্গে। রবীবাবু বিলাতে গমন করেন/ রবীবাবুর বিলাত গমন পাথেয় একহাজার/ টাকা মেজবাবু মহাশয়ের লেখা মতে/ বম্বেতে Dr Atmaram Pandurang/ নিকট রেজেষ্টরি ও ইনসিওর করিয়া/ এক হাজার টাকার এক কেতা পূর্ণ নোট/ পাঠান যায়—১০০০্'। এর পূর্বেও ৯ আশ্বিন ঠাকুরবাড়ির প্রধান খাজাঞ্চি প্রসন্নকুমার বিশ্বাস ডাঃ পাণ্ডুরঙের কাছে একটি চিঠি পাঠান ও উত্তর পাবার জন্যে খামের মধ্যে 'আদ আনা দামের টিকিট' দিয়ে দেন—পত্রের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অবশ্য কিছু বলা শক্ত। যাত্রার পূর্ব দিন দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথের কাছে একটি

টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন—হতে পারে উক্ত পত্র ও এই টেলিগ্রাম রবীন্দ্রনাথের বিলাতযাত্রার পাথেয়-সমস্যাকে কেন্দ্র করেই প্রেরিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের ইংলণ্ড যাত্রা ও সেখানে অবস্থান-কালের বিবরণ আমরা প্রধানত তাঁর লেখা ও ভারতী-তে প্রকাশিত 'য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র' থেকে জানতে পারি। বৈশাখ ১২৮৬ থেকে শ্রাবণ ১২৮৭ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে [মাঘ ও চৈত্র ১২৮৬ বাদে] এই পত্রগুলি ভারতী-তে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র [১২৮৮] নামে এগুলি গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়। রবীন্দ্রনাথের এই পর্বের জীবন-ইতিহাস বর্ণনা প্রধানত এই গ্রন্থ ও জীবনস্মৃতি-র উপর নির্ভরশীল।

20 Sep 1878 [শুক্র ৫ আশ্বিন] 'পুনা' স্টীমার [S. S. "Poona"]-যোগে রবীন্দ্রনাথ বোম্বাই বন্দর ত্যাগ করেন বিকেল পাঁচটার সময়। তিনি লিখেছেন, 'আস্তে আস্তে আমাদের চোখের সামনে ভারতবর্ষের শেষ তটরেখা মিলিয়ে গেল। চারি দিকের লোকের কোলাহল সহিতে না পেরে আমি আমার নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেম। গোপন করবার বিশেষ প্রয়োজন দেখছি নে, আমার মনটা বড়োই কেমন নির্জীব অবসন্ন ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছিল'।[*] কেবল মন নয়, 'সমুদ্রপীড়া'র আক্রমণে সন্ধ্যা থেকেই তাঁর শরীরও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। জনৈক সহযাত্রী জোর করে খাবার টেবিলে ও পরে জাহাজের ডেকে নিয়ে গেলেন, কিন্তু তাঁর শরীর দৃশ্য উপভোগের পক্ষে খুব অনুকূল ছিল না, সুতরাং অল্পক্ষণের মধ্যই কেবিনে বিছানায় ফিরে আসতে হল। এরপর কেবিনের সেই অন্ধকার ছোটো ঘরের মধ্যে 'অসূর্যম্পশ্যরূপ ও অবায়ুস্পর্শদেহ হয়ে ছয়টা দিন কেবল বেঁচে ছিলেম মাত্র।'[২২] এই সময়ে জাহাজের একজন স্টুয়ার্ড তাকে যথেষ্ট যত্ন করে। ছ-দিন পরে [? 26 Sep বৃহ ১১ আশ্বিন] জাহাজ এডেনের কাছাকাছি পৌঁছলে সমুদ্র অনেকটা শান্ত হল, রবীন্দ্রনাথও অত্যন্ত দুর্বল দেহে ঘর থেকে বেরিয়ে ছাতে এসে অনেক দিন পরে খোলা হাওয়ায় নিশ্বাস নেবার সুযোগ পেলেন।

28 Sep [শনি ১৩ আশ্বিন] জাহাজ এডেনে পৌঁছল। 'সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখি, আমাদের সম্মুখে সব পাহাড় পর্বত উঠেছে। অতি সুন্দর পরিষ্কার প্রভাত; সূর্য সবে মাত্র উঠেছে, সমুদ্র অতিশয় শান্ত। দূর থেকে সেই পর্বতময় ভূভাগের প্রভাতদৃশ্য এমন সুন্দর দেখাচ্ছে যে কী বলব। পর্বতের উপর রঙিন মেঘগুলি এমন নত হয়ে পড়েছে যে মনে হয় যেন, অপরিমিত সূর্যকিরণ পান করে তাদের আর দাঁড়াবার শক্তি নেই, পর্বতের উপরে যেন অবসন্ন হয়ে পড়েছে।'[২৩] এডেনে পৌঁছে বাড়িতে চিঠি লিখতে গিয়ে দেখেন কদিনের নাড়াচাড়ায় 'বুদ্ধির রাজ্যে একটা অরাজকতা ঘটেছে।'

জাহাজ এডেন ছেড়ে লোহিত সাগর দিয়ে যখন সুয়েজের দিকে যাত্রা করল, তখনই রবীন্দ্রনাথ সহযাত্রীদের দিকে মনোযোগ দেবার সুযোগ পেলেন। এঁদের মধ্যে আরও একজন বাঙালি ছিলেন, তাঁকে রবীন্দ্রনাথ 'ব—' মহাশয় বলে উল্লেখ করেছেন। এঁর যদিও অভ্যাস ছিল অন্যদের পিতৃদত্ত নামের বদলে নিজের দেওয়া নামে সম্বোধন করা এবং রবীন্দ্রনাথের 'অবতার' নামকরণ করেছিলেন, তবু তাঁর মধ্যে 'বৃদ্ধত্বের বুদ্ধি ও বালকত্বের শাদাসিদা নিশ্চিন্ত ভাব'-এর একত্র সমাবেশ তাঁকে আকৃষ্ট করত। হয়তো বাল্যবন্ধু শ্রীকণ্ঠ সিংহ বা বড়োদাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের খানিকটা আভাস তিনি 'ব—' মহাশয়ের মধ্যে পেতেন। ইনি ছাড়া 'ঘোরতর ফিলজফর মানুষ T-মহাশয়', জনৈক 'আস্ত জনবুল' এবং 'ইয়ুরাসীয় B—'এর কথা রবীন্দ্রনাথ সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। শেষোক্ত জনের প্রসঙ্গে তিনি দুটি উল্লেখযোগ্য তথ্য আমাদের সরবরাহ করেছেন, প্রথমত অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটিতে তাঁর ভর্তি হওয়ার কথা এইসময়ে ভাবা হয়েছিল ও দ্বিতীয়ত জাহাজেও

তিনি ইংরেজি ভাষা-চর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন—Trench-এর *Proverbs and Their Lessons* গ্রন্থপাঠ তার একটি দৃষ্টান্ত।

জাহাজের সহযাত্রিণীদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, 'আমি স্বভাবতই 'লেডি'-জাতিকে বড়ো ডরাই। তাঁদের কাছে ঘেঁষতে গেলে এত প্রকার বিপদের সম্ভাবনা যে, চাণক্য পণ্ডিত থাকলে 'লেডি'দের কাছ থেকে দশ সহস্র হস্ত দূরে থাকতে পরামর্শ দিতেন। এক তো মনোরাজ্যে নানাপ্রকার শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা—তা ছাড়া সর্বদাই ভয় হয় পাছে কী কথা বলতে কী কথা বলে ফেলি, আর আমাদের অসহিষ্ণু কোমলস্বভাব লেডি তাঁদের আদব-কায়দার তিলমাত্র ব্যতিক্রম সইতে না পেরে দারুণ ঘৃণায় ও লজ্জায় একেবারে মূর্ছা যান, আর দশ দিক থেকে দশটা জেণ্ট্‌ল্‌ম্যান একেবারে হাঁ হাঁ করে এসে পড়েন।'[২৪] এই উক্তির মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের বিলাত সম্পর্কে মানসিকতা এবং য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র-এর বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট ধরা পড়েছে। এই পত্রগুচ্ছেরই অন্যত্র তিনি ইঙ্গবঙ্গ-সম্প্রদায়ের বিলাতি চাকচিক্যে বিভ্রান্ত যে চিত্র অঙ্কন করেছেন, প্রথম থেকেই তিনি সেই শ্রেণীভুক্ত না হওয়ার জন্যেই যেন পণ করে বসেছিলেন। ফলে আগাগোড়া সমালোচনার মনোভাবটিকে জাগ্রত করে রাখার দিকেই তাঁর সমস্ত প্রয়াস কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই কারণেই তিনি লিখেছিলেন, 'এই চিঠিগুলির অধিকাংশই বাল্যবয়সের বাহাদুরি। অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া, আঘাত করিয়া, তর্ক করিয়া রচনার আতশবাজি করিবার এই প্রয়াস। শ্রদ্ধা করিবার, গ্রহণ করিবার, প্রবেশলাভ করিবার শক্তিই যে সকলের চেয়ে মহৎশক্তি এবং বিনয়ের দ্বারাই যে সকলের চেয়ে বড়ো করিয়া অধিকার বিস্তার করা যায়—কাঁচাবয়সে এ-কথা মন বুঝিতে চায় না। ভালোলাগা, প্রশংসা করা, যেন একটা পরাভব—সে যেন দুর্বলতা—এইজন্য কেবলই খোঁচা দিয়া আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার এই চেষ্টা।'[২৫] কথাগুলি রবীন্দ্রনাথ পত্রগুচ্ছ সম্পর্কে বলেছেন বটে, কিন্তু বিলাতী সমাজের প্রতি তাঁর তৎকালীন মনোভাবের প্রসঙ্গেও এগুলি প্রযোজ্য হতে পারে।

'এডেন থেকে সুয়েজ যেতে দিন পাঁচেক লেগেছিল।' তাঁরা overland যাত্রী, তাই [? ১৮ আশ্বিন বৃহ 3 Oct] তাঁদের সুয়েজে নামতে হল। তিনজন বাঙালি ও একজন ইংরেজ দু শিলিং দিয়ে একটি আরব নৌকো ভাড়া ও কিছু বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সুয়েজ শহরে পৌঁছলেন। অবাধ্য গাধার পিঠে চড়ে শহর প্রদক্ষিণ করতে হয় এবং এখানে একপ্রকার জঘন্য সংক্রামক চক্ষুরোগ আছে শুনে রবীন্দ্রনাথকে শহর দর্শনের আশা ত্যাগ করতে হল। সুয়েজ থেকে রেলপথে তাঁরা ভূমধ্যসাগরের বন্দর আলেকজান্দ্রিয়ার অভিমুখে যাত্রা করলেন। সারারাত ধরে ট্রেন-ভ্রমণের পর সকাল বেলা তাঁরা আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছলেন [? ১৯ আশ্বিন 4 Oct]। তাঁর ধারণা ছিল আফ্রিকার সর্বত্রই অনুর্বর মরুভূমি, কিন্তু দেখলেন 'রেলের লাইনের দু পারে সবুজ শস্যক্ষেত্র। জায়গায় জায়গায় খেজুরের গাছে থোলো থোলো খেজুর ফ'লে রয়েছে।... চার দিককার সেই হরিৎক্ষেত্রের উপর খেজুরকুঞ্জের মধ্যে প্রভাতটি আমার অতি চমৎকার লেগেছিল।'[২৬] আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে তাঁদের জন্য 'মঙ্গোলিয়া' স্টীমার [S. S. "Mongolia"] অপেক্ষা করছিল। তাতে উঠে ভালো করে স্নান করে একবার শহর দেখে এলেন : 'শহরটি খুব জমকালো বটে। অ্যালেক্‌জান্দ্রিয়ার বন্দর খুব প্রকাণ্ড। অসংখ্য অসংখ্য জাহাজ এখানে আশ্রয় পায়। ইয়ুরোপীয়, মুসলমান, সকল প্রকার জাতিরই জাহাজ এ বন্দরে আছে; কেবল দুঃখের বিষয় হিন্দুদের জাহাজ নেই।'[২৭] [প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, তাঁর পিতামহ দ্বারকানাথের নিজস্ব

জাহাজ ছিল—দেনার দায়ে তা বিক্রি হয়ে যায়; দ্র ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী (১৩৭৬)। ১৭৬]।

আলেকজান্দ্রিয়া থেকে চার-পাঁচ দিন পরে তাঁরা রাত্রি একটা-দুটোয় ইটালির ব্রিন্দিশি বন্দরে পৌঁছন [? ২৩ আশ্বিন মঙ্গল 8Oct]। ট্রেন পাওয়ার অনিশ্চয়তায় বাকি রাত্রি কাটাতে হল হোটেলে। এই প্রথম তাঁর য়ুরোপের মাটিতে পদার্পণ। তাঁর কাল্পনিক স্বভাবের জন্য মনে করেছিলেন য়ুরোপে পৌঁছেই চোখের সামনে কী-এক অপূর্ব দৃশ্য খুলে যাবে। —কিন্তু 'কল্পনার সঙ্গে সত্যরাজ্যের প্রায় বনে না। আমার স্বভাবদোষে অনেক জিনিস ভালো করে ভোগ করতে পারি নে। কোনো নূতন দেশে আসবার আগেই আমি তাকে এমন নূতনতর মনে করে রাখি যে, এসে আর তা নূতন বলে মনেই হয় না।'[২৮] এই কারণে য়ুরোপকে তাঁর তেমন নতুন মনে হয় নি।

সকালে উঠে 'একটা আধ-মরা ঘোড়া ও আধ-ভাঙা গাড়ি চড়ে' শহর দেখে এসে তিনটের ট্রেনে তাঁরা ব্রিন্দিশি ছাড়লেন। 'রেলোয়ের পথের দু ধারে আঙুরের ক্ষেত্র, সে চমৎকার দেখতে।... পর্বত নদী হ্রদ কুটির ক্ষেত্র ছোটো ছোটো গ্রাম প্রভৃতি যত-কিছু কবির স্বপ্নের ধন সমস্ত চারি দিকে শোভা পাচ্ছে। গাছপালার মধ্যে থেকে যখন কোনো-একটি দূরস্থ নগর—তার প্রাসাদচূড়া, তার চার্চের শিখর, তার ছবির মতো বাড়িগুলি আস্তে আস্তে চোখে পড়ে তখন বড়ো ভালো লাগে।... সন্ধ্যে বেলায় একটি পাহাড়ের নীচে অতি সুন্দর একটি হ্রদ দেখেছিলেম, তা আর আমি ভুলতে পারব না। তার চারি দিকে গাছপালা, সন্ধ্যার ছায়া জলে পড়েছে।'[২৯]

ট্রেন পথে আল্পস পর্বতমালার বিখ্যাত Mont Cenis-এর টানেল অতিক্রম করতে আধঘণ্টা সময় নিল। 'ইটালি থেকে ফ্রান্স্ পর্যন্ত সমস্ত রাস্তা—নির্ঝর নদী পর্বত গ্রাম হ্রদ দেখতে দেখতে আমরা পথের কষ্ট ভুলে গিয়েছিলেম। এই রাস্তাটুকু আমরা যেন একটি কাব্য পড়তে পড়তে গিয়েছিলেম।'[২৯]

পরদিন [? ২৪ আশ্বিন বুধ 9 Oct] সকালে ট্রেন প্যারিসে পৌঁছল। 'কী জমকালো শহর! সেই অভ্রভেদী প্রাসাদের অরণ্যের মধ্যে গিয়ে পড়লে অভিভূত হয়ে যেতে হয়।... একটা হোটেলে গেলেম, তার সমস্ত এমন প্রকাণ্ড কাণ্ড যে, ঢিলে কাপড় পরে যেমন সোয়াস্তি হয় না সে হোটেলে থাকতে গেলেও আমার বোধ হয় তেমন অসোয়াস্তি হয়। স্মরণস্তম্ভ, উৎস, বাগান, প্রাসাদ, পাথরে বাঁধানো রাস্তা, গাড়ি, ঘোড়া, জনকোলাহল প্রভৃতি দেখে অবাক্ হয়ে যেতে হয়।'[৩০] প্যারিসে পৌঁছেই তাঁরা গেলেন একটি টার্কিশ বাথে। রবীন্দ্রনাথকে দেখে এখানকার একজন কর্মী বলে যে, তাঁর শরীর বেশ লম্বা আছে—এখন পাশের দিকে বাড়লে তিনি একজন সুপুরুষের মধ্যে গণ্য হবেন। এখানকার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, 'আমি দেখলেম, টার্কিশ বাথে স্নান করা আর শরীরটাকে ধোপার বাড়ি দেওয়া এক কথা।'[৩১] এর পর এক পাউণ্ড দিয়ে সমস্ত দিনের জন্য একটি গাড়ি ভাড়া করে তাঁরা দেখতে গেলেন 1878-এর বিখ্যাত প্যারিসের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী। কিন্তু মাত্র একদিনে তার প্রায় কিছুই ভালো করে দেখা সম্ভব হয় নি। তাই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'প্যারিস এক্‌জিবিশনের একটা স্তূপাকার ভাব মনে আছে, কিন্তু শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাব কিছুই মনে নেই। সাধারণতঃ মনে আছে যে, চিত্রশালায় গিয়ে অসংখ্য অসংখ্য চমৎকার ছবি দেখেছি—স্থাপত্যশালায় গিয়ে অসংখ্য অসংখ্য প্রস্তরমূর্তি দেখেছি—নানা দেশবিদেশের নানা জিনিস দেখেছি—কিন্তু বিশেষ কিছু মনে নেই।'[৩২]

পরের দিন [? আশ্বিন বৃহ 10 Oct] প্যারিস থেকে লণ্ডনে এলেন। লণ্ডন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক ধারণা খুব প্রশংসনীয় নয় : 'এমন বিষণ্ণ অন্ধকার পুরী আর কখনো দেখি নি। ধোঁওয়া, মেঘ, বৃষ্টি, কোয়াশা, কাদা আর লোকজনের ব্যস্ত-সমস্ত ভাব—এই হচ্ছে লন্‌ডনের যথাসর্বস্ব।'[৩২] সঙ্গীরা অবশ্য তাঁকে বলেন যে, 'লন্‌ডনের সঙ্গে প্রথম দৃষ্টিতেই ভালোবাসা হয় না; কিছুদিন থেকে, তাকে ভালো করে চিনলে তবে লন্‌ডনের মাধুর্য বোঝা যায়', তবু মাত্র দু-এক ঘণ্টা লণ্ডনে থেকে যখন ব্রাইটনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন তখন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তখন পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ও কন্যা ইন্দিরাকে নিয়ে ইংলণ্ডের দক্ষিণে সাসেক্স কাউন্টির অন্তর্ভুক্ত সমুদ্রতীরবর্তী শহর ব্রাইটনে বাস করছিলেন [কবীন্দ্রনাথ বা চোবির ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়েছিল]। সেখানে যাবার সময় রবীন্দ্রনাথকে যেটি সবচেয়ে বেশি অবাক করেছিল সেটি হল সেখানকার রেল-ব্যবস্থা : 'লনডন থেকে ব্রাইটনে আসবার সময় দেখি—প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে উপর দিয়ে একটা, নীচে দিয়ে একটা, পাশ দিয়ে একটা, এমন চারি দিক থেকে হুস্‌হাস্ করে ট্রেন ছুটেছে। সে ট্রেনগুলোর চেহারা দেখলে আমার লন্‌ডনের লোক মনে পড়ে—এ দিক থেকে, ও দিক থেকে, মহা ব্যস্তভাবে হাঁস্ ফাঁস্ করতে করতে চলেছে; এক তিল সময় নষ্ট করলে চলে না!'[৩৩]

ব্রাইটনের বাসস্থান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'আমাদের ব্রাইটনের বাড়িটি সমুদ্রের কাছে একটি নিরালা জায়গায়, এক সার ২০।২৫টি বাড়ি, বাড়িগুলির নাম হচ্ছে Medina villas।... আমি লন্‌ডনে থেকে যখন প্রথম শুনলুম যে, আমরা মেদিনা ভিলায় বাস করতে যাচ্ছি তখন কত কী কল্পনা করেছিলুম তার ঠিক নেই—বাগান, গাছ, পালা, ফল, ফুল, মাঠ, সরোবর ইত্যাদি। বাড়িতে এসে যে দিকে চেয়ে দেখি সেই দিকেই বাড়ি, ঘর, রাস্তা, গাড়ি, ঘোড়া—'ভিলা'ত্বর মধ্যে আমাদের বাড়ির সামনে দু-চার হাত জমিতে দু-চারটে গাছ পোঁতা আছে।... আমাদের দেশের তুলনায় এখানকার ঘরগুলো লম্বা চৌড়া ও উঁচুতে ঢের ছোটো। ছোটো ছোটো ঘরগুলো চার দিকে জানলা বন্ধ, একটু বাতাস আসবার জো নেই, কেবল জানলাগুলো সমস্ত কাঁচের ব'লে আলো আসে।... ছোটো হোক, ঘরগুলো যথেষ্ট সাজানো; ছবি টেবিল চৌকি কৌচ ফুলদানি পিয়ানো ইত্যাদি গৃহসজ্জা।'[৩৪] 'মেদিনা ভিলা' প্রকৃতপক্ষে ব্রাইটনে অবস্থিত নয়, 'ব্রাইটনের গা ঘেঁষে হোভ নামে যে শহরটি তার অন্তর্গত—ব্রাইটন ও হোভ কার্যত দুটি মিলে একটি শহর।'* বাড়িগুলি এখনও ঠিক সেই অবস্থাতেই আছে—মুখোমুখি ৪৩।৪৪টি বাড়ি অর্থাৎ এক-এক দিকে ২০।২৫টি।

একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর 'স্মৃতিকথা'র খানিকটা উদ্ধৃত করছি : "ছেলেরা শুনত 'পাপা আসছে, পাপা আসছে'। কিন্তু সেখানে যত ছেলের পাপার রং সাদা দেখে, আর ওঁর [সত্যেন্দ্রনাথের] রং কালো দেখে বিবি [ইন্দিরা দেবী] দরজার আড়ালে লুকিয়ে গিয়ে বল্ল "That's not my Papa!" ওদের 'পাপার' সঙ্গে ভাব করতে অনেক সময় লাগল।"[৩৫] রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ [৬] ও ইন্দিরা [৫]-র বলতে গেলে এখানেই প্রথম পরিচয়; ভাইপো-ভাইঝিদের মধ্যে এঁরা দুজনই সারাজীবন তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'ছেলেরা আমার অদ্ভুত ইংরেজি উচ্চারণে ভারি আমোদ বোধ করিল। তাহাদের আর সকলরকম খেলায় আমার কোনো বাধা ছিল না, কেবল তাহাদের এই আমোদটাতে আমি সম্পূর্ণমনে যোগ দিতে পারিতাম না।... এই দুটি ছোটো ছেলের [একজন অবশ্য মেয়ে] মন ভোলাইবার,

তাহাদিগের হাসাইবার, আমোদ দিবার নানাপ্রকার উপায় আমি প্রতিদিন উদ্‌ভাবন করিতাম।... শিশুদের কাছে হৃদয়কে দান করিবার অবকাশ সেই আমার জীবনে প্রথম ঘটিয়াছিল—দানের আয়োজন তাই এমন বিচিত্রভাবে পূর্ণ হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল।'[৩৬] ইন্দিরা দেবী তাঁর দু-একটি উদ্‌ভাবনীর বিবরণ দিয়েছেন, "ছেলেদের মন ভোলানোর তাঁর একটি উপায় ছিল, নানারকম মজা করে গান গাওয়া। যেমন 'আজু মোরণ বন বোলে' গানটি মধ্যলয়ে আরম্ভ করে দ্রুত হতে দ্রুততর লয়ে গেয়ে যখন 'তুম সন হম হলমল কর রমকে রমকে ঝোলে' গাইতেন তখন শেষকালে তাঁর ঠোঁটদুটি যেন কেবল কাঁপত, আর আমরা হেসে কুটিকুটি হতুম। 'Darling, you are growing old' প্রভৃতি ইংরেজি গানের সুরও মজা করে টেনে টেনে গাইতেন"।[৩৭]

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ব্রাইটনের জীবন সম্পর্কে লিখেছেন, 'আমি যখন ইংলণ্ডে গিয়া পৌঁছাই, তখন অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি। তখনও খুব বেশী শীত বলিয়া আমার মনে হয় নাই। আমরা ব্রাইটনে ছিলাম। ব্রাইটনে তখনও যথেষ্ট রৌদ্র ছিল।... আমরা প্রায় মাঝে মাঝে ছেলেদের লইয়া সমুদ্র তীরের তৃণক্ষেত্রে ছুটাছুটি করিতাম।... দশটা এগারোটার সময় আমাদের বেড়াইবার সময় ছিল! যাহা হউক, আমরা যখন ব্রাইটনে আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন সমুদ্রতীরে সূর্য্যকরোৎসব।'[৩৮]

এই পারিবারিক পরিবেশ সেই বিদেশেও রবীন্দ্রনাথের মনকে অনেকটা আরাম দিয়েছিল। ছেলেবেলা থেকেই পৃথিবীর জনসমাজের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ছিল ক্ষীণ। সুতরাং সতেরো বৎসর বয়সে একা বিদেশের অপরিচিত 'জনসমুদ্রের মধ্যে ভাসিয়া পড়িলে খুব একচোট হাবুডুবু খাইবার আশঙ্কা ছিল।' কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অবস্থা সে-রকম হয়নি। এ-প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 'যাঁরা পূর্বে বিলেতে অনেককাল ছিলেন বিলেত যাঁরা খুব ভালো করে চেনেন তাঁরা আমাকে সঙ্গে করে এনেছেন ও তাঁদের সঙ্গেই আমি বাস করছি। বিলাতে আসবার আগেই বিলেতের বিষয় তাঁদের কাছে অনেক শুনতে পেতেম, সুতরাং এখানে এসে খুব অল্প জিনিস নিতান্ত নতুন মনে হয়েছে, এখানকার লোকের সঙ্গে মিশতে গিয়ে প্রতি পদে হুঁচট খেয়ে খেয়ে আচার ব্যবহার আমাকে শিখতে হয় নি।'[৩৯] এরই ফলে বিলেতের নারী পুরুষ ও সমাজ-ব্যবস্থাকে রবীন্দ্রনাথ অনেকটা নৈর্ব্যক্তিকভাবে দেখতে পেরেছেন।

কিন্তু সমুদ্রের এপারের ঘর থেকে সমুদ্রের ওপারের ঘরে যাবার জন্য তো তাঁকে ইংলণ্ডে পাঠানো হয় নি। তাই তাঁকে ব্রাইটনে একটি স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'একদিন ব্রাইটনে একটি পাবলিক স্কুলে আমি ভর্তি হইলাম।'[৪০] কিন্তু তাঁর এই উক্তি সম্ভবত ঠিক নয়। ড দেবীপদ ভট্টাচার্য লিখেছেন, 'ব্রাইটনের তথ্য-কর্তা (ইনফরমেশন অফিসর)-কে চিঠি লিখে জানতে পারি ১৮৭৮-৭৯ সালে ব্রাইটনে যে দুটি মাত্র পাবলিক স্কুল ছিল, তাদের ছাত্র ভর্তির রেজিস্টারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামে কোনো ছাত্রের নাম নেই। এই পত্রোত্তরে খুশি না হয়ে ব্রাইটন্-বাসিনী আমার ছাত্রী শ্রীমতী কেতকী কুশারী ডাইসনকে এ সম্পর্কে খোঁজ নিতে বলি। তিনি ও তাঁর স্বামী রবর্ট (পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক) এ বিষয়ে যা-যা খোঁজ নেওয়া দরকার সবই নিয়ে আমাকে জানান যে পূর্বোক্ত তথ্য-কর্তার উক্তি সত্য। মনে হয় রবীন্দ্রনাথ স্মৃতি থেকে লিখতে গিয়ে ভুল করেছিলেন। তিনি যে স্কুলে পড়েছিলেন সে ধরনের কয়েকটি ডে-স্কুল (day school) তৎকালীন ব্রাইটন ও হোভ অঞ্চলে ছিল।... ঐ ডে-স্কুলগুলি 'small privately owned'—পাবলিক স্কুল নয়। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের মন্তব্য উল্লেখ করেছেন কিন্তু তাঁর নামটি বলেন নি, তাহলে সহজেই তিনি কোন স্কুলে

পড়েছিলেন সেটা জানা যেত। দেখা যায় বেশীর ভাগ প্রাইভেট স্কুলগুলির স্বত্বাধিকারিণী ছিলেন মহিলারা। মনে হয় রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন 'Brighton Proprietory School for Boys'-এ এবং এই স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন P. Capon। স্কুলের ঠিকানা 7 Ship Street (—Page's Court Directory for Brighton & Hove 1879)। রবীন্দ্রনাথ যে বিলিতি গান ও নাচে দীক্ষা লাভ করেছিলেন সে বোধকরি এখানকার স্কুল থেকে। উক্ত প্রাইভেট স্কুলগুলির অস্তিত্ব বিলুপ্তপ্রায়। সেজন্য তাদের প্রত্যেকটির রেকর্ড অনুসন্ধান করা সম্ভব হল না।'[৪১]

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ প্রথমেই আমার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বাহবা, তোমার মাথাটা তো চমৎকার!" (What a splendid head you have!) এই ছোটো কথাটা যে আমার মনে আছে তাহার কারণ এই যে, বাড়িতে আমার দর্পহরণ করিবার জন্য যাঁহার [নতুন বউঠাকরুন কাদম্বরী দেবী] প্রবল অধ্যবসায় ছিল—তিনি বিশেষ করিয়া আমাকে এই কথাটি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, আমার ললাট এবং মুখশ্রী পৃথিবীর অন্য অনেকের সহিত তুলনায় কোনোমতে মধ্যমশ্রেণীর বলিয়া গণ্য হইতে পারে।'[৪২] বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে খুব লঘু মনে হলেও রবীন্দ্রনাথের মানস-বিবর্তনের ক্ষেত্রে এর কিছু গুরুত্ব আছে। কলকাতা ত্যাগের পর এই নিয়ে দ্বিতীয়বার রবীন্দ্রনাথ তাঁর মুখ-সৌন্দর্যের প্রশংসা শুনলেন—প্রথমবার শুনেছিলেন আনা-র কাছে—পরেও কয়েকবার শুনেছেন। এর ফলে সচেতনভাবে তিনি হয়তো উভয় দেশের বিচারের প্রণালী ও আদর্শের বিভিন্নতার কথাই চিন্তা করেছেন, কিন্তু নতুন আত্মবিশ্বাসের আলোকে নিজের অজ্ঞাতেই বাল্য-কৈশোরের হীনমন্যতার কুহেলিকা কাটিয়ে উঠেছেন। এই আত্মবিশ্বাস বিলাত প্রবাসের সময়ে তেমন করে ফুটে ওঠে নি, দেশে ফেরবার পর তার পূর্ণ প্রকাশ লক্ষ্য করা গেছে।

ব্রাইটনে স্কুলের ছাত্রেরা তাঁর সঙ্গে যথেষ্ট সহৃদয় আচরণ করলেও সেখানে রবীন্দ্রনাথের অবস্থানকাল খুব দীর্ঘ হতে পারে নি। তিনি আশ্বিনের শেষ সপ্তাহে [Oct 1878] ইংলণ্ডে পৌঁছেছিলেন। কার্তিকের মাঝামাঝি [Nov-এর শুরুতে] সম্ভবত তাঁকে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের ধারণা, Dec 1878-এর শেষ পর্যন্ত তিনি ব্রাইটনেই কাটান—প্রবল শীত ও প্রথম বরফ পড়ার অভিজ্ঞতা তিনি য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র ও জীবনস্মৃতি-তে উল্লেখ করেছেন—সম্ভবত বড়োদিনের সময়ও রবীন্দ্রনাথ সেখানে ছিলেন, এরপর Jan 1879-এর শুরুতেই তাঁকে লণ্ডনে নিয়ে আসা হয়। এই অনুমান সঠিক হলে সিদ্ধান্ত করতে হয়, ব্রাইটনের স্কুলে তাঁর পঠদ্দশা দু মাসের বেশি স্থায়ী হয় নি।

রবীন্দ্রনাথের ব্রাইটন-জীবনের কথা আমরা আগে কিছুটা আলোচনা করেছি। এ-বিষয়ে আরও কিছু তথ্য সংকলন করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রধান সহায় 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র'। পত্রগুলি প্রথমে আত্মীয়-বন্ধুদের উদ্দেশ্যে লিখিত ও প্রেরিত হয়েছিল, কিন্তু ভারতী-তে প্রকাশের সময় এগুলির পারম্পর্য যথাযথভাবে রক্ষিত হয়েছে বলে মনে হয় না। প্রথম পত্রটি হয়তো জাহাজেই লেখা শুরু হয়েছিল [সম্ভবত এই অংশটুকুই বৈশাখ ১২৮৬-র ভারতী-তে প্রকাশিত হয়েছিল], কিন্তু এটির সমাপ্তি অবশ্যই ব্রাইটনে—কারণ লণ্ডনে পৌঁছনো এবং দু-এক ঘণ্টা পরে লণ্ডন পরিত্যাগের বর্ণনা দিয়ে পত্রটি শেষ হয়েছে। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্র এবং ষষ্ঠ পত্রের অন্তত কিয়দংশ ব্রাইটনে বসে লেখা অর্থাৎ উপরোক্ত দু-আড়াই মাসের মধ্যে লিখিত হয়েছিল, পত্রগুলির মধ্যে তাৎক্ষণিক বর্ণনার একটি আভাস পাওয়া যায়।

ইংরেজি সাহিত্যের মধ্য দিয়ে ইংলণ্ডকে চেনার ফলে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল 'এই ক্ষুদ্র দ্বীপের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত বুঝি টেনিসনের বীণাধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে;... এই দুই-হস্ত পরিমিত

ভূমির যেখানে থাকি-না কেন, গ্ল্যাড্স্টোনের বাগ্মিতা, ম্যাক্স্মূলরের বেদ-ব্যাখ্যা, টিন্ড্যালের বিজ্ঞানতত্ত্ব, কার্লাইলের গভীর চিন্তা, বেনের দর্শনশাস্ত্র শুনতে পাব',[১] কিন্তু নৈরাশ্যের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন 'মেয়েরা বেশভূষায় লিপ্ত, পুরুষেরা কাজকর্ম করছে, সংসার যেমন চলে থাকে তেমনি চলছে—কেবল রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে যা-কিছু কোলাহল শোনা যায়।'[৪৩] সেখানকার মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা; 'এ দেশের মেয়েরা পিয়ানো বাজায়, গান গায়, আগুনের ধারে আগুন পোয়ায়, সোফায় ঠেসান দিয়ে নভেল পড়ে, ভিজিটরদের সঙ্গে আলাপচারি করে ও আবশ্যক বা অনাবশ্যক-মতে যুবকদের সঙ্গে flirt করে।'[৪৪] পুরুষদের মধ্যেও ভারতবর্ষ এবং নিজেদের দেশের সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে অজ্ঞতা তাঁকে বিস্মিত করেছিল।

ব্রাইটনের ইংরেজ পরিবারগুলির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার কিছু বিবরণ রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন। জনৈক আধবুড়ো চিকিৎসাব্যবসায়ী ডাক্তার M—তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এঁর বাড়িতে একদিন সান্ধ্যনিমন্ত্রণে যোগ দিয়েছিলেন —এই নিমন্ত্রণসভার বিস্তৃত বিবরণও তিনি দিয়েছেন—এখানে তিনি বাংলা গান 'প্রেমের কথা আর বোলো না' ও অন্য একটি গান পরিবেশন করেছিলেন। এছাড়াও কোনো এক মঙ্গলবারে একজনের বাড়িতে নাচের নিমন্ত্রণে এবং একদিন ফ্যান্সি বল-এ জরি-দেওয়া মখমলের কাপড় ও পাগড়ি পরে দাড়ি গোঁফ লাগিয়ে বাংলার জমিদার সেজে যোগ দেন। প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানেরই বিস্তৃত বর্ণনা তিনি দিয়েছেন—মনে হয়, দেশে থাকতে ইংরেজি বই পড়ে 'ইংরাজদিগের আদব্-কায়দা' প্রবন্ধে যে কাজ শুরু করেছিলেন, তারই পূর্ণতাবিধান করেছেন এর অন্য কতকগুলি দিক নিয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে।

কিন্তু এই অভিজ্ঞতার আরও কিছু অন্তরঙ্গ দিক ছিল। সে-কথা রবীন্দ্রনাথ কৌতুক করে বলেছেন দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে পূর্বোক্ত আলাপচারিতে : 'দুঃখের কথা বলব কি, আমার এই চেহারাটা যে নেহাৎ অচল নয় একথা আমি প্রথম টের পাই কোথায় জানো?—বিলেতে—আর একথা আমাকে সর্বপ্রথম বলে আমার এক বোন।... তার কাছে নাকি তার দু-একজন ওদেশিনী সখী একথা বলত। আরে ছাই, আমার কাছেই বল্, তাও না। কি জানি হয়ত আমার লজ্জা দেখেই লজ্জাশীলারা লজ্জা পেতেন; কে বলতে পারে?... এতই লাজুক ও মুখচোরা ছিলাম সেসময়ে যে তরুণীমহলে এরকম প্রতিষ্ঠার কানাঘুষা শুনেও ওদিকে ভিড়তে সাহস পাই নি। সত্যি বলছি আমার সেই বোনটি আমাকে প্রায়ই তিরস্কার করত : Why can't you flirt a little?' অনেক সময়ে করত কি—হয়ত তার কোনো রূপসী সখীর কাছে হঠাৎ আমাকে একলা ফেলে কি অছিলায় আসছি বলে' দে চম্পট।'[৪৫]

এই বোন সম্ভবত জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের কন্যা বলেন্দ্রবালা [ডাক নাম 'বালা']; তাঁর আর এক কন্যা সত্যেন্দ্রবালা, ডাক নাম ছিল সতু। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী এঁদের সম্পর্কে বলেছেন, 'বালা ও সতু খুব বেঁটে ছিলেন, চেহারাও তেমন ভাল ছিল না, কেবল খুব চুল ও বড় বড় চোখ ছিল। তখনকার ধরণের ইংরিজী পোশাক পরতেন।... বালা পিয়ানো বাজাত, সেই সঙ্গে রবি গাইতেন, তাতে সে খুব খুশি হত। দুজনে খুব জমে গেল।'[৪৬]

ইংলণ্ডে গিয়ে বিলিতি সংগীত শোনা ও শেখার দিকে রবীন্দ্রনাথের খুব উৎসাহ দেখা গিয়েছিল। এই পরিবেশেই রবিকাকার সঙ্গে পরিচয় বলে ইন্দিরা দেবী রবীন্দ্রস্মৃতির কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই বিলিতি সংগীতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। রবীন্দ্রনাথও উল্লেখ করেছেন ব্রাইটনের সংগীতশালায় তিনি মাদাম

নীলসন অথবা মাদাম আল্‌বানীর গান শুনতে গিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'কণ্ঠস্বরের এমন আশ্চর্য শক্তি পূর্বে কখনো দেখি নাই।... আমার মনে হইল যেন কণ্ঠস্বরে সার্কাসের ঘোড়া হাঁকাইতেছে। কণ্ঠনলীর মধ্যে সুরের লীলা কোথাও কিছুমাত্র বাধা পাইতেছে না। মনে যতই বিস্ময় অনুভব করি-না কেন সেদিন গানটা আমার একেবারেই ভালো লাগিল না। বিশেষত, তাহার মধ্যে স্থানে স্থানে পাখির ডাকের নকল ছিল, সে আমার কাছে অত্যন্ত হাস্যজনক মনে হইয়াছিল। মোটের উপর কেবলই মনে হইতে লাগিল মনুষ্যকণ্ঠের প্রকৃতিকে যেন অতিক্রম করা হইতেছে। তাহার পরে পুরুষ গায়কদের গান শুনিয়া আমার আরাম বোধ হইতে লাগিল—বিশেষত 'টেনর' গলা যাহাকে বলে সেটা নিতান্ত একটা পথহারা ঝোড়ো হাওয়ার অশরীরী বিলাপের মতো নয়—তাহার মধ্যে নরকণ্ঠের রক্তমাংসের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার পরে গান শুনিতে শুনিতে ও শিখিতে শিখিতে য়ুরোপীয় সংগীতের রস পাইতে লাগিলাম।'[৪৭] টমাস ম্যুরের *Irish Melodies* রবীন্দ্রনাথের একটি প্রিয় গ্রন্থ ছিল। 'এই আইরিশ মেলডীজ্ আমি সুরে শুনিব, শিখিব এবং শিখিয়া আসিয়া অক্ষয়বাবুকে শুনাইব ইহাই আমার বড়ো ইচ্ছা ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে জীবনের কোনো কোনো ইচ্ছা পূর্ণ হয় এবং পূর্ণ হইয়াই আত্মহত্যা সাধন করে। আইরিশ মেলডীজ বিলাতে গিয়া কতকগুলি শুনিলাম ও শিখিলাম কিন্তু আগাগোড়া সব গানগুলি সম্পূর্ণ করিবার ইচ্ছা আর রহিল না। অনেকগুলি সুর মিষ্ট এবং করুণ এবং সরল, কিন্তু তবু তাহাতে আয়র্লণ্ডের প্রাচীন কবিসভার নীরব বীণা তেমন করিয়া যোগ দিল না।'[৪৮] ইন্দিরা দেবী রবীন্দ্রনাথের বিলিতি সংগীতচর্চা সম্পর্কে তাঁর বাল্যস্মৃতি উদ্ধার করেছেন : 'সেই সময় থেকেই বিলিতি সংগীতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, এবং শুনেছি তাঁর সুরেলা জোরালো তারসপ্তকের চড়া গলা, যাকে ও দেশে বলে 'টেনর', শুনে ওরা মুগ্ধ হত। সে বয়সে অবশ্য এর সম্পূর্ণ রসগ্রহণ করবার ক্ষমতা আমার ছিল না, কিন্তু এটুকু মনে আছে যে, '*Won't you tell me, Molly darling*'/'*Darling, you are growing old*'/'*Good-bye, sweetheart good-bye*' প্রভৃতি তখনকার জনপ্রিয় গানগুলি তিনি গাইতেন।'[৪৯]

ব্রাইটনে থাকার সময়েই রবীন্দ্রনাথ প্রথম বরফ পড়ার দৃশ্য দেখেন। তুষারপাতের সূচনার বর্ণনা আছে য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র-এর তৃতীয় পত্রে [দ্র পৃ ৩৯]। পরবর্তীকালে বালক পত্রিকার আশ্বিন-কার্তিক ১২৯২ সংখ্যায় [পৃ ৩৪১-৪৪] 'বরফ পড়া/(দৃশ্য)' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই অভিজ্ঞতার বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন : 'খ্রীষ্ট মাসের সময় আগতপ্রায়। কন্‌কনে শীত। জ্যোৎস্না রাত্রি।... সন্ধ্যাবেলা আহার করিয়া অগ্নিকুণ্ড ঘিরিয়া আমরা গল্পে নিমগ্ন। দুইটি ছেলে আমার প্রতি আক্রমণ করিয়াছেন।... গরম হইয়া সকলে বসিয়া আছি, এমন সময়ে খবর আসিল, বরফ পড়িয়াছে। কখন পড়িতে আরম্ভ হইয়াছিল জানিতে পারি নাই, আমাদের দ্বার সমস্ত রুদ্ধ ছিল। ছেলে-পিলে মিলিয়া লাফালাফি করিয়া বাহিরে গিয়া দেখি—কি চমৎকার দৃশ্য! শীতে জ্যোৎস্না স্তর জমিয়া জমিয়া, রাস্তায়, ঘাসের উপর, গাছের শূন্য ডালে, গড়ানো স্লেটের ছাতে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে।... সেই রাত্রি ও নির্জ্জনতা, জ্যোৎস্না ও বরফ সমস্ত মিলিয়া কেমন এক অপূর্ব্ব দৃশ্য সৃজন করিয়াছিল। ছেলেরা (এবং আমিও) ঘাসের উপর হইতে বরফ কুড়াইয়া পাকাইয়া গোলা করিতেছিল। সেগুলো ঘরে আনিতেই ঘরের তাতে গলিয়া জল হইয়া যাইতে লাগিল।' [পৃ ৩৪৩] জীবনস্মৃতি-তেও [দ্র ১৭।৩৫৯] এই দৃশ্যের দীর্ঘ বর্ণনা আছে।

আমরা আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত Jan 1879-র শুরুতেই ব্রাইটন ছেড়ে লণ্ডনে চলে আসেন। সত্যেন্দ্রনাথের বাল্যবন্ধু বিখ্যাত ব্যারিস্টার তারকনাথ পালিত তখন পুত্রদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করার জন্য

ইংলণ্ডে ছিলেন।* ব্রাইটনে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষালাভের নমুনা দেখে তিনি বুঝেছিলেন, এভাবে চললে যে-উদ্দেশ্যে তিনি ইংলণ্ডে এসেছেন—অর্থাৎ আই. সি. এস. পরীক্ষা দেবার বা ব্যারিস্টার হবার জন্য—তা কিছুতেই সফল হবার নয়। সেইজন্যে তিনি সত্যেন্দ্রনাথকে বলে তাঁকে লণ্ডনে নিয়ে এসে প্রথমে একটা বাসায় একলা ছেড়ে দিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'সে-বাসাটা ছিল রিজেন্ট উদ্যানের সম্মুখেই। তখন ঘোরতর শীত। সম্মুখের বাগানের গাছগুলায় একটিও পাতা নাই—বরফে-ঢাকা আঁকাবাঁকা রোগা ডালগুলা লইয়া তাহারা সারি সারি আকাশের দিকে তাকাইয়া খাড়া দাঁড়াইয়া আছে—দেখিয়া আমার হাড়গুলার মধ্যে পর্যন্ত যেন শীত করিতে থাকিত। নবাগত প্রবাসীর পক্ষে শীতের লণ্ডনের মতো এমন নির্মম স্থান, আর-কোথাও নাই। কাছাকাছির মধ্যে পরিচিত কেহ নাই, রাস্তাঘাট ভালো করিয়া চিনি না। একলা ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া থাকিবার দিন আবার আমার জীবনে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু বাহির তখন মনোরম নহে, তাহার ললাটে ভ্রূকুটি; আকাশের রঙ ঘোলা, আলোক মৃতব্যক্তির চক্ষুতারার মতো দীপ্তিহীন; দশদিক আপনাকে সংকুচিত করিয়া আনিয়াছে, জগতের মধ্যে উদার আহ্বান নাই।'[৫০] ঘরের মধ্যে একটি হারমোনিয়ম ছাড়া অন্যান্য আসবাব প্রায় কিছুই ছিল না। অন্ধকার ঘনিয়ে এলে আপনমনে সেই যন্ত্রটা বাজাতেন এবং স্বল্পপরিচিত ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে কেউ দেখা করতে এলে তাঁদের বিদায় নেবার সময় 'আমার ইছা্ করিত, কোট ধরিয়া তাঁহাদিগকে টানিয়া আবার ঘরে আনিয়া বসাই।'

এখানে থাকার সময়ে একজন তাঁকে ল্যাটিন শেখাতে আসতেন। অত্যন্ত রোগা, শীতবস্ত্রের অভাবে পীড়িত, অনশনক্লিষ্ট এই দরিদ্র ব্যক্তিটিকে দিয়ে তাঁর পড়ার সাহায্য কিছুমাত্র না হলেও তাঁকে বিদায় করতে রবীন্দ্রনাথের মন রাজি হত না। যে-কদিন তিনি সেই বাসায় ছিলেন এমনি করে ল্যাটিন পড়ার ছল করেই কেটে গেল। এই বাতিকগ্রস্ত ব্যক্তিটির একটি বিশেষ মত ছিল এই যে, পৃথিবীতে এক-একটি যুগে একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মানবসমাজে একই ভাবের আবির্ভাব হয়, যদিও সভ্যতার তারতম্য-অনুসারে সেই ভাবের রূপান্তর ঘটে থাকে। তাঁর মতের সপক্ষে কোনো প্রমাণ উপস্থিত করতে না পারলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর সেকথা অবিশ্বাস করেন নি, তিনি লিখেছেন : 'এখনো আমার এই বিশ্বাস যে সমস্ত মানুষের মনের সঙ্গে মনের একটি অখণ্ড গভীর যোগ আছে; তাহার এক জায়গায় যে-শক্তির ক্রিয়া ঘটে অন্যত্র গূঢ়ভাবে তাহা সংক্রামিত হইয়া থাকে।'[৫১] হয়তো অখ্যাত অবজ্ঞাত ল্যাটিন শিক্ষকের এই মত পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের সযত্ন-লালিত বিশ্বমানবমনের ধারণাকে অঙ্কুরিত হতে সাহায্য করেছিল।

এখান থেকে তারকনাথ পালিত তাঁকে নিয়ে এলেন মিঃ বার্কার নামক ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় পণ্ডিত এক শিক্ষকের পরিবারে। এককালীন পাদ্রি সদাব্যস্ত এই আধবুড়ো শিক্ষকটি অত্যন্ত খুঁতখুঁতে এবং তাঁর স্ত্রীটি অত্যন্ত ভালোমানুষ। নিঃসন্তান এই দম্পতির মধ্যে মনের মিল ছিল না, সুতরাং সংসারের মধ্যে একটা চাপা অশান্তি সব সময়েই বিরাজ করত। মিসেস বার্কার রবীন্দ্রনাথকে খুব যত্ন করতেন, আর ভালোবাসতেন Tiny নামের একটি কুকুরকে। আর সেইজন্যই স্ত্রীকে যখন বার্কার দণ্ড দিতে ইচ্ছা করতেন তখন পীড়া দিতেন সেই কুকুরকে। তাই 'এই কুকুরকে অবলম্বন করিয়া মিসেস বার্কার আপনার বেদনার ক্ষেত্রকে আরও খানিকটা বিস্তৃত করিয়া তুলিয়াছিলেন।'[৫১] য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র-এর অষ্টম পত্রে রবীন্দ্রনাথ এই দম্পতির করুণ-হাস্যোজ্জ্বল একটি চিত্র অঙ্কন করেছেন [দ্র পৃ ১৩৮-৪১]। এঁর কাছে পড়া সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র যা

বলেছেন তার মধ্যে কিছু অতিরিক্ত সংবাদ আছে : 'বার্কার নামক আর একজন শিক্ষক ছাত্রদিগকে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করাইয়া দিতেন। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে তাঁহার কাছে পড়িতাম গ্রীনস হিসট্রি অফ দি ইংলিস পিপ্‌ল।'*

রিজেন্ট পার্কের বাসায় একা-একা কিংবা মিঃ বার্কারের পরিবারে রবীন্দ্রনাথ কতদিন বাস করেছিলেন, সে-সম্বন্ধে নিশ্চিত করে বলার মতো উপকরণ আমাদের হাতে নেই। যদিও অগ্রহায়ণ মাস থেকেই প্রতি মাসে তাঁর খরচের জন্য জোড়াসাঁকো থেকে বিভিন্ন অঙ্কের টাকা বিল অফ এক্সচেঞ্জ [Bill of Exchange] মারফৎ সত্যেন্দ্রনাথের কাছে পাঠানো হত, কিন্তু প্রথম দিকে সর্বদাই পাঠানো হয়েছে লণ্ডনে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রযত্নে—সুতরাং ঐ হিসাবগুলি থেকে তাঁদের বিভিন্ন জায়গায় অবস্থানের হদিশ করা সম্ভব হয় না। অবশ্য 7 Feb 1879 [শুক্র ২৭ মাঘ] তারিখ সত্যেন্দ্রনাথ যে লণ্ডনে ছিলেন, তা জানা যায় *Journal of the National Indian Association*-এর Mar 1879 সংখ্যা থেকে—ঐদিন রাত্রি ৮টায় গ্রেট পোর্টল্যাণ্ড স্ট্রীটে অবস্থিত Langham Hall-এ National Indian Association-এর বার্ষিক অধিবেশনে সত্যেন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন এবং একটি অনতিদীর্ঘ ভাষণে ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেন। ইংলণ্ড-প্রবাসী অনেক ভারতীয় এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতির সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এর পরেও রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত আরও কয়েকমাস লণ্ডনে বাস করেছিলেন—অন্তত Jun 1879-এর মাঝামাঝি [জ্যৈষ্ঠ ১২৮৬-র শেষ] পর্যন্ত তিনি লণ্ডনে ছিলেন এবং পার্লামেন্টের অধিবেশন দেখতে গিয়েছিলেন, এমন প্রমাণ আছে। আমরা সে-সম্পর্কে যথাসময়ে আলোচনা করব। কিন্তু বর্তমান বৎসরের অর্থাৎ ১২৮৫ বঙ্গাব্দের শেষ পর্যন্ত [৩০ চৈত্র শনি 12 Apr 1879] তাঁর গতিবিধি সম্পর্কে আর কিছু জানা যায় না।

উপরের আলোচনায় আমরা প্রসঙ্গত জানিয়েছি যে, রবীন্দ্রনাথের জন্য বিল অফ এক্সচেঞ্জ মারফৎ জোড়াসাঁকো থেকে টাকা পাঠানো হত। এরূপ টাকা পাঠানোর প্রথম হিসাবটি আমরা পাই ১৭ অগ্র° [সোম 2 Dec 1878] তারিখে : 'বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলাত গমন খাতে খরচ ১৫০্ ব° S. N. Tagore Esqre C. S. Care of G. M. Tagore Esqre 17 Collingham Road/ South Kensington/ London S. W./ দ° শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রহায়ণ মাসের খরচ জন্য দেড়শত টাকার/21/03001 ন° এক কেতা বিল অব এক্সচেঞ্জ/ (12£-2s-2d) রেজেষ্টারি করিয়া/পাঠাইয়া দেওয়া যায়—১৫০্'; এই বিল অফ এক্সচেঞ্জ Chartered Mercantile Bank of India, London, and China-র উপর কাটা হয়, পরবর্তীকালের এটি কাটা হয়েছে Bank of England-এর উপর। অনুরূপভাবে পৌষ ও মাঘ মাসের খরচের জন্য দেড়শ' টাকা করে পাঠানো হয়। কিন্তু ফাল্গুন থেকে মাসিক পনেরো পাউণ্ড করে পাঠানো শুরু হয় [বিনিময় হারের পরিবর্তনের জন্য টাকার অঙ্কে পার্থক্য দেখা যায়]। আষাঢ় ১২৮৬ [Jul 1879] থেকে মাসিক বরাদ্দ বেড়ে হয়েছে কুড়ি পাউণ্ড। সত্যেন্দ্রনাথের জন্য এরূপ মাসোহারার বন্দোবস্ত না থাকলেও ১৭ ফাল্গুন [শুক্র 28 Feb 1879] তাঁকে একশো পাউণ্ডের বিল অফ এক্সচেঞ্জ পাঠাতে দেখা যায়।

এই বৎসর রবীন্দ্রনাথের জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা 'কবি-কাহিনী'র গ্রন্থাকারে প্রকাশ। এটিই তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি এইরূপ :

‘কবি-কাহিনী।/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।/ ও/ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক/ প্রকাশিত।/কলিকাতা/ মেচুয়াবাজার-রোডের ৪৯ সংখ্যক ভবনে/সরস্বতী যন্ত্রে শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক/মুদ্রিত।/সংবৎ ১৯৩৫।’

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ গ্রন্থটির বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন, ‘কবিকাহিনী/ এই খণ্ডকাব্যখানি প্রথমে ভারতীতে প্রকাশিত হয়। ভারতী ১ম বর্ষ ১২৮৪ সন (১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ) পৌষ ২৬৪-২৬৮ পৃষ্ঠা, ১ম সর্গ—২৩৮ লাইন, মাঘ ৩১৮-৩২৫ পৃষ্ঠা, ২য় সর্গ—৪২৫ লাইন, ফাল্গুন ৩৬০-৩৬৩ পৃষ্ঠা, ৩য় সর্গ—১৫৫ লাইন, চৈত্র ৩৯৩-৩৯৯ পৃষ্ঠা, ৪র্থ সর্গ— ৩৬৭ লাইন, মোট ১১৮৫ লাইন।...

‘গ্রন্থপরিচয়/গ্রন্থখানির আকার ৬৩/৪"+৪১/৮" (১৭ মিমি×১০.৫মিমি) ডবল্ ফুলস্ ক্যাপ্ ১৬ পেজি ৩ ফর্মা ৬ পৃষ্ঠায় মোট, মুখপত্র + ৫৩ পৃষ্ঠা; স্মল পাইকা অক্ষরে প্রতি পৃষ্ঠায় ২৪ লাইন ছাপা।’[৫২]

ক্যালকাটা গেজেট-এর পরিশিষ্ট রূপে মুদ্রিত বেঙ্গল লাইব্রেরির ত্রৈমাসিক বিবরণ অনুযায়ী গ্রন্থটির প্রকাশের তারিখ : 5 Nov 1878 [মঙ্গল ২০ কার্তিক ১২৮৫], মুদ্রণসংখ্যা : ৫০০ এবং মূল্য : ছয় আনা।

এই গ্রন্থ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘এই কবিকাহিনী কাব্যই আমার রচনাবলীর মধ্যে প্রথম গ্রন্থ-আকারে বাহির হয়। আমি যখন মেজদাদার নিকট আমেদাবাদে ছিলাম তখন আমার কোনো উৎসাহী বন্ধু এই বইখানা ছাপাইয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়া আমাকে বিস্মিত করিয়া দেন। তিনি যে কাজটা ভালো করিয়াছিলেন তাহা আমি মনে করি না, কিন্তু তখন আমার মনে যে-ভাবোদয় হইয়াছিল, শাস্তি দিবার প্রবল ইচ্ছা তাহাকে কোনোমতেই বলা যায় না। দণ্ড তিনি পাইয়াছিলেন, কিন্তু সে বইলেখকের কাছে নহে—বই কিনিবার মালেক যাহারা তাহাদের কাছ হইতে। শুনা যায় সেই বইয়ের বোঝা সুদীর্ঘকাল দোকানের শেল্‌ফ্ এবং তাঁহার চিত্তকে ভারাতুর করিয়া অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিতেছিল।’[৫৩]

এই ‘উৎসাহী বন্ধু’ গ্রন্থটির প্রকাশক প্রবোধচন্দ্র ঘোষ; ইনি 1876-এর সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে এনট্রান্স ক্লাসে সোমেন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদের সহপাঠী ছিলেন ও সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছিল, যা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়েছে।[*]

উপরে উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যে সম্ভবত একটু ভুল আছে। রবীন্দ্রনাথ 20 Sep বিলাত যাত্রা করেন ও কবি-কাহিনী-র প্রকাশের তারিখ 5 Nov; বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তকতালিকায় প্রদত্ত এই তারিখ যদি সঠিক না-ও হয়, তবু আমেদাবাদে অবস্থানকালে এই গ্রন্থ নিশ্চয়ই তাঁর হাতে পৌঁছয় নি। কারণ ইতিপূর্বে রবি-অনুরাগিণী আনা তড়খড়ের যে-পত্র উদ্ধৃত হয়েছে তা থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ভারতী-তে প্রকাশিত ‘কবি-কাহিনী’-র ফাইল-ই দিয়ে গিয়েছিলেন, প্রকাশিত গ্রন্থ নয়। যদি ইতিমধ্যে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে যেত, তাহলে আনা-কে সেই গ্রন্থ উপহার দেওয়াই স্বাভাবিক ছিল। অবশ্য এমন হতে পারে যে, প্রবোধচন্দ্র বা সোমেন্দ্রনাথের চিঠিতে তিনি গ্রন্থ-প্রকাশের আয়োজনের কথা জানতে পেরেছিলেন, দু-এক ফর্মা প্রুফও দেখে থাকতে পারেন—জীবনস্মৃতি-রচনাকালে এই স্মৃতি তাঁকে বিভ্রান্ত করেছে।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ-সম্পাদিত বান্ধব পত্রিকার মাঘ ১২৮৫ সংখ্যা-য় [৪।১০।৪৬৪-৬৭] কবি-কাহিনী-র একটি বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশিত হয়।[৫৪] সমালোচনা-প্রসঙ্গে সম্পাদক লেখেন, ‘... যাঁহারা শব্দ ও ছন্দ অপেক্ষা কাব্যগত ভাবেরই সমধিক আদর করেন, তাঁহারা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিকে বাঙ্গালা ভাষার নূতন একখানি

আভরণ বলিয়া গ্রহণ করিবেন। ইহাতে যথার্থই কবিতা আছে।... যে কবিতা, শিশির-সিক্ত কমল-কলির মত কথা না কহিয়াও মনুষ্য-হৃদয়ের সহিত নীরবে কথোপকথন করে;—যে কবিতা ফোটে ফোটে হইয়াও ফোটে না, অথচ অপরিস্ফুট সৌন্দর্যে মনঃপ্রাণ কাড়িয়া লয়, এই কবি-কাহিনীর প্রায়ই সর্বত্রই সেইরূপ প্রীতিময়ী পবিত্র কবিতা সুরুচিসম্পন্ন পাঠকের চিত্তবিনোদন করিবে।'

জীবনস্মৃতি-র প্রথম পাণ্ডুলিপিতে এই-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "বঙ্গসাহিত্যে সুপ্রথিতনামা শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় তাঁহার 'বান্ধব' পত্রে এই কাব্য-সমালোচন উপলক্ষ্যে লেখককে উদয়োন্মুখ কবি বলিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। খ্যাত ব্যক্তির লেখনী হইতে এই আমি প্রথম খ্যাতি লাভ করিয়াছিলাম।... প্রথম হইতে সাধারণের নিকট হইতে বাহবা পাইয়া আমি যে রচনাকার্যে অগ্রসর হইয়াছি, এ-কথা আমি স্বীকার করিতে পারিব না।"[৫৫] রবীন্দ্রনাথের শেষোক্ত মন্তব্যটি অবশ্য আমাদের পক্ষে মেনে নেওয়া শক্ত, প্রথম দিকে তিনি অজস্র অনুকূল সমালোচনা লাভ করেছিলেন—এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত আমরা আগেই পেয়েছি, পরেও অনেক পাব। তবে এ-কথা ঠিক গ্রন্থ-বিক্রয়ের হিসাবে এই আনুকূল্য ঠিকমতো প্রতিফলিত হয় নি।

কবি-কাহিনী-র আর-কোনো সংস্করণ বা পুনর্মুদ্রণ হয় নি; দীর্ঘকাল পরে আশ্বিন ১৩৪৭ [1940]-এ রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহের প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পুনঃপ্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি সম্পর্কে অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য আমরা যথাস্থানে পরিবেশন করেছি।

বর্তমান বৎসরে রবীন্দ্র-রচনা প্রকাশের বিবরণ ইতিপূর্বে আমরা ভাদ্র মাস পর্যন্ত দিয়ে এসেছি। ভারতী-র আশ্বিন সংখ্যা [২।৬]-য় তাঁর দুটি লেখা প্রকাশিত হয় :

২৭২-৭৯ 'পিত্রার্কা ও লরা'

২৮৫-৮৮ 'লীলা (গাথা)' দ্র শৈশবসঙ্গীত অ-১।৪৬৭-৭৪

—এই দুটি রচনা-সম্পর্কেই আমরা আগে আলোচনা করেছি। 'পিত্রার্কা ও লরা' বার্ণিক রায়-সম্পাদিত 'লা পয়েজি' পত্রিকায় [৮।২।৮৯-৯৬, প্রেত্রার্ক বিশেষ সংখ্যা, Jan-Jun 1974] পুনর্মুদ্রিত হলেও এখনও কোনো গ্রন্থভুক্ত হয় নি। 'লীলা'র শেষ আটটি ছত্র 'শৈশবসঙ্গীত'-এ বর্জিত হয়েছে। এর প্রথম চারটি ছত্র মালতীপুঁথি-তে পাওয়া যায়, কিন্তু শেষের ছত্র-চারটি শুধু ভারতী-তেই মুদ্রিত হয়েছিল।

কার্তিক সংখ্যা [২।৭] ভারতী-তেও রবীন্দ্রনাথের দুটি রচনা প্রকাশিত হয় :

২৮৯-৯৮ 'গেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ'

২৯৮-৩০৬ 'ফুলবালা' [দ্বিতীয়ার্ধ] দ্র শৈশবসঙ্গীত। অ-১। ৪৩৪-৫০

—এই সংখ্যা যখন প্রকাশিত হয়, রবীন্দ্রনাথ তখন ব্রাইটনে বাস করছেন। উপরের দুটি রচনা-সম্পর্কে আমরা বলেছি, 'ফুলবালা'-র দ্বিতীয় অংশটি আমেদাবাদে রচিত হয় এবং 'গেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ' সম্ভবত বোম্বাইতে লেখা। 'বিয়াত্রীচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য', 'পিত্রার্কা ও লরা' এবং বর্তমান প্রবন্ধটি একটি ভাবসূত্রে গ্রথিত বলে আমাদের মনে হয়। 'গেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ শেষ করেছেন এইভাবে : 'গেটের এই প্রেম কাহিনী সমুদয়ে পাঠকেরা যে মহাকবি গেটের হৃদয় জানিতে পারিবেন মাত্র তাহা নহে—প্রেমের বিচিত্র মূর্ত্তিও দেখিতে পাইবেন।' বিদেশের এই তিন জন শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যের মধ্যে প্রেমের এই বিচিত্র রূপ অনুসন্ধান উপরোক্ত তিনটি প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমকালীন মানসপ্রবণতা

অনুসারে দান্তে বা পেত্রার্কার প্রতি যতটা সহানুভূতি অনুভব করেছেন গেটের প্রতি ততটা নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রেমচেতনার এই বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বিচার করলে প্রবন্ধ তিনটি একটি অতিরিক্ত মাত্রা লাভ করে, এদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সেখানেই। বর্তমান রচনাটি কোথাও পুনর্মুদ্রিত হয় নি।

অগ্রহায়ণ সংখ্যা [২।৮] ভারতী-তে রবীন্দ্রনাথের কোনো লেখা নেই। বস্তুত ভারতী প্রকাশিত হবার পর এইটিই প্রথম সংখ্যা যা তাঁর রচনা ছাড়া প্রকাশ পেল। এর পর পৌষ [২।৯] ও মাঘ [২।১০] সংখ্যাতেও তাঁর কোনো রচনা প্রকাশিত হয় নি। ফাল্গুন সংখ্যা [২।১১]-য় আবার তাঁর দুটি লেখা দেখা যায় :

৫০৩-১২ 'নৰ্ম্ম্যান্ জাতি ও অ্যাঙ্গলো-নৰ্ম্ম্যান্ সাহিত্য' [প্রথম প্রস্তাব]

৫১৩-১৮ 'অপ্সরা-প্রেম।/ (গাথা)' দ্র শৈশবসঙ্গীত। অ-১।৪৭৬-৮৫

'নৰ্ম্ম্যান্ জাতি...' প্রবন্ধটিতে শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত 'স্যাক্সন্ জাতি ও অ্যাঙ্গলো স্যাক্সন সাহিত্য' প্রবন্ধটিরই ক্রমানুসরণ করা হয়েছে। রচনাটির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে Taine-রচিত ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসের পরিবর্তে অন্য-কোনো পুস্তকের সাহায্য বেশি পরিমাণে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রবন্ধটিতে নর্ম্যান্ জাতির ইতিহাস ও চরিত্রগত বিশেষত্ব বর্ণিত হয়েছে অ্যাংলো-নর্ম্যান সাহিত্যালোচনার ভূমিকা হিসেবে। বর্তমান সংখ্যায় প্রবন্ধের প্রথম প্রস্তাবটি প্রকাশিত হয়, দ্বিতীয় প্রস্তাব মুদ্রিত হয় জ্যৈষ্ঠ ১২৮৬ [৩।২] সংখ্যায়। রচনার ধারাটি লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, ইংরেজি সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস বাংলায় লেখাই রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল—অবশ্য মূল লক্ষ্য ছিল এই পথে ইংরেজি সাহিত্যের মর্মমূলে প্রবেশ করা। আমাদের দুর্ভাগ্য তাঁর এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ প্রাথমিক পর্যায়ের বেশি অগ্রসর হতে পারে নি।

'অপ্সরা-প্রেম' গাথাটির কিয়দংশের প্রাথমিক খসড়া মালতীপুঁথি-তে পাওয়া যায়, এ-কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। অবশ্য ভারতী-তে মুদ্রিত পাঠের প্রথম ও শেষাংশ উক্ত খসড়াতে পাওয়া যায় না, কিন্তু আমাদের ধারণা এই অংশগুলিও একই পাণ্ডুলিপিতে লিখিত হয়েছিল—যা পরে হারিয়ে গেছে। অনুমান করা যায় যে, এই খসড়াটি মালতীপুঁথি-র তিনটি পাতা বা ছ-টি পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছিল—যার একটি পাতা বা 67/৩৫ক ও 68/৩৫খ পৃষ্ঠা-দুটি মাত্র রক্ষা পেয়েছে, বাকি দুটি পাতা বা চারটি পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ বিনষ্ট। এরূপ অনুমানের কারণ—'কোথায় গো সখা কোথা গো!/ কত দিন ধ'রে, সখা, তব আশে...' ইত্যাদি যে-অংশটি ধুয়া হিসেবে [ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে] কয়েকবার ব্যবহৃত হতে দেখা যায়, পাণ্ডুলিপির 67/৩৫ক পৃষ্ঠায় 'শুকায়ে গিয়াছে নয়নের জল/যেতেছে দিবস নিশি/কোথা গো' লিখে রবীন্দ্রনাথ সেই অংশটি আর লেখেন নি, যার অর্থ পূর্ব-লিখিত ধুয়াটি এখানে পুনরাবৃত্ত হবে [রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা ১-এর সম্পাদক ও চিত্তরঞ্জন দেব উভয়েই পাণ্ডুলিপির পাঠটি অসম্পূর্ণ বলে মনে করেছেন] এবং 68/৩৫খ পৃষ্ঠার 'কেন গো সাগর, এমন চপল—এমন অধীর প্রাণ' গানটি এমন অসমাপ্ত আকারে পাওয়া যায়, যাতে স্পষ্টই বোঝা যায় এর পরেও আরও খানিকটা—অন্তত 'তবে থাম গো সাগর, থাম গো,/ কেন হয়েছ অধীরপ্রাণ' ধুয়াটি পর্যন্ত—লিখিত হওয়াই স্বাভাবিক, যা আরও একটি পাণ্ডুলিপি-পৃষ্ঠার অস্তিত্বকে সপ্রমাণ করে। কিন্তু এই অনুমান মেনে নিলেও সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হয় না। শৈশবসঙ্গীত কাব্যগ্রন্থে গাথাটি যখন সংকলিত হয়, তখন দেখা যায় উক্ত গানটিতে ভারতী-র পাঠের অতিরিক্ত আরও ২৮টি ছত্র যোগ করা হয়েছে এবং তার পরেও ১৬০টি ছত্র আছে। এই ১৮৮টি ছত্র ভারতী-তে প্রকাশিত হয় নি। প্রশ্ন উঠতে পারে, এই অংশটি কি একই সময়ে রচিত, কিংবা গ্রন্থপ্রকাশের সময়ে নতুন করে লিখে দেওয়া হয়েছিল। কবিতার ভাষার দিক দিয়ে বিচার করলে

শেষোক্ত সম্ভাবনাটি বাতিল করতে হয়; আবার একই সময়ে রচিত বলে মনে হয় না, কারণ ভারতী-তে ক্রমানুসৃতির কোনো উল্লেখ নেই ও যদি ইতিমধ্যেই অংশটি রচনা হয়ে যেত তাহলে চৈত্র সংখ্যাতেই সেটি প্রকাশিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল—এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের একটি রচনাও নেই।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ১

১২৮৫ বঙ্গাব্দে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা দ্বিজেন্দ্রনাথের স্ত্রী সর্বসুন্দরী দেবীর মৃত্যু। মৃত্যুর তারিখ সম্ভবত ১৫ আষাঢ় [শুক্র 28 Jun 1878],এই দিন ক্যাশবহি-র হিসাবে দেখা যায় : 'বড়বধু ঠাকুরাণীর পীড়ার জন্য ডাক্তার চার্লস সাহেবকে ফি দিবার জন্য দেওয়া যায়... নিজ রোজের ১৬্'; আবার ঐদিনই 'বড়ঠাকুরাণীর চতুর্থর খরচ ও শ্রাদ্ধর খরচ জন্য এডবান্স্' হিসেবে ২০০ টাকা দেওয়া হয়—'২৬ আষাঢ় শ্রাদ্ধ হয়' এই উল্লেখও ক্যাশবহি-তেই পাওয়া যায়। মৃত্যুর কারণ অনুমান করা যায় ২৫ শ্রাবণের একটি হিসাব থেকে : 'বড়বাবু মহাশয়ের একটি পুত্র হইয়া মৃত্যু হওয়ায় তাহার/দাহ করার ব্যয় ২্' ও বড় বধু ঠাকুরাণীর মৃত্যু সম্বাদ/ লইয়া আছিলাল সি° বোলপুর যায় তাহার ট্রেন ভাড়া ৩।' অর্থাৎ প্রসব-জনিত জটিলতার কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। এই মৃত্যুর একটি বর্ণনা দিয়েছেন প্রফুল্লময়ী দেবী : 'আটমাসের একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া মারা যাইবার পর হইতে তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে। নানা চিকিৎসার দ্বারা কোনও ফল না হওয়াতে শেষকালে মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় আমি নিকটে ছিলাম, মৃত্যুর কিছু পূর্বেই সংকেতের দ্বারা আমাকে জানাইলেন যে, তিনি তাঁহার স্বামীকে ও ছেলে মেয়েদের দেখিতে চান। আমি তৎক্ষণাৎ বড় ভাসুরকে তাঁহার ইচ্ছার কথা জানাইলাম। তিনি আসিবার অল্পক্ষণ আগেই তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়া যায়।'[৫৬] তিনি দ্বিপেন্দ্র, অরুণেন্দ্র, নীতীন্দ্র, সুধীন্দ্র ও কৃতীন্দ্র—এই পাঁচটি পুত্র এবং দুই কন্যা সরোজা ও ঊষাকে রেখে যান, সরোজা ইতিপূর্বেই বিবাহিতা। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ আমেদাবাদে বাস করছেন।

অগ্রহায়ণ মাসে ঠাকুরবাড়িতে কয়েকটি আনন্দানুষ্ঠানের খবর পাওয়া যায়। হেমেন্দ্রনাথের পঞ্চম কন্যা শোভনা এবং শরৎকুমারী দেবীর দ্বিতীয় বা কনিষ্ঠ পুত্র যশঃপ্রকাশের অন্নপ্রাশন হয় এই মাসেই। আর বৈঠকখানা বাড়িতে গিরীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা কাদম্বিনী দেবী ও যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র ইন্দুপ্রকাশের বিবাহ হয়, তাঁর 'আয়ুবড় ভাত'-এর আয়োজন করা হয় ভদ্রাসন বাড়িতে।

সোমেন্দ্রনাথের বায়ুরোগের সূত্রপাত হয় সম্ভবত ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি [Mar 1879]। ২৪ ফাল্গুন [7 Mar] তারিখের দুটি হিসাবে দেখা যায় : 'সোমবাবু মহাশয়কে সিলাইদহ হইতে/দ্বিপুবাবু ও মোহিনীবাবু [দ্বিজেন্দ্রনাথের জামাতা মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়] লইয়া আইসেন/তাহার ব্যয়' এবং 'সোমবাবুর পীড়া হওয়ায় রসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের ফি'। এর আগে Feb 1879 পর্যন্ত সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে তাঁর বেতন মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে দেখে মনে হয় তখনো তাঁর ব্যাধির লক্ষণ খুব বেশি প্রকট হয়ে ওঠে নি। কিন্তু চৈত্র মাসের মধ্যে সম্ভবত তাঁর অবস্থা খুব জটিল হয়ে উঠেছিল; এই অনুমানের কারণ ৬ বৈশাখ ১২৮৬ [18 Apr 1879] তারিখের একটি হিসাব : 'মকদ্দমা খাতে/খরচ—২০০্ ব° Dr. A. Payneদ° বারিষ্টার ইভানস্ সাহেবের অপিনিয়ন মতে/উক্ত ডাক্তারবাবু সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখিতে আইসে তাহার ফি' অর্থাৎ এই

ব্যাধির পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়-সম্পত্তির নতুন বিলি-বন্দোবস্তের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল।* এর পরে যদিও তাঁর দেখাশোনার জন্য বিশেষ আয়োজন করা হয়েছিল, তবু মনে হয় তিনি কখনোই বীরেন্দ্রনাথের মতো 'বিপজ্জনক' হয়ে ওঠেন নি, ফলে তাঁকে মানসিক হাসপাতালে পাঠাবার দরকার হয় নি। আবার বিবাহ দিয়ে রোগ সারানোর মতো সহজ ভাবনাও তাঁর ক্ষেত্রে ভাবা হয় নি, সম্ভবত বীরেন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত সামনে থাকার জন্যই। কিন্তু তাঁর শ্রাদ্ধবাসরে ভ্রাতুষ্পুত্র সুধীন্দ্রনাথ-কৃত প্রার্থনা [দ্র তত্ত্ববোধিনী, ফাল্গুন ১৮৪৩ শক (১৩২৮)। ২৮৯-৯০] ছাড়া বিভিন্ন স্মৃতিকথায় তাঁর সম্পর্কে এত কম উল্লেখ পাওয়া যায় যে তাঁর স্বভাব-প্রকৃতি ও জীবনধারার একটি স্পষ্ট ধারণা করা শক্ত। অবশ্য সুধীন্দ্রনাথ-কৃত উক্ত প্রার্থনায় সোমেন্দ্রনাথের ব্যাধির প্রকৃতি ছাড়াও তাঁর সম্পর্কে কতকগুলি বিশেষ সংবাদ পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, 'সোমকাকা আজীবন বায়ুরোগে কষ্ট পাইয়াছেন। জীবদ্দশায় যখনই তাঁহার এই রোগ প্রবল আকার ধারণ করিত, তখনই তাঁহার অন্তরের প্রকৃত নিগূঢ় ভাবসকল পরিস্ফুট হইয়া উঠিত; তখন তিনি লোকনির্ব্বিচারে সকলকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেন, সকলের করমর্দ্দন করিতেন, কুকুরকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিতেন, সকলের উচ্ছিষ্ট আহারের জন্য লালায়িত হইতেন, এমন কি, মেথরকে পর্য্যন্ত ঘরে আনিয়া তাঁহার পালঙ্কে বসাইতে তিনি কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিতেন না।... প্রাতরাশের সময় কাকামশায় তাঁহার পানীয় দুগ্ধের কিয়দংশ কুকুর বা বিড়ালের আহারের জন্য রাখিয়া দিতেন, রুটির টুক্‌রা ছোলা পাখিদের আহারের জন্য রাখিয়া বাগানে নিক্ষেপ করিতেন, একদিনও ইহার ব্যতিক্রম দেখি নাই।'[৫৭]

সংগীতেও তাঁর যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। এমন-কি কোনো কোনো ব্যক্তির কাছে সোমেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের চেয়েও সুকণ্ঠ ও সংগীতে পারদর্শী বলে খ্যাত ছিলেন। এমন-ই একজনের কথা বলেছেন অবনীন্দ্রনাথ : 'তিনি হলেন দ্বারকানাথের ভাগিনেয় ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তিনি বলতেন—হ্যাঁ, গলা হচ্ছে সোমবাবুর যেমনি গলা তেমনি গান গায় বটে। রবিবাবু আবার কী গান গায়'।"[৫৮] কয়েকটি ব্রহ্মসংগীতও তিনি রচনা করেছিলেন, তার একটি সরলা দেবীর 'শতগান' [১৩০৭।২০৩]-এ স্বরলিপি-সহ প্রকাশিত হয়েছিল : 'দেখিতে তরঙ্গময় ভব পারাবার'। ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার তিনি অন্যতম গুণগ্রাহী ছিলেন, তার কিছু বর্ণনা আমরা আগেই দিয়েছি। দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র সৌমেন্দ্রনাথের 'যাত্রী' গ্রন্থেও সোমেন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণ করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ-সোমেন্দ্রনাথ-সত্যপ্রসাদ ত্রয়ীর অন্যতম সত্যপ্রসাদ বিবাহের পরও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে কলেজী শিক্ষা অব্যাহত রেখেছিলেন; ১২ কার্তিক [28 Oct] তাঁর 'এল্ এ [এফ. এ—ফার্স্ট আর্টস, পরবর্তীকালের ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার সমতুল] পরিক্ষা দিবার জন্য' কুড়ি টাকা ফি জমা দেওয়া হয়, কিন্তু এই পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। Mar 1879-এ দেখা যায়, তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়েছেন।

স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী জানকীনাথ ঘোষাল ব্যারিস্টারি পরীক্ষার জন্য Dec 1875-এ ইংলণ্ডে পৌঁছন। এতদিন তাঁরা সিমলা অঞ্চলে একটি বাড়িতে বাস করছিলেন—সরলা দেবী জানিয়েছেন, 'এখনকার মিনার্ভা থিয়েটারের পাশ দিয়ে একটা গলিতে সে বাড়ি'।[৫৯] জানকীনাথ বিলাত যাত্রার পূর্বেই সে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে সপরিবারে জোড়াসাঁকোয় চলে আসেন। স্বর্ণকুমারী দেবী এসে আশ্রয় নেন বহির্বাটীর তেতলার একাংশে, যার অপর অংশটি ছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অধিকারে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে এই বোনটির যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল,

'দীপনির্বাণ' প্রধানত তাঁর উৎসাহেই রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। এখন পাশাপাশি বাস করার সুবাদে সেই ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়ল। তিনি বলেছেন, 'জানকী বিলাত যাইবার সময়, আমার কনিষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী আমাদের বাড়ীতে বাস করিতে আসায়, সাহিত্য-চর্চায়, আমরা তাঁহাকেও আমাদের আর একজন যোগ্য সঙ্গীরূপে পাইলাম।... স্বর্ণকুমারীও অনেক সময় আমার রচিত সুরে গান প্রস্তুত করিতেন। সাহিত্য এবং সঙ্গীত চর্চায় আমাদের তেতলা মহলের আবহাওয়া তখন দিবারাত্রি সমভাবে পূর্ণ হইয়া থাকিত।'[৬০] এই সম্মিলন স্বর্ণকুমারী দেবীর সাহিত্যিক-জীবনের পক্ষে খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল। এর প্রথম ফসল আমরা দেখতে পাই ভারতী-র পৌষ ১২৮৫-সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত তাঁর 'ছিন্নমুকুল' উপন্যাসে। সংগীত-রচনায় তার উৎসাহের পরিচয়ও ঐ উপন্যাস থেকেই পাওয়া যায়:

'রিমিঝিম ঘন বরিষে—সখিলো,
বিরহী নয়ন-পারা, ঢালিছে শ্রাবণ ধারা,
কি জ্বলে মরমে জ্বালা, নিভাই কেমনে সে,
গুরু গুরু গর্জ্জনে, গর্জ্জে নবীন ঘন,
দলকে দামিনী বিকাশে।' [ছিন্নমুকুল—২১শ পরিচ্ছেদ : ভারতী, বৈশাখ ।৮]

—এই গানটি অবলম্বনেই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ 'কালমৃগয়া'-র [১২৮৯] 'ঝম্ ঝম্ ঘন ঘন রে বরষে' [পাঠান্তর : 'রিম্ ঝিম্ ঘন ঘন রে'—বাল্মীকি প্রতিভা, ২য় সং] গানটি রচনা করেছিলেন।*

অন্যান্য পারিবারিক প্রসঙ্গের মধ্যে উল্লেখ করা যায় স্বর্ণকুমারী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরণ্ময়ী দেবী প্রথমে Doveton স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন [সরকারী তহবিল থেকেই তাঁর Oct-Nov-এর বেতন দেওয়া হয়েছে], কিন্তু জোড়াসাঁকোয় আসার পর Jan 1879-এ তিনি ও তাঁর মধ্যমা ভগিনী সরলা দেবী বেথুন স্কুলে ভর্তি হন, Mar-এ কনিষ্ঠা ঊর্মিলাও ঐ স্কুলে ভর্তি হন। এই মাসেই হেমেন্দ্রনাথের কন্যা প্রতিভা দেবী বেথুন স্কুল ছেড়ে ভর্তি হন লরেটো হাউসে।

উল্লেখযোগ্য, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও জানকীনাথ একত্রে ইতিপূর্বে 'ঠাকুর ঘোষাল কোম্পানী' নামে পাটের ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়েছিলেন। সম্ভবত Nov 1876 থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নীলের ব্যবসা শুরু করেন। এই ব্যবসা যে লাভজনক হয়ে উঠেছিল, তার একটি প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮ মাঘ [30 Jan 1879] তারিখের একটি হিসাব থেকে : 'মা° বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর/দ° উহার নিল বিক্রয়ের মূল্য জমা... ১৮৭৩।০৩'—এই টাকা সরকারী তহবিলে আমানত হিসেবে জমা রাখা হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও তাঁর জীবনস্মৃতি-তে এই লাভের কথা উল্লেখ করেছেন। অবশ্য 'ঠাকুর ঘোষাল কোম্পানী'র কাজকর্ম এই সময়েও অব্যাহত ছিল, ক্যাশবহি-তে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই কোম্পানির আইন-আদালত-সম্পর্কিত বিষয় দেখাশোনা করতেন কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী।

দেবেন্দ্রনাথের গতিবিধি সম্পর্কে উল্লেখ করার মতো বিষয় হল, তিনি বৈশাখ মাসের শুরুতেই চন্দননগরে বাস করতে যান; এই সময়ে তিনি দু-মাসের কিছু বেশি সময় সেখানে কাটান—পরবর্তীকালে দীর্ঘ দিন তিনি চন্দননগর-চুঁচুড়া অঞ্চলে কাটিয়েছিলেন, তার সূচনা এই সময়েই। ১০ আষাঢ় তিনি যান শান্তিনিকেতনে; ১৮ আষাঢ় সর্বসুন্দরী দেবীর মৃত্যু উপলক্ষে জোড়াসাঁকোয় এসে কয়েকদিন থেকে আবার শান্তিনিকেতনে ফিরে

যান। ১০ আশ্বিন [25 Sep] জ্যেষ্ঠ জামাতা সারদাপ্রসাদকে ব্যক্তিগত ব্যবসার জন্য শতকরা ৮ টাকা সুদে ১১,৫০০ টাকা ঋণ দেন। অগ্রহায়ণ মাসের গোড়ায় কলকাতায় ফিরে কয়েকদিন থেকে ঐ মাসের মাঝামাঝি যান আসাম-অঞ্চলে। [ক্যাশবহি-তে তাঁর তিব্বত-যাত্রার কথা প্রথমে উল্লিখিত হয়েছিল—হয়তো সেইরকম সংকল্প নিয়েই তিনি যাত্রা করেছিলেন—কিন্তু আসাম ভ্রমণ করেই তিনি ফিরে আসেন।] আবার চৈত্র মাসের শুরুতে আমরা তাঁকে দেখি দার্জিলিঙে। ৩ অগ্র° [18 Nov] তিনি ইংলণ্ডে সত্যেন্দ্রনাথের কাছে একটি পত্র পাঠান : 'কর্ত্তা মহাশয়ের দেওয়া মেজবাবুর নিকট বিলাতে এক পত্র পাঠানর টিকিট ব্যয়... ।ল°'।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ২

রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত না থাকলেও ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য আমরা ব্রাহ্মসমাজ-সম্পর্কিত কিছু তথ্য এখানে পরিবেশন করছি।

১১ মাঘ [বৃহ 23 Jan 1879] যথারীতি আদি ব্রাহ্মসমাজের একোনপঞ্চাশ সাংবৎসরিক অনুষ্ঠিত হয়। প্রাতে আদি ব্রাহ্মসমাজগৃহে শম্ভুনাথ গড়গড়ি ও বেচারাম চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন ও ব্রহ্মসংগীত হয় : ললিত—আড়াঠেকা। দেখিতে তরঙ্গময় ভব পারাবার [সোমেন্দ্রনাথ]।

দেবেন্দ্র-ভবনে সায়ংকালীন উপাসনায় বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা ও নিম্নলিখিত ব্রহ্মসংগীতগুলি গীত হয়:

ইমন কল্যাণ—আড়াঠেকা। বহুক ঝটিকা ঝড় কাঁপায়ে ভূধরবর। [স্বর্ণকুমারী];

পরজ—আড়াঠেকা। রাজ রাজেশ্বর ওহে দীন জনে দেখা দাও।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এই ক'টি গানের উল্লেখ থাকলেও, আমাদের ধারণা আরও অনেকগুলি গান গীত হয়, কিন্তু হয়তো পুরোনো পরিচিত গান বলেই সেগুলি উদ্ধৃত হয় নি। সায়ংকালীন অধিবেশনে দর্শক-শ্রোতার বাহুল্যের জন্য প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রিত হয়, ফলে 'সংবাদ প্রভাকর' [৪৮।২২৯, ১৩ মাঘ 25 Jan] সমালোচনা করে লেখে, '...আমরা দেখিয়া দুঃখিত হইলাম, এবারে অনেক ভদ্রলোককে তথায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। যাঁহারা সন্ধ্যার পর সমাজ দর্শনে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। সকলকেই ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। কেবল কোন কোন বিশেষ পরিচিত লোককেই প্রবেশ করিতে দেওয়া হইয়াছে। প্রধান বা আদি ব্রাহ্মসমাজের এই ব্যবহার কতদূর সঙ্গত, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম।' এই ধরনের সমালোচনার ফলে পরের বৎসর সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পূর্বেই বিজ্ঞাপন দিয়ে জানান, 'শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ১১ মাঘের উৎসবে অত্যন্ত জনতা ও লোকেরা মৃতকল্প হয়, তজ্জন্য ঐ দিবসে রাত্রি কালের উপাসনার সময় উপাসনাক্ষেত্রের বসিবার স্থান লোকপূর্ণ হইলে প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করা হইবে।' [তত্ত্ববোধিনী, মাঘ ১৮০১ শক। ১৯৯] পরবর্তীকালে এইজন্যই প্রবেশপত্রের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, অবশ্য বিনামূল্যেই এই প্রবেশপত্র সংগ্রহ করা যেত।

মাঘোৎসবের কয়েক দিন পূর্বে ৭ মাঘ [রবি 19 Jan] দেবেন্দ্র-ভবনে দুপুর তিনটেয় দ্বিজেন্দ্রনাথের আহ্বানে 'ব্রাহ্মসমাজ-সংস্থাপক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা' হয়। ক্রমে এটি একটি বার্ষিক কৃত্যে

পরিণত হয়।

ভগবতীচরণ দে সোমপ্রকাশ পত্রিকার ২২ মাঘ সংখ্যায় [২০।১২] একটি পত্র লিখে এই সভার বিভিন্ন অব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করলেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করেছেন; তিনি লিখেছেন, ... সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগেই এই সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল।...এতকাল কি আদি ব্রাহ্মসমাজ, কি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ, কি অন্যান্য সাধারণ সমাজ, সকলেই রামমোহন রায়ের প্রতি যারপরনাই তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সে অভাব দূর করিতে, স্বকর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন দেখিয়া আমরা বড়ই প্রীত হইয়াছি, বাস্তবিক এটী তাঁহাদের একটা নূতন কীর্ত্তি বলিতে হইবে।... কেশব বাবু এবং তাঁহার গোঁড়া ব্রাহ্মেরা উপরিউক্ত সভায় উপস্থিত হন নাই। কিন্তু ইহাতে তাঁহাদেরই অকৃতজ্ঞতা ও নীচতা প্রকাশ পাইয়াছে, সভার কোন অনিষ্টই হয় নাই, সভাতে ন্যূনাধিক আটশত লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, কেশব বাবুরা সভাতে কেন উপস্থিত হন নাই, ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, একে তো সভা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে আহূত হইয়াছিল, তাহাতে আবার সভা দেবেন্দ্র বাবুর বাটীতে হইয়াছিল, সুতরাং সেখানে কেশব বাবুরা যে উপস্থিত হইবেন তাঁহাদের সে উদারতাটুকু নাই।' তিনটি ব্রাহ্মসমাজের পারস্পরিক সম্পর্কটি বোঝার পক্ষে পত্রাংশটি যথেষ্ট সহায়ক। সভায় দ্বিজেন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু ও শিবনাথ শাস্ত্রী ভাষণ দেন বা প্রবন্ধ পাঠ করেন।

আগেই বলা হয়েছে, কুচবিহার-বিবাহকে উপলক্ষ করে কেশবচন্দ্র সেন-পরিচালিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ভাঙনের সূত্রপাত হয়েছিল। বস্তুত ১২ চৈত্র [রবি 24 Mar 1878] এই ভাঙন সম্পূর্ণ হয়েছিল, যেদিন প্রতিবাদীদল পুলিশের দ্বারা সমাজমন্দির থেকে বিতাড়িত হয়ে ডাঃ উপেন্দ্রনাথ বসুর বাড়িতে স্বতন্ত্রভাবে উপাসনা করেছিলেন। এরপর ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫ [বুধ 15 May 1878] বিকেল পাঁচটায় টাউন হলে ব্রাহ্মদের একটি সভা আহ্বান করে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ-সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, 'আমরা যখন স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করি, তখন আমাদের মনে দুইটি ভাব প্রবল ছিল। প্রথম, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে একনায়কত্ব দেখিয়াছি, কেশববাবু সর্বেসর্বা, এখানে তাহা হইবে না, এখানে সাধারণতন্ত্র প্রণালী অনুসারে কার্য হইবে। দ্বিতীয়, কেশববাবু ব্রাহ্মগণের ও ব্রাহ্মসমাজ সকলের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন, এখানে তাহা হইবে না, এখানে সভ্যগণের ও সমাজ সকলের মত গ্রহণ করিয়া কার্য হইবে।...ধর্ম বিষয়ে কোনো নূতন মত, বা ধর্মজীবনের কোনো নূতন আদর্শ যে স্থাপন করিতে হইবে, তাহা আমাদের লক্ষ্যস্থলে ছিল না। বরং আমাদের ভাব এই ছিল যে, আমরাই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত কার্য করিতেছি।'[৬১] তিনি বলেছেন, জনৈক উৎসাহী ব্রাহ্ম গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ প্রথম এই নামটি প্রস্তাব করেন [উৎসাহের আতিশয্যে ইনি এঁর এক পুত্রের নামকরণ করেন 'সাধারণচন্দ্র']। এই নাম নিয়ে আলোচনা করার জন্য এঁরা কয়েকজন একদিন চুঁচুড়া [? চন্দননগর]-য় দেবেন্দ্রনাথের কাছে যান। শিবনাথ লিখেছেন, "তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' নামটা শুনিয়া বলিলেন, "বেশ হয়েছে। আমাদের সমাজের নাম 'আদি' সমাজ, আমরা কালে আছি। কেশববাবুর সমাজের নাম 'ভারতবর্ষীয়' সমাজ, তাঁরা দেশে আছেন। তোমরা দেশ কালের অতীত হইয়া যাও।" সেখান হইতে আমরা নূতন সমাজের নাম 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' রাখা স্থির করিয়া আসিলাম। সেই নামই রাখা হইল।"[৬১]

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হবার পক্ষকাল পরে ১৬ জ্যৈষ্ঠ [বুধ 29 May] সমাজের বাংলা মুখপত্র 'তত্ত্বকৌমুদী' পাক্ষিক পত্রিকা হিসেবে শিবনাথ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। রামমোহন রায় সম্পাদিত 'সম্বাদ কৌমুদী'-র 'কৌমুদী' এবং অপর দুই ব্রাহ্মসমাজের পত্রিকা 'তত্ত্ববোধিনী' ও 'ধর্ম্মতত্ত্ব'-র 'তত্ত্ব' শব্দের মিলনে 'তত্ত্বকৌমুদী' নামকরণ করা হয়। শিবনাথ লিখেছেন, 'আমার মনের ভাব ছিল যে, রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে যে আধ্যাত্মিক ও সার্বজনীন মহা ধর্মের ভাব প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, 'তত্ত্বকৌমুদী' তাহাই প্রচার করিবে।'[৬২]

২১১ নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে [বিধান সরণী] একখণ্ড জমি ক্রয় করে মাঘোৎসবের দিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নতুন উপাসনাগৃহের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। সকলকে বিস্মিত ক'রে এই কাজের জন্য দেবেন্দ্রনাথ সাত হাজার টাকা সাহায্য করেন।

ব্রাহ্মধর্মান্দোলনের দিক দিয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কৃতিত্ব খুব উজ্জ্বল নয়। দেবেন্দ্রনাথের সময়ে এবং পরে কিছুটা কেশবচন্দ্রের সময়েও ব্রাহ্মসমাজে আধ্যাত্মিকতার চর্চা যতটা প্রাধান্য পেয়েছিল, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি দু-চারজন ছাড়া সেভাবে ধর্মভাবনায় ভাবিত ব্যক্তির অভাব খুবই অনুভব করা যায়। শিবনাথ শাস্ত্রী নিজেই লিখেছেন, 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ভাব বলিলে সভ্যগণের মধ্যে মতবিরোধ, দোষ প্রদর্শনেচ্ছা প্রভৃতি বুঝায়।'[৬৩] অন্য দুই সমাজের সঙ্গে নানা ধরনের বিতর্ক-বিরোধ, রক্ষণশীল হিন্দুধর্মের বিপরীতে এক শ্রেণীর গোড়া 'ব্রাহ্ময়ানি' এই সমাজের কার্যকারিতা অনেকটা ক্ষুণ্ণ করেছে। কিন্তু শিক্ষাবিস্তার, তরুণ ছাত্রসমাজের মধ্যে জাতীয়ভাবের উদ্দীপন, দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি নিবারণ ইত্যাদি সমাজসেবামূলক কাজকর্মে অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ একটি বিশিষ্ট স্থান দাবি করতে পারে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনেও এই সমাজের সভ্যেরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

শিক্ষাবিস্তারের দিক দিয়ে এই সমাজের প্রথম কাজ হল 6 Jan 1879 [সোম ২৩ পৌষ] তারিখে 'সিটি স্কুল' স্থাপন। আনন্দমোহন বসু এর প্রাথমিক ব্যয়ভার বহন করেন, শিবনাথ শাস্ত্রী হন প্রধান শিক্ষক ও সেক্রেটারি এবং ছাত্রসমাজের অবিসংবাদী নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—যদিও ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ছিলেন না—শিক্ষকতার ভার গ্রহণ করেন। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই স্কুলটি যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করে।

উপরোক্ত প্রসঙ্গটি এত বিস্তারিতভাবে আলোচিত হল এই কারণে যে, পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন—সেই-সব প্রসঙ্গ আলোচনার সময়ে বর্তমান পটভূমিকাটি মনে রাখলে সেগুলি ঠিকভাবে বোঝার পক্ষে সহায়ক হবে।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩

ডাঃ আত্মারাম পাণ্ডুরঙের [1823-98] কন্যা আনা তড়খড়-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ-সম্পর্ক মাত্র এক মাস বা তার সামান্য কিছু বেশি হলেও এঁর স্মৃতি বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তাঁর মনে অম্লান ছিল। এই জন্য আনা-

সম্পর্কে অনেকের মনেই কিছু কৌতূহল আছে। আমরা তাঁর সম্বন্ধে কিছু তথ্য আগেই জানিয়েছি, অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য এখানে পরিবেশিত হল।

প্রথমেই একটি ভুল সংশোধন করে নেওয়া দরকার। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়[৬৪] ও অমিতাভ চৌধুরী[৬৫] দুজনেই আনা-কে সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু দাদোবা পাণ্ডুরঙ তড়খড়ের কন্যা বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ-কথা ঠিক নয়। আমরা ইতিপূর্বেই জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর স্মৃতিকথায় আনা-কে ডাঃ আত্মারাম পাণ্ডুরঙের কন্যা বলে উল্লিখিত হতে দেখেছি। অন্যত্রও একই তথ্য পাওয়া যায়, যার কোনো কোনোটি আমরা পরে অন্য প্রয়োজনে উদ্ধৃত করব।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয়ের সময়ে আনা-র বয়স কত ছিল এ-সম্পর্কেও একটি সংশয় আছে। দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'মারাঠি ষোড়শী' বলে উল্লেখ করেছেন। প্রভাতবাবু লিখেছেন, 'বয়সে তিনি রবীন্দ্রনাথ হইতে কিছু বড় হইবেন।' কিন্তু অমিতাভ চৌধুরী এ-সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট তথ্য পরিবেশন করেছেন। মারাঠী মাসিক পত্রিকা 'মনোহর'-এর Sep 1961 সংখ্যায় এস. বি. যোশী একটি প্রবন্ধে আনা-র জন্ম 1855-এ বলে মত প্রকাশ করেছেন অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের থেকে তিনি ছ-বছরের বড়ো।[৬৬] অন্যান্য বালিকার সঙ্গে আনা-র একটি ফোটো পাওয়া গেছে, তা থেকে জানা যায় যে তিনি বম্বের আলেকজান্দ্রা স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। এই স্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মানকজী করসেদজী, যাঁর বাড়িতে সত্যেন্দ্রনাথ প্রথমবার সস্ত্রীক কিছুদিন বাস করেছিলেন। আনা এই স্কুলের প্রথম বারো জন ছাত্রীর অন্যতম ছিলেন। তিনি 1876-এ ইংলণ্ড গিয়ে ২৩ বৎসর বয়সে 1878-এ প্রত্যাবর্তন করেন।[৬৭]

রবীন্দ্রনাথ বোম্বাই থেকে বিলাতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন 20 Sep 1878 [৫ আশ্বিন] তারিখে। আমরা আগেই জানিয়েছি, বাড়ি থেকে ইনসিওর করে পাঠানো ১০০০ টাকা আমেদাবাদের ঠিকানায় চলে যাওয়ায় সত্যেন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত আনা-র বাবা ডাঃ আত্মারাম পাণ্ডুরঙের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথের পাথেয় হিসেবে ঐ পরিমাণ টাকা ধার নিয়ে সমুদ্রপাড়ি দেন। কিছুদিন পরে অবশ্য জোড়াসাঁকো থেকে টাকা পাঠিয়ে এই ঋণ শোধ করা হয়। এর পরে একটি কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ হল, ২১ ফাল্গুন [মঙ্গল 4 Mar 1879] ডাঃ পাণ্ডুরঙ ও তাঁর দুই মেয়ের কলকাতায় আগমন। *Brahmo Public Opinion* পত্রিকা [Vol. 1, No. 49, Mar 6, p. 557] সংবাদ দেয় : 'Weheartilywelcome Dr. Atmaram Pandoorang, the Sheriff of Bombay and his two accomplished daughters, Mrs. Weselker and Miss Anna Turkhud in our midst. The doctor arrived on Tuesday morning by the Mail Train and put up with Mr. and Mrs. Mano Mohun Ghose at No. 4 Theatre Road.' ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ২৬ ফাল্গুন [রবি 9 Mar] অ্যালবার্ট হলে তাঁদের একটি নাগরিক সংবর্ধনা জানানো হয়। *Brahmo Public Opinion* [Vol. 1, No. 50, Mar 13, p. 570] সংবর্ধনা-সভার বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে লেখে : 'Dr. Atmaram leaves Calcutta by the end of this week and we need scarcely add, carries with him the best wishes of his Bengali friends and acquaintances. His two daughters will stay here for a short time and we hope the Bengali ladies of Calcutta will combine to give these highly accomplished ladies a public reception.' এই পত্রিকার 3 Apr [Vol. II, No. 2, p. 13] সংখ্যা থেকে জানা যায়, তাঁরা বুধবার [১৩ চৈত্র 26 Mar] কলকাতা ত্যাগ করেন। ডাঃ পাণ্ডুরঙ ঠিক কী উদ্দেশ্যে কন্যাদের নিয়ে কলকাতায়

এসেছিলেন তা জানা না গেলেও আমাদের ধারণা তিনি জোড়াসাঁকো ঠাকুরপরিবারের সঙ্গে অবশ্যই যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। উপরের সংবাদেই প্রকাশ যে, তিনি ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষের বাড়িতে এসে উঠেছিলেন, যিনি ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সত্যেন্দ্রনাথ যখন সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন, তখন পাণ্ডুরঙ পরিবারের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতার কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। তাছাড়া ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৮ [26 May 1871] তারিখে 'বম্বে আত্মারাম পাণ্ডুরামের নিকট শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের ছবি পাঠাইবার ব্যয়'-এর উল্লেখ ক্যাশবহি-তে দেখা যায়। সুতরাং কলকাতায় এসে ডাঃ পাণ্ডুরঙ দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন [দেবেন্দ্রনাথ তখন জোড়াসাঁকোতেই ছিলেন], এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা একথা ভাবতে প্রলুব্ধ হই যে, নিছক কলকাতা পরিভ্রমণ বা দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার তাঁর স-কন্যা কলকাতা আগমনের উদ্দেশ্য ছিল না, 'রবি-অনুরাগিণী' আনা-র হৃদয়দৌর্বল্য দেখে কন্যাবৎসল ডাঃ পাণ্ডুরঙ হয়তো সেই অনুরাগকে সার্থক করার জন্য বিশেষ কোনো প্রস্তাব নিয়েই কলকাতায় এসেছিলেন। অবশ্য এটি নিছক অনুমান, একে সপ্রমাণ করার মতো কোনো তথ্য আমাদের হাতে নেই।

এই ঘটনার কয়েক মাস পরে 11 Nov 1879 [মঙ্গল ২৬ কার্তিক ১২৮৬] তারিখে বরোদা কলেজের উপাধ্যক্ষ হ্যারল্ড লিট্ল্ডেলের সঙ্গে আনা-র বিবাহ হয়। *Journal of the National Indian Association* পত্রিকায় [Jan 1880, p. 60] সংবাদটি প্রকাশিত হয় 'PERSONAL INTELLIGENCE' শিরোনামে : 'MARRIAGE.—November 11th, Mr. Harold Littledale, Vice-Principal of the Baroda High School and College, to Miss Ana Turkhud, second daughter of Dr. Atmaram Pandurang Turkhud, Sheriff of Bombay.' স্বদেশী পত্রিকা *Bengalee* [No. 44, Nov 15, p. 518]-তেও সংবাদটি প্রকাশিত হয় : 'Wednesday, November 12. We understand that a marriage has been arranged between Miss Anna Turkhud the youngest daughter of Dr. Atmaram Pandurang, of Bombay, and Mr. Harold Littledale, who has just come out to India as Vice-Principal of the Rajkumar College, Baroda. The interesting ceremony will take place in the course of the current month. Miss Anna Turkhud was educated in England, and is a highly accomplished Mahratta lady. The marriage will be solemnized in the civil form unaccompanied by religious rites.'—বিবাহ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল, *Bengalee*-র প্রতিবেদক সে সংবাদ তখনো পান নি। লক্ষণীয়, প্রথম সংবাদটিতে আনা-কে ডাঃ পাণ্ডুরঙের 'second daughter' ও দ্বিতীয় সংবাদে 'youngest daughter' বলে উল্লেখ করা হয়েছে—এর মধ্যে প্রথম সংবাদটি যথার্থ—আনা ডাঃ পাণ্ডুরঙের দ্বিতীয়া কন্যা-ই ছিলেন, পূর্বোক্ত মিসেস ওয়েসেলকর তাঁর প্রথমা কন্যা। আনা-র মৃত্যুর পর বামাবোধিনী পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে যে প্রবন্ধ[৬৮] প্রকাশিত হয়, তাতে এই বিবাহ সম্বন্ধে লেখা হয়েছিল, 'ডবলিন নগরে বরদা কলেজের অধ্যাপক লিটেলডেলের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাৎই প্রণয়ের মূল। এই প্রণয়ই পরিণামে পরিণয়ে পরিণত হয়। এই বিবাহে ভারতবাসীদিগের ও ইয়ুরোপীয়দিগের মধ্যে হুলস্থুল পড়িয়া যায়।' এই আন্তর্জাতিক বিবাহ যে যথেষ্ট কৌতূহলের সঞ্চার করেছিল উপরোক্ত দেশী ও বিদেশী পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদই তার প্রমাণ।

অমিতাভ চৌধুরী সম্ভবত এস. বি. যোশীর পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধ ও বোম্বাই প্রবাসী সলিল ঘোষের গবেষণা অবলম্বন কতকগুলি নতুন তথ্য উল্লেখ করেছেন।[৬৯] এই তথ্যানুযায়ী 18 Nov 1879 তারিখে ৩৫ বৎসর বয়স্ক স্কচ শিক্ষাবিদ হ্যারল্ড লিট্‌লডেলের সঙ্গে আনা-র বিবাহ হয়। একটি মত অনুসারে আনা-র বিবাহ হয় ইংলণ্ডে, বিবাহবিচ্ছেদের পর তিনি বোম্বাইয়ে ফিরে আসেন এবং সেখানেই ক্ষয় রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু বোম্বেতে ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের অফিসে আনা-র বিবাহের একটি রেকর্ড পাওয়া গেছে। জানা যায়, বিয়ের পর তড়খড় পরিবারের সকলে সত্যেন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণে তাঁর গৃহে এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন। 1880-তে আনা বরোদার রানীর গৃহশিক্ষিকা রূপে নিযুক্ত হন। বরোদাতে কিছুকাল থাকার পর লিট্‌লডেল-দম্পতি এডিনবরাতে চলে যান। আনা-র দুটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ভারত ত্যাগের পর মাতৃভূমির সঙ্গে বা নিজের পরিবারের সঙ্গে আনা-র বিশেষ কোনো যোগাযোগ ছিল না বলে মনে হয়। বোম্বের কাছাকাছি এক কবরস্থানে আনা-র সমাধি রয়েছে বলে যে ধারণা ছিল, এডিনবরাতেই অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে আনা-র মৃত্যু জ্ঞাত হওয়ায় সে-ধারণা পরিত্যক্ত হয়েছে।

উপরে প্রদত্ত তথ্যগুলি একটু সতর্কভাবে পরীক্ষা করা দরকার। ন্যাশানাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েশন-এর জার্নালে আনা-র বিবাহের তারিখ 11 Nov বলে উল্লিখিত হয়েছে, সমসাময়িক পত্রিকার বিবরণ বলে এই তারিখটিই গ্রহণযোগ্য। *Bengalee*-তে প্রকাশিত সংবাদে বিবাহস্থলের সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও বোম্বাইতেই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল এরূপ ইঙ্গিত রয়েছে। এই বিবাহের প্রায় দেড় বছর পরে 11 May 1880 তারিখে সত্যেন্দ্রনাথ 'ফর্লো' ছুটির শেষে সুরাটের শিকারপুরে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাণ্ড সেসন্স জজ [অস্থায়ী] রূপে কাজে যোগ দেন। বিবাহের সময় তিনি ইংলণ্ডে ছিলেন সুতরাং তাঁর গৃহে তড়খড় পরিবারকে নিমন্ত্রণ করার প্রশ্ন ওঠে না, অবশ্য দেশে ফিরে আসার পরে এরূপ নিমন্ত্রণের ব্যাপার ঘটে থাকতে পারে।

আনা-র মৃত্যু হয় 5 Jul 1891 [রবি ২২ আষাঢ় ১২৯৮] তারিখে এডিনবরা শহরে। তাঁর মৃত্যুর পর বামাবোধিনী পত্রিকার পূর্বোক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধটির লেখক কে আমাদের জানা নেই, কিন্তু আনা-সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্যে পরিপূর্ণ বলে আমরা রচনাটির বেশির ভাগই উদ্ধৃত করছি : 'বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ সমাজ-সংস্কারক আত্মারাম পাণ্ডুরাংয়ের বিদুষী কন্যা গত ৫ই জুলাই তারিখে এডিনবরা নগরে মানবলীলা সংবরণ করেন—... যে সকল ভারতমহিলা পাশ্চাত্য শিক্ষায় সর্ব্বপ্রথমে সুশিক্ষিতা হন, আনাবাই তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। তাঁহার পিতা সদালাপী, উন্নতমনা, মার্জ্জিতবুদ্ধি, জ্ঞানী ও পরম ধার্ম্মিক। ইনি বালিকা কন্যাকে অধ্যায়নার্থে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। ইহাতে ইনি সমাজের বিরাগভাজন হন। কিন্তু কিছুতেই ভয় পান নাই; জাতিভেদের বন্ধন উল্লঙ্ঘন করিয়া কিছুমাত্র দুঃখিত হন নাই। বুদ্ধিমতী আনা অলৌকিকী শক্তির পরিচায়িকা। ষোড়শ বৎসরে তিনি যেরূপ গুণবতী হইয়া উঠিয়াছিলেন, সেরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। ডাক্তার আনন্দীবাই যে অসামান্য মনস্বিতার পরিচয় দেন স্ত্রী কবি বঙ্গ-যুবতী কুমারী তরুদত্ত যে কবিত্বের লালিত্যে অখিল সভ্য জগৎকে বিমুগ্ধ করেন, ইঁহারও সেই শক্তি ছিল, বিকাশের সম্পূর্ণ সুযোগ হয় নাই।...গীতবাদ্যে তিনি সুনিপুণা ছিলেন। মাতৃভাষা মহারাষ্ট্রীয় ব্যতীত তিনি ইংরাজী, ফরাসী, জর্ম্মণ ও পর্ত্তুগীজ ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এই সকল ভাষায় কথোপকথন করিতে পারিতেন। তিনি সংস্কৃতও কিছু কিছু জানিতেন। তাঁহার রীতি নীতি চাল চলন এত ভাল ছিল, তিনি এরূপ সদালাপিনী ছিলেন, যে একবার যিনি তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার হৃদয়গ্রাহিতার প্রশংসাবাদ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।...

'আনাবাই "নলিনী" ['Lotus-Flower'] স্বাক্ষরিত বিবিধ প্রবন্ধ, ছোট ছোট গদ্য ও পদ্য দেশীয় ও বিলাতী সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রাদিতে লিখিতেন। চিকালগোদা নামক স্থানে মনের মত একটি বাটী নির্মাণ করাইয়া তিনি তাহাতে বাস করিতেন।

'ভুবন বিখ্যাত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বালী হইতে প্রত্যাগমনকালে শকট হইতে পতনে উদরে বেদনা লাগে। এই বেদনাই তাঁহার সাংঘাতিক রোগের মুখ্য কারণ, আনাবাইয়েরও তদ্রূপ। একদা সেকেন্দারেবাদে একটি শকট দুর্ঘটনা দুই বৎসর পূর্ব্বে ঘটে, কিন্তু তদবধি ইঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। পীড়া নিবন্ধন ইতি গত এপ্রেলমাসে ইয়ুরোপ যাত্রা করেন; এবং সেখানেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।...'

এই জীবনবৃত্তান্তে সবচেয়ে বেশী লক্ষণীয় বিষয়টি হচ্ছে যে, বিবাহিত জীবনেও তিনি রবীন্দ্রনাথকে ভোলেন নি; সেই কিশোর-কবির প্রদত্ত আদরের ডাক নাম 'নলিনী' স্বাক্ষরেই তিনি প্রবন্ধাদি প্রকাশ করতেন —তাঁর অপেক্ষাকৃত পরিণত মনেও সেই 'আপন-মানুষের দূত' গভীর স্বাক্ষর এঁকে দিয়েছিলেন, এ তারই প্রমাণ। তাঁর এক ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম রাখা হয়েছিল 'রবীন্দ্রনাথ', এ-প্রসঙ্গে এই তথ্যটিও উল্লেখযোগ্য। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখেছেন : 'One of his (Dr. Atmaram's) sons, Mr. Ramchand Atmaram, is my neighbour at Bandra. He reads Bengali,...He has given Bengali names to his sons, one of whom is named Rabindra.'[৬৯]

এই পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘকাল পরেও রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ ছিল। আনা-র কনিষ্ঠা ভগিনী মানক-কে 29 Jan 1918 [১৬ মাঘ ১৩২৪] রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

It is nice of you to write to me as you have done. Your voice belongs to that little world of familiar faces in a city of strangers where I took my shelter when I was seventeen and where you were just emerging from your nebulous stage of indistinctness. ...The other day when I accepted an invitation to come to Bombay I hoped to see you and talk to you of the old days spent under your father's roof.[৭০]

উল্লেখপঞ্জী

১ রবীন্দ্রজীবনী ১ [১৩৬৭]। ৮০

২ রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা ১ [১৩৭২]। ২৪১

৩ ঐ ১। ১৫৩

৪ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৫৭

৫ ছেলেবেলা ২৬। ৬২৭

৬ আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস [1915]। ২৫৮-৫৯

৭ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৫৭

৮ জীবনস্মৃতি [১৩৬৮]। ২০৪

৯ ঐ ১৭। ৩৫৮

১০ ঐ [১৩৬৮]। ২০৪

১১ রবীন্দ্রজীবনী ১ [১৩৯২]। ৮৩, পাদটীকা ৩

১২ ‘প্রথম আলোর চরণধ্বনি’, রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য [সুবর্ণরেখা সং, ১৩৯৫]। ১০১

১৩ ছেলেবেলা ২৬। ৬২৮

১৪ পুরাতনী [১৩৬৪]। ৩১

১৫ দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩

১৬ ছেলেবেলা ২৬। ৬২৮

১৭ ঐ ২৬। ৬২৮

১৮ তীর্থংকর [২য় সং : ১৩৫১]। ১৪৪-৪৫

১৯ ঐ। ১৪৫

২০ ছেলেবেলা ২৬। ৬২৯

২১ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ১। ৮৮

২২ য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র [১৩৬৭]। ১

২৩ ঐ। ৩-৪

২৪ ঐ। ৫

২৫ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৫৮

২৬ য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র। ১৩

২৭ ঐ। ১৪

২৮ ঐ। ১৫

২৯ ঐ। ১৭

৩০ ঐ। ১৮

৩১ ঐ। ১৯

৩২ য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র। ২০

৩৩ ঐ। ২৫

৩৪ ঐ। ৮৪-৮৫

৩৫ পুরাতনী। ৪০

৩৬ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৫৯

৩৭ রবীন্দ্রস্মৃতি [১৩৮০]। ১৫-১৬

৩৮ ‘বরফ পড়া’ : বালক, আশ্বিন-কার্তিক ১২৯২। ৩৪২

৩৯ য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র। ৫০

৪০ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৬০

৪১ রবীন্দ্রচর্যা [২য় সং : ১৩৯২]। ২৩-২৪

৪২ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৬০

৪৩ য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র। ২০-২১

৪৪ ঐ। ২২

৪৫ তীর্থংকর। ১৪২-৪৩

৪৬ পুরাতনী। ৩৯-৪০

৪৭ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৭৮-৭৯

৪৮ ঐ ১৭। ৩৮০-৮১

৪৯ রবীন্দ্রস্মৃতি। ১৩

৫০ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৬০

৫১ ঐ ১৭। ৩৬২

৫২ 'রবীন্দ্রপরিচয়' : প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯। ২১৫

৫৩ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৫৫

৫৪ দ্র ড অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত রবীন্দ্রবিতান [১৩৬৮]। ১-৫

৫৫ গ্রন্থপরিচয়, জীবনস্মৃতি ১৭। ৪৭৬-৭৭

৫৬ 'আমাদের কথা', বলেন্দ্রনাথ শতবার্ষিকী গ্রন্থ [1972]। ২৩-২৪

৫৭ তত্ত্ববোধিনী, ফাল্গুন ১৮৪৩ শক [১৩২৮]। ২৯০

৫৮ ঘরোয়া [১৩৭৭]। ১৩৬

৫৯ জীবনের ঝরাপাতা [১৩৮২]। ৫

৬০ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি [২য় সং : ১৩৮৯]। ৫৮-৬১

৬১ শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত [১৩৮৩]। ১১৮

৬২ আত্মচরিত। ১২০

৬৩ ঐ। ১১৯

৬৪ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ১। ৮৭

৬৫ দ্র 'আপন মানুষের দূতী' : রবীন্দ্রনাথের পকেট বুক এবং [১৩৭৮]। ১৪; রবি-অনুরাগিণী [১৩৮৪]। ২২

৬৬ ঐ। ১৭

৬৭ দ্র ই. বি. খোটে-সম্পাদিত বিশ্রদ্ধ শারদা ১ [1972]। ১২৬; তথ্যটি সংগ্রহ করে দিয়েছেন বিশ্বভারতীর মারাঠী-অধ্যাপিকা বীণা আলাসে।

৬৮ 'আনা বাই (বিবী লিটেলডেল)', বামাবোধিনী, আশ্বিন ১২৯৮। ১৬২-৬৩

৬৯ 'আপন মানুষের দূতী'। ১৭-১৮

৭০ 'Early Recollections III', *The Modern Review*, Apr. 1927, p. 418.

৭১ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি

---

*১ '...আমি হস্তান্তরিত পুস্তকের বাজারেই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি হইতে অপসৃত একখানি পুস্তক পাই। তাহারই মধ্যে কোনও অজ্ঞাত পুস্তকের পুস্তনির একটি পৃষ্ঠা লুক্কায়িত ছিল। সাদা পুস্তনির উপর পেনসিলে লেখা আর একটি অভঙ্গের অনুবাদ ছিল। হস্তাক্ষর নিঃসংশয়ে কিশোর রবীন্দ্রনাথের।...' —রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য [সুবর্ণরেখা সং: ১৩৯৫]।২২৬

*২ প্রবোধচন্দ্র সেন নবরত্নমালা-র [১৩১৪] ভূমিকা থেকে 'ইহাতে সংস্কৃতের যে সকল অনুবাদ আছে তন্মধ্যে আমার নিজের ছাড়া কতকগুলি শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথের কৃত' অংশটি উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন, 'এই গ্রন্থে তুকারামের অনেকগুলি অভঙ্গের পদ্যানুবাদও আছে। এই অনুবাদে রবীন্দ্রনাথের হাত ছিল কিনা সে বিষয়ে গ্রন্থকার নীরব।' [রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা ১।১৫৩] কিন্তু একটি বিষয় অধ্যাপক সেনের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। ভারতী-র তিনটি সংখ্যায় প্রকাশিত সম্পূর্ণ 'তুকারাম' প্রবন্ধটি সত্যেন্দ্রনাথের বোম্বাই চিত্র [22 May 1889] গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে এবং গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করে তিনি লিখেছেন, 'তুমি এই গ্রন্থ-প্রকাশ বিষয়ে বিস্তর সাহায্য করিয়াছ—তোমার প্ররোচনায় ইহার জন্মলাভ, ইহার স্থানে স্থানে তোমার হস্তচিহ্ন বিদ্যমান।'—গ্রন্থটিতে সংকলিত অন্যান্য প্রবন্ধগুলি দেখলেই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের হস্তচিহ্ন শুধু 'তুকারাম'-এই থাকতে পারে। আরও একটি প্রমাণ—মালতীপুঁথি-তে প্রাপ্ত ও ভারতী-তে প্রকাশিত 'আমারি বেলায় উনি সংসারে বিরাগী' অনুবাদটির পাঠ—'আমারি বেলায় উনি যোগী' [দ্র রূপান্তর। ১১৫]—বোম্বাই চিত্র-তে বহুলভাবে পরিবর্তিত হয়েছে; আরও কয়েকটি পদে কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। 'গ্রন্থ-প্রকাশ বিষয়ে বিস্তর সাহায্য' করার সময়েই রবীন্দ্রনাথ এই পরিবর্তনগুলি করেন, এই অনুমান অযৌক্তিক নয়।

*৩ পদগুলি ভারতী-তে প্রকাশের ক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়েছে; এর সঙ্গে পাণ্ডুলিপি-পৃষ্ঠার সম্পর্কটি অনুধাবন করলে বোঝা যায় মালতীপুঁথি-তে পৃষ্ঠাগুলি কী রকম পারম্পর্যহীন অবস্থায় রয়েছে। সঠিক পরম্পরাটি হওয়া উচিত—18/৯খ, 17/৯ক, 12/৬খ, 11/৬ক। মনে রাখা দরকার 11/৬ক পৃষ্ঠায় পাঁচটি অনুবাদ রয়েছে, যার মধ্যে প্রথম তিনটি আষাঢ়-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

* রবীন্দ্রনাথের অষ্টাদশতম জন্মদিন; প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, জন্মদিন-পালনের প্রথা এই সময়ে ঠাকুরবাড়িতে চালু হয় নি, ইংলণ্ড থেকে প্রত্যাবর্তনান্তে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী এটির প্রবর্তন করেন।

* প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, এটি ফরাসী শিল্পী Gustave Dore [1833-83]-এর আঁকা চিত্রে সমৃদ্ধ। দ্র রবীন্দ্রজীবনী ১ [১৩৯২]। ৮১

* 'কাব্যসংগ্রহঃ/অর্থাৎ/কালিদাসাদিমহাকবিগণ/বিরচিতত্রিপঞ্চাশৎ/উত্তমসম্পূর্ণকাব্যানি।/ শ্রীডাক্তর-যোহন-হেবর্লিনকর্তৃক/সমাহৃতমুদ্রাঙ্কিতানি/শ্রীরামপুরীয়চন্দ্রোদয়যন্ত্রে/১৮৪৭'। এই গ্রন্থ ও তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন ড পম্পা মজুমদার তাঁর রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস [১৩৭১] গ্রন্থের ৩২৪-৩০ পৃষ্ঠায়। আগ্রহী পাঠককে এই তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনাটি পড়ে নিতে অনুরোধ করি।

* মুদ্রণ-প্রমাদে ছাপা হয়েছে 'বয়স ২০।১২৮৬।১৮৭৯'।

* বক্তৃতাটি ৪ অগ্র° ১২৮৩ তারিখে দেবেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে হিন্দু স্কুল থিয়েটারে বঙ্গভাষা-সমালোচনী-সভার অধিবেশনে পঠিত হয়। পুস্তিকাটির 'বিজ্ঞাপন'-এর তারিখ ১৩ বৈশাখ ১৮০০ শক।

* দ্বিতীয় কবিতাটি সম্পর্কে আমরা আগে লিখেছিলাম, এটি "সামান্য ভিন্নরূপে 'বিদায়' নামে ভারতী-র মাঘ ১২৮৪-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানে কবির নাম ছিল Mrs. Opie, এখানে মুর-এর নামে কবিতাটি চিহ্নিত হয়েছে।" কিন্তু মঞ্জুলা ভট্টাচার্য 22 Jun 1986 তারিখের রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় 'রবীন্দ্রনাথ, মুর ও এমিলিয়া ওপি' প্রবন্ধে আমাদের ভুলটি দেখিয়ে দিয়েছেন। দুটি অনুবাদের প্রথম ছত্র-দুটি সদৃশ হলেও প্রকৃতপক্ষে সে-দুটি স্বতন্ত্র কবিতা। Moore-রচিত কবিতাটির প্রথম ছত্র : 'Go where glory waits thee'। শ্রীমতী ভট্টাচার্য তাঁর প্রবন্ধে টমাস মুর ও এমিলিয়া ওপি-র মূল কবিতাগুলি ও রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ উদ্ধার করে দিয়েছেন, এর জন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

* *History of English Literature* by H. A. Taine, D.C.L., Translated from the French by H. Van Laun, Vol. I. London, Chatto & Windus, 1871.

* রবীন্দ্রভবন-গ্রন্থাগারে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহৃত দান্তের একটি কাব্যগ্রন্থ আছে, বইটিতে তাঁর হস্তাক্ষরে লেখা—'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।/ কলিকাতা/ ১৮৭৮' অর্থাৎ সম্ভবত কলকাতায় থাকার সময়েই তিনি বইটি সংগ্রহ করেন। গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি এইরূপ : "THE "CHANDOS CLASSICS."/ THE/ VISION;/ OR/ HELL, PURGATORY, AND PARADISE,/ OF/ DANTE ALIGHIERI./ TRANSLATED

BY/ THE REV. H. F. CARY, A. M./ LONDON :/ FREDERICK WARNE AND CO. BEDFORD STREET, STRAND./ NEW YORK, SCRIBNER, WELFORD, AND ARMSTRONG.'

* আনা দুবছর আগে ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন। কৃষ্ণ কৃপালনী লিখেছেন, 'The visitor's Book maintained at the Samadhi of Raja Rammohun Roy at Arno's Vale cemetery in Bristol carries the following entry with Ana's signature : 'Ana Turkhud of Bombay/ V. A. Atmaram (Turkhud) of Bombay/ visited the Rajah's tomb this day & paid our respects to the memory of our earlist Reformer. Aug. 26, 1876.' —*Rabindranath Tagore : A Biography* [1980], p. 79.

* পত্রটি সজনীকান্ত দাসের আবিষ্কার। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'হঠাৎ মহর্ষির আত্মচরিতের সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত একটি ইংরেজী অনুবাদ-গ্রন্থ চোরাবাজার হইতে আমার হস্তগত হয়। তাহার মধ্যেই এই চিঠিখানি সুরক্ষিত ছিল।...রবীন্দ্রনাথের কাছে উহা লইয়া গেলাম। চিঠিটি দেখিয়া একেবারে সায়ংসন্ধ্যায় রবির প্রভাত-দীপ্তি যেন ফিরিয়া আসিল। কিছুক্ষণ নির্বাক থাকিয়া তিনি রথীন্দ্রনাথকে ডাকিলেন এবং চিঠিখানি তাঁহাকে দেখাইয়া এই মাত্র মন্তব্য করিলেন যে, তোমরা রবীন্দ্র যাদুঘর যদি করিতে চাও, এই পত্রটিকে সর্বাধিক গৌরবের স্থান দিও।' —রবীন্দ্রনাথ; জীবন ও সাহিত্য! ২৩২-৩৩

* রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলা-য় লিখেছেন, 'আমার মুখে অবাধ্যতা প্রকাশ পাবার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল'—কথাটি ঠিক নয়। আনা-র মৃত্যু হয় 5 Jul 1891 [রবি ২২ আষাঢ় ১২৯৮]—আমরা তার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের শ্মশ্রুশোভিত মুখমণ্ডলের সাক্ষাৎ বিভিন্ন আলোকচিত্রে দেখতে পাই।

* বিখ্যাত কবি দলপতরাম সত্যেন্দ্রনাথের প্রশস্তি-মূলক একটি স্বরচিত দোহা পাঠ করেন। বম্বের সিদ্ধার্থ কলেজের গুজরাটি সাহিত্যের প্রাক্তন অধ্যাপক টি. টি. ভাট এই সংবর্ধনার বিবরণ, দলপতরামের মূল দোহা ও তার ইংরেজি অনুবাদ শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রভবনে প্রেরণ করেন [21.3.1979]। সেখান থেকেই এই সংবাদটি পাওয়া। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা। ৬৭ থেকেও জানা যায়, সত্যেন্দ্রনাথ 14-19 Sep ছুটি নিয়েছিলেন, 20 Sep থেকে তাঁর 'ফার্লো' ছুটি আরম্ভ হয়।

* য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র [রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সং : পৌষ ১৩৬৭]। ১; এই গ্রন্থ থেকে যাবতীয় উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে আমরা এই সংস্করণটিই ব্যবহার করেছি, এটি প্রথম সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ, রচনাবলী-তে সম্পাদিত সারাংশ মাত্র মুদ্রিত হয়েছে।

* ড দেবীপদ ভট্টাচার্য, "ব্রাইটন্ ও 'মেদিনা ভিলা'র বাসিন্দা" : রবীন্দ্র-চর্যা [২য় সং : ১৩৯২]। ২৩; এই প্রবন্ধে ড ভট্টাচার্য রবীন্দ্রনাথের ব্রাইটনের জীবন-সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য দিয়েছেন। অনেকগুলি তথ্য অকুস্থল থেকে পাঠিয়েছেন তাঁর ছাত্রী কেতকী কুশারী ডাইসন। বর্তমান আলোচনায় আমরা উভয়ের প্রদত্ত তথ্যগুলি যথেষ্ট ব্যবহার করেছি।

* সোমপ্রকাশ [২১।৮, ২৩ পৌষ 6 Jan 1879] পত্রিকায় লিখিত হয়, 'ব্যারিষ্টার বাবু তারকনাথ পালিত স্ত্রী-পুত্র সঙ্গে লইয়া লণ্ডনে পৌঁছিয়াছেন। ইনি পুত্রদিগকে তথায় শিক্ষার্থ রাখিয়া আসিবেন। বাবু জানকীনাথ ঘোষাল এই সঙ্গে গিয়াছেন। তিনিও তথায় আইন অধ্যয়ন করিবার জন্য রহিলেন।' এই সংবাদটি আমাদের সিদ্ধান্ত সমর্থন করে। 6 Jan সংখ্যায় তারকনাথের লণ্ডন পৌঁছনোর সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার অর্থ এর অন্তত পক্ষকাল পূর্বে তিনি সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তারপর ব্রাইটনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আসেন।

* 'জীবনস্মৃতির জন্মকথা', শারদীয়া আনন্দবাজার ১৩৮৩।১২; ১৪ বৈশাখ ১৩১৮ [1911] শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের আলোচনার ক্ষিতিমোহন সেন-কৃত অনুলিপি।

* এঁর সম্পর্কে ইন্দিরা দেবী তাঁর অপ্রকাশিত স্মৃতিকথায় একটি মজার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন : 'রবিকার এক বন্ধু ছিলেন প্রবোধ চন্দ্র ঘোষ, তার নামে সোদ্দা (সত্যদা) ছড়া বেঁধেছিলেন : প্রবোধা চন্দ্রা ঘোষা তাঁর শাঁস নেই কেবল খোসা।' প্রিয়নাথ সেনকে ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা অনেকগুলি পত্রে রবীন্দ্রনাথ এঁর সম্বন্ধে অনেক কৌতুকপূর্ণ মন্তব্য করেছেন।

* 1 Oct 1879 তারিখে হাইকোর্ট কর্তৃক সোমেন্দ্রনাথকে অপ্রকৃতিস্থ ঘোষণা করা হয়, দ্র Tagore Family Papers, No. 70.

* ইন্দিরা দেবী লিখেছেন, একটি হিন্দি গান 'রিমি ঝিমি রিমি ঝিমি' ভেঙে রবীন্দ্রনাথের গানটি রচিত হয়, দ্র রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম [১৩৮০]। ৩২

ঊ ন বিং শ   অ ধ্যা য়

১২৮৬ [1879-80] ১৮০১ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের ঊনবিংশ বৎসর

য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত চিঠিগুলিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইংলণ্ড-প্রবাসের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দিলেও, আমরা যে-রীতিতে তাঁর জীবন-বৃত্তান্ত সংকলন করছি তার পক্ষে যথোপযুক্ত তথ্যের অভাব আছে। প্রধান অসুবিধা চিঠিগুলিতে কোনো তারিখ নেই [হয়তো মূল চিঠিতে ছিল, কিন্তু ভারতী-তে প্রকাশের সময় সেগুলি পরিত্যক্ত হয়েছে] এবং ভারতী-তে ও গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় এগুলির ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় নি। এর ফলে জীবনেতিহাসের কালানুক্রমিকতায় কতকগুলি অনুমানের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বলেছি, Jan 1879-এর গোড়ায় তারকনাথ পালিতের সঙ্গে তিনি ব্রাইটন ত্যাগ করে লণ্ডনে এসে রিজেন্ট পার্কের সামনে একটি বাসায় কিছুদিন একাকী বাস করেন ও পরে মিঃ বার্কারের পরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই পরিবারে বা এই সময়ে তিনি কতদিন লণ্ডনে ছিলেন, তা অবশ্য বলা সম্ভব নয়।

লণ্ডনে থাকবার সময় তিনি হয়তো 7 Feb 1879 [শুক্র ২৭ মাঘ ১২৮৫] তারিখে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন, সে-কথা আমরা আগেই বলেছি। পার্লামেন্টের গ্রীষ্মকালীন অধিবেশন আরম্ভ হলে তিনি অন্তত দু-দিন হাউস অফ কমন্সে বিতর্ক শুনতে যান। কোন্ কোন্ তারিখে সেখানে গিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তার উল্লেখ না করলেও বিতর্কের বিষয়বস্তুর যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তার থেকে *Hansard's Parliamentary Debates*[*] গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট খণ্ডের সাহায্যে আমরা তারিখগুলি নির্ধারণ করতে পারি। সেই অনুযায়ী দেখা যায়, তিনি প্রথম যেদিন পার্লামেন্টে যান, সেদিনটি হল 23 May 1879 [শুক্র ১০ জ্যৈষ্ঠ]। প্রথম দিনের অভিজ্ঞতায় তিনি যথেষ্ট নিরাশ হয়েছিলেন : 'পার্ল্যামেন্টের অভ্রভেদী চূড়া, প্রকাণ্ড বাড়ি, হাঁ-করা ঘরগুলো দেখলে খুব তাক লেগে যায়; কিন্তু ভিতরে গেলে তেমন ভক্তি হয় না।'[১] তাঁরা যখন সভায় প্রবেশ করলেন, 'তখন O'donnel বলে একজন Irish member ভারতবর্ষসংক্রান্ত বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, Press Act-এর বিরুদ্ধে ও অন্যান্য নানা বিষয় নিয়ে[২] তিনি আন্দোলন করছিলেন।' কিন্তু হাউসে আইরিশ সদস্যরা অত্যন্ত অপ্রিয়, সুতরাং তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে যায়। ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়ে সেখানকার গণতন্ত্র সম্পর্কে যে সশ্রদ্ধ মনোভাব জন্মলাভ করে, সেদিনকার বিতর্কের চেহারা দেখে সেই শ্রদ্ধা রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই বজায় রাখতে পারেননি—তাঁর বর্ণনা পড়ে সেই কথাই মনে হয়। দীর্ঘকাল পরে [1906] ডন সোসাইটিতে প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় তিনি এই বিরূপ অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করেছেন : 'আমি যখন বিলাতে পার্লামেন্ট-সভায় যাই তখন সেখানে সভ্যদিগের অসংযত আচারব্যবহারে একেবারে স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। বক্তাকে কত প্রকারে যে তাঁহারা বাধা দিতে চেষ্টা করিতেছিলেন তাহা কল্পনার

অতীত। কেহ হাততালি দিতেছেন, কেহ বা hiss করিতেছেন, এইরূপ নানা উপায়ে তাঁহাকে বসাইতে চেষ্টা করিতেছেন। আমি তখন ভাবিলাম যাঁহাদের হস্তে জাতির মঙ্গলামঙ্গল শাসনভার সমস্ত ন্যস্ত রহিয়াছে, যাঁহারা বাল্যসুলভ চপলতা অনেকদিন অতিক্রম করিয়া এখন বিজ্ঞ বয়ঃস্থ হইয়াছেন তাঁহাদের স্বভাবেই যখন এত চপলতা, তখন সাধারণ লোকের ব্যবহার যে আরও অসংযত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি?[২ক] রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র-তে প্রকাশিত মতামতকে পরবর্তীকালে লঘু করে দেখাবার প্রয়াস করেছেন। কিন্তু কোনো-কোনো অভিজ্ঞতা যে তাঁর পরিণত বয়সের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপদ্ধতিকে প্রভাবিত করেছিল, এটি তার অন্যতম উদাহরণ। করতালি দেওয়ার বিজাতীয় প্রথা ত্যাগ করে 'সাধু সাধু' শব্দে সমর্থন বা হর্ষ প্রকাশের জন্য তিনি সুপারিশ করেছিলেন।

এর পরে তিনি হাউস অফ কমন্সে যান 12 Jan [বৃহ ৩০ জ্যৈষ্ঠ] তারিখে :'গত বৃহস্পতিবারে House of Commons-এ ভারতবর্ষ নিয়ে খুব বাদানুবাদ চলেছিল, সে দিন ব্রাইট [John Bright, 1811-89] সিভিল সার্ভিস সম্বন্ধে[২] ও গ্ল্যাড্‌স্টোন [william Ewart Gladstone, 1809-98] তূলাজাতের শুল্ক ও আফগান যুদ্ধ সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয়দের দরখাস্ত[২] দাখিল করেন।'[৩] সভায় রবীন্দ্রনাথ একা যান নি, সম্ভবত সত্যেন্দ্রনাথ ও আরও কয়েকজন বাঙালি তাঁর সঙ্গে ছিলেন— Speaker's Gallery-র টিকিট নিয়ে তাঁরা সেখানে যান। এই দিনের অধিবেশনের একটি নিখুঁত বিবরণ রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন—গ্ল্যাডস্টোনের বাগ্মিতার সপ্রশংস উল্লেখ, আইরিশ সদস্য সলিভানের [Mr. Sullivan] বক্তৃতার সঙ্গে তাঁর পার্থক্য, হাউসে আইরিশ সদস্যদের প্রতি ইংরেজদের অবজ্ঞা ইত্যাদির যে সুনিপুণ বিশ্লেষণ তিনি করেছেন, তাতে তাঁর মানসিক পরিণতির মাত্রাটি দেখলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। আর তিনি যখন লেখেন, 'আমার স্বভাবতই আইরিশ মেম্বরদের প্রতি টান' কিংবা তাঁদের প্রতি ইংরেজ সদস্যদের আচরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন—তখন বুঝতে পারা যায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি ও হিন্দুমেলার স্বাদেশিকতার আবহাওয়ায় পুষ্ট হয়ে তাঁর মনে একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক চেতনা ইতিমধ্যেই যথেষ্ট জাগ্রত হয়ে উঠেছে।

এই পত্রে রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় লিখেছেন, 'আমি যে-কবার হৌসে গিয়েছি, দুই-একজন ছাড়া Diplomatic Gallery-তে লোক দেখতে পাই নি'[৪]—তাতে মনে হয় উপরোক্ত দু-দিন ছাড়াও হয়তো আরও কয়েকবার তিনি পার্লামেন্টে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেই দিনগুলির বিতর্কের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে তিনি কিছু লেখেন নি বলে তারিখগুলি নিরূপণ করা সম্ভব নয়।

বসন্তকালের শুরু থেকে গরমকালের কিছুদিন পর্যন্ত 'লন্‌ডন উৎসবে পূর্ণ থাকে—থিয়েটার, নাচ, গান, প্রকাশ্য ও পারিবারিক 'বল', আমোদ-প্রমোদে চার দিক ঘেঁষাঘেঁষি ঠেসাঠেসি।' এই সময়কার লণ্ডনের যে-বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন, তাতে বোঝা যায় এগুলি সম্পর্কে তাঁর কিছু কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সুযোগ ঘটেছিল। অনুরূপ সুযোগ পাওয়া তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক, কারণ সত্যেন্দ্রনাথ-তারকনাথ পালিত প্রভৃতি বিলাত-ফেরত ব্যক্তিরা তখন তাঁর সঙ্গেই রয়েছেন, তাছাড়া আত্মীয় জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং তাঁর কন্যা-দ্বয় বলেন্দ্রবালা ও সত্যেন্দ্রবালা তো লণ্ডনের প্রায় স্থায়ী বাসিন্দা। এই সুযোগ রবীন্দ্রনাথের পক্ষে লাভজনক হয়েছিল। যদিও তিনি সিভিল সার্ভিস বা ব্যারিস্টারি পরীক্ষা দেবার ঘোষিত উদ্দেশ্য নিয়েই ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন, তবু তাঁর মানসিকতা ছিল অনেকটা পর্যটকদের মতো—সেখানকার জীবনধারার মধ্যে সম্পূর্ণ

মিশে না গিয়ে খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে ইংরেজদের ভালো-মন্দ সচেতন মন নিয়ে বিচার করে দেখেছেন। এই বিচারের মধ্যে সমালোচনার প্রবণতাই মুখ্য হয়ে উঠেছিল—পরবর্তীকালে যে-কারণে তিনি এই পত্রগুলিতে প্রকাশিত মনোভাবকে ধিক্কার জানিয়েছিলেন—তবু সেই সময়কার ইংরেজ জাতির একটি অংশের জীবনযাত্রার ও ইঙ্গ-বঙ্গ নামের বিচিত্র সমাজের যে পরিচয় তিনি এখানে উদ্‌ঘাটিত করেছেন তা খুব একটা অতিরঞ্জিত নয়, এ-কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন*। পত্রের মধ্যে কিছুটা বাহাদুরি দেখাবার চেষ্টা নিশ্চয়ই আছে—লেখাকে সরস ও উপভোগ্য করার প্রয়াসও তার কারণ হতে পারে—কিন্তু ইংরেজদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে অতি-মুগ্ধতার অভাব তাঁকে ইঙ্গ-বঙ্গ শ্রেণীর সংখ্যাবৃদ্ধি করতে দেয় নি, এ-কথাও মনে রাখা দরকার। তাছাড়া ইংরেজদের ভালো দিকটি তিনি একেবারেই দেখতে পান নি, এ-কথা সত্য নয়। নারী-পুরুষের সহজ সম্পর্ক, পরিবারের মধ্যে বয়স্কদের অভিভাবক-সুলভ শাসন-প্রবৃত্তির আপেক্ষিক অভাব ইত্যাদির প্রশংসা করে তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথের সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন—এ-প্রসঙ্গে সেই তথ্যটিও স্মরণীয়।

যাই হোক, লণ্ডনের সীজন শেষ হবার মুখে তিনি লণ্ডন ত্যাগ করে Kent County-র অন্তর্ভুক্ত Tunbridge Wells নামক একটি পাড়াগাঁর মতো জায়গায় গিয়ে কয়েকটি দিন কাটিয়ে আসেন। সত্যেন্দ্রনাথ, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী প্রভৃতিও সঙ্গে ছিলেন। স্মৃতিকথা-য় জ্ঞানদানন্দিনী Tunbridge Wells-এ যাওয়ার কথা লিখেছেন।[৫] কয়লার ধোঁয়ায় ভারগ্রস্ত লণ্ডনের দূষিত বাতাসের মধ্য থেকে এই পাড়াগাঁয়ের নির্মল আবহাওয়ায় এসে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট স্বস্তি বোধ করেছেন। টন্‌ব্রিজ ওয়েল্‌স তার 'লৌহপদার্থ-মিশ্রিত স্বাস্থ্যকর উৎসের জন্য বিখ্যাত'—কিন্তু উৎসের যে রূপ-সৌন্দর্য তাঁর কল্পনায় ছিল, বাস্তবের সঙ্গে তার আত্যন্তিক পার্থক্য তাঁকে যথেষ্ট হতাশ করেছে। কিন্তু 'এখানকার আকাশ মুখ-গোঁ-করা নয়, বাড়িগুলো অনাতিথ্যভাবসূচক নয়, পথিকদের মুখ ঘোরতর ব্যস্তভাবময় নয়, রাস্তাগুলো ঘর্ঘরধ্বনিত পাষাণহৃদয় নয়'[৬] —লণ্ডনের সঙ্গে এই পার্থক্য তাঁর কাছে খুবই ভালো লেগেছে। য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র-এর একাদশ পত্রে এখানকার অভিজ্ঞতার কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু জীবনস্মৃতি-র একটি বর্ণনার সঙ্গে টন্‌ব্রিজ ওয়েলস-এ রবীন্দ্রনাথের অবস্থানের কালটিকে মেলানো শক্ত, এখানে সেটি উল্লেখ করা দরকার। তিনি লিখেছেন, 'একবার শীতের সময় আমি টন্‌ব্রিজ ওয়েল্‌স্‌ শহরের রাস্তা দিয়া যাইবার সময় দেখিলাম একজন লোক রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া আছে; তাহার ছেঁড়া জুতার ভিতর দিয়া পা দেখা যাইতেছে, পায়ে মোজা নাই, বুকের খানিকটা খোলা। ভিক্ষা করা নিষিদ্ধ বলিয়া সে আমাকে কোনো কথা বলিল না, কেবল মুহূর্তকালের জন্য আমার মুখের দিকে তাকাইল। আমি তাহাকে যে-মুদ্রা দিলাম তাহা তাহার পক্ষে প্রত্যাশার অতীত ছিল। আমি কিছুদূর চলিয়া আসিলে সে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "মহাশয়, আপনি আমাকে ভ্রমক্রমে একটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছেন।" —বলিয়া সেই মুদ্রাটি আমাকে ফিরাইয়া দিতে উদ্যত হইল।'[৭] এর পরে রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ আরও একটি কাহিনী বর্ণনা করেছেন। নিম্নশ্রেণীর ইংরেজদের মধ্যেও জাতিগত সততার পরিচয় দেবার জন্যই তিনি ঘটনাদুটির উল্লেখ করেছেন—কিন্তু আমাদের পক্ষে প্রসঙ্গটি উত্থাপনের উদ্দেশ্য 'একবার শীতের সময়' এই বর্ণনাটির দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র-এর সমসাময়িক বর্ণনা অধিকতর নির্ভরযোগ্য—সেদিক থেকে টন্‌ব্রিজ ওয়েল্‌স তাঁর অবস্থান-কাল গ্রীষ্মের সূচনা বলেই গৃহীত

হতে পারে, বিশেষত পরবর্তী ঘটনাটি টর্কি [Torquay] স্টেশনে ঘটেছিল এরূপ অনুমান তিনি ব্যক্ত করেছেন যা ঘটনাধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অবশ্য এমনও হতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষীয় বসন্ত ও গ্রীষ্মকালের হিসেব অনুসারে য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র-এর বর্ণনাটি লিখেছিলেন, সেদিক দিয়ে তাঁর টন্‌ব্রিজ ওয়েল্‌স-এ অবস্থানকাল হয়তো ফাল্গুন মাসের শেষাংশ [Mar 1879], ইংলণ্ডে যে-সময়টিকে শীতের সময় বললে খুব একটা ভুল হয় না। যাই হোক, টন্‌ব্রিজ ওয়েল্‌স থেকে সম্ভবত তিনি লণ্ডনের বিষাদপূর্ণ আবহাওয়াতেই ফিরে এসেছিলেন। 'এমনসময় বউঠাকুরানী যখন ডেভনশিয়রে টর্কিনগর [Torquay, Devonshire] হইতে ডাক দিলেন তখন আনন্দে সেখানে দৌড় দিলাম। সেখানে পাহাড়ে, সমুদ্রে, ফুলবিছানো প্রান্তরে, পাইনবনের ছায়ায় আমার দুইটি লীলাচঞ্চল শিশুসঙ্গীকে লইয়া কী সুখে কাটিয়াছিল বলিতে পারি না।'[৮] এখানকার জীবনযাত্রার বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায় য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র-এর দ্বাদশ পত্রে। কিন্তু 'দুই চক্ষু যখন মুগ্ধ, মন আনন্দে অভিষিক্ত এবং অবকাশে পূর্ণ দিনগুলি নিষ্কণ্টক সুখের বোঝা লইয়া প্রত্যহ অনন্তের নিস্তব্ধ নীলাকাশসমুদ্রে পাড়ি দিতেছে, তখনো কেন যে মনের মধ্যে কবিতা লেখার তাগিদ আসিতেছে না, এই কথা চিন্তা করিয়া এক-একদিন মনে আঘাত পাইয়াছি।'[৮] এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য রবীন্দ্রনাথ একদিন কবিতার খাতা-হাতে ছাতা-মাথায় সমুদ্র তীরে শৈলবেলায় কবির কর্তব্য পালন করতে গেলেন। স্থান-নির্বাচন সুন্দর হয়েছিল—'একটি সমুচ্চ শিলাতট চিরব্যগ্রতার মতো সমুদ্রের অভিমুখে শূন্যে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে;—সম্মুখের ফেনরেখাঙ্কিত তরল নীলিমার দোলার উপর দিনের আকাশ দোল খাইয়া তরঙ্গের কলগানে হাসিমুখে ঘুমাইতেছে—পশ্চাতে সারিবাঁধা পাইনের সুগন্ধি ছায়াখানি বনলক্ষ্মীর আলস্যস্খলিত আঁচলটির মতো ছড়াইয়া পড়িয়াছে।'[৯] সেই শিলাসনে বসে যে কবিতাটি রচনা করেছিলেন—তার নাম দিয়েছিলেন 'মগ্নতরী'—পরবর্তী আষাঢ় ১২৮৬-সংখ্যা ভারতী-তে সেটি 'ভগ্নতরী/(গাথা)' নামে পাঁচটি সর্গে বিভক্ত হয়ে মুদ্রিত হয়েছিল, পরে শৈশবসঙ্গীত [১২৯১] গ্রন্থে সংকলিত হয়।

মনের যে-অবস্থায় কবিতাটি লিখিত হয়েছিল, তাতে একটি গীতি-কবিতা লেখাই হয়তো স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু পরিবর্তে লিখিত হল একটি 'গাথা'-কবিতা—সম্ভবত এই পর্যায়ের শেষ 'গাথা'—কবিতার বিষয়বস্তুও বিষাদময়, তার মধ্যে পরিবেশ-গত মানসিকতার পরিচয় নেই। কবিতাটির কোনো পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি, কিন্তু এর অন্তর্গত ললিতার গানটি—'ওই কথা বল সখা, বল আর বার'—অপরিবর্তিত-রূপে পাওয়া যায় মালতীপুঁথি-র 70/৩৬খ পৃষ্ঠায় বিখ্যাত গান 'ভাল যদি বাস সখি কি দিব গো আর'-এর পরে ও আরো দুটি গানের সঙ্গে, যার একটি 'ভগ্নহৃদয়'-এর প্রথম সর্গে ব্যবহৃত হয়েছে। মনে হয় গানটি আগে কোনো সময়ে লেখা—হয়তো বোম্বাইতে থাকার সময়ে—এখানে প্রয়োজনমতো ব্যবহার করা হয়েছে।

'ভগ্নতরী' আষাঢ়-সংখ্যা ভারতী-তে প্রকাশিত হয়েছিল [? 28 Jun]—সুতরাং কবিতাটি লিখে ভারতী-র দপ্তরে প্রেরণ করার জন্য ন্যূনপক্ষে তিন সপ্তাহ সময় প্রয়োজন অর্থাৎ এটি রচনার সময় Jun মাসের প্রথম সপ্তাহের পরে হওয়া সম্ভব নয়—যে-সময়ে রবীন্দ্রনাথ লণ্ডনে পার্লামেণ্টের বিতর্ক শোনা ইত্যাদিতে ব্যাপৃত। তাই তাঁর উক্তি অনুযায়ী এটি টর্কি-তে রচিত হলে সেখানে অবস্থানের কালটি আরও পূর্ববর্তী বলে সিদ্ধান্ত করতে হয়।

ভারতী-র এই আষাঢ় সংখ্যাতেই 'চ্যাটার্টন—বালক কবি' নামে একটি অসম্পূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আমাদের ধারণা, টর্কি-তে যাওয়া বা আসার পথে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত ব্রিস্টল নগরও পরিদর্শন করেন,* যদিও এই ভ্রমণের উল্লেখ তিনি কোথাও করেন নি। টর্কি থেকে ব্রিস্টল খুব একটা দূরেও নয়—এমন-কি লণ্ডন থেকে ব্রিস্টল হয়েও টর্কিতে আসা যায়। রামমোহন রায়ের সমাধিভূমি বলে আদি ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত বাঙালি হিসেবে এই জায়গার প্রতি তাঁদের একটা আকর্ষণ থাকা স্বাভাবিক। তাছাড়া উপরোক্ত প্রবন্ধে চ্যাটার্টনের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ব্রিস্টলের গির্জার যে বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন, তা হয়তো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই উদ্ভূত। বালককবি চ্যাটার্টনের Rowley Poems-এর প্রাচীন কবিতার নকলনবিশির কাহিনী শুনে একসময় রবীন্দ্রনাথ ভানুসিংহের কবিতা লিখতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন—তাঁরই স্মৃতি-বিজড়িত ব্রিস্টলের গির্জা ও তাঁর মৃত্যুর দীর্ঘ ৭০ বৎসর পরে 1840-তে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ দেখে তিনি উক্ত কবির জীবনকাহিনী বর্ণনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন, এমন ভাবনা অযৌক্তিক নয়। যাই হোক, আমাদের মনে হয় 'চ্যাটার্টন—বালক কবি' প্রবন্ধটি ইংলণ্ডেই রচিত হয়েছিল। ইতিপূর্বে অক্ষয় চৌধুরীর কাছে তিনি চ্যাটার্টনের জীবন-কাহিনী শুনেছিলেন, সেই কাহিনীর নাটকীয়তা তাঁর কল্পনাকে উজ্জীবিত করে তুলেছিল, কিন্তু 'তাঁহার কাব্য যে কিরূপ তাহা জানিতাম না—বোধ করি অক্ষয়বাবুও বিশেষ কিছু জানিতেন না, এবং জানিলে বোধহয় রসভঙ্গ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল।'[১০] এই প্রবন্ধ লেখার সময় অবশ্য তিনি চ্যাটার্টনের কবিতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন এবং তিনটি কাব্যাংশ বাংলায় অনুবাদ করে প্রবন্ধে ব্যবহার করেছেন। এই পরিচয়ের সূত্র সম্ভবত W. W. Skeat-সম্পাদিত দু-খণ্ডে প্রকাশিত চ্যাটার্টনের *Poetical Works* [1871]। আগেই বলেছি, প্রবন্ধটি অসম্পূর্ণ—ভারতী-র আষাঢ় সংখ্যায় রচনাটির শেষে 'ক্রমশঃ' লেখা আছে, কিন্তু আর কোনো সংখ্যায় এর ক্রমানুসৃতি লক্ষ্য করা যায় না।

টর্কি-তে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্যেরা কতদিন অবস্থান করেছিলেন, তা ঠিক বলা যায় না। কিন্তু মনে হয়, আষাঢ় মাসের প্রথম দিকেই [Jun 1879] তিনি লণ্ডনে ফিরে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'কিন্তু কর্তব্যের পেয়াদা নিশ্চিন্ত হইয়া নাই। আবার তাগিদ আসিল—আবার লণ্ডনে ফিরিয়া গেলাম।'[১১] মনে প্রশ্ন জাগে, কর্তব্যের তাগিদ বলতে তিনি এখানে কী বোঝাতে চেয়েছেন? আমাদের মনে হয়, লণ্ডন য়ুনিভার্সিটির ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়ার তাগিদে তাঁকে লণ্ডনে ফিরতে হয়েছিল। তখন বছরে দু-বার এই পরীক্ষা নেওয়া হত—January এবং June মাসে; রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত Jun 1879-এর পরীক্ষা দেওয়ার জন্য লণ্ডনে ফিরে এসেছিলেন।*

লণ্ডনে ফিরে রবীন্দ্রনাথ ডাক্তার স্কট নামক একজন ভদ্র গৃহস্থের বাড়ি আশ্রয় পেলেন। তাঁর বাড়ির ঠিকানা ছিল সম্ভবত ১০ নং ট্যাভিসটক স্কোয়ার। পক্বকেশ বৃদ্ধ ডাক্তার মিঃ স্কট, তাঁর স্ত্রী [এঁদের দুজনকে য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র-তে Mr. K ও Mrs. K বলে উল্লেখ করেছেন], তাঁদের চার মেয়ে, দুই ছেলে, তিন দাসী ও Toby নামের একটি কুকুর—এই ছিল বাড়ির জনসংখ্যা। ডাক্তার স্কটের বড়ো ছেলে Mr. N অফিসে কাজ করেন ও জনৈকা Miss I-এর সঙ্গে engaged, সুতরাং তাঁকে বাড়িতে বিশেষ দেখা যায় না। বাকি সবাই বাড়িতে থাকেন এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অল্পদিনের মধ্যে তাঁদের বিশেষ হৃদ্য-সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তিনি প্রথম যেদিন সন্ধ্যার সময় বাক্স তোরঙ্গ নিয়ে তাঁদের পরিবারে বাস করতে এলেন, সেদিন মেজো মেয়ে

Miss J এবং সেজো মেয়ে Miss A [lice-Lucy?] এই ভারতবর্ষীয় অতিথির আগমন আশঙ্কায় কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে পালিয়ে গিয়েছিলেন—প্রায় এক সপ্তাহ বাড়িতে ফেরেন নি। Miss J পরে তাঁকে বলেছিলেন, বাড়িতে এসে প্রথম-প্রথম যদিও কথাবার্তা বলেছিলেন, কিন্তু দুদিন পর্যন্ত তাঁর মুখের দিকে তাকান নি, 'হয়তো তাঁর ভয় হয়েছিল যে, কী অপূর্ব ছাঁচে ঢালা মুখই না জানি দেখবেন।'[১২]

এই পরিবারে বসবাস-কালে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতই গৃহসুখ লাভ করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'অতি অল্পদিনের মধ্যে আমি ইঁহাদের ঘরের লোকের মতো হইয়া গেলাম। মিসেস স্কট আমাকে আপন ছেলের মতোই স্নেহ করিতেন। তাঁহার মেয়েরা আমাকে যেরূপ মনের সঙ্গে যত্ন করিতেন তাহা আত্মীয়দের কাছ হইতেও পাওয়া দুর্লভ।'[১৩] তারকনাথ পালিত তাঁকে মেজ বৌঠাকুরানীর ঘরের বাঁধন থেকে ছাড়িয়ে এনেছিলেন পড়াশুনোয় সম্পূর্ণ মনোযোগ পড়বে বলে, ডাক্তার স্কটের বাড়িতে তিনি আর-এক ঘরের বাঁধনে জড়িয়ে পড়লেন—'তাঁরা আমাকে ভুলিয়ে দিলেন যে, বিদেশে এসেছি। মিসেস স্কট আমাকে যে স্নেহ করতেন সে একেবারে খাঁটি। আমার জন্যে সকল সময়েই মায়ের মতো ভাবনা ছিল তাঁর মনে।'[১৪] পারিবারিক জীবনে মায়ের প্রকৃত যত্ন তাঁর ভাগ্যে জোটে নি, সারদা দেবীর মৃত্যুর পর বড়দিদি সৌদামিনী দেবী ও নতুন-বৌঠান কাদম্বরী দেবী সেই অভাব খানিকটা মোচন করেছিলেন—কিন্তু স্নেহে, যত্নে ও উদ্বেগে প্রকৃত মায়ের স্থান গ্রহণ করেছিলেন মিসেস স্কট। য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র, জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলা-য় গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কথা বর্ণনা করেছেন, উপরের উদ্ধৃতি দুটি তারই প্রমাণ।

ইংলণ্ডের একটি মধ্যবিত্ত সুখী পরিবারের অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথ এখানে বাস করেই অর্জন করেছিলেন, তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র ও জীবনস্মৃতি-তে—সরস আন্তরিকতায় সমস্ত বর্ণনাটি সমুজ্জ্বল; ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া রোঁয়াতে চোখ-মুখ-ঢাকা এক-চোখ-কানা বুড়ো ছোট্ট কুকুর Toby-ও এই আন্তরিকতার স্পর্শে একটি 'ব্যক্তি'তে পরিণত হয়েছে ['আদর পেয়ে এই ব্যক্তির কতকগুলি নবাবি চাল হয়েছে'[১৫]]। সুরেন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা—এই দুই 'লীলাচঞ্চল শিশুসঙ্গীকে' ছেড়ে এসে তাঁর মনের যে বেদনা অবশ্যম্ভাবী ছিল, তাও অনেকটা প্রশমিত হতে পেরেছে এই গৃহের দুটি শিশুকে কেন্দ্র করে—ডাক্তার স্কটের ছোটো ছেলে Tom ও মেয়ে Ethel-এর কাছে 'রবিকা' Uncle Arthur-এ পরিণত হয়ে প্রায় একই ভূমিকা পালন করেছেন।

বড়ো Miss K কত বড়ো ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের বর্ণনা থেকে বোঝা না গেলেও মনে হয়, তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক মোটামুটি সৌজন্য-মূলক ছিল। সে তুলনায় Miss J ও Miss A-র সঙ্গে সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠতর। বাড়িতে তিনজন দাসী থাকলেও মিসেস স্কট বা তাঁর মেয়েরা সংসারের বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। Miss J প্রত্যহ ঝাড়ন দিয়ে বসবার ঘরের আসবাব-পত্র সাফ করেন ও অবসর সময়ে *Green's History of the English People* প্রভৃতি বই পড়েন; Miss A বালিসের আচ্ছাদন আসন মোজা কাপড় প্রভৃতি সেলাই করেন, ভাইপোর জন্য পশমের জামা তৈরি করেন এবং বাড়ির মধ্যে একমাত্র গাইয়ে-বাজিয়ে বলে এক-একদিন বাজনা ও গান অভ্যাস করেন। এছাড়া অন্যান্য সামাজিকতা রক্ষা, বিকেলে সবাই মিলে একটু বেরিয়ে আসা, সন্ধেবেলা ডিনারের পর ড্রয়িং-রুমে আগুনের ধারে বসে গান-বাজনা বা পড়াশুনো তো আছেই। ব্রাইটনে থাকার সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথ অনেক ইংরেজি গান শিখতে শুরু করেছিলেন, অনেকেই যে তাঁর

গলার প্রশংসা করতেন সে-কথা রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন ও ইন্দিরা দেবীও উল্লেখ করেছেন তাঁর স্মৃতিকথায় : 'শুনেছি তাঁর সুরেলা জোরালো তারসপ্তকের চড়া গলা, যাকে ও দেশে বলে 'টেনর্', শুনে ওরা মুগ্ধ হত।'[১৬] তাই কোনো-কোনোদিন তিনি গান করেন ও Miss A পিয়ানো বাজান, Miss A তাঁকে অনেকগুলি গানও শিখিয়েছিলেন। কিন্তু বেশির ভাগ দিন হত পড়াশুনা। 'আমার উপরে ভার পড়েছিল রোজ সন্ধ্যেবেলায় রাত এগারোটা পর্যন্ত পালা ক'রে কাব্যনাটক ইতিহাস পড়ে শোনানো। ঐ অল্প সময়ের মধ্যে অনেক পড়া হয়ে গেছে। সেই পড়া ক্লাসের পড়া নয়। সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের মিলন।[১৭] এই মনের মিলন সম্ভবত সাধারণ মানুষকে অতিক্রম করে ব্যক্তি মানুষকে আশ্রয় করেছিল, সে-প্রসঙ্গ আমরা পরে আলোচনা করব।

স্কট-পরিবারের আন্তর্গত সকলের কথাই রবীন্দ্রনাথ কিছু-কিছু উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তাঁর সমস্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করে দিয়েছেন গৃহস্বামিনী মিসেস স্কটের উদ্দেশে। মাতৃস্নেহের পরিপূর্ণ আস্বাদ তিনি মিসেস স্কটের কাছেই পেয়েছিলেন, সে-কথা আমরা আগেই বলেছি। শীতের সময় বিশেষ গরম কাপড় না পরলে তাঁর কাছে র্ভৎসনা জোটে, খাবার সময় যদি তাঁর মনে হয় যথেষ্ট খাওয়া হয় নি তাঁর মনোমতো খাওয়া যতক্ষণ না হচ্ছে তিনি পীড়াপীড়ি করতে থাকেন, দিনের মধ্যে দৈবাৎ দুবার কাশলে জোর করে তিনি স্নান বন্ধ করিয়ে দশ-রকম ওষুধ গেলান ও শুতে যাবার আগে পায়ে গরম জল ঢালবার বন্দোবস্ত করে তবে ক্ষান্ত হন। পড়াশুনোর চাপ যখন বাড়ত তাঁর মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে ভেবে তিনি অহেতুক ব্যস্ত হয়ে উঠতেন।

কিন্তু যে-জিনিসটি মিসেস স্কটের মধ্যে দেখে রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ হয়েছিলেন, সেটি হল তাঁর ঐকান্তিক পতিভক্তি। তিনি লিখেছেন, 'আমরা বলিয়া থাকি এবং আমিও তাহা বিশ্বাস করিতাম যে, আমাদের দেশে পতিভক্তির একটি বিশিষ্টতা আছে, য়ুরোপে তাহা নাই। কিন্তু আমাদের দেশের সাধ্বীগৃহিণীর সঙ্গে মিসেস স্কটের আমি তো বিশেষ পার্থক্য দেখি নাই। স্বামীর সেবায় তাঁহার সমস্ত মন ব্যাপৃত ছিল।... স্বামীর প্রত্যেক ছোটোখাটো কাজটিও মিসেস স্কট নিজের হাতে করিতেন।... গৃহস্থালির সমস্ত কাজ সারিয়া সন্ধ্যার সময় আমাদের পড়াশুনা গানবাজনায় তিনি সম্পূর্ণ যোগ দিতেন; অবকাশের কালে আমোদ-প্রমোদকে জমাইয়া তোলা, সেটাও গৃহিণীর কর্তব্যেরই অঙ্গ।'[১৮]

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একটি কৌতুককর ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি রবীন্দ্রজীবনের পক্ষেও উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী জীবনে তিনি বহুবার বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে প্ল্যানচেট-চর্চার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। বোঝা যায়, ইহলোকের এই আপাত-সংক্ষিপ্ত সময়-সীমাতেই মানুষের জীবন আবদ্ধ এ-কথা মেনে নিতে তাঁর মন সায় দিত না। যাই হোক, এই প্ল্যানচেট-চর্চার সূত্রপাত সম্ভবত বিলেতেই। স্কট-কন্যাদের নিয়ে এক-একদিন সন্ধ্যায় টেবিল-চালা হত; কয়েকজন মিলে একটা টিপাইয়ে হাত লাগিয়ে রাখতেন, আর টিপাইটা 'ঘরময় উন্মত্তের মতো দাপাদাপি করিয়া বেড়াইত'। শেষে এমন হল, তাঁরা যাতেই হাত দেন সেটাই নড়তে থাকে। মিসেস স্কট ব্যাপারটি খুব পছন্দ করতেন না, কিন্তু এই ছেলেমানুষি কাণ্ডে বাধা না দিয়ে সেই অনাচার সহ্য করে যেতেন। কিন্তু একদিন তাঁরা যখন ডাক্তার স্কটের লম্বা টুপিটির দিকে হাত বাড়ালেন, তিনি ব্যাকুল হয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে তাঁদের বাধা দিলেন—তাঁর স্বামীর মাথার টুপিতে মুহূর্তের জন্য শয়তানের সংস্রব ঘটে, এটা তিনি সইতে পারলেন না।

মিসেস স্কটের মনোভাবটি বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'এই-সমস্তের মধ্যে একটি জিনিস দেখিতে পাইতাম, সেটি স্বামীর প্রতি তাঁহার ভক্তি। তাঁহার সেই আত্মবিসর্জনপর মধুর নম্রতা স্মরণ করিয়া স্পষ্ট

বুঝিতে পারি, স্ত্রীলোকের প্রেমের স্বাভাবিক চরম পরিণাম ভক্তি। যেখানে তাহাদের প্রেম আপন বিকাশে কোনো বাধা পায় নাই সেখানে তাহা আপনি পূজায় আসিয়া ঠেকে। যেখানে ভোগবিলাসের আয়োজন প্রচুর, সেখানে আমোদপ্রমোদেই দিনরাত্রিকে আবিল করিয়া রাখে, সেখানে এই প্রেমের বিকৃতি ঘটে; সেখানে স্ত্রীপ্রকৃতি আপনার পূর্ণ আনন্দ পায় না।'[১৯] এই বিশ্লেষণ নিঃসন্দেহে পরবর্তীকালের, কিন্তু নারীজাতির মধ্যে 'প্রমোদা' ও 'শান্তা' এই দুই রূপের মধ্যে দ্বিতীয়টি অর্থাৎ তার কল্যাণী মূর্তির প্রতিই রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ, তাঁর জীবন ও রচনা এইসময়েই তার প্রমাণ দিতে শুরু করেছে।

রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত আষাঢ় বা শ্রাবণ মাসের [Jul 1879] কোনো সময়ে স্কট-পরিবারের মধ্যে বাস করতে যান। আষাঢ় মাস থেকেই তাঁর জন্য মাসিক বরাদ্দ পনেরো পাউণ্ড থেকে বেড়ে কুড়ি পাউণ্ডে দাঁড়ায়। এর আগে ক্যাশবহি-র ৩০ জ্যৈষ্ঠ [বৃহ 12 Jun] তারিখের হিসাবে দেখা যায়—'কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের প্রেরিত মেজবাবু মহাশয়ের নামের এক পত্র বিলাতে পাঠানর টিকিট ব্যয়৷০' —পত্রটি রক্ষিত হয় নি, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ এই পত্রে মাসিক বরাদ্দ বাড়ানোর কথাও লিখেছিলেন, হয়তো তারই ফলে স্কট-পরিবারে তাঁর বসবাসের আয়োজন করা হয়েছিল।

এখানে আসার কিছুদিনের মধ্যেই বাড়ি থেকে তাঁর জন্য একটি সুন্দর উপহার এসে পৌঁছয়। এই সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অশ্রুমতী' নাটক প্রকাশিত হয়; গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লেখেন:

ভাই রবি,

তুমি অশ্রুমতীকে দ্যাখবার জন্য উৎসুক হয়ে আছ। এই লও, আমার অশ্রুমতীকে তোমার কাছে পাঠাই। ইংলণ্ড-প্রবাসে তাকে দেখে, তোমার প্রবাস-দুঃখ যদি ক্ষণকালের জন্যও ঘোচে তা হ'লে আমি সুখী হব।

৯ই শ্রাবণ
১৮০১ শক

তোমার
দাদা

—নাটকটির পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথের ইংলণ্ড যাবার আগেই হয়েছিল, উৎসর্গলিপি থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যসংগ্রহ [১৩৭৬] গ্রন্থের সম্পাদক এরূপ অনুমান করেছেন।[২০] অনুমান যথার্থ নাও হতে পারে, পত্রের মাধ্যমে নাটকটির পরিকল্পনা ও রচনার কথা জেনেও তাঁর মনে ঔৎসুক্য সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। নাটকটির একটি উল্লেখযোগ্য দিক এর তৃতীয় অঙ্ক তৃতীয় গর্ভাঙ্কে রবীন্দ্রনাথ-রচিত প্রথম ব্রজবুলি পদ 'গহন কুসুমকুঞ্জ-মাঝে' গানটি ব্যবহৃত হয়েছিল। অগ্রহায়ণ ১২৮৪-সংখ্যা ভারতী-তে প্রকাশের সময় গানটির সুর ছিল 'বিহাগড়া', নাটকে এটির সুর 'ঝিঁঝিট'—এ-সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

আরও দুটি বই ইংলণ্ডে রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রেরিত হয়েছিল। একটির সংবাদ পাওয়া যায় ক্যাশবহি-তে ১০ জ্যৈষ্ঠ [শুক্র 23 May] তারিখের হিসাবে—'অবলাবান্ধব পুস্তক বিলাতে রবিবাবুর নিকট' পাঠাবার জন্য দু-আনা খরচ করা হয়েছে। 'অবলাবান্ধব' সম্পাদনা করতেন প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মনেতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর ১২৮৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসেই পত্রিকাটি মাসিক আকারে পুনঃপ্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি আমরা দেখি নি, সুতরাং আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয় এটি কেন বিলেতে রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রেরিত হয়েছিল।

অপর গ্রন্থটি ন-দিদি স্বর্ণকুমারী দেবী-রচিত গীতিনাট্য ‘বসন্ত উৎসব’। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ-অনুযায়ী গ্রন্থটির প্রকাশের তারিখ : 4 Nov 1879 [১৯ কার্তিক ১২৮৬]। স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা হিরণ্ময়ী দেবী এ-সম্বন্ধে লিখেছেন, ‘যোড়াসাঁকো হইতে কাব্য-নাট্যের সৃজন প্রথম এই ‘বসন্ত-উৎসবে’ই। ইংলণ্ডে বইখানি পড়িয়া রবিমামা মাকে যে আনন্দপূর্ণ পত্র লেখেন, বড়ই দুঃখের বিষয়, সে পত্রখানি মা রাখেন নাই। রবিমামা বিলাত হইতে বাড়ি ফিরিবার পর আমাদের অন্তঃপুরে বসন্ত-উৎসবের অভিনয়েও হইয়াছিল।’[২১]

ক্যাশবহি-তে ‘অশ্রুমতী’ ও ‘বসন্ত-উৎসব’ বিলেতে পাঠানো বাবদ কোনো খরচের উল্লেখ দেখা যায় না, সম্ভবত ব্যক্তিগত উদ্যোগেই গ্রন্থদুটি প্রেরিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, দেবেন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারোর চিঠি বিলাতে প্রেরণের সংবাদও ক্যাশবহি থেকে পাওয়া যায় না; চিঠিপত্রের যাতায়াত নিশ্চয়ই অব্যাহত ছিল, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষ নিজের খরচেই তা পাঠাতেন বলে ক্যাশবহি সে-সম্পর্কে নীরব।

ডাক্তার স্কটের পরিবারে কয়েকটি মাস কাটাবার পর তারকনাথ পালিতের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ University College, London-**এর** Faculty of Arts & Laws **বিভাগে ভর্তি হন** 13 Nov 1879 [বৃহ ২৮ কার্তিক] তারিখে।* ভর্তির বিবরণে দেখা যায়, তাঁর বয়স ১৮ বৎসর এবং লণ্ডনের আবাসস্থল হিসেবে 10 Tavistock Square, W. C. লেখা হয়েছে—যেটিকে আমরা ডাক্তার স্কটের বাড়ির ঠিকানা বলে গ্রহণ করেছি। এই বিবরণেই দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ কেবল English Class-এর জন্য ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিং জমা দিয়াছেন। তিনি কতদিন এখানে পড়েছিলেন এই প্রশ্নের উত্তরে য়ুনিভার্সিটি কলেজের রেজিস্ট্রার ড ভট্টাচার্যকে লিখেছিলেন, ‘I regret there are no records now existing which give the length of time he actually studied here.’ **অবশ্য** রবীন্দ্রনাথ নিজেই উল্লেখ করেছেন তিনি তিন মাস মাত্র য়ুনিভার্সিটিতে পড়েছিলেন,[২২] আনুষঙ্গিক তথ্যও তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন করে। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন, তিনি কোন্ কোর্স অনুযায়ী সেখানে পড়েছিলেন। ড ভট্টাচার্য উল্লিখিত প্রবন্ধে তারকনাথ পালিতের পুত্র লোকেন্দ্রনাথের য়ুনিভার্সিটি কলেজে ভর্তির বিবরণ সংবলিত নিদর্শনপত্রের একটি ফোটো-কপিও প্রকাশ করেছেন, যা আমাদের প্রশ্নের উত্তর-সন্ধানে কিছুটা সাহায্য করতে পারে। নিদর্শনপত্রটিতে দেখা যায় লোকেন্দ্রনাথ য়ুনিভার্সিটি কলেজে ভর্তি হয়েছেন রবীন্দ্রনাথের আগেই 20 Oct 1879 [সোম ৪ কার্তিক] তারিখে, তাঁর বয়সের জায়গার লেখা ‘14 on 8/9/80’। তিনি 1879-80 শিক্ষাবর্ষের জন্য মোট ৩৯ পাউণ্ড ১৮ শিলিং জমা দেন, তাঁর পঠিতব্য বিষয় ছিল —Latin, English, French [? আরও একটি ভাষা, ড ভট্টাচার্য লিখেছেন ‘ইতালীয়ান’ দ্র রবীন্দ্র-চর্যা। ৩২], Pure Mathematics এবং Physics। আমরা পূর্বেই লণ্ডন য়ুনিভার্সিটির ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার যে সিলেবাস উদ্ধৃত করেছি, তার সঙ্গে উপরোক্ত তালিকার সাদৃশ্য দেখে মনে হয় লোকেন্দ্রনাথ ওই পরীক্ষার জন্য তৈরি হবার উদ্দেশ্যেই কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। ষোলো বছরের কম বয়সের ছাত্ররা এই পরীক্ষা দিতে পারত না, লোকেন্দ্রনাথও 1879-80, 1880-81 ও 1881-82 তিনটি সেশন পড়াশুনো করে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ষোলো বছর বয়সেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে দেখা যায় তিনি কেবল English বিষয়েই বেতন জমা দিয়েছেন ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিং—যেখানে লোকেন্দ্রনাথ এই বিষয়ে বেতন দিয়েছেন ৯ পাউণ্ড ৯ শিলিং [ড ভট্টাচার্যকে লিখিত রেজিস্ট্রারের পত্র থেকে জানা যায় Oct থেকে Jun ন-মাসে একটি সেশন গণনা করা হত, সুতরাং সম্ভবত উক্ত বিষয়ে মাসিক বেতন ছিল ১ পাউণ্ড ১ শিলিং—রবীন্দ্রনাথ এক মাস পরে ভর্তি হয়েছিলেন বলে ওই পরিমাণ অর্থ কম লেগেছিল। এই অনুমান যথার্থ হলে একটি সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে পড়ে

যে, অন্তত Jun 1880 পর্যন্ত তিনি য়ুনিভার্সিটি কলেজে পড়বেন ভর্তির সময় সেইরকমই ঠিক ছিল]। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'বিলাতে যখন আমি য়ুনিভার্‌সিটি কলেজে ইংরেজি-সাহিত্য-ক্লাসে তখন সেখানে লোকেন পালিত ছিল আমার সহধ্যায়ী বন্ধু'[২৩]—কিন্তু বোঝা শক্ত যে তেরো বছরের বালক লোকেন্দ্রনাথ তিন বছরের কোর্সের প্রথম বছরে যে ক্লাসে পড়াশুনো করছেন, আঠারো বছরের তরুণ রবীন্দ্রনাথ সেই একই ক্লাসে কী করে তাঁর সহধ্যায়ী হতে পারেন। তাছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলি আয়ত্ত করার প্রশ্নটিও উপেক্ষা করা যায় না। সুতরাং মনে হয় রবীন্দ্রনাথের বর্ণনার মধ্যে কিছু অসংগতি আছে, আরও তথ্য সংগৃহীত না হওয়া পর্যন্ত যার জট ছাড়ানো কঠিন।

ইংরেজি সাহিত্যের ক্লাসে শিক্ষক ছিলেন হেনরি মরলি [Henry Morley, 1822-94], রবীন্দ্রনাথ আজীবন তাঁর সম্পর্কে সুগভীর শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন, 'আমি তখন লণ্ডন য়ুনিভর্সিটিতে ভরতি হয়েছি, ইংরেজি সাহিত্য পড়াচ্ছেন হেনরি মরলি। সে তো পড়ার বই থেকে চালান দেওয়া শুকনো মাল নয়। সাহিত্য তাঁর মনে, তাঁর গলার সুরে প্রাণ পেয়ে উঠত—আমাদের সেই মরমে পৌঁছত যেখানে প্রাণ চায় আপন খোরাক, মাঝখানে রসের কিছুই লোকসান হত না। বাড়িতে এসে ক্ল্যারেণ্ডন প্রেসের বইগুলি থেকে পড়বার বিষয় উলটেপালটে বুঝে নিতুম। অর্থাৎ নিজের মাস্টারি করার কাজটা নিজেই নিয়েছিলুম।'[২৪] মৃত্যুর মাত্র চার মাস পূর্বে 17 Apr 1941 [বৃহ ৪ বৈশাখ ১৩৪৮] কথাপ্রসঙ্গে তিনি রানী চন্দকে বলেছিলেন, 'হেনরি মর্লির মতো শিক্ষক পাওয়া আমার জীবনের বড়ো একটা সৌভাগ্য। তাঁর পড়াবার পদ্ধতি ছিল নতুন ধরনের। তিনি কখনো শব্দের অর্থ করে করে পড়াতেন না। পাঠ্য বিষয় তিনি ক্লাসে এমন ভাবে আবৃত্তি করে যেতেন, যাতে ক'রে তার বিষয়বস্তু বুঝতে আমাদের কষ্ট হত না। তাঁর আবৃত্তির মধ্যেই তিনি যা বোঝাতে চাইতেন তা পরিষ্কার ফুটে উঠত। আমরা তার পরে বই নিয়ে ঘরে বসে আলোচনা করতুম, নিজেরাই নিজেদের শিক্ষা দিতুম; পাঠ্যবিষয় বুঝতে আমাদের কোথাও কোনো কষ্ট হত না। এমনিই ছিল তাঁর শিক্ষা দেবার ক্ষমতা বা পদ্ধতি।'[২৫] শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বা বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-পড়ানোর যে-বিবরণ বিভিন্নজনের স্মৃতিকথায় পাওয়া যায়, তার সঙ্গে হেনরি মরলির পড়ানোর পদ্ধতির অনেক সাদৃশ্য আছে, এই সাদৃশ্য নিতান্ত কাকতালীয় নয় বলেই মনে হয়। উপরোক্ত আলাপচারির পরবর্তী অংশটুকুও উদ্ধারযোগ্য, তার মধ্যে হেনরি মরলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও রবীন্দ্রনাথের পাঠপ্রগতি উভয়েরই বিষয়ে কিছু পরিচয় পাওয়া যায় : "তিনি আর-একটা করতেন—সপ্তাহের একটি বিশেষ নির্ধারিত দিনে ছেলেরা নাম না দিয়ে প্রবন্ধ বা কিছু লিখে তাঁর ডেস্কে লুকিয়ে রেখে আসত। তিনি বাড়ি গিয়ে পড়তেন ও একটি বিশেষ দিনে ক্লাসে সেই-সব লেখার সমালোচনা করতেন। আমরা সবাই সেই দিনটির জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতুম। তিনি কখনো কারো লেখার সমালোচনা করতে গিয়ে কাউকে আঘাত করতেন না, কারণ তাঁর মনে করুণা ছিল। শুধু একদিন তার ব্যতিক্রম হয়েছিল। একটি ভারতীয় ছাত্র ইংরেজদের স্তুতিবাদ ক'রে ও সেই তুলনায় নিজেদের স্বজাতীয় নিকৃষ্টতা দেখিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখে লুকিয়ে তাঁর ডেস্কে রেখে আসে। হেনরি মর্লি সেই প্রবন্ধ প'ড়ে খুব রেগে যান। তিনি সেদিন ক্লাসে এসে সেই প্রবন্ধটির তীব্র নিন্দা করেন এবং তিনি বলেন, এতে যে ইংরেজদের স্তুতি করা হয়েছে, তাতে যেন কোনো সত্যিকারের ইংরেজ খুশি না হয়। সেদিন তাঁর মন অপ্রসন্ন ছিল বলে সেই প্রবন্ধটির ভাষার ও রচনার সমালোচনা করে ছিন্নভিন্ন করে দিলেন। আমাদের লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছিল।... তার পর বাধ্য হয়ে আমাকে একটি প্রবন্ধ লিখতে হয় সেই লজ্জা ঢাকবার জন্য। মেজদা একবার

একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন "ভারতবর্ষে ইংরেজ"* সম্বন্ধে। তাতে ছিল ভারতীয়দের সঙ্গে ইংরেজদের ব্যবহার সম্বন্ধে সব তথ্য। আমি অনেকটা তারই উপর লক্ষ রেখে ও কিছু রঙ চড়িয়ে ইংরেজদের নিন্দে করে একটি প্রবন্ধ লিখে লুকিয়ে তাঁর ডেস্কে চালান করে দিলুম। তার পরের দিনগুলি ভয়ে ভয়ে নিজের ভাগ্য গণনা করতে লাগলুম। যেদিন সেই বিশেষ দিনটি এল, সেদিন আমি পলাতক।... বিকেলে এক জায়গায় বসে আছি, হঠাৎ দেখি পিঠে এক চাপড়। আমার বন্ধু লোকেন পালিত উল্লসিত হয়ে আমার পিঠ চাপড়ে বললে, 'ওহে তোমার আজ জয়-জয়কার। হেনরি মর্লি তোমার প্রবন্ধের অজস্র প্রশংসা করলেন। কী তোমার বিষয়বস্তুর, কী তোমার লেখার ভঙ্গীর, কী তোমার ভাষার।' এবং তিনি ক্লাসে যে-সব ইংরেজ ছাত্র ছিল তাদের উদ্দেশ্যে বললেন 'তোমরা হয়তো অনেকেই পরে ভারতবর্ষে যাবে কিন্তু আজকের দিনে এই যে ভারতীয় ছেলেটি ইংরেজদের ব্যবহার সম্বন্ধে যা বললে তা যেন কোনোদিন ভুলো না। আর তাদের সম্বন্ধে যেন কোনো অসম্মান না থাকে।' সেদিনের মতো এমন সত্যিকারের প্রশংসা জীবনে আমি পাই নি।"[২৬] লক্ষণীয়, হেনরি মরলি রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটির প্রশংসা করেছিলেন শুধু বিষয়বস্তুর জন্য নয়—তার ভাষা ও লেখার ভঙ্গীর জন্যও। তাঁর ইংরেজি ভাষা ও রচনাভঙ্গীও এই সময়ে একটি বিশিষ্টতা অর্জন করেছিল—রবীন্দ্রনাথের জীবন-বৃত্তান্তের পক্ষে এটি একটি মূল্যবান তথ্য বলে মনে করি।

Edward Thompson হেনরি মরলির কাছে পড়া সম্পর্কে কিছু অতিরিক্ত তথ্য দিয়েছেন : "I heard him speak of the pleasure which came from reading the *Religio Medici* [1642, by Sir Thomas Browne, 1605-82] with Henry Morley, Also, 'I read C*oriolanus* [1609, শেক্স্পীয়রের এই নাটকটি 1880-তে লণ্ডন য়ুনিভার্সিটির বি. এ. পরীক্ষার পাঠ্য ছিল] with him, and greatly enjoyedit. His reading was beautiful. And *Antony and Cleopatra* [1608], which I liked very much'.[২৭]

লোকেন্দ্রনাথ পালিত রবীন্দ্রনাথের চেয়ে যদিও প্রায় পাঁচ বছরের ছোটো ছিলেন, তবু য়ুনিভার্সিটি কলেজে পড়ার সময়ে তাঁদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল, যা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছে। অপেক্ষাকৃত বড়ো বয়সে চার-পাঁচ বছরের তারতম্য বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার পক্ষে কোনো বাধাই নয়, কিন্তু লণ্ডন য়ুনিভার্সিটিতে পড়ার সময়ে এই ব্যবধান অতিক্রম করা কঠিন। কিন্তু তবু যে সেই অসম-বয়সী বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল, সে-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'বয়সের গৌরব নাই বলিয়াই বয়স সম্বন্ধে বালক আপনার মর্যাদা বাঁচাইয়া চলিতে চায়। কিন্তু এই বালকটি সম্বন্ধে সে-বাধা আমার মনে একেবারেই ছিল না। তাহার একমাত্র কারণ, বুদ্ধি-শক্তিতে আমি লোকেনকে কিছুমাত্র ছোটো বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না।'[২৮] ফলে য়ুনিভার্সিটি কলেজের লাইব্রেরি 'কত পাঠরত প্রতিবেশিনী ছাত্রীর নীল চক্ষুর নীরব ভর্ৎসনা-কটাক্ষ' উপেক্ষা করে দুই বন্ধুর সরব হাস্যালাপে মুখরিত হয়ে উঠত। সাহিত্যালাপও হত, লোকেন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের তুলনায় অনেক কম পড়লেও চিন্তাশক্তির দ্বারা সেই অভাব অনায়াসেই পূরণ করে নিতেন।

বাংলা শব্দতত্ত্ব তাঁদের আলোচনার একটি অন্যতম বিষয় ছিল। ডাক্তার স্কটের একটি কন্যা রবীন্দ্রনাথের কাছে বাংলা শিখতে চেয়েছিলেন। তাঁকে বাংলা বর্ণমালা শেখাবার সময় গর্ব করে বলেছিলেন যে, বাংলা ভাষার বানান একটি নিয়ম মেনে চলে, ইংরেজি বানানরীতির মতো তা অসংযত নয়। কিন্তু ভাষাশিক্ষা একটু এগোবার পর দেখা গেল বাংলা বানানও বাঁধন মানে না, তার নিয়মরীতি লঙ্ঘন এতদিন অভ্যাসবশত ধরা

পড়ে নি। 'তখন এই নিয়মব্যতিক্রমের একটা নিয়ম খুঁজিতে প্রবৃত্ত হইলাম। য়ুনিভার্‌সিটি কলেজের লাইব্রেরিতে বসিয়া এই কাজ করিতাম। লোকেন এই বিষয়ে আমাকে যে-সাহায্য করিত তাহাতে আমার বিস্ময় বোধ হইত।'[২৯]

প্রসঙ্গটির কিঞ্চিৎ বিশদ বর্ণনা আছে কয়েক বছর পরে লেখা 'বাঙ্গলা উচ্চারণ' [বালক, আশ্বিন ১২৯২। ২৬৯-৭৪; শব্দতত্ত্ব ১২।৩৩৭-৪২] প্রবন্ধে। সেখানে তিনি লিখেছেন, '[বাংলা] বর্ণমালার মধ্যে যতই গোলযোগ থাক্‌ না কেন, আমাদের উচ্চারণের মধ্যে কোনো অনিয়ম নাই, এইরূপ আমার ধারণা ছিল। ইংলণ্ডে থাকিতে আমার একজন ইংরেজ বন্ধুকে বাংলা পড়াইবার সময় আমার চৈতন্য হইল, এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ সমূলক নয়।'[৩০] বাংলা উচ্চারণের এই বিশৃঙ্খলা যখন নজরে পড়ল, তখন সেই বিশৃঙ্খলার মধ্যেও কোনো নিয়ম আছে কিনা তা জানার জন্য তাঁর কৌতূহল জাগ্রত হল—ছাত্রীকে শিক্ষাদানের তাগিদও এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এ-কথাও অনুমানসাধ্য। 'আমার কাছে তখন খানদুই বাংলা অভিধান ছিল। মনোযোগ দিয়া তাহা হইতে একটা নিয়ম বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এই সকল উদাহরণ ও তাহার টীকায় রাশি রাশি কাগজ পুরিয়া গিয়াছিল।'[৩১] দেশে ফেরার সময়েও কাগজগুলি তাঁর সঙ্গে ছিল এবং একটি চামড়ার বাক্সে সেগুলি রেখে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু কোনো একটি বালিকার [? ইন্দিরা দেবী] পুতুলের সংসারকে জায়গা দেবার জন্য সেগুলির অন্তর্ধান ঘটে। বাংলা শব্দতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ দেখা দেয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার-ইত্যাদি সম্পাদিত 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ/ বিদ্যাপতি' পাঠ করার সময়ে, তখনও তিনি দুরূহ শব্দের সমুচ্চয় ও ব্যাকরণের বিশেষত্বগুলি নিজের বুদ্ধি অনুসারে একটি ছোটো বাঁধানো খাতায় নোট করে রেখেছিলেন। এখনও বাংলা উচ্চারণের বিশৃঙ্খলা ও তার মধ্যে নিয়ম আবিষ্কারের চেষ্টায় রাশি রাশি কাগজ পূর্ণ করেছিলেন। দুটি প্রচেষ্টাই অপরের ত্রুটিতে অবলুপ্ত হয়েছে, কিন্তু জীবনের নানা পর্বে—এমন কি মৃত্যুর মাত্র তিন বছর আগে বাংলাভাষা-পরিচয় [১৩৪৫] রচনা পর্যন্ত—শব্দের রহস্য তাঁর মন অধিকার করে ছিল, বিভিন্ন সময়ে লেখা অনেক প্রবন্ধে তার ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

এই নীরস ব্যাকরণ-চর্চার পশ্চাদপটটি অবশ্য যথেষ্টই সরস। উপরেই উল্লিখিত হয়েছে, ডাক্তার স্কটের একটি কন্যাকে বাংলা শেখাতে গিয়েই বাংলা-উচ্চারণের বিশৃঙ্খলার প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। কিন্তু বাংলাভাষা শিক্ষার আগ্রহের মধ্যেই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের প্রতি উক্ত কন্যাটির বিশেষ মনোযোগের ইঙ্গিত মেলে। জীবনস্মৃতি, ছেলেবেলা প্রভৃতি স্মৃতিমূলক রচনায় কিংবা সমকালীন য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র-তে স্কট-কন্যাদের সম্বন্ধে অল্পবিস্তর উল্লেখ থাকলেও এঁদের সম্পর্কে কোনো মানসিক দৌর্বল্যের প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ উত্থাপন করেন নি। কিন্তু বহু বৎসর পরে 1 Jan 1927 [শনি ১৭ পৌষ ১৩৩৩] তারিখে সকালবেলায় দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে আলাপচারিতে তিনি স্পষ্ট করেই বলেন, 'আমি বিলেতে প্রথমে যে ডাক্তার পরিবারে অতিথি হয়ে ছিলাম তাঁর দুটি মেয়েই যে আমাকে ভালোবাসত একথা আজ আমার কাছে একটুও ঝাপ্‌সা নেই—কিন্তু তখন যদি ছাই সেকথা বিশ্বাস করার এতটুকুও মরাল কারেজ থাকত!'[৩২]

1890-এ রবীন্দ্রনাথ যখন দ্বিতীয়বার ইংলণ্ড-ভবনে যান, তখন 11 Sep [বৃহ ২৭ ভাদ্র ১২৯৭] লণ্ডনে ডাঃ স্কটের বাড়িতে যান, কিন্তু তাঁরা তখন লণ্ডনের বাইরে New Maldin-এ চলে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নৈরাশ্য গোপন করেন নি য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি-তে [দ্র রবিজীবনী ৩।১৫৫-৫৬]। 19 Sep [শুক্র ৪ আশ্বিন]

New Maldin-এ গিয়ে এই পরিবারের সঙ্গে তিনি মিলিত হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু লোকেন্দ্রনাথের অনাগ্রহে সেই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয় নি।

অন্তত লুসি স্কট যে রবীন্দ্রনাথকে ভোলেন নি, সেটি জানা যায় 2 Feb 1929 তাঁকে লেখা লুসির ভ্রাতা ডাঃ স্যামুয়েল-এর পুত্র S. G. Scott-এর একটি চিঠিতে। তিনি লিখেছেন : 'My aunt Lucy has often told me of the enjoyable evenings spent them with reading aloud, music and singing, and the enjoyment your singing always gave. She played and sang a good deal and always.' তিনি নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর লুসি তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি পত্রও লেখেন, 'But she thinks she must have misdirected the letter as he did not hear from you.' পত্রলেখক মিঃ স্কট বৃদ্ধা লুসির দৈন্যাবস্থার উল্লেখ করে অর্থসাহায্যের প্রত্যাশায় এই পত্র লিখেছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পত্রটি থেকে জানা যায় না সেই প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছিল কিনা।[*] শ্রদ্ধেয় ড ভবতোষ দত্ত লুসি স্কটকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠির একটি মাইক্রোফিল্মের সন্ধান দেন, কিন্তু সেটি এখনও সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি।

আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু অধ্যাপক প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, Oct 1879-এ Gilchrist scholarship-এর মেয়াদ শেষ হলে বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ্ প্রমথনাথ বসু [1855-1935] লণ্ডনে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের জন্য যে কোচিং ক্লাশ খোলেন তাতে 1879-এর শেষদিকে বা 1880-র প্রথমদিকে রবীন্দ্রনাথও যোগ দেন।[৩৩] এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ লণ্ডন য়ুনিভার্সিটিতে পড়ছেন।

সম্ভবত শীতকাল শুরুর মুখেই [Nov 1879-এর শেষ দিকে] সত্যেন্দ্রনাথ সপরিবারে ফ্রান্সের দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরের তীরে Nice শহরে বসবাস করার জন্য ইংলণ্ড ত্যাগ করেন। হয়তো এই সংবাদ ও রবীন্দ্রনাথের পড়াশুনো ইত্যাদির খবর জানিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ পিতার কাছে একটি চিঠি লেখেন। ২৩ অগ্রহায়ণ [সোম ৪ Dec] তারিখে ক্যাশবহি-র একটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে 'উক্ত মহাশয়ের [দেবেন্দ্রনাথের] নিকট বিলাত হইতে প্রেরিত মেজবাবু মহাশয়ের হাতের লেখায় একপত্র' পাঠানো হয়েছে; চৈত্র ১২৮৫ থেকে দীর্ঘ প্রায় ন-মাস দার্জিলিঙে কাটিয়ে অগ্রহায়ণের গোড়ায় কলকাতায় ফিরে দেবেন্দ্রনাথ এই সময়ে শান্তিনিকেতনে বাস করছেন।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে ফ্রান্সে যান নি। বড়োদিনের সময়ে ও ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিন [1 Jan 1880 বৃহ ১৮ পৌষ] তিনি যে লণ্ডনেই ছিলেন, তার প্রমাণ য়ুরোপ-প্রবাসী পত্রের শেষ চিঠিটি—এটি ওই দিনই লেখা। এমন-কি Jan 1880-র শেষ দিকেও যে তিনি লণ্ডনেই অবস্থান করেছেন, তা বোঝা যায় ৭ মাঘ [20 Jan] তারিখের একটি হিসাব থেকে :ব° R. N. Tagore Esqre/ দ° উক্ত বাবুর মাঘ মাসের খরচ জন্য বেঙ্ক অব ইংলণ্ডের উপর কুড়ি পাউণ্ডর কাত 23/130 ন° এক কেতা বিল অব এক্সচেঞ্জ...২৩৭॥৴৫'। হিসাবটির একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল, এই বারে বিল অফ এক্সচেঞ্জটি রবীন্দ্রনাথের নিজের নামেই পাঠানো হয়েছে, এর আগে পর্যন্ত এগুলি পাঠানো হত সত্যেন্দ্রনাথের নামে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রযত্নে। তবে এর আগে একটি রেজিস্ট্রী চিঠি রবীন্দ্রনাথের নামেই পাঠানো হয়, তার বিবরণ পাওয়া যায় ১৫ পৌষ [29 Dec]-এর হিসাবে : 'কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের প্রেরিত রবীবাবু ও মেজবাবু মহাশয়ের/ নামের দুইপত্র একত্রে এক লেফেফার ভিতর দিয়া রেজেষ্টারি/ করিয়া রবীবাবুর নিকট পাঠান যায় বিলাতে ব্যয়...।৫০' [দেবেন্দ্রনাথ

তখন কলকাতায়]। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'মেজদাদাদের দেশে ফিরিবার সময় উপস্থিত হইল। পিতা লিখিয়া পাঠাইলেন, আমাকেও তাঁহাদের সঙ্গে ফিরিতে হইবে।'[৩৪] উপরের হিসাবে যে পত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, সম্ভবত তাতেই দেবেন্দ্রনাথের এই নির্দেশ প্রেরিত হয়েছিল। মনে প্রশ্ন জাগে, প্রায় এক বছর এলোমেলোভাবে কাটিয়ে য়ুনিভার্সিটি কলেজে রবীন্দ্রনাথের পড়াশুনো যখন একটা সুনির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত হতে শুরু করেছে, ঠিক তখনই কেন তাঁর উপর দেশে ফেরার নির্দেশ জারি হল। রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন : "'ভারতী'র পত্রধারা তাঁহার এই আকস্মিক প্রত্যাবর্তন-আদেশের কারণ কি না তাহার সঠিক প্রমাণ দিতে পারিব না; তবে আমাদের সন্দেহ হয় তরুণ কবির প্রগলভতায় অভিভাবকগণ অসন্তুষ্ট হইয়াই তাঁহাকে ফিরিয়া আসিবার জন্য পত্র দেন।"[৩৫] কিন্তু আই. সি. এস. পড়ার সময়ে বিলাত-প্রবাসকালে সত্যেন্দ্রনাথও পিতার কাছে লিখিত পত্রাবলীতে [পত্রগুলি পাওয়া যায় নি, কিন্তু পুরাতনী-তে সংকলিত জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে লেখা চিঠিতে তাদের বিষয়বস্তুর খানিকটা আভাস মেলে] যথেষ্ট প্রগল্‌ভতার পরিচয় দিয়েছিলেন, সে-কথা এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করা দরকার। তাছাড়া ভারতী-তে প্রকাশিত 'য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র'গুলি নিয়ে সম্পাদকীয় বিতর্কের সূত্রপাত ঘটেছিল অগ্রহায়ণ-সংখ্যায়, পৌষ-সংখ্যার বিতর্কও একতরফা, রবীন্দ্রনাথের উত্তর প্রথম প্রকাশিত হয় ফাল্গুন-সংখ্যায়, তখন তিনি স্বদেশের পথে যাত্রা শুরু করেছেন। [অবশ্য উত্তরটি সম্ভবত পৌষ মাসেই রচিত হয়েছিল; কিন্তু সেটি কলকাতায় পৌঁছবার আগেই দেবেন্দ্রনাথ আদেশপত্রটি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, পত্র-প্রেরণের তারিখ থেকে এমন ধারণাই হয়]। অভিভাবকহীন অবস্থায় রবীন্দ্রনাথকে ইংলণ্ডে রাখা দেবেন্দ্রনাথ চান নি এমন যুক্তিও অচল, কেননা অভিভাবক হিসেবে জ্ঞানেন্দ্রমোহন তো ছিলেন-ই, তাছাড়া তাঁর দুই জামাতা জানকীনাথ ঘোষাল ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তখন যথাক্রমে ব্যারিস্টারি ও ডাক্তারি পড়ার জন্য ইংলণ্ডেই অবস্থান করছেন। সেইজন্যই মনে হয় স্কট-কন্যাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গতার কাহিনী হয়তো কোনো সূত্রে পল্লবিত হয়ে দেবেন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছেছিল, তারই ফলে এই অকালপ্রত্যাবর্তনের নির্দেশ।[*] রবীন্দ্রনাথ আই. সি. এস. বা ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফেরেন নি, এতে অন্তত আমাদের দুঃখিত হবার কারণ নেই; কিন্তু আমরা দেখতে পাই সমগ্র ছাত্রজীবনে যে-রবীন্দ্রনাথ শিক্ষায়তনের গণ্ডিবদ্ধ পড়াশুনোর প্রতি বিরূপতা দেখিয়েছেন, তিনিই লণ্ডন য়ুনিভার্সিটি কলেজে হেনরি মরলির শিক্ষাপদ্ধতির কাছে সাগ্রহ আত্মসমর্পণ করেছিলেন। অসময়ে দেশে ফিরে যেতে না হলে এর ফলে তাঁর জীবনধারা পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারত, এ-প্রসঙ্গে এই সম্ভাবনার কথা ভাবা বোধ হয় অনুচিত হবে না।

যাই হোক, এই আদেশে রবীন্দ্রনাথের দুঃখিত হওয়ারই কথা, কিন্তু তাঁর মন্তব্য থেকে তা বোঝা যায় না : 'সে-প্রস্তাবে আমি খুশি হইয়া উঠিলাম। দেশের আলোক দেশের আকাশ আমাকে ভিতরে ভিতরে ডাক দিতেছিল।'[৩৬] এই বৈপরীত্য তাঁর পরবর্তী জীবনে বারবার দেখা দিয়েছে—সামান্যতম আহ্বানেই তিনি বিদেশযাত্রা করেছেন, কিন্তু কিছুদিন পরেই ঘরে ফেরার ডাক তাঁর অন্তরে এসে পৌঁছেছে।

দেশে ফেরার আগে ভারতের একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীর বিধবা স্ত্রীর [Mrs. wood][*] অনুরোধে লণ্ডনের বাইরে তাঁর বাড়িতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে একটি কৌতুকপ্রদ অথচ বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, জীবনস্মৃতি-তে তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন [দ্র ১৭। ৩৬৫-৬৮]। এই করুণ অভিজ্ঞতার ফলে তাঁকে লণ্ডনে ফিরে দু-তিন দিন বিছানায় পড়ে 'নিরঙ্কুশ ভালোমানুষি'র প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল।

'ডাক্তারের মেয়েরা কহিলেন, "দোহাই তোমার এই নিমন্ত্রণ-ব্যাপারকে আমাদের দেশের আতিথ্যের নমুনা বলিয়া গ্রহণ করিয়ো না। এ তোমাদের ভারতবর্ষের নিমকের গুণ।"[৩৭] জায়গাটি কোথায় রবীন্দ্রনাথ তা লেখেন নি, কিন্তু তাঁর বর্ণনা থেকে মনে হয় এটি লণ্ডনের উত্তরে অবস্থিত।

এদিকে বিদায়ের সময় নিকটবর্তী হয়ে আসায় ডাঃ স্কটের বাড়িতেও এক শোকাবহ দৃশ্যের অবতারণা হল। 'বিদায়গ্রহণকালে মিসেস স্কট আমার দুই হাত ধরিয়া কাঁদিয়া কহিলেন, "এমন করিয়াই যদি চলিয়া যাইবে তবে এত অল্পদিনের জন্য তুমি কেন এখানে আসিলে।"[৩৮] স্কট-কন্যাদের প্রতিক্রিয়ার কথা রবীন্দ্রনাথ লেখেন নি, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার বিবরণ স্মরণ করলে বোঝা যায় সেখানেও সাধারণ সৌজন্য-বিনিময়ের মধ্য দিয়ে বিদায় পর্ব সমাপ্ত হয় নি। রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়ার অবশ্য প্রমাণ আছে; মালতীপুঁথি-র 61/৩২ক ও 62/৩২খ পৃষ্ঠায় একটি অসম্পূর্ণ কবিতা দেখা যায়, যেটি এই বিদায় অবলম্বনেই লেখা। কবিতাটি লণ্ডনেই লেখা হয়েছিল কিনা এ-সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া না গেলেও, প্রায় সমকালেই এটি রচিত এ-সম্পর্কে সন্দেহের কোনো কারণ নেই। সমকালীনতার চিহ্ন পাণ্ডুলিপি-পৃষ্ঠাতেই পাওয়া যায়; বোঝা যায় অব্যবহিত বেদনার অভিঘাতে কবিতাটির সমগ্র ভাবরূপ মনের মধ্যে স্পষ্ট হওয়ার আগেই তিনি এটি লিখতে শুরু করেছিলেন। এটি আরম্ভ হয়েছিল একটি স্তম্ভে:

ফুরালো দুদিন
কেহ নাহি জানে এই দুইটি দিবসে—
কি বিপ্লব বাধিয়াছে একটি হৃদয়ে।
দুইটি দিবস
চিরজীবনের স্রোত দিয়াছে ফিরায়ে—
এই দুই দিবসের পদ চিহ্ন [হ্ন] গুলি
শত বরষের শিরে রহিবে অঙ্কিত।
x যত অশ্রু বরষেছি এই দুই দিন
যত হাসি হাসিয়াছি এই দুই দিন x
এই দুই দিবসের হাসি অশ্রু মিলি
হৃদয়ে স্থাপিবে চির x হাসি অশ্রু। x বসন্ত বরষা—*

—কবিতার পরবর্তী অংশ দুটি স্তম্ভে লেখা; উপরের অংশটি রবীন্দ্রনাথ কেটে দেন নি, কিন্তু এর ভাবটি ও কয়েকটি ছত্র পরিবর্তিত আকারে 62/৩২খ পৃষ্ঠায় আবার লিখেছেন। পরে কবিতাটি ভারতী-র জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭ [পৃ ৫৯-৬০] সংখ্যায় আরও অনেকগুলি ছত্র এবং পাঠান্তরসহ 'শ্রীদিক্‌শূন্য ভট্টাচার্য্য' স্বাক্ষরে 'দুদিন' নামে মুদ্রিত হয়। ভারতী-তে সাধারণত রচয়িতার নাম মুদ্রিত হত না, তা-সত্ত্বেও 'শ্রীদিক্‌শূন্য ভট্টাচার্য' নাম ব্যবহার কিছু তাৎপর্য বহন করে বলে মনে হয়—গভীর হৃদয়বেদনাকে লঘু করে দেখানোর প্রয়াস এতে সুস্পষ্ট। ড ভবতোষ দত্ত মহাশয় আমাদের জানিয়েছেন, নিউ ইয়র্কের ড অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে Miss Scott-কে লেখা রবীন্দ্রনাথের কিছু চিঠির মাইক্রোফিল্ম রক্ষিত আছে। এগুলি পেলে রবীন্দ্রনাথের জীবনের একটি বিশেষ পর্ব উদ্ভাসিত হবে।

রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত Feb 1880-র মাঝামাঝি [ফাল্গুন মাসের প্রথম দিকে] লণ্ডন ত্যাগ করে ফ্রান্সে Nice শহরে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলিত হন। ৭ ফাল্গুন [বুধ 18 Feb] তারিখে ক্যাশবহি-র হিসাবে দেখা যায় : 'মেজবাবু মহাশয়ের আসিবার জন্য Passage money জমা দেওয়া সম্বন্ধে অনুসন্ধান লওয়ার জন্য ফ্রেঞ্চ

বেঙ্কে প্রসন্নকুমার বিশ্বাসের জাতাতের গাড়ি ভাড়া', পরের দিনের হিসাব : 'ব° Paris Bank দ° France-এর অন্তর্গত Nice হইতে/ মেজবাবু মহাশয়ের আসিবার জন্য/Passage money উক্ত বেঙ্কে জমা দেওয়া যায়/ ও ঐ বেঙ্ক হইতে Paris ও Paris হইতে/ মেজবাবু মহাশয়ের নিকট Nice এ টেলিগ্রাফ করার ব্যয়/ ঐদিনে জমা দেওয়া যায়/গুঃ T. Palit Esqre ও প্রসন্নকুমার বিশ্বাস..২৯০৩ ° [হিসাবে উল্লিখিত T. Palit হচ্ছেন ব্যারিস্টার তারকনাথ পালিত, তিনি পুত্রদের লণ্ডনে পড়াশুনোর বন্দোবস্ত করে ইতিমধ্যেই কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন]। এই হিসাব থেকে বোঝা যায় 19 Feb-এর পরবর্তী দু-এক দিনের মধ্যেই সত্যেন্দ্রনাথ সপরিবারে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন, এর কয়েকদিন আগে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সঙ্গে মিলিত হন। লক্ষণীয়, উপরের হিসাবে রবীন্দ্রনাথের কোনো উল্লেখ নেই। সম্ভবত সত্যেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত প্রভাবে নিয়মানুসারে পূর্বাহ্নে জাহাজভাড়া জমা না দিয়েই তিনি সমুদ্র-যাত্রা করেন; কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর ভাড়া শোধ করা হয়, এর উল্লেখ পাওয়া যায় ১০ চৈত্র [বৃহ 25 Mar]-এর হিসাবে : 'ব° Ofice of Messageries Maritimes দ° রবিবাবুর বিলাত হইতে আসিবার Passage Money শোধ—৭১৭৷৷ল০। উক্ত ফরাসী জাহাজ-কোম্পানির অফিস কলকাতাতেও ছিল, সুতরাং এ-ব্যাপারে বিশেষ কোনো অসুবিধা হয় নি।

'য়ুরোপ-যাত্রী কোনো বঙ্গীয় যুবকের পত্র' ভারতী-তে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এবং সেই রূপেই গ্রন্থে মুদ্রিত হওয়ার ফলে লণ্ডন-প্রবাসের শেষ দু-মাস, ফ্রান্সে গমন ও প্রত্যাবর্তন-পথে সমুদ্রযাত্রার বিবরণ আমাদের অজ্ঞাত থেকে গেছে। ইন্দিরা দেবীর অপ্রকাশিত স্মৃতিকথায় সামান্য একটু খবর জানা যায় : 'যাবার ও আসবার জাহাজের নাম P & 0 কোংয়ের Oscus ও Maniam ছিল বোধ হয়। ফেরবার সময় খুব ঝড় হয় মনে আছে, এবং দোলের ধাক্কা সামলাবার জন্য খাবার টেবিলের চারধারে যে ছোট রেলিং দেওয়া থাকে, তা' ডিঙ্গিয়ে চায়ের পেয়ালা-পিরীচ ঝন্ ঝন্ করে' মেঝেতে পড়ে ভেঙ্গে যায়।... রবিকাকা আমাদের *Helen's Babies* নামে যে বই পড়ে শোনাতেন, তাতে কত আনন্দ পেয়েছি কি বল্‌ব।' তিনি অন্যত্র লিখেছেন, 'তার [*Irish Melodies*] মধ্যে 'The Last Rose of Summer'* নামে একটি গান আমি ফিরতি-বেলায় জাহাজের কাপ্তেনকে গেয়ে শুনিয়েছিলুম, একটু একটু মনে পড়ে।'[৩৯] প্রথম উদ্ধৃতিটিতে ইন্দিরা দেবী অবশ্য ফেরার পথের জাহাজ ও জাহাজ-কোম্পানির নামটি ভুল লিখেছেন; আমরা আগেই জেনেছি যে, জাহাজ কোম্পানির নাম 'Messageries Maritimes', আর জাহাজটির নাম 'S. S. Oxus'—ভগ্নহৃদয় কাব্যের পাণ্ডুলিপিতে 'Feb 1880' সময়-নির্দেশ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ উক্ত নামটি উল্লেখ করেছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সহ রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় পৌঁছন সম্ভবত চৈত্র মাসের প্রথমে বা Mar 1880-র মাঝামাঝি সময়ে। ৭ চৈত্র [শুক্র 19 Mar] তারিখে ক্যাশবহি-র হিসাবে দেখা যায় : 'মেজবাবু মহাশয়ের আগমন উপলক্ষে ব্যয় ব° বেণীমাধব রায়/ দ° মেজবাবু মহাশয়ের জন্য চা খাবার সরঞ্জাম ক্রয়...২৯৷৶৬'। *Journal of the National Indian Association*-এর Mar 1880-সংখ্যায় তাঁদের প্রত্যাবর্তন-সংবাদ প্রকাশিত হয় : 'Mr, and Mrs. Satyendra Nath Tagore ad their children and Mr. Robinath Tagore have returned to India'—বেঙ্গলী [Vol. XXI. No. 13, Mar 27], হিন্দু পেট্রিয়ট [vol. XXVII, No. 13, Mar 29] প্রভৃতি সংবাদপত্রে খবরটি উদ্ধৃত হয়েছিল।

বিলেত-যাত্রার সময়ে জাহাজ থেকে ও পরে রবীন্দ্রনাথ আত্মীয় ও বন্ধুদের কাছে যে চিঠিগুলি লেখেন, তারই কিয়দংশ ধারাবাহিকভাবে ভারতী পত্রিকার বৈশাখ ১২৮৬ [৩।১] সংখ্যা থেকে মুদ্রিত হতে শুরু করে ও মাঝে মাঝে কয়েক সংখ্যা বাদ দিয়ে শ্রাবণ ১২৮৭ [৪।৪] পর্যন্ত মোট ১৪টি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। শ্রাবণ-সংখ্যার পরে আর কোনো চিঠি মুদ্রিত হয় নি, গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে ভারতী-তে প্রকাশিত পত্রগুলিই কিছুটা ক্রম বদলিয়ে সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত হয়, কিন্তু পত্ররচনার কালানুক্রম সেখানেও রক্ষিত হয় নি। পত্রগুলি তারিখ-বর্জিত, সুতরাং কোন্ তারিখে কোন্ পত্রটি লেখা হয়েছিল তা আবিষ্কার করা দুরূহ। কয়েকটি মাত্র পত্রে কিছু ঘটনার উল্লেখ থাকায় বিভিন্ন সূত্রে কতকগুলি তারিখ নির্ধারণ করা যায়; কিন্তু কয়েকটি চিঠিতে সময়ের বর্ণনা এমনই বিভ্রান্তিকর যে রবীন্দ্রজীবনের কালানুক্রম নির্দেশে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। জীবনস্মৃতি-তে পত্রগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'অশুভক্ষণে বিলাতযাত্রার পত্র প্রথমে আত্মীয়দিগকে ও পরে ভারতীতে পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম।... এই চিঠিগুলির অধিকাংশই বাল্যবয়সের বাহাদুরি। অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া, আঘাত করিয়া, তর্ক করিয়া রচনার আতশবাজি করিবার এই প্রয়াস... আমার কাছে আজ হাস্যকর হইতে পারিত যদি ইহার ঔদ্ধত্য ও অসরলতা আমার কাছে কষ্টকর না হইত।'[৪০] পত্রগুচ্ছ সম্পর্কে এই মনোভাব রবীন্দ্রনাথ ত্যাগ না করলেও বহুকাল পরে পাশ্চাত্য ভ্রমণ [আশ্বিন ১৩৪৩] গ্রন্থে কতকগুলি পত্র সম্পূর্ণ বর্জন ও বাকিগুলির বহুল সংস্কার করে যখন প্রকাশ করেন, তখন ভূমিকা-স্বরূপ চারুচন্দ্র দত্তকে লিখিত পত্রে লিখেছিলেন, 'লেখার জঙ্গলগুলো সাফ করবামাত্র দেখা গেল—এর মধ্যে শ্রদ্ধা বস্তুটাই ছিল গোপনে, অশ্রদ্ধাটা উঠেছিল বাহিরে আগাছার মতো নিবিড় হয়ে। আসল জিনিষটাকে তারা আচ্ছন্ন করেছিল, কিন্তু নষ্ট করে নি।'[৪১] তাছাড়া বাংলা সাহিত্যে চলতি ভাষায় লেখা প্রথম বই এবং 'বাংলা চলতি-ভাষার সহজ-প্রকাশ-পটুতার প্রমাণ' হিসেবে চিঠিগুলির মূল্য তিনি স্বীকার করেছেন।

কিন্তু মূল পত্রগুলি কার উদ্দেশ্যে লিখিত হয়েছিল তা নিশ্চিত করে বলা শক্ত। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'পত্রগুলি পাঠ করিলে আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে মনে হয়, এইগুলি কবির বৌ ঠাকুরানী কাদম্বরী দেবীর উদ্দেশ্যে লিখিত।'[৪২] আমাদের কাছে এই বক্তব্য সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না, কারণ 'তোমার মতো সুপুরুষ এখানকার মতো রূপমুগ্ধ দেশে এলে এখানকার হৃদয়রাজ্যে এত ভাঙচুর লোকসান করতে পারে যে, সে একটা নিদারুণ করুণরসোদ্দীপক ব্যাপার হয়ে ওঠে' [পৃ ৯৩] কিংবা 'তুমি হচ্ছ কবি মানুষ, ছড়াটড়া লিখে থাক, তুমি এখানে এলে বাস্তবিক তোমার লাগত ভালো' [পৃ ১৯৫] প্রভৃতি বাক্য কাদম্বরী দেবী বা কোনো নারীকে লেখা কিছুতেই সম্ভব নয়। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য অনেক খুঁটিনাটি বিচার করে চতুর্থ, ষষ্ঠ, দশম ও দ্বাদশ পত্র ছাড়া বাকিগুলি কাদম্বরী দেবীকে লেখা বলে মত প্রকাশ করেছেন [দ্র কবিমানসী ১। ১৪৪-৪৬]। কিন্তু তাঁর বিচার একটু একদেশদর্শী বলে মনে হয়, যা অনেক সময়ে অতি-সরলীকরণের পথে অগ্রসর হয়েছে।

আমরা এবার প্রয়োজনানুযায়ী মন্তব্য-সহ এই বৎসরে ভারতী-তে রবীন্দ্র-রচনার প্রকাশসূচীটি কালানুক্রমিক-ভাবে উপস্থাপিত করছি:

ভারতী, বৈশাখ ১২৮৫ *[৩।১]:*

৩৪-৩৫ 'ভানুসিংহের কবিতা' ['মাধব! না কহ আদর বাণী'] দ্র ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ২। ২০ [১৫ সংখ্যক]

৪২-৪৮ 'য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র' দ্র য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র [১৩৬৭]। ১-৯ [১ম পত্র, অর্ধাংশ]

রবীন্দ্রনাথ 20 Sep 1978 [শুক্র ৫ আশ্বিন ১২৮৫] তারিখে 'পুনা' স্টীমারে চড়ে বোম্বাই ত্যাগ করেন ও 28 Sep [শনি ১৩ আশ্বিন] 'এডেনে পৌঁছে বাড়িতে চিঠি লিখতে আরম্ভ' করেন—সম্ভবত উক্ত চিঠিটিই এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'পাশ্চাত্য ভ্রমণ' গ্রন্থে ও রবীন্দ্র-রচনাবলী-র প্রথম খণ্ডে কিছু কিছু অংশ বর্জিত হয়েছে ও কিছু সংস্কারের চিহ্নও দেখা যায়।

ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৬ *[৩।২]:*

৪৯-৬০ 'নৰ্ম্ম্যান্ জাতি ও অ্যাঙ্গলো-নৰ্ম্ম্যান্ সাহিত্য।/দ্বিতীয় প্রস্তাব'

প্রবন্ধটির প্রথম প্রস্তাব অংশ ফাল্গুন ১২৮৫-সংখ্যা ভারতী-তে প্রকাশিত হয়; এই প্রস্তাবে রবীন্দ্রনাথ 'নর্ম্যান জাতি-চরিত্র ও তাহাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' আলোচনা করে শেষে লিখেছিলেন, 'ইংরাজি সাহিত্যে ও ইংরাজি চরিত্রে নৰ্ম্ম্যান প্রভাব স্পষ্ট লক্ষিত হয়—ইংরাজি সাহিত্যের ইতিবৃত্ত জানিবার নিমিত্তই আমরা নৰ্ম্ম্যান সাহিত্য আলোচনা করিতেছি।' দ্বিতীয় প্রস্তাবটিতে তিনি অ্যাংলো-নৰ্ম্ম্যান সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করছেন ও ন-টি কাব্যাংশের পদ্যানুবাদ ও কোনো-কোনোটির মূল উদ্ধার করে দিয়েছেন। William Langland-এর কাব্য আলোচনা করে তিনি প্রস্তাব সমাপ্ত করেছেন এই বলে : '...পিয়ার্স প্লোম্যান্ কাব্যই সেমি স্যাক্সন সাহিত্যের শেষ সীমাচিহ্ন স্বরূপ করা গেল। তাহার পরেই গাউয়ার Gower ও চসারের Chaucer কাল। তখন হইতে প্রকৃত পক্ষে ইংরাজি সাহিত্য আরম্ভ হইল। এতকাল ইংরাজি ভাষা নির্ম্মিত হইতেছিল এতক্ষণে তাহা এক প্রকার সমাপ্ত হইল।' এই সময়ে লিখিত আরও অনেকগুলি প্রবন্ধের মতোই এ-দুটিও কোথাও পুনর্মুদ্রিত হয় নি। রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক রচনাগুলিকে আমরা উপেক্ষা করতে অভ্যস্ত, কিন্তু মনে রাখা দরকার এগুলি রচনার সময়কাল প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রমানসেরও নির্মাণ-কাল, তাই কী বিচিত্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সেই মনটি গঠিত হয়ে উঠছিল তার ইতিহাস বোঝার জন্য পুরোনো জীর্ণ পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে এগুলিকে উদ্ধার করে পাঠকদের পক্ষে সহজলভ্য করার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

৮৭-৯৪ 'য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র' দ্র য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র। ৯-২০ [১ম পত্র, শেষাংশ]

পত্রটিতে এডেন থেকে ব্রাইটন পর্যন্ত যাত্রার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। পূর্ব পত্রে যেমন প্রায় ডায়ারির মতো তারিখ দিয়ে যাত্রাটি বর্ণিত হয়েছে, এটিতে সেরূপ করা হয় নি, ফলে নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় ঠিক কোন্ তারিখে রবীন্দ্রনাথ লণ্ডন বা ব্রাইটনে পৌঁছেছিলেন। তবে তাঁর বর্ণনা অনুসারে হিসাব করলে মনে হয় ২৫ আশ্বিন ১২৮৫ [বৃহ 10 Oct 1878] নাগাদ তিনি ব্রাইটনে পৌঁছন, অবশ্য দু-একদিন আগে-পিছে হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পত্রটি সম্ভবত ব্রাইটনে বসেই লেখা।

ভারতী, আষাঢ় ১২৮৬ *[৩।৩]:*

১১৯-২৩ 'য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র' দ্র য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র। ২০-২৭ [২য় পত্র]

এই পত্রটিও ব্রাইটন থেকে লেখা। এখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে পরিচয় ও কিছু কিছু অভিজ্ঞতার যে বিবরণ রবীন্দ্রনাথ এতে দিয়েছেন, তাতে মনে হয় ব্রাইটনে পৌঁছবার পর বেশ কিছুদিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলে—সম্ভবত Oct-এর শেষে কিংবা Nov-এর শুরুতে [কার্তিক ১২৮৫]—তিনি এই পত্র লিখেছিলেন। 'প—ডাক্তারকে আমার শিক্ষক খুব educated man বলে সুখ্যাতি করে থাকেন' [পৃ ২৭]—এই বাক্যাংশ থেকে অনুমান করা যায় তিনি এরই মধ্যে সেখানকার স্কুলেও ভর্তি হয়েছিলেন।

১২৩-৩১ 'ভগ্নতরী।/(গাথা)' ১ম-৭ম সর্গ দ্র শৈশবসঙ্গীত অ-১। ৪৯৮-৫১৪

এই গাথা-কবিতাটি সম্পর্কে আমরা পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

১৩৮-৪৪ 'চ্যাটার্টণ—বালক-কবি'

এই প্রবন্ধটি সম্বন্ধেও আগেই আলোচনা হয়েছে। এটি এখনও পুর্নমুদ্রিত হয় নি।

ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৬ *[৩।৪]:*

১৫৯-৬৮ 'য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র' দ্র য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র। ২৮-৪২ [৩য় পত্র ও ৪র্থ পত্রের ১ম অনুচ্ছেদ]

এই পত্রে 'ফ্যান্সি-বল' ও অন্যান্য নৃত্যসভার বা শীতের আবির্ভাবের যে বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন, তা সবই ব্রাইটনে অবস্থান-কালীন এবং হয়তো Dec 1878-এর [? অগ্র° ১২৮৫] কোনো সময় রচিত। কিন্তু ৪র্থ পত্রের ১ম অনুচ্ছেদটি ভারতী-তে অহেতুক পত্র-শেষে সংযোজিত হয়েছে, এখানে 23 May 1879 [শুক্র ১০ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৬] তারিখের ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়, সুতরাং তারও পরবর্তী কালের রচনা।

ভারতী, ভাদ্র ১২৮৬ *[৩।৫]:*

২১৩-২৪ 'য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র'। দ্র য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র। ৪২-৬১ [৪র্থ পত্রের ১ম অনুচ্ছেদটি বাদ দিয়ে বাকি অংশ এবং ৫ম পত্রের প্রথম আটটি অনুচ্ছেদ '...একটা সমগ্র চিত্র আঁকতে চেষ্টা করছি।' পর্যন্ত]

পত্রের প্রথম অংশটিতে House of Commons-এর 12 Jun [বৃহ ৩০ জ্যৈষ্ঠ]-এ বিতর্ক শোনার অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে, সুতরাং এটি এর কয়েকদিনের মধ্যে Jun-এর মাঝামাঝি [আষাঢ়-এর প্রথমে] লেখা বলে স্বচ্ছন্দে অনুমান করা চলে। কিন্তু পরের অংশটির বিষয়বস্তু আলাদা, কাজেই স্বতন্ত্র পত্র হিসেবে লিখিত বলেই মনে হয়। সেই কারণে ভারতী-তে প্রকাশিত পাঠে বিভ্রান্তি-সৃষ্টির অবকাশ আছে। ২২৫ 'ভাসিয়ে দে তরী'/ রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল একতাল দ্র গীতবিতান ৩। ৯৫২

সজনীকান্ত দাস লিখেছেন, 'গানটি যদিও তালিকাভুক্ত আছে কিন্তু ইহার ভাষা ও মিল বিপরীত সাক্ষ্যই দেয়।'[৪৩] গানটি অবশ্য রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে তাঁর কোনো গীতি-সংগ্রহ-গ্রন্থে সংকলিত হয় নি, তবুও উক্তিটি সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ আছে। কিছুটা সংক্ষিপ্ত আকারে গানটি বালক পত্রিকার আষাঢ় ১২৯২ সংখ্যায় [১৪৪-৪৫] প্রতিভা দেবী-কৃত স্বরলিপিসহ প্রকাশিত হয়। পরে স্বরলিপি-গীতিমালা [১৩০৪]-য় 'কথাঃ—শ্রীজ্যো—/—শ্রীর' এই অস্পষ্ট লেখক-পরিচয়-সহ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপিটি মুদ্রিত হয় দ্র স্বরবিতান ৩৫। এখানে রাগ ও তালের জায়গায় লেখা 'দেশ। ত্রিতাল'। সুরকার-প্রসঙ্গে গীতবিতান-এর

গ্রন্থপরিচয়-এ লিখিত হয়েছে : "সুরকারের উল্লেখ না থাকায় 'হিন্দিভাঙা সুর' বলিয়া মনে হয়" [পৃ ১০১৬], গানটি শুনলে কিন্তু তা মনে হয় না, বরং কয়েকটি বিশেষ ধরনের স্বরবিনাসের জন্য সুরটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দেওয়া বলেই ধারণা করতে হয়। যে-ধরনের ভাব গানটিতে ব্যক্ত হয়েছে, তাতে মনে হয় এটি Torquay-শহরে অবসর-যাপনের সময় লিখিত হয়ে থাকতে পারে।

গানটির সম্পর্কে আর-একটি বিশেষ তথ্য হল, কয়েক বছর পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বপ্নময়ী [১২৮৮] নাটকে এটি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত আকারে [কেবল 'নাহি সাড়া নাহি শব্দ, মন্ত্রে যেন সব স্তব্ধ' ছত্রটি ছাড়া] শেষ দৃশ্যে সুমতি ও জগতের গান রূপে ব্যবহৃত হয়েছে—'অনন্ত সাগর-মাঝে দাও তরী ভাসাইয়া'—সুখের সংগীত দুঃখ-গীতিতে পরিণত; সুরটিও বদল হয়েছে—'বাগেশ্রী' [—আড়াঠেকা], যেটি আবার বাল্মীকিপ্রতিভা-র ২য় সংস্করণ [১২৯২]-এ 'রাঙা-পদ পদ্মযুগে প্রণমি গো ভবদারা' গানের সুরটিকে মনে করিয়ে দেয়।

ভারতী, আশ্বিন ১২৮৬ *[৩।৬]:*

২৮৯-৬৪ 'য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র' দ্র য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র। ৬১-৮৪ [৫ম পত্রের অবশিষ্টাংশ]

পত্রটি মূলত 'ইঙ্গবঙ্গ-নামক এক অদ্ভুত নতুন জীবের...বিস্তারিত বিবরণ সমেত একটা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখবার বাসনা'র ফল—কাজেই ভারতী-র পূর্ব সংখ্যায় প্রকাশিত অংশ এবং বর্তমান অংশটি একই সঙ্গে লিখিত হতে পারে কিংবা পর পর দুটি চিঠিতে একই বিষয়ের ক্রমানুসৃতিও হতে পারে। মুদ্রিত গ্রন্থে অবশ্য সমগ্র বিষয়টি একটি পত্রের আকারেই পরিবেশিত হয়েছে।

২৭৬-৭৭ 'নিন্দা-তত্ত্ব' [?]

এই প্রবন্ধটি সম্পর্কে সজনীকান্ত দাস লিখেছেন, 'প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ চলতি ভাষায় ('য়ুরোপযাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্রে'র ভাষায়) লিখিত হইলেও এতদ্‌সম্পর্কে আমি নিঃসংশয় নহি।'[৪৪] কিন্তু প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা : কালানুক্রমিক সূচী'-তে [দ্র রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা ১।২৪৫] ও ড সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রসাহিত্যের আদিপর্ব গ্রন্থের 'কালক্রম' অংশে প্রবন্ধটিকে নিঃসন্দিগ্ধভাবে তালিকাভুক্ত করেছেন, যদিও কেউই তাঁদের যুক্তি প্রদর্শন করেন নি। প্রবন্ধটি পড়লে সজনীকান্তের দ্বিধার কারণটি বোঝা যায়। 'য়ুরোপযাত্রী...'-র ভাষা কেউ হুবহু নকল করতে পেরেছেন, এ-কথা বিশ্বাস করলে রচনাটির লেখক অন্য কেউ হতে পারেন বলে ভাবা যায়, বিশেষত 'পত্র'-গুলির হাস্যোজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত বাগ্‌ভঙ্গি রচনাটিতে অনুপস্থিত। তবু আমরা কয়েকটি কারণে রচনাটিকে রবীন্দ্রনাথের লেখা বলে চিহ্নিত করতে চাই। প্রথমত, সামান্য একটি বক্তব্যের ক্ষীণ সূত্র ধরে কথার জাল বুনে বুনে একটি প্রবন্ধ তৈরি করার যে-প্রবণতা তাঁর পরবর্তীকালের 'যথার্থ দোসর' [জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮], 'গোলাম চোর' [আষাঢ় ১২৮৮] প্রভৃতি রচনাগুলির মধ্যে দেখি, 'নিন্দা-তত্ত্ব'কে তারই পূর্বসূরী বলে মনে করা যায়। দ্বিতীয়ত, সমকালীন ও অল্প-কিছু পরবর্তীকালের লেখকদের মধ্যে গুরুচণ্ডালী দোষ না ঘটিয়ে চল্‌তি ভাষায় গদ্যরচনা প্রায় বিরল এবং যে-দোষ থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রথমাবধিই সম্পূর্ণ মুক্ত—আলোচ্য রচনাটিতে আমরা সেই বিশুদ্ধ চল্‌তি ভাষার পরিচয় পাই। তৃতীয়ত, মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে-বিরূপতার সাক্ষাৎ স্থানে-অস্থানে প্রায়ই পাওয়া যায়, বর্তমান রচনাটিতেও তা উপস্থিত : 'আত্ম-নিন্দা ও বিনয় কেউ যেন এক পদার্থ মনে না করেন। বাঙ্গলা এক

মহাকাব্যে মহাকবি রামের মুখে অনেক স্থলে "ভিখারী" বোলে আত্মপরিচয় বসিয়েছেন, যেমন "ভিখারী রাঘব; দূতি, বিদিত জগতে!" বোধ হয় কবি রামকে বিনয়ী কর্‌বার অভিলাষে এই রকম কোরে থাক্‌বেন, কিন্তু আমরা একে বিনয় বোল্‌তে পারিনে।'[৪৫] এমনও মনে করা যেতে পারে, 'য়ুরোপ-প্রবাসী-র...' চতুর্থ পত্রের শেষে [দ্র পৃ ৪৮-৪৯] মানবমনের যে বিচিত্র গতিপ্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন সেইটিই তাঁকে বিস্তৃতভাবে নিন্দার তত্ত্ব বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত করিয়েছিল।

ভারতী, কার্তিক ১২৮৬ *[৩/৭]:*

২৯৬-৩০৪ 'য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র' দ্র য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র। ১২৯-৪১ [৮ম পত্র]।

পত্রটি গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সময়ে ক্রম বদল করলেও, ভারতী-তে ৬ষ্ঠ পত্র-রূপে মুদ্রিত হয়। ফলে একটি বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবকাশ আছে। পত্রটি শুরু হয়েছে : 'আমি বিলিতি মেয়েদের একটু নিন্দে করে লিখেছিলুম বলে বুঝি সেটা ভালো লেগেছে'—এটি পড়ে ভারতী-র পাঠকদের পক্ষে এবং যাঁরা প্রথম প্রকাশের ক্রম অনুসারে পত্রগুলি পড়তে যাবেন তাঁদের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে শ্রাবণ-সংখ্যায় প্রকাশিত পত্রটিই [৩য় পত্র] বুঝি উক্তিটির লক্ষ্য। কিন্তু আমাদের ধারণা, অগ্রহায়ণ-সংখ্যায় মুদ্রিত পত্রের [৬ষ্ঠ পত্র] বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করেই মন্তব্যটি করা হয়েছে—সুতরাং ধারাবাহিক পাঠকদের পক্ষে বিভ্রান্তিকর এবং সেইজন্যই গ্রন্থপ্রকাশের সময়ে রবীন্দ্রনাথ সঠিক ক্রমটি রক্ষার তাগিদে পত্রটির স্থান পরিবর্তন করেছেন। কিন্তু তাতেও সমস্ত দিক রক্ষিত হয়েছে বলে মনে হয় না। কারণ, আমাদের অনুমান, গ্রন্থভুক্ত ষষ্ঠ পত্রটির প্রথমাংশ ব্রাইটনে বসে লেখা; কিন্তু শেষাংশের picnic party-র বর্ণনা যে একই কালে সেইখানেই লিখিত হয়েছিল, এ-সম্পর্কে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক, ম—[? মতিলাল গুপ্ত] বা ক—[? কৃষ্ণনাথ মিত্র] মহাশয় প্রভৃতি ইংলণ্ড-প্রবাসী বাঙালিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্রাইটনে পরিচয় [ও অন্তরঙ্গতা] হয়েছিল, একথা বিশ্বাস্য মনে হয় না। সুতরাং সিদ্ধান্ত করতে হয়, ভারতী-তে প্রকাশের সময় সম্পাদকমণ্ডলী পত্রগুলির কিছু সম্পাদনা করেছিলেন অর্থাৎ কখনো কখনো বিভিন্ন সময়ে লিখিত একাধিক পত্র জুড়ে দিয়ে একটি পত্রের আকার দিয়েছেন এবং সেক্ষেত্রে কালানুক্রমও রক্ষা করেন নি। এর উদাহরণ আমরা শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যায় মুদ্রিত পত্র-দুটির ক্ষেত্রেই পেয়েছি। আবার বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত পত্রের শেষাংশে যেখানে Mr. B-এর কথা লেখা হয়েছে, সেটি একটি স্বতন্ত্র পত্র বলেই আমাদের মনে হয়।

৩১৭-২৩ 'সম্পাদকের বৈঠক'

বর্তমান সংখ্যায় মোট ১৭টি অনুবাদ-কবিতা ও গান মুদ্রিত হয়েছে, এর সবগুলিই যে রবীন্দ্রনাথের রচনা তা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করার পক্ষে যথেষ্ট তথ্য নেই; কিন্তু এদের অনেকগুলিই রবীন্দ্ররচনা বলে চিহ্নিত হওয়ায় বাকিগুলিও তাঁর রচিত বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

৩১৭ 'বৃদ্ধ কবি।/ভূপালী রাগিণী'/মন হোতে প্রেম যেতেছে শুকায়ে' [Translated from an English translation of the poem,/by Talharian the Welsh poet.'] দ্র গীতবিতান ৩। ৮৭১; রবিচ্ছায়া [বিবিধ ৬৫]। ৫৯—কিন্তু এখানে সুরের উল্লেখ নেই। স্বরলিপিও নেই।

৩১৭ 'বেহাগ/জাগি রহে চাঁদ আকাশে যখন'

৩১৮ ‘পূরবী।/পাতায় পাতায় দুলিছে শিশির’ [‘Translated from an English translation of an Irish song.’]

৩১৮ ‘পিলু। বল, গো বালা, আমারি তুমি’ [‘Moore’s Irish Melodies’] দ্র গীতবিতান ৩। ৮৭১; রবিচ্ছায়া [বিবিধ ১৭]। ১২; গান [1909]। ১৯৭—এখানে সুরের উল্লেখ আছে ‘ভৈরবী-ঝাঁপতাল’, কিন্তু সুরটি সংরক্ষিত হয় নি। Moore-এর ‘Love’s Young Dream’ কবিতার প্রথম ও শেষ স্তবকের অনুবাদ, মূল রচনাটির প্রাসঙ্গিক অংশ গীতবিতান-এর ‘গ্রন্থপরিচয়’ [পৃ ১০০৫] অংশে উদ্ধৃত হয়েছে।

৩১৯ ‘রূপসী আমার, প্রেয়সী আমার’ [‘Burns’]

৩১৯-২০ ‘সুশীলা আমার, জানালার পরে’ [‘Burns’]

৩২০ ‘কোরনা ছলনা, কোরনা ছলনা’ [‘Chappel’]

৩২০ ‘চপলারে আমি অনেক ভাবিয়া’

৩২১ ‘রাখ মোর কথা, সখা, ভুলে যাও তারে’

৩২১ ‘না, সখা, মনের ব্যথা কোরনা গোপন!’ দ্র গীতবিতান ৩। ৭৭৪; রবিচ্ছায়া [বিবিধ ৯৯]। >৫১—‘ইমন কল্যাণ—কাওয়ালি’ সুর-নির্দেশ থাকলেও সুরটি সংরক্ষিত হয় নি।

৩২১ ‘ভৈরবী—ঝাঁপতাল।/‘কাছে তার যাই যদি, কত যেন পায় নিধি’ দ্র গীতবিতান ৩। ৭৭২; রবিচ্ছায়া [বিবিধ ১০২]। ৮৫—এখানে সুর-নির্দেশ : ‘টোড়ি—ঝাঁপতাল’, কিন্তু স্বরবিতান ২০-তে ইন্দিরা দেবী-কৃত স্বরলিপি ‘জয়জয়ন্তী। কাহারবা’ সুর-তালে গ্রথিত। গানটি ভগ্নহৃদয় [১২৮৮] কাব্যের ৭ম সর্গে অনিলের গান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে [দ্র অ-১। ১৮১-৮২], আবার ‘লাজময়ী’ শিরোনামে শৈশবসঙ্গীত [১২৯১] গ্রন্থেও সংকলিত হয়, [দ্র অ-১। ৪৯৩-৯৪] সুর-তাল নির্দেশ নেই, কিছু পাঠভেদও দেখা যায়। ৩২১ ‘দেশ।/বুঝেছি বুঝেছি সখা, ভেঙ্গেছে প্রণয়’ দ্র গীতবিতান ৩। ৭৭৪-৮৫; স্বপ্নময়ী নাটকে তৃতীয় অঙ্ক ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কে সুমতির গান, সেখানে সুর-নির্দেশ : ‘রাগিণী। ভৈরবী’; রবিচ্ছায়া [বিবিধ ৯৮]। ৮১, সুর-তাল : ‘মিশ্র পিলু—আড়াঠেকা’, ইন্দিরা দেবী-কৃত স্বরলিপিতে [স্বরবিতান ২০] এই সুরটিই রক্ষিত হয়েছে; ভগ্নহৃদয়-এর ঊনবিংশ সর্গে ললিতার গান হিসেবে ব্যবহৃত [দ্র অ-১। ২৩৭-৩৮]। বিভিন্ন গ্রন্থে কিছু কিছু পাঠভেদ দেখা যায়।

৩২২ ‘এখন ত আর নাই কোনো আশা’ [‘Lord Cantalupe’]

৩২২ ‘প্রেমতত্ত্ব।/নিঝর মিশিছে তটিনীর সাথে’ [‘Shelley’]—‘Love’s Philosophy’ কবিতার অনুবাদ। কোনো সুর-নির্দেশ না থাকলেও রবিচ্ছায়ার ‘বিবিধ সঙ্গীত’ বিভাগে [৯ সংখ্যক, পৃ ৬-৭] সংকলিত হয়েছিল, পরে আর কোথাও পুনর্মুদ্রিত হয় নি।

৩২২ ‘নলিনী।/লীলাময়ী নলিনী’ [‘Tennyson’]

৩২২-২৩ ‘কি করিব বল, সখা, তোমার লাগিয়া?’ দ্র গীতবিতান ৩। ৭৭৪; ভগ্নহৃদয়-এর ত্রয়োদশ সর্গে ললিতার গান রূপে ব্যবহৃত হয়েছে [দ্র অ-১। ২১৩]; রবিচ্ছায়া [বিবিধ ৫৪]। ৫১, সুর-তাল ‘মিশ্র ইমন কল্যাণ—কাওয়ালি’ নির্দেশিত হলেও সুরটি রক্ষিত হয় নি।

আমাদের অনুমান, এই গান ও অনুবাদগুলি বিলাত-প্রবাসকালেই রচিত হয়েছিল। গানগুলির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য এই যে, এদের মধ্যে অনেকগুলিতেই সুরের নির্দেশ আছে—কিন্তু সেগুলিই যখন স্বপ্নময়ী-তে বা রবিচ্ছায়া-য় গৃহীত হয়েছে [কতকগুলির সে-সৌভাগ্য ঘটে নি] তখন প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সুরের পার্থক্য দেখা যায়। এর থেকে মনে হয় ইংলণ্ডে অবস্থান-কালে রচিত এই গানগুলিতে রবীন্দ্রনাথ প্রথমে নিজেই সুর দিয়েছিলেন, কিন্তু দেশে ফেরার পর তিনি সুরগুলি ভুলে গিয়েছিলেন নতুবা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহায়তায় সেগুলিতে নতুন সুর যোজনা করা হয়। এমন-কি স্বপ্নময়ী নাটকে নির্দেশিত সুরও রবিচ্ছায়া-য় পরিবর্তিত হয়েছে, কোথাও আবার স্বরবিতান-এ সংকলিত সুরও ভিন্নতর।

ভারতী, অগ্র° ১২৮৬ *[৩।৮]:*

৩৪৮-৬৫ 'য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র' দ্র য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র। ৮৪-১০৯ [৬ষ্ঠ পত্র]

পূর্ববর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত পত্রের আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা এই পত্রটি সম্পর্কেও আলোচনা করেছি। এর অন্তত প্রথমাংশটি অগ্রহায়ণ ১২৮৫ [Nov-Dec 1878] নাগাদ লেখা। পত্রটির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, এতে প্রকাশিত স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যকে কেন্দ্র করে সম্পাদকীয় টীকার মাধ্যমে বিতর্কের সূচনা করা হয়। রবীন্দ্রনাথ এই সমালোচনার যে উত্তর দেন, সেটি প্রকাশিত হয় ফাল্গুন সংখ্যায় [মুদ্রিত গ্রন্থে ৭ম পত্র]। এক শতাব্দীর পরপার থেকে আমরা এই বিতর্কের বিষয়টির প্রতি কৌতুকের দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে পারি এবং আমাদের সর্বাত্মক সমর্থন যে রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই পড়বে, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ভারতী-সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ যে দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিচার করেছিলেন, সেটিও এখানে উল্লেখ করার যোগ্য। ইঙ্গবঙ্গদের কথা ছেড়ে দিলেও, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে ইংরেজের অনুকরণে একধরনের বাড়াবাড়ি রকমের স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রবর্তিত হয়েছিল যা দেশের বিভিন্ন মহলে সমালোচিত হচ্ছিল। আমরা আগেই দেখেছি, আদি ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ ছিল রক্ষণশীলতা ও প্রগতিশীলতা উভয়ের আত্যন্তিকতার একটি মধ্যবর্তী পথ অনুসরণ। আর সেই কারণে কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্রে প্রগতিশীল মতামতের বাহুল্য দর্শন করেই দ্বিজেন্দ্রনাথ, বলতে গেলে আদি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকেই সমালোচনামূলক টীকা জুড়ে দেবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন। তত্ত্ববোধিনী-র অগ্রহায়ণ ১৮০০ শক [১২৮৫, পৃ ১৫৪-৬০] সংখ্যায় 'স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধেও সদৃশ মতামত প্রকাশিত হয়েছিল, এই তথ্যটিও স্মরণীয়। অবশ্য এই বিতর্কে সম্পাদকের পক্ষ থেকে যে মত ব্যক্ত হয়েছিল, দ্বিজেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত মতও যে তার থেকে বিশেষ পৃথক ছিল না তার প্রমাণ পাওয়া যায় বহুদিন পরে ১২৯৭ বঙ্গাব্দে চৈতন্য লাইব্রেরি সভার বিশেষ অধিবেশনে পঠিত তাঁর 'আর্য্যামী এবং সাহেবিআনা' প্রবন্ধে [দ্র প্রবন্ধমালা। ১০৩-৪৮]। এই পত্রে ইংলণ্ডের নিমন্ত্রণসভা-সম্পর্কে যে মন্তব্য রবীন্দ্রনাথ করেছেন, পরবর্তীকালে সেই বিষয়টি নিয়েই তিনি 'নিমন্ত্রণসভা' [দ্র ভারতী, আষাঢ় ১২৮৮। ১৩৯-৪৫] নামে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটি বর্তমান পত্রের পরিশিষ্ট হিসেবে গণ্য হতে পারে।

ভারতী, পৌষ ১২৮৬ *[৩।৯]:*

৩৮৪-৪১১ 'য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র' দ্র য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র। ১৪১-৬৭ [৯ম পত্র]

এই চিঠিটিতে যদিও ব্রাইটনের কথা আছে তবু এটি সেখানে বসে লেখা নয়, কেননা এখানে যে-ধরনের মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে বিলিতি সমাজের মধ্যে দীর্ঘদিন বসবাস করার পরই তা করা সম্ভব। আবার চিঠির মধ্যে সু—[সুরেন্দ্রনাথ] ও বি—[বিবি, ইন্দিরা দেবী]-র যে রকম প্রত্যক্ষ উপস্থিতির বর্ণনা আছে তাতে মনে হয় Torquay-তে সত্যেন্দ্রনাথদের সঙ্গে অবসর-যাপনের সময়ই পত্রটি লিখিত হয়েছিল। এই পত্রটিও ভারতী-সম্পাদকের পাদটীকায় কণ্টকিত। যে দুটি বিষয় নিয়ে উভয় ভ্রাতার মধ্যে বিতর্ক চলেছিল তার একটির সূচনা গত সংখ্যায় প্রকাশিত পত্রে ব্যক্ত স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ক রবীন্দ্রনাথের মতামতকে কেন্দ্র করে, বর্তমান পত্রে অপর বিষয়টির অবতারণা হয়েছে পরিবারে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের মধ্যে আদর্শ সম্পর্ক অবলম্বন করে—প্রসঙ্গক্রমে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কের কথাও এসেছে। মনে হয়, যে ধরনের কঠোর শাসনের মধ্যে দিয়ে তাঁর বাল্যকাল অতিবাহিত হয়েছিল তার সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ-ইন্দিরার ও অন্যান্য ইংরেজ বালক-বালিকার বাল্যকালের তুলনা করে তিনি দেশীয় সমাজে প্রচলিত 'পারিবারিক দাসত্ব' সম্পর্কে একটি ধারণা গড়ে তুলেছিলেন। এই পত্রে তিনি লিখেছেন, 'আমি যখন টর্কিতে ছিলুম তখন একটি ছেলে আমার সঙ্গে খুব ভাব করে নিয়েছিল; পৃথিবীর যা-কিছু দেখত তাই যেন তার ভারী আশ্চর্য লাগত, প্রতি পদে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করে আমাকে ভারী মুশকিলে ফেলত—তার কৌতূহলের আর আদি অন্ত নেই।'[৪৬] বাল্যকালে এইভাবেই রবীন্দ্রনাথের মনে বিভিন্ন প্রশ্ন ও কৌতূহল গুঞ্জরিত হত, কিন্তু তার নিবৃত্তি কী করে হত পড়ার ঘরের এক কোণে তৈরি নকল পাহাড়ের পরিণতির বর্ণনা থেকেই তা আমরা বুঝতে পারি। তিনি আরও লিখেছেন, 'আমি এখানকার একটা প্রাইবেট স্কুল দেখেছিলেম—মাস্টার ছেলেদের সঙ্গে ঠাট্টাঠুট্টি করেন, খেলা করেন, কত যে স্বাধীনতা দেন তার ঠিক নেই; অথচ তাতে কিছু তাদের 'মাথা-খাওয়া' হয় নি, পড়াশুনোতে তাদের কিছু মাত্র ত্রুটি নেই।'[৪৭] এর পাশাপাশি আমরা গর্বমেণ্ট পাঠশালার হরনাথ পণ্ডিতের শিক্ষাদান-পদ্ধতির কথা স্মরণ করতে পারি। দ্বিজেন্দ্রনাথ এই সব মতামতেরও সমালোচনা করেন। কিন্তু স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রসঙ্গে উভয়ের তর্কবিতর্ক যেমন কয়েকটি পত্র জুড়ে চলেছে, বর্তমান বিষয় নিয়ে বিতর্কের ক্ষেত্রে তেমন ঘটে নি—তা এই একটি পত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। অবশ্য বেশ কিছুদিন পরে চৈত্র ১২৮৭-সংখ্যা ভারতী-তে [পৃ ৫৫৩-৬৪] রবীন্দ্রনাথ 'পারিবারিক দাসত্ব'-শীর্ষক একটি প্রবন্ধে বিষয়টি খুব তীব্রভাবে উপস্থাপিত করেন এবং যথারীতি দ্বিজেন্দ্রনাথও 'উপরের প্রস্তাব উপলক্ষে সম্পাদকের মন্তব্য' [পৃ ৫৬৪-৬৮] নামে সেই বক্তব্যের সমালোচনা করেন। উক্ত প্রবন্ধ ও মন্তব্যটিকে আমরা 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র'-এর পরিশিষ্ট হিসেবে গণ্য করতে পারি।

মাঘ ১২৮৬-সংখ্যা [৩।১০] ভারতী-তে রবীন্দ্রনাথের কোনো রচনা প্রকাশিত হয় নি।

ভারতী, ফাল্গুন ১২৮৬ *[৩।১১]:*

৫১২ 'প্রেম মরীচিকা' ['ও কথা বোল না তারে'] দ্র শৈশবসঙ্গীত অ-১। ৪৯৪-৯৫; গীতবিতান ৩। ৮৭৫

ভারতী-তে প্রকাশের সময়েই এর সুর নির্দেশ করা হয়েছে 'ঝিঁজিট খাম্বাজ', রবিচ্ছায়া [বিবিধ, ৪৪ সংখ্যক, পৃ ৪১]-তে ও শৈশবসঙ্গীত-এও একই সুর-নির্দেশ রয়েছে—কিন্তু গানটির সুর স্বরলিপিতে সংরক্ষিত হয় নি। ভারতী ও শৈশবসঙ্গীত-এ চারটি ছত্র অতিরিক্ত দেখা যায়। গানটির রচনাকাল ও স্থান নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা কঠিন, কিন্তু মনে হয় বিলাতপ্রবাসকালে রচিত।

৫১৩-২৫ 'য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র' দ্র য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র। ১১০-২৮ [৭ম পত্র]

অগ্রহায়ণ-সংখ্যায় প্রকাশিত পত্রে [ষষ্ঠ পত্র] ভারতী-সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ যে সমালোচনামূলক টীকা যোগ করেছিলেন বর্তমান পত্রটি তারই উত্তর, সুতরাং অনুমান করা যায় পৌষ ১২৮৬ [Dec 1879-Jan 1880]-র কোনো সময়ে লণ্ডনেই এটি রচিত হয়েছিল। এই বিতর্ক যে অনেকের মধ্যেই সরস কৌতূহল জাগিয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় *The Sunday Mirror* [Vol. XX, No. 87, Apr 11, 1880]-এর একটি গ্রন্থ-সমালোচনায় : 'There is an amusing controversy carried on—we suspect by brothers of the same family—on female improvement and emancipation. The temper is happily preserved on both sides, while considerable flashes of witticism serve to render the perusal a highly edifying one.' কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে খুব নম্রভাবে প্রতিবাদ করেছিলেন, তা নয়। আর সেই কারণেই তিনি প্রথমেই টীকাটি সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথের লিখিত কি না সে-সম্পর্কে সন্দেহ ব্যক্ত করে ঔদ্ধত্য-প্রকাশের দোষ ক্ষালন করবার চেষ্টা করেছেন : 'তিনি যে সেটা লেখেন নি তার প্রধান প্রমাণ হচ্ছে এই যে, সম্পাদক-মহাশয়ের গাম্ভীর্য এতদূর বিচলিত হতে আর কখনো দেখি নি; দ্বিতীয়তঃ যে-সকল যুক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে তা সম্পাদক-মহাশয়ের লেখনীর অযোগ্য। খুব সম্ভব, কোনো উদ্ধত যুবক সম্পাদকের ক্ষমতা নিজের তরুণ স্কন্ধে গ্রহণ করে ভারতীর এক কোণে অলক্ষিত ভাবে এই নোটটি গুঁজে দিয়েছেন'[৪৮] এবং সম্পূর্ণ উত্তরটি রচনা করেছেন এক কল্পিত 'লেখক-মহাশয়'-কে উদ্দেশ করে। অথচ দ্বিজেন্দ্রনাথের গদ্যভাষার সঙ্গে পরিচিত যে-কেউ—অন্তত রবীন্দ্রনাথ তো বটেই—টীকাটিকে তাঁর রচনা বলে সনাক্ত করতে পারবেন। এই পত্রের উপরেও দ্বিজেন্দ্রনাথ টীকা রচনা করেছিলেন এবং দেখা যায় তিনিই আগাগোড়া একটি লঘু মেজাজ রক্ষা করে গেছেন—প্রায় একুশ বছরের ছোটো পুত্রোপম কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সম-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে তাঁর সঙ্গে তর্ক করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সেই টীকারও প্রত্যুত্তর দিয়েছেন বৈশাখ ১২৮৭ সংখ্যায় [১০ম পত্র], তখন অবশ্য তিনি দেশে ফিরে এসেছেন।

ভারতী-র চৈত্র ১২৮৬ [৩।১২] সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের কোনো রচনা প্রকাশিত হয় নি।

কিন্তু দেশে ফেরার আগেই পুস্তকাকারে মুদ্রিত তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বনফুল' প্রকাশিত হয়; বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকা অনুযায়ী প্রকাশের তারিখ 9 Mar 1880 [মঙ্গল ২৭ ফাল্গুন ১২৮৬]। সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় গ্রন্থটি প্রথম আত্মপ্রকাশ করলেও পুস্তকাকারে এটি কবিকাহিনী-র পরে প্রকাশিত হয়। আমরা আগেই বলেছি, বন্ধু প্রবোধচন্দ্র ঘোষের আগ্রহে ও চেষ্টায় কবিকাহিনী মুদ্রিত হয় [5 Nov 1878]। বনফুল-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি-র পাণ্ডুলিপিতে লিখেছেন, '....বছর তিন চার পরে দাদা সোমেন্দ্রনাথ অন্ধ পক্ষপাতিত্বের উৎসাহে এটি গ্রন্থ আকারে ছাপাইয়াও ছিলেন।' সোমন্দ্রনাথের সঙ্গে কাব্যগ্রন্থটির যোগাযোগের আর একটি উদাহরণ দেওয়া যায় ক্যাশবহি-র ৩ চৈত্র [সোম 15 Mar]-এর একটি হিসাব থেকে : '১ চৈত্রের খরচ—/শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের নিকট সোমবাবুর এক পত্র/ও সোমবাবুর দেওয়া বনফুল নামক পুস্তিকা/ পাঠানর টিকিট ব্যয়৴০'। বিলাত-প্রত্যাগত ভাইকে আশ্চর্যান্বিত ও আনন্দিত করার অভিপ্রায়ই হয়তো সোমেন্দ্রনাথের মনে কার্যকরী হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের বিলাত-গমন ও প্রত্যাবর্তন দুটি গ্রন্থপ্রকাশের দ্বারা চিহ্নিত, এই যোগাযোগ নিছক কাকতালীয় নয় বলেই মনে হয়।

গ্রন্থটির আখ্যাপত্রে আছে:

'বন-ফুল।/কাব্যোপন্যাস।/ "অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈঃ।"/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।/ শ্রীমতিলাল মণ্ডল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।/গুপ্তপ্রেশ;/২২১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট;—কলিকাতা।/১২৮৬ সাল।'

বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকা থেকে জানা যায়, বইটির মুদ্রণসংখ্যা ছিল ১০০০ এবং মূল্য আট আনা। এছাড়া গ্রন্থের চতুর্থ পৃষ্ঠায় [।০]। 'বিজ্ঞপ্তি'তে জানানো হয়েছে : 'কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরী ও চিনাবাজার পদ্মচন্দ্র নাথের/দোকানে প্রাপ্তব্য।'

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ তাঁর 'রবীন্দ্র-পরিচয়' প্রবন্ধে গ্রন্থটির বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন:

'পুস্তক-পরিচয়/বনফুল বইখানি সাড়ে ছয় ইঞ্চি লম্বা, চার ইঞ্চি চওড়া (৬॥""৪"), ডিমাই ১২ পেজি, ৮ ফর্ম্মা ২ পৃষ্ঠা, ইংলিশ অক্ষরে ২০ এম্-এ কম্পোজ, প্রত্যেক পৃষ্ঠায় কুড়ি লাইন ছাপা। কাগজের মলাট, এক পৃষ্ঠা নামপত্র (title page) + এক পৃষ্ঠা অশুদ্ধ সংশোধন + ৯৩ পৃষ্ঠা। উৎসর্গপত্র নাই।'[৪৯]

প্রশান্তচন্দ্র লিখেছিলেন, 'মোট ১৫৮২ [১৬৭৯] লাইনের মধ্যে এক লাইনও পুনর্মুদ্রিত হয় নাই বা কাব্যগ্রন্থাবলীর কোন সংস্করণে স্থান পায় নাই।' পরে অবশ্য সজনীকান্ত দাস ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ : প্রথম খণ্ড [আশ্বিন ১৩৪৭]-তে গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রিত হয়। কাব্যটি সম্পর্কে অন্যান্য আলোচনা আমরা যথাস্থানে করেছি।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত কাব্যগ্রন্থ 'কবি কাহিনী' প্রকাশের পর 'পূর্ব বঙ্গের বিদ্যাসাগর' বলে খ্যাত 'বান্ধব'-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ কাব্যটির একটি অনুকূল সমালোচনা প্রকাশ করেন [মাঘ ১২৮৫। ৪৬৪-৬৭]। বর্তমান কাব্যটি সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয় *The Sunday Mirror* [Vol, XX, No. 134, Jun 6 1880, p. 5] পত্রিকায়। এটি লিখেছিলেন সম্ভবত সম্পাদক কৃষ্ণবিহারী সেন। সমালোচনাটি দুষ্প্রাপ্য বলে এটি আমরা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করছি:

BANAFULA. */This book, we believe, first appeared in the pages of the Jnankur. It is well that it has been exhumed from the catacomb of a defunct journal and brought to the light of the day to live a new life and run a large currency. Indeed it is too good a book to be lost that way. Slender in structure as it is, it is full of spirit, elegance, and lyrical beauty. The style is clear and the versification melodious and unaffected. Some of the descriptions are, indeed, very vigorous. The beginning of the third canto, the closing lines of the second, where the heroine bids farewell to her mountain home, as well as those where she puts an end to her unhappy existence, clearly evidence the power the author has of giving faultless expressions to lyrical moments.

It is a simple love story. The plot, however, does not possess much dramatic interest. It is based upon the love course of an unsophisticated little girl brought up by her father in all ignorance of the world and its ways, away in their mountain home on the Himalayas. The divine image of Miranda, it seems, has suggested this portrait, which though not strictly

original, still claims some distinctive charms of its own. The other three characters are unimportant, and remain all the while on the background.

Mr. Tagore, we know, is still a very young man, and his book, excellent as it is in many respects, bears evidence enough of this fact. The exuberance of emotional outbursts and the consequent absence of the poetry for sobre feeling and meditative calm and the excessive richness of coloring are faults which are incidental to youth, which, we doubt not, will disappear with years. He is a poet of still greater promise than performance. Young as he is, he has the sacred fire within him.

*Banafula, by Rabindra Nath Tagore. Printed and published by Matilal Gupta, Gupta Press.

যদিও রবীন্দ্রনাথ কোথাও সমালোচনাটির উল্লেখ করেন নি, তবু এটি নিশ্চয়ই তাঁর চোখে পড়েছিল এবং আশা করি এটি তাঁর ক্ষোভের কারণ হয় নি।

সোমপ্রকাশ [২৩।১৪, ৫ শ্রাবণ ১২৮৭] 'বনফুল (কাব্য)'-এর প্রাপ্তিস্বীকার করেছে, কিন্তু গ্রন্থটি সমালোচিত হয়েছিল কিনা আমরা জানতে পারি নি।

এরই মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আর একটি কাব্য রচিত হচ্ছিল। তিনি লিখেছেন, 'বিলাতে আর-একটি কাব্যের পত্তন হইয়াছিল। কতকটা ফিরিবার পথে কতকটা দেশে ফিরিয়া আসিয়া ইহা সমাধা করি। ভগ্নহৃদয় নামে ইহা ছাপানো হইয়াছিল'।[৫০] শান্তিনিকেতন-রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপিতে [অভিজ্ঞান-সংখ্যা : ৯৩] দ্বিতীয় সর্গ [রবীন্দ্রনাথ প্রথমে 'অঙ্ক' লিখেছিলেন]-টির সূচনায় পৃষ্ঠার উপরে লিখিত আছে—'S.S. Oxus/February/1880'। আমরা জানি, Feb 1880-র শেষ দিকে তিনি Oxus ষ্টীমশিপে ফ্রান্সের Nice শহর থেকে ভারতাভিমুখে যাত্রা করেন। সুতরাং উপরোক্ত নির্দেশ থেকে বোঝা যায় দ্বিতীয় সর্গটি উক্ত জাহাজে ওই সময়ে লেখা। প্রথম সর্গটি বিলাত-প্রবাসকালেই লিখিত হয়েছিল। কিন্তু এই সমস্ত স্থান-কালের বিবরণ প্রকৃতপক্ষে ভগ্নহৃদয়-এর উক্ত পাণ্ডুলিপিটির ক্ষেত্রেই শুধু প্রযোজ্য। কারণ এই কাব্যের প্রকৃত সূচনা বহু পূর্বে —সম্ভবত আমেদাবাদে থাকার সময়ে কিংবা তারও আগে।[*] কাব্যে ব্যবহৃত অনেকগুলি গান ও কবিতার খসড়া মালতীপুঁথি-তে পাওয়া যায়, কতকগুলি ইতিপূর্বেই ভারতী-তে প্রকাশিত হয়েছিল। এইজন্যই মনে হয়, কাব্যটির একটি অস্পষ্ট ধারণা হয়তো অনেক দিন আগেই তাঁর মনে গড়ে উঠেছিল, তারপর বিভিন্ন সময়ে টুকরো টুকরো কবিতা ও গান মালতীপুঁথি-র পৃষ্ঠায় বা অন্যত্র তিনি রচনা করেছিলেন—বিলাত-প্রবাসের শেষ পর্বে গল্পের একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো কল্পনা করে নূতন কবিতা ও গান রচনার সঙ্গে পূর্বলিখিত গানগুলিও প্রয়োজনমতো তাতে সন্নিবেশিত করেছেন। এইভাবে লিখিত যে-ক'টি গান ভগ্নহৃদয়-এ গৃহীত হয় নি, পরবর্তীকালে তার বেশির ভাগ 'রবিচ্ছায়া' গ্রন্থে 'বিবিধ' বিভাগে স্থান লাভ করেছে। গীতবিতান ৩য় খণ্ডের 'গ্রন্থপরিচয়'-এ কানাই সামন্ত যে লিখেছেন, 'ইহার মধ্যে যেগুলি প্রেমের গান তাহাতে আবার প্রায়শই একটি 'নাটকীয়তা'ও দেখা যায়।...[এগুলি] যে ঐরূপ কেন তাহা আজও গবেষকগণের অনুসন্ধান-সাপেক্ষ বলা চলে' [পৃ ১০০৪]—তার কারণ এইটিই বলে মনে করি। ভগ্নহৃদয় নাটকের আকারে লেখা কাব্য—সুতরাং তার

জন্য লেখা গানগুলিতে একটি কথোপকথনের ভাব থাকাই স্বাভাবিক; কিন্তু যে-গানগুলি শেষপর্যন্ত কাব্যে গৃহীত হয় নি, প্রসঙ্গচ্যুত হওয়ার ফলে সেগুলির মধ্যে 'নাটকীয়তা'র সূত্রটি ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য মালতীপুঁথি-র 70/৩৬খ পৃষ্ঠাটিকে উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যাক। এই পৃষ্ঠায় অনেকগুলি গান লিখিত হয়েছিল, তাদের প্রথম ছত্রগুলি ও পরবর্তী সংকলনের বিবরণ দেওয়া হল:

(১) 'ভাল যদি বাস সখি কি দিব গো আর' দ্র রবিচ্ছায়া [বিবিধ ৪৮]।৪৪; গীতবিতান ৩।৭৭৯

(২) 'ওই কথা বল সখা বল আর বার' দ্র 'ভগ্নতরী', ভারতী, আষাঢ় ১২৮৬।১২৪-২৫; রবিচ্ছায়া [বিবিধ ৩৮]। ৩৫; গীতবিতান ৩।৮৭৪

(৩) 'ও কথা বোল না সখি—প্রাণে লাগে ব্যথা'

(৪) 'কতদিন একসাথে ছিনু ঘুমঘোরে' দ্র ভগ্নহৃদয় অ-১। ১৩৯, ১ম সর্গে মুরলার গান

(৫) 'কি হবে বল গো সখি ভালবাসি অভাগারে'

এই কবিতা বা গানগুলির প্রত্যেকটিতেই 'নাটকীয়তা' রয়েছে অর্থাৎ এগুলি উক্তি-প্রত্যুক্তির ঢঙে রচিত, কিন্তু এদের মধ্যে মাত্র দ্বিতীয়টি 'ভগ্নতরী' গাথায় ও চতুর্থটি ভগ্নহৃদয় কাব্যে গৃহীত হয়েছে, অপর তিনটির মধ্যে শুধু প্রথম দুটি পরে রবিচ্ছায়া-য় সংকলিত হয়—অন্য দুটি সম্পূর্ণ বর্জিত। একই সময়ে লিখিত 69/৩৬ক পৃষ্ঠার দুটি গান 'গা সখি গাইলি যদি আবার সে গান রে' [রবিচ্ছায়া। ১৪, বিবিধ ২১] ও 'সেই যদি সেই যদি ভাঙিল এ পোড়া হৃদি' [রবিচ্ছায়া। ৪৩, বিবিধ ৪৭] পরে গীতগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে, কিন্তু 71/৩৭ক পৃষ্ঠার 'এ হতভাগারে ভাল কে বাসিতে চায়?' ও 'জানি সখা অভাগীরে ভাল তুমি বাসনা' গান বা কবিতা-দুটির সে সৌভাগ্য হয় নি—যদিও সবগুলির মধ্যেই একই ধরনের নাট্যরস রয়েছে। মালতীপুঁথি থেকে এইরূপ আরও উদাহরণ সংকলন করা যেতে পারে। এগুলির আরও একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য মালতীপুঁথি-র 'সখা' ও 'সখী' অনেক ক্ষেত্রেই চরিত্রের প্রয়োজনে যথাক্রমে 'সখী' ও 'সখা'-য় পরিবর্তিত হয়েছে, যা আমাদের সিদ্ধান্ত সমর্থন করে।

এখানে আর-একটি বিষয় বিবেচ্য। ভগ্নহৃদয়-এর উপরোক্ত ৯৩-সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে 'আননের দুই পাশ অবদ্ধ কুন্তলরাশ' ছত্রটির [দ্র ভগ্নহৃদয় অ-১। ১৭০, ষষ্ঠ সর্গে কবির উক্তি] পাশে 'Steamer' কথাটি ও 'কবি —একটি প্রাণের কথা রোয়েছে গোপনে' [দ্র ঐ। ১৭১, ঐ] ছত্রটি পাশে 'Bulpore May/1880 উল্লেখটি পাওয়া যায়। এর থেকে অনুমান করা চলে, ষষ্ঠ সর্গের কিছুদূর পর্যন্ত বিলাত-প্রত্যাবর্তন-পথে ষ্টীমারেই রচিত হয়েছিল, এর পর কিছুদিন স্থগিত থেকে May 1880-তে রবীন্দ্রনাথ যখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে বোলপুরে যান তখন পরবর্তী অংশ লেখা শুরু হয়। বিষয়টি নিয়ে আমরা পরে আবার আলোচনা করব।

রবীন্দ্রনাথ বিলেত থেকে সিভিল সার্ভিস বা ব্যারিস্টারি পরীক্ষা পাস করে আসতে পারেন নি কিংবা কোনো ডিগ্রিও নিয়ে আসেন নি, সুতরাং বস্তুগত দিক থেকে তাঁর দেড় বছরের কিছু বেশি সময়ের বিলাতপ্রবাস ব্যর্থই হয়েছে বলা চলে। কিন্তু স্থূল দেনা-পাওনার হিসেব দিয়ে জীবনের সার্থকতা-অসার্থকতার পরিমাপ করা সবসময় সম্ভব হয় না। বিলাতপ্রবাসের কথা দিয়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ বয়সে লেখা আত্মকথা 'ছেলেবেলা' সমাপ্ত করেছেন—যার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এই যে তাঁর মনের বাল্যাবস্থা এরই ফলে কেটে গিয়েছিল। সেখান থেকে যখন তিনি ফিরে এসেছেন, তখন শুধু তাঁর গানের গলা বা 'কথা কহিবার গলারও

একটু কেমন সুর বদল' হয় নি, তাঁর ব্যক্তিত্বটিও একটু নতুন রকমের হয়ে উঠেছিল। যে মূর্তিকারের হাতে বাংলাদেশের মাটি দিয়ে তাঁর চেহারার আদল তৈরি হয়ে উঠেছিল তাতে মিশ্রণ বিশেষ ছিল না, 'তার মালমসলা নিজের মধ্যেই জমা ছিল, আর কিছু কিছু ছিল ঘরের হাওয়া আর ঘরের লোকের হাতে।'[৫১] কিন্তু বিলেতে পৌঁছবার পর 'জীবনগঠনে আরম্ভ হল বিদিশি কারিগরি—কেমিস্ট্রিতে যাকে বলে যৌগিক বস্তুর সৃষ্টি।'[৫২] স্কুলমহলের আশেপাশে ঘুরে লাভের খাতায় যতটুকু জমা পড়েছে তার পরিমাণ বেশি নয়—কিন্তু মানুষের কাছাকাছি থেকে ও ইংরেজের হৃদয়ের নৈকট্য পেয়ে তাঁর বাংলাদেশী চেহারায় মিশেছে নতুন নতুন মালমশলা, সেইটাই আসল লাভ—'বিলেতে গেলেম, বারিস্টর হই নি। জীবনের গোড়াকার কাঠামোটাকে নাড়া দেবার মতো ধাক্কা পাই নি, নিজের মধ্যে নিয়েছি পূর্ব-পশ্চিমের হাত মেলানো—আমার নামটার মানে পেয়েছি প্রাণের মধ্যে।'[৫৩] যে বিশ্বজনীনতা রবীন্দ্র-কাব্য ও দর্শনের অন্যতম ভিত্তি তার বাস্তব প্রতিষ্ঠা এই প্রথম বিলাতপ্রবাসের মধ্য দিয়েই সম্পন্ন হয়েছিল, এইখানেই তার সর্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতা।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ১

রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ ত্রয়ীর অন্যতম ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ 1876-এ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও সেখানেই এফ. এ. পড়তে থাকেন। 1878-এর শেষে তিনি এফ. এ. পরীক্ষা দেন, কিন্তু উত্তীর্ণ হতে না পারায় Mar 1879-এ প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। এরই মধ্যে 22 Feb 1877-এ [১২ ফাল্গুন ১২৮৩] তাঁর বিবাহ হয় দ্বাদশ বর্ষীয়া নরেন্দ্রবালা দেবী [জন্ম : ১২ অগ্রহায়ণ ১২৭১]-র সঙ্গে। 1879-এও তিনি এফ. এ. পরীক্ষা দেন, কিন্তু এবারও তিনি উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ যখন ইংলণ্ড থেকে ফিরে আসেন, তখনও তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র।

ইতিমধ্যে সত্যপ্রসাদ সম্ভবত একটি কন্যার জনক হন। ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৬ [17 May 1879] তারিখে ক্যাশবহি-র হিসাবে দেখা যায় 'সত্যবাবুর স্ত্রীর পীড়ার জন্য বিবিদাই আসিবার ফি, গাড়ি ভাড়া...১২ল০'—এই ধরনের খরচ নানা জায়গায় সন্তানজন্মের সঙ্গেই সম্পর্কিত। ১ বৈশাখ ১২৯০ তারিখে 'মসূরী পর্বত' থেকে জামাতা সারদাপ্রসাদকে একটি পত্রে [অপ্রকাশিত] দেবেন্দ্রনাথ যে লিখেছেন, '...বোধ করি শ্রীমান সত্যপ্রসাদের কন্যার নামকরণ সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে'—সম্ভবত উক্ত কন্যার নামকরণ প্রসঙ্গেই তা লিখিত হয়েছিল [যদিও জন্ম ও নামকরণ-অনুষ্ঠানের ব্যবধানটি অস্বাভাবিক রকম দীর্ঘ মনে হয়]। অগ্রহায়ণ ১২৯২ [Nov 1885]-এ কন্যাটির মৃত্যু হয়। এঁর নাম জানা যায় নি, কোনো বংশতালিকায় এঁর সম্বন্ধে কোনো উল্লেখও দেখা যায় না।

২৭ অগ্রহায়ণ [শুক্র 12 Dec] রাত্রে হেমেন্দ্রনাথের একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। এই কন্যা সুনৃতা না সুষমা—সে-কথা নিশ্চিত করে বলার মতো তথ্য আমাদের হাতে নেই। Sep 1876-এ [আশ্বিন ১২৮৩] তাঁর পঞ্চম কন্যা শোভনা দেবীর জন্ম হয়েছিল, তাঁর অন্নপ্রাশন হয় অগ্র° ১২৮৫-তে; কিন্তু ১২৮৪ বঙ্গাব্দের ক্যাশবহি হারিয়ে যাওয়ায় ওই বৎসর হেমেন্দ্রনাথের কোনো কন্যার জন্ম হয় কিনা জানার উপায় নেই,

সেইজন্যই এই সংশয়। [জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক বিবরণটি নিখুঁতভাবে সংকলন করার অসুবিধাগুলি সম্পর্কে পাঠককে সচেতন করার জন্যই এই বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।]

দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা সরোজাসুন্দরী দেবীর বিবাহ হয়েছিল মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। ২১ মাঘ তিনি একটি মৃত পুত্র প্রসব করেন। হিসাবে দেখা যায় : 'শ্রীমতী সরোজাসুন্দরী দেবী প্রশব হওয়ায় দাই-এর বিদায় করার জন্য শ্রীমতী বড়দিদি ঠাকুরানীর নিকট দেওয়া যায়'—এই হিসাব থেকে বুঝতে পারি সারদা দেবী ও সর্বসুন্দরী দেবীর মৃত্যুর পর বড়দিদি ঠাকুরানী সৌদামিনী দেবীই ঠাকুরবাড়ির গৃহকর্ত্রীর আসনটি গ্রহণ করেছেন, এই জন্যই দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে 'গৃহরক্ষিতা সৌদামিনী' আখ্যা দিয়েছিলেন।

এই বৎসর জোড়াসাঁকো ঠাকুরপরিবারে একটি দুর্ঘটনা ঘটে, তার ফলে স্বর্ণকুমারী দেবীর পাঁচ বৎসর বয়স্কা কন্যা ঊর্মিলার মৃত্যু ঘটে ১৭ পৌষ [বুধ 31 Dec 1879] তারিখে। সরলা দেবী এই মৃত্যুর বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে : 'মৃত্যুছায়ার একটা আভাস এল আমার জীবনে আমাদের সব ছোটবোন ঊর্মিলার হঠাৎ মৃত্যুতে। ঊর্মিলা ছিল নতুন মামীর [কাদম্বরী দেবী] আদুরে। তিনিই তাকে দেখতেন শুনতেন খাওয়াতেন পরাতেন। তাঁর সঙ্গে সে বাইরের তেতালাতেই থাকত—আমাদের তিনজনের সঙ্গে বাড়ির ভিতরে নয়। নিঃসন্তান নতুন মামীরই মেয়ে যেন সে। শুধু আমরা যখন ইস্কুলে যেতে লাগলুম তাকেও আমাদের সঙ্গে ইস্কুলে পাঠান হল [চৈত্র ১২৮৫ : Mar 1879]। এক পাল্কীতে চড়ে যাওয়ার সেই সময়ে মাত্র তার সঙ্গে আমাদের যোগ। তার সঙ্গে আর কোনো সংস্রব আমার মনে পড়ে না।....ইস্কুলে ভর্তি হওয়ার দুই এক মাস পরেই [প্রকৃতপক্ষে প্রায় ন-মাস পরে] একদিন নতুন মামীর ছাদের বাঁকা সিঁড়ি দিয়ে গোলাবাড়ির দিকে আপনাআপনি নামতে গিয়ে নীচে পড়ে গিয়ে brain concussion-এ মৃত্যু হয় তার। বাবামশায় তখন বিলেতে।/সারা বাড়িতে সেদিন এক ঘোর কালোছায়া। মা উপরে আছেন, আমাদের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি'।[৫৪] ক্যাশবহি-র হিসাব থেকে জানা যায় সেদিন তাঁর জন্যেও ওষুধের প্রয়োজন হয়েছিল।

ঘটনাটির বর্ণনা আমাদের একটি অনালোচিত তথ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির ঘরে ঘরে তখন ভরা সংসার। দেবেন্দ্রনাথের বিবাহিত পুত্র ও কন্যাদের প্রায় সকলেই বহু সংখ্যক সন্তানের জনক বা জননী—তাদের কলকাকলিতে সারা বাড়ি মুখরিত। কিন্তু এরই মধ্যে একটি ঘরে এক নিঃসন্তানা নারী তাঁর মর্মবেদনা সাহিত্য-সংগীত-শিল্পজগতের মক্ষীরানী হয়ে নীরবে বহন করে গেছেন—তিনি হচ্ছেন কাদম্বরী দেবী। প্রায় সমবয়সী মাতৃহীন দেবরের আদর-যত্নের ভার গ্রহণ করে তাঁর মায়ের স্থান পূর্ণ করার চেষ্টা করেছেন তিনি—কিন্তু একটি শিশুকে খাইয়ে-দাইয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে নারীমনের যে তৃপ্তি তা তাঁকে দিয়ে পূর্ণ করা সম্ভব ছিল না। রবীন্দ্রনাথের বিলাতযাত্রা এই শূন্যতাকে নিঃসন্দেহে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। তাই জানকীনাথ 1878-এর শেষ দিকে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য ইংলণ্ডে যাওয়ার আগে স্বর্ণকুমারী দেবী ও তাঁর চারটি পুত্র-কন্যাকে জোড়াসাঁকোতে রেখে গেলেন, তখন তাঁদের কনিষ্ঠা শিশুকন্যা ঊর্মিলাকে নিয়ে তাঁর নারীহৃদয়ের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করেছিলেন, সরলা দেবীর বর্ণনা এই তথ্যটি জানিয়ে দেয়। সাহিত্য ও সংগীত-চর্চায় ব্যস্ত স্বর্ণকুমারীর 'পেট্রিশিয়ন চাল' সম্পর্কে সরলা দেবী যে অভিযাগ করেছেন, ঊর্মিলার পক্ষেও সেই একই অভিযোগ করা সম্ভব ছিল, কিন্তু 'প্লিবিয়ানের হৃদয়'সম্পন্না কাদম্বরী দেবী সেই সুযোগ দেন নি। সুতরাং আকস্মিক দুর্ঘটনায় সেই ঊর্মিলার অপঘাত মৃত্যু তাঁকে কতখানি আঘাত দিয়েছিল তা অনুমান করা কঠিন নয়।

উর্মিলার পিতা জানকীনাথ 1878-এর শেষ দিকে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্যে ইংলণ্ডে যান। *Journal of the National Association*-এর Jan 1880 সংখ্যায় দেখা যায় 'Mr. J. Ghoshal has passed the Preliminary Examination for admission to the Inns of Court', Mar 1880-সংখ্যায় দেখি তিনি Inner Temple-এ যোগ দিয়েছেন; কিন্তু Jun 1880-সংখ্যায় তাঁর সম্পর্কে লেখা হয় : 'Departures.—Mr. J. Ghoshal, for Calcutta...in the *Ancona*, May 5th, from Southampton.' হিরণ্ময়ী দেবী লিখেছেন, 'আইনে তাঁহার বিশেষরূপ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়া তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে বিলাত যাইয়া ব্যারিষ্টার হইবার পরামর্শ দেন এবং তিনি আমাদের মাতুলালয়ে রাখিয়া বিলাত যাত্রা করেন। সেখানে অধিকাংশ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন কিন্তু শেষ পরীক্ষার পূর্ব্বেই ছয় বৎসর বয়স্কা কনিষ্ঠা কন্যার মৃত্যু সংবাদে তাঁহাকে দেশে ফিরিতে হয়। ইচ্ছা ছিল আবার যাইয়া শেষ পরীক্ষা দিবেন এবং তজ্জন্য বরাবর ফি দিয়া নাম বজায় রাখিয়াছিলেন, কিন্তু ঘটনাচক্রে আর যাওয়া হয় নাই।'[৫৫]

দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ ও অরুণেন্দ্রনাথের উপনয়ন হয়েছিল ২৪ ফাল্গুন ১২৮৪ [7 Mar 1878], আর এই বৎসর ৪ ফাল্গুন [রবি 15 Feb 1880] তারিখে তাঁদের ব্রাহ্মদীক্ষা নিষ্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে দেবেন্দ্রনাথ পৌত্রদ্বয়কে উপদেশ প্রদান করেন।

দেবেন্দ্রনাথ গত বৎসর চৈত্র মাসের গোড়ায় দার্জিলিং যান, অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমে কলকাতায় ফিরে কিছুদিন বোলপুরে অবস্থান করেন; রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ইংলণ্ড থেকে প্রত্যাবর্তন করলে ১৭ চৈত্র [সোম 29 Mar 1880] তিনি আবার দার্জিলিং যাত্রা করেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ২

রবীন্দ্রনাথ যদিও প্রায় সমগ্র ১২৮৬ বঙ্গাব্দ বিলাতপ্রবাসেই কাটিয়েছেন, তবু ইতিহাসের সূত্র রক্ষার জন্য ব্রাহ্মসমাজের কিছু উল্লেখযোগ্য বিবরণ এখানে সংকলিত হল।

১১ মাঘ [শনি 24 Jan 1880] আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠান যথারীতি ব্রাহ্মসমাজগৃহে এবং সায়ংকালীন উপাসনা দেবেন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত হয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-য় প্রকাশিত বিবরণ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, সুতরাং সংগীত প্রভৃতি ক্ষেত্রে কী ধরনের আয়োজন হয়েছিল বোঝা যায় না। এই বৎসর থেকে সান্ধ্য-উপাসনায় দর্শকের প্রবেশাধিকার সংকুচিত হয়েছিল, সে-কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

পূর্ব বৎসরের মতো এ-বৎসরও ৫ মাঘ [রবি 18 Jan] দুপুর তিনটেয় 'ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ' সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১২ মাঘ [রবি 25 Jan 1880] ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মোৎসবে কেশবচন্দ্র 'নববিধান' ঘোষণা করেন। এইদিন 'নবশিশুর জন্ম' শীর্ষক বক্তৃতায় তিনি বলেন, 'পঞ্চাশবৎসর ব্রাহ্মসমাজগর্ভে ধর্ম্মের শিশু গঠিত হইতেছিল, বহুকালের প্রসব-যন্ত্রণার পর এক সর্বাঙ্গসুন্দর শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সেই শিশুর ভিতরে যোগ, ধ্যান, বৈরাগ্য, প্রেম, ভক্তি সমুদায় গুণ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। সেই শিশুর অন্তরে বেদ বেদান্ত পুরাণ তন্ত্র বাইবেল কোরাণ সমুদায় রহিয়াছে।'[৫৬] 'নববিধান'-এর বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনার স্থান এখানে নয়, তার

প্রয়োজনও খুব একটা নেই, কিন্তু সর্বধর্মসমন্বয়ের আদর্শ সামনে রেখে বিচিত্র কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়ে কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুরাগীরা এক বিরাট আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। কুচবিহার-বিবাহের পর থেকে পত্র-পত্রিকায় কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে যে বিষোদগার আরম্ভ হয়েছিল, যার পরিণামে ভারতবর্ষীয় সমাজের একটি অংশ পৃথক হয়ে গিয়ে 15 May 1878-এ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা এবং বিশেষভাবে শিক্ষাক্ষেত্রকে অবলম্বন করে প্রাধান্য পেতে শুরু করেছিল, তার প্রতিক্রিয়ায় নিজ প্রতিষ্ঠা বজায় রাখাও ভারতবর্ষীয় সমাজের অস্তিত্বরক্ষার প্রয়োজনে কেশবচন্দ্রের পক্ষে নতুন একটা কিছু করার অত্যন্ত প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। 'নববিধান' ঘোষণা তারই পরিণাম বলা যেতে পারে। 15 Mar 1875 [২ চৈত্র ১২৮১] বেলঘরিয়া উদ্যানে রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে দেখা হবার পর কেশবচন্দ্রের ধর্মচিন্তায় কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা দিচ্ছিল —ঈশ্বরকে মাতৃভাবে সাধনা তার অন্যতম। বৈষ্ণবদের মতো সংকীর্তন সহযোগে নগর পরিক্রমা আগেই শুরু হয়েছিল। এই সব মিলে কেশবচন্দ্রের হাতে ব্রাহ্মধর্ম সম্পূর্ণ নতুন রূপ ধারণ করল। স্বভাবতই আদি ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই সব পরিবর্তনকে খুব ভালো ভাবে গ্রহণ করতে পারে নি।

আমরা আগেই বলেছি, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রথম থেকেই শিক্ষাবিস্তারের দিকে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল, 6 Jan 1879 [২৩ পৌষ ১২৮৫] সিটি স্কুল প্রতিষ্ঠা তারই প্রথম ফল। বর্তমান বৎসরে এই স্কুলকে কেন্দ্র করে 'ছাত্রসমাজ' স্থাপিত হল 27 Apr 1879 [রবি ১৫ বৈশাখ ১২৮৬] তারিখে। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, 'সিটি-স্কুলটি জমিয়া বসিলে কয়েক মাস পরেই...আনন্দমোহনবাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া আমার বহুদিনের সঙ্কল্পিত একটি কাজের সূত্রপাত করা গেল; তাহা ছাত্র সমাজ নামে একটি সমাজ স্থাপন করা। প্রথমে এক সপ্তাহ অন্তর রবিবার প্রাতে সংক্ষিপ্ত উপাসনাপূর্বক নানা বিষয়ে উপদেশ দিবার রীতি প্রবর্তিত হইল। স্কুল কলেজে ধর্মবিহীন শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই অভাব কিয়ৎ পরিমাণে দূর করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং আমরা সেইভাবে বক্তৃতা করিতাম। ঐ সকল বক্তৃতার অধিকাংশ আনন্দমোহনবাবু ও আমি দিতাম। প্রথমে সিটি স্কুল গৃহে ছাত্র সমাজের অধিবেশন হইত। তৎপরে উপাসনা মন্দির নির্মিত হইলে সেখানে উঠিয়া যায়।'[৫৭] বহুদিন পরে এই ছাত্র সমাজের তরুণ সভ্যদের চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসবে [১২ মাঘ ১৩১৭: 26 Jan 1911] 'ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা' প্রবন্ধ পাঠ করেন। এঁরাই পরে 1921-এ রবীন্দ্রনাথকে উক্ত সমাজের 'সম্মানিত সভ্য' করার জন্য প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩

রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে House of Commons-এর বিতর্ক শোনবার জন্য যে-কদিন গিয়েছিলেন, তার মধ্যে দু-দিনের বিবরণ য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র-এর মধ্যে দিয়েছেন। বিতর্কের বিষয়বস্তু তিনি খুব সংক্ষেপেই উল্লেখ করেছেন। আমরা একটু বিস্তারিত আকারেই এগুলি উল্লেখ করছি, ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের সমসাময়িক গতিপ্রকৃতি বোঝার পক্ষে প্রসঙ্গটির গুরুত্ব আছে।

প্রথম দিন 23 May 1879 [শুক্র ১০ জ্যৈষ্ঠ] আইরিশ সদস্য Mr. O'Donnell ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের একটি প্রতিনিধিদলের প্রতি লর্ড লিটনের দুর্ব্যবহারের সমালোচনা করে একটি প্রস্তাব **পেশ**

করেন : 'That this House regrets that Lord Lytton and his advisers have shown such unwise disrespect for the sentiments of a vast population, which is at the same time deprived of all constitutional representation, and subject to a harsh and grinding taxation, of the most oppressive kind.' প্রতিনিধিদল লাইসেন্স অ্যাক্ট প্রভৃতি অর্থনৈতিক বিধি ও আফগানিস্থানে সরকারি নীতি সোমপ্রকাশ-এ সমালোচিত হওয়ায় উক্ত পত্রিকার বিরুদ্ধে গৃহীত দমনমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহারের দাবি নিয়ে লর্ড লিটনের সঙ্গে দেখা করলে তিনি অত্যন্ত রূঢ় ভাষা প্রয়োগ করেন। 24 Feb তারিখে সোমপ্রকাশ-এ আফগানিস্থান সম্পর্কে 'লাহোরস্থ সংবাদদাতা'র একটি পত্র প্রকাশিত হয়—এটিকে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক ও ইংরেজ জাতির প্রতি ঘৃণাব্যঞ্জক বলে অভিযোগ করে 18 Mar একটি বিজ্ঞপ্তিতে পত্রিকাটির মুদ্রক ও প্রকাশককে এক হাজার টাকার একটি মুচলেকা সম্পাদন করার আদেশ দেওয়া হয় [এই আদেশের প্রতিবাদে সোমপ্রকাশ-সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ পত্রিকা বন্ধ করে দেন; সরকার আদেশটি প্রত্যাহার করায় 9 Apr 1880 থেকে পত্রিকা পুনঃপ্রকাশিত হতে থাকে।] অথচ এই পত্রটিই ইংরেজি পত্রিকা *Deccan Star*-এ প্রকাশিত হলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হয় নি—মোটামুটি এই ছিল Mr. O'Donnell-এর বক্তৃতার সারাংশ। Sir David Wedderburn তাঁর প্রস্তাব সমর্থন করলেও সরকারপক্ষীয় Mr. E. Stanhope-এর বক্তৃতায় লর্ড লিটনের কাজকে সমর্থন করা হয় এবং প্রস্তাবটি ২১৫-৩৬ ভোটে বাতিল হয়ে যায়।[৫৮]

রবীন্দ্রনাথ-প্রদত্ত দ্বিতীয় বিবরণটি 12 Jun [৩০ জ্যৈষ্ঠ] তারিখের। এইদিন Mr. O'Donnell কলোনীসমূহের স্টেট সেক্রেটারিকে 27 May-র *Tiverton Gazette*-এ প্রকাশিত ও 3 Jun-এর *Echo* পত্রিকায় উদ্ধৃত একজন ব্রিটিশ সৈন্যের চিঠিতে এবং ওই একই তারিখে *Daily Chronicle*-এর দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ সংবাদদাতা-প্রেরিত সংবাদে জুলু [Zulu] যুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্যদের নৃশংসতার যে বিবরণ বেরিয়েছে সে-সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। *Echo* পত্রিকায় উদ্ধৃত অংশটি হল : 'On March the 30th, the day after the battle, about eight miles from the camp, we found about five hundred wounded, most of them mortally, and begging us for mercy's sake not to kill them; but they got no chance after what they had done to our comrades at Isandula.' এটি পাঠ করে তিনি প্রশ্ন করেন, 'Whether operations in South Africa are being conducted by the British Troops according to the usages of civilisation?' সরকারপক্ষীয় Sir Michael Hicks-Beach প্রভৃতি এই সব সংবাদের প্রতিবাদ করলে আইরিশ সদস্য Mr. Sullivan, Mr. Parnell প্রভৃতি জোরালো বক্তৃতা করেন।[৫৯] পরে Mr. John Bright সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের বয়ঃসীমা কমানোর বিরুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রেরিত ছ-টি দরখাস্ত সভার বিবেচনার জন্য উপস্থিত করেন।[৬০] [1876-এ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা সংক্রান্ত নূতন বিধিতে পরীক্ষার্থীদের ঊর্ধ্বতম বয়ঃসীমা ২১ থেকে কমিয়ে ১৯ বৎসর ধার্য করা হয়। এর ফলে ভারতীয়দের পক্ষে উচ্চ রাজপদ পাওয়ার সুযোগ হ্রাস করা হল বুঝতে পেরে ভারতে শিক্ষিত মহলে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়। 24 Mar 1877 তারিখে কলকাতার টাউন হলে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে একটি বিরাট সভা হয় এবং পরীক্ষার্থীদের বয়ঃসীমা ২২ বৎসর করা ও উক্ত পরীক্ষা লণ্ডনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতেরও দু-একটি কেন্দ্রে গ্রহণ করার জন্য দাবী জানিয়ে পার্লামেন্টে আবেদন পত্র প্রেরণ করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। সুরেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায় এ-ব্যাপারে জনমত গঠনের জন্য ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন ও বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে একযোগে কাজ করতে পারে তার উদ্দেশ্যে চেষ্টা করতে থাকেন। সুরেন্দ্রনাথের এই সফর ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ড রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, 'এইরূপে ভারতের রাজনীতিক ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধভাবে কার্য করিবার যে সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হইল, উনিশ শতকের ইতিহাসে তাহা একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা, ভারতের মুক্তিসংগ্রামে ইহা ভারত সভা ও সুরেন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য।']৬১ মিঃ ব্রাইট দরখাস্তগুলি মুদ্রিত করার প্রস্তাব করলে স্পীকার এগুলিকে পার্লামেন্টের মুদ্রণ-সংক্রান্ত কমিটির কাছে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেন, সুতরাং রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাঁর বক্তৃতা শোনবার সৌভাগ্য অর্জন করা সম্ভব হয় নি।

এরপর বিরোধী দলের নেতা মিঃ গ্ল্যাডস্টোন 'তুলাজাতের শুল্ক ও আফগান যুদ্ধ সম্বন্ধে' কলকাতাবাসীদের একটি দরখাস্ত সভায় পেশ করে তার সমর্থনে বক্তৃতা করেন। ইংলণ্ডে প্রস্তুত বস্ত্রসামগ্রী ভারতের বাজারে সহজে বিক্রির জন্য ভারতীয় বস্ত্রের উপর যে বিশেষ শুল্ক ধার্য হয়েছিল এবং আফগানযুদ্ধের বিপুল ব্যয়ভার ভারতেরই প্রতিরক্ষার জন্য এই যুক্তিতে ভারতের অর্থভাণ্ডার থেকে এই ব্যয় মেটানোর জন্য যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা প্রেরিত উক্ত আবেদনপত্রে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়। মিঃ গ্ল্যাডস্টোন এর সমর্থনে দীর্ঘ বক্তৃতা করেন,৬২ রবীন্দ্রনাথ যার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছেন। উক্ত দরখাস্ত প্রসঙ্গে ড মজুমদার লিখেছেন, 'দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের ব্যয়ভার ভারতের উপর চাপানো এবং বিলাতে ম্যাঞ্চেষ্টারের বস্ত্রশিল্পের স্বার্থে বিলাতী বস্ত্রের আমদানি কর হ্রাস করিয়া দেশীয় বস্ত্রশিল্পের অনিষ্ট সাধন—এই দুইয়ের তীব্র প্রতিবাদ জানাইতে যে সভা আহূত হয় তাহাতে প্রায় তিন হাজার লোক উপস্থিত ছিল। উপরন্তু এই সভার উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতি জানাইয়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু চিঠি ও টেলিগ্রাম আসিয়া ছিল।'৬৩

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৪

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর তৃতীয় নাটক অশ্রুমতী বিলাত-প্রবাসী ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন [৯ শ্রাবণ ১২৮৬]। নাট্যশালার ইতিহাস-সংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে নাটকটির প্রথম অভিনয় হয় 1881-এ বেঙ্গল থিয়েটারে। কিন্তু তথ্যটি ঠিক নয়। ২৭ ভাদ্র [বৃহ 11 Sep 1879] তারিখে ক্যাশবহি-র একটি হিসাবে দেখা যায় 'সোমবাবু মহাশয় অশ্রুমতী নাটক থিএটর দেখিতে এই দিন যান তাহার টিকিট ক্রয় ৮্'—তখন বৃহস্পতিবারে সাধারণ নাট্যশালায় কোনো অভিনয় হত না, সুতরাং খরচটি অন্য-কোনো দিনের, সম্ভবত ২৬ ভাদ্র [বুধ 10 Sep] তারিখের। শুধু সোমেন্দ্রনাথ নন, বাড়ির মেয়েরাও এই অভিনয় দেখেন; ক্যাশবহি-র ১৮ আশ্বিনের হিসাব : 'দ° ৮ আশ্বিন/বেঙ্গল থিএটরে বাটীর সকল মেয়েরা অশ্রুমতী থিএটর দেখিতে জান....৭্', এর পরিপূরক হিসাবটি লিখিত হয় ১২ আশ্বিনে : 'দ° অশ্রুমতী নাটক বাটীর মধ্যের সকলকে অভিনয় দেখাইবার ব্যয়...১৪২লত'। এই বিশেষ অভিনয় হয় ৮ আশ্বিন মঙ্গল 23 Sep 1879 তারিখে; 'বিশেষ অভিনয়', কেননা এদিন ঠাকুরগোষ্ঠীর লোকেরাই কেবল অভিনয় দেখতে পেয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ এই

অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন : ‘অশ্রুমতী অভিনয় হল, বাড়ির মেয়েরা কেউ দেখতে পেলেন না। তখন পাবলিক স্টেজে গিয়ে মেয়েরা দেখবে, এ দস্তুর ছিল না।....বাবামশায় [গুণেন্দ্রনাথ] বললেন, পুরো বেঙ্গল থিয়েটার এক রাতের জন্য ভাড়া নেওয়া হোক। কেবল আমাদের বাড়ির লোকজন থাকবে সেদিন।....সেই প্রথম মেয়েরা ছাড়া পেলে পাবলিক স্টেজে থিয়েটার দেখতে [সামাজিক দিক দিয়েও ঘটনাটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে]।....অনেক টাকা খরচ করে এক দিনের জন্য স্টেজ ভাড়া করা হল; বেঞ্চিটেঞ্চি নয়, ও-সব সরিয়ে বাড়ির বৈঠকখানা থেকে আসবাবপত্র নিয়ে হল্ সাজানো হল। নীচে কার্পেট পেতে ইজি-চেয়ার, ফুলের মালা, আলবোলা; মেয়েদের জন্য চিকের ব্যবস্থা—....। ছোটোদিদিমা ত্রিপুরাসুন্দরী আছেন, বাড়ির ছেলেমেয়ে কেউ বাদ যাবে না,....কালীকেষ্ট ঠাকুরের দুই মেয়েও ছিলেন আমার পাশে।’* তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী এই অভিনয়ে প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী সুকুমারী দত্ত [গোলাপী] মলিনা ও অক্ষয় কুমার মজুমদার ভীল সর্দার সেজেছিলেন। অন্য বিবরণে ভূমিকালিপিতে এই নামগুলি পাওয়া যায় : প্রতাপসিংহ—বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, সেলিম—হরি বৈষ্ণব এবং অশ্রুমতী—বনবিহারিণী [ভুনি]।[৬৪]

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৫

স্বর্ণকুমারী দেবীর বসন্ত-উৎসব গীতিনাট্যের বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকা অনুসারে প্রকাশের তারিখ 4 Nov 1879 [মঙ্গল ১৯ কার্তিক]। এই তারিখ ঠিক না-ও হতে পারে, কারণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অশ্রুমতী নাটকের ক্ষেত্রেও একই তারিখ পাওয়া যায় যেটি সম্ভবত শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসের মধ্যেই প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল। স্বর্ণকুমারীর এই গীতিনাট্যটির প্রেরণা এসেছিল বোধ হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের একটি প্রস্তাব থেকে; তিনি বলেছেন, “একদিন আমাদের বারাণ্ডার আড্ডায় কথা উঠিল—সেকালে কেমন বসন্ত-উৎসব হইত। আমি বলিলাম—‘এসোনা আমরাও একদিন সেকেলে ধরণে বসন্ত-উৎসব করি।’....একদিন এক বসন্ত-সন্ধ্যায় সমস্ত উদ্যান বিবিধ রঙীন আলোকে আলোকিত হইয়া নন্দনকাননে পরিণত হইয়া উঠিল। পিচকারী আবীর কুঙ্কুম প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সমস্ত সরঞ্জাম উপস্থিত হইয়া গেল। খুব আবীরখেলা হইতে লাগিল। তারপর গান বাজনা আমোদ প্রমোদও কিছুমাত্র বাদ গেল না।’[৬৫] এই সূত্রেই সম্ভবত ‘বসন্ত-উৎসব’ রচিত ও অভিনীত হয়েছিল। দেবেন্দ্রভবনে যদিও দোলউৎসবের কোনো আয়োজন ছিল না, কিন্তু পার্শ্ববর্তী বৈঠকখানা বাড়িতে এই উৎসব যে প্রবল সমারোহের সঙ্গেই পালিত হত তার বিবরণ দিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর ধারে [পৃ ৪৪-৪৬] ও প্রতিমা দেবী স্মৃতিচিত্র গ্রন্থে। তার থেকে মনে হয় উপরোক্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল বৈঠকখানা বাড়িরই সুপ্রশস্ত ও সুসজ্জিত উদ্যানে, এসব ব্যাপারে গুণেন্দ্রনাথের আগ্রহ ছিল যথেষ্ট।

এর প্রথম অভিনয়ের সময় রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে। সরলা দেবী লিখেছেন, ‘রবীন্দ্রনাথের বিলেতনিবাস কালেই আমার মায়ের রচিত ‘বসন্তোৎসব’ গীতিনাট্যের অভিনয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অধ্যক্ষতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সঙ্গীতের এক মহাহিল্লোলে হিল্লোলিত হয়ে উঠেছিল বাড়ি তখন। আমাদের শিশুকণ্ঠেও প্রতিধ্বনিত হতে থাকত বড় বড় ভাবের বড় বড় কথায় বড় বড় রাগ—“চন্দ্রশূন্য তারাশূন্য মেঘান্ধ নিশীথে য়ে য়ে য়ে য়ে”—বাগেশ্রীর তানে আমাদের গলা ও মন খেলিয়ে খেলিয়ে উঠত।’[৬৬] রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ড থেকে ফিরে

আসার ও গীতিনাট্যটি এক বা একাধিকবার অভিনীত হয়েছিল। হিরণ্ময়ী দেবীর পূর্বোদ্ধৃত লেখার মধ্যে আছে : 'রবিমামা বিলাত হইতে বাড়ি ফিরিবার পর আমাদের অন্তঃপুরে বসন্ত-উৎসবের অভিনয়ও হইয়াছিল।' তাছাড়া ইন্দিরা দেবীর স্মৃতির সঙ্গেও একটি অভিনয়ের অভিজ্ঞতা জড়িত, যেটি পরবর্তীকালে অভিনয়ের সম্ভাব্যতাকেই সপ্রমাণ করে : "স্বর্ণপিসিমার গীতিনাট্য 'বসন্ত-উৎসবে'র সঙ্গেও আমাদের ছেলেবেলার স্মৃতি জড়িত। তার গোড়ার দিকের গান 'ধর্ লো ধর্ লো ডালা, এই নে কামিনীফুল' এখনো কানে বাজে।

"অন্য গানগুলিও কতক কতক মনে আছে—

> লীলা। চন্দ্রশূন্য তারাশূন্য মেঘান্ধ নিশীথ চেয়ে
> দুরভেদ্য অন্ধকারে হৃদয় রয়েছে ছেয়ে।....

ঢালা বাগেশ্রী রাগিণীতে এই শোকসংগীত নতুনকাকিমা [কাদম্বরী দেবী] বসে গাইছেন, তাঁর বড়ো বড়ো চোখ আর দীর্ঘ ঘন কেশ ছিল বলে তাঁকে বেশ মানিয়েছিল। জ্যোতিকাকা আর রবিকাকা দুজনে মিলে

রবীন্দ্রনাথের আঁকা স্কেচ : রোগশয্যায় মৃণালিনী দেবী
তারিখ : অষ্টমী পূজা ১২৯৩ [৫ অক্টোবর ১৮৮৬]
[রবীন্দ্রভবনের সৌজন্যে]

টিনের তলোয়ার নিয়ে এই গানটি গেয়ে যুদ্ধ করেছিলেন।—

কিরণ। লও এই লও, লও প্রতিফল।
কুমার। দেখিব বীরত্ব তোর থাকে কি অটল।
কিরণ। মূঢ় হ রে সাবধান!
কুমার। এ অমোঘ সন্ধান।
কিরণ। এ আঘাতে অবশ্যই বধিব পরান।”[৬৭]

পশুপতি শাশমল লিখেছেন, ‘প্রকৃতপক্ষে স্বর্ণকুমারীর বসন্ত-উৎসবই হল ঋতু-উৎসব সংক্রান্ত প্রথম গীতিনাট্য’[৬৮] তাঁর এ-কথা মেনে নিতে কোনো বাধা নেই, অবশ্য পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ-রচিত ঋতু-নাট্যগুলিতে যে গভীর দার্শনিকতার পরিচয় পাওয়া যায় বসন্ত-উৎসব-এর পরিকল্পনা সেদিক থেকে ভিন্নতর।

গ্রন্থটির আখ্যাপত্র : ‘বসন্ত-উৎসব। গীতিনাট্য। “দীপনির্ব্বাণ”—লেখনী-প্রসূত।/কলিকাতা/বাল্মীকি যন্ত্রে/ শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তি কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।/শক ১৮০১।/মূল্য ।ল০ আনা’; দু-বৎসরের মধ্যে ভাদ্র ১৮০৩ শকে [১২৮৮] গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়, যা এর জনসমাদরকেই প্রমাণ করে। বইটি ‘বিহঙ্গিনী’ শরৎকুমারী চৌধুরানীকে উৎসর্গীকৃত।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৬

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, লালমোহন ঘোষ প্রভৃতি ভারতের, বিশেষত বাংলার, রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বক্তৃতা ও বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে যেভাবে রূপায়িত করতে শুরু করেছিলেন, তাতে হিন্দুমেলা তার রাজনৈতিক গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছিল। তাছাড়া 1876-এ কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি সংক্রান্ত নূতন আইনে করদাতাদের দ্বারা ৪৮ জন সদস্য নির্বাচনের নিয়ম প্রবর্তিত হওয়ায় জনসাধারণ ও জননেতাদের মনোযোগ অনেকটা একে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছিল, যার মধ্যে হিন্দুমেলার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নবগোপাল মিত্রও ছিলেন। বর্তমান বৎসরে উক্ত মেলার চতুর্দশ অধিবেশন ২৯ মাঘ [বুধ 11 Feb 1880] মাঘ-সংক্রান্তির দিনে ব্রজনাথ ধরের উদ্যানে আরম্ভ হয়। সুলভ সমাচার [৯। ৪৫, ৩ ফাল্গুন ১২৮৬] খবরটি মন্তব্য-সহ প্রকাশ করে : ‘২৯ শে মাঘ হইতে রাজা বাজার ব্রজনাথ ধরের বাগানে হিন্দু মেলা আরম্ভ হইয়াছে, ইহার উন্নতি না হইয়া দিন দিন হ্রাস হইতেছে। বাঙ্গালীর উৎসাহ খড়ের আগুন।’ হিন্দু পেট্রিয়ট [Vol. XXVI, No. 7 Feb 16, p. 75]-এর বিবরণে নবগোপাল মিত্রের কৃতিত্ব স্বীকার করে লেখা হয়েছে : ‘The Hindu Mela, the existence of which is chiefly due to the exertions of Babu Nobogopal Mitter, has opened. As usual there is an interesting collection of works of art, manufacture.’ ন্যাশানাল পেপার-এর এই সময়কার ফাইল পাওয়া গেলে হয়তো অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া যেত, কিন্তু সংবাদ প্রকাশে অন্যান্য পত্রিকার কার্পণ্য দেখেই বোঝা যায় জনসাধারণের মধ্যে হিন্দুমেলা কোনো উৎসাহ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে, যদিও জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পৃষ্ঠপোষকতা তখনও যে অব্যাহত ছিল তা আমরা জানতে পারি ২১ মাঘ [3 Feb]-এর একটি হিসাব থেকে : ‘ব° বাবু নবগোপাল মিত্র/দ° ১৮০১ শকের হিন্দু মেলার দান...১০০’। হিন্দুমেলার এই পরিণতি আমাদের কাছে দুর্ভাগ্যজনক মনে হয়, কারণ যে স্বনির্ভরতা ও সামাজিক চেতনার বিকাশের আদর্শ নিয়ে মেলার জন্ম

হয়েছিল ঔপনিবেশিক শাসন ও অর্থনীতির দ্বারা শোষিত ভারতের মুক্তির পক্ষে তা অপরিহার্য ছিল। কিন্তু দেশকে একেবারে নিম্নতম স্তর থেকে গড়ে তোলার চেষ্টা না করে জননেতারা বিভিন্ন রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের দিকে তাঁদের সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছিলেন। এই ধরনের চিন্তা রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ও সামাজিক দর্শনের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা আমরা রবীন্দ্রজীবনের বিভিন্ন স্তরে লক্ষ্য করব।

রবীন্দ্রনাথের অন্যতম কাব্যগুরু বিহারীলাল চক্রবর্তীর বিখ্যাত কাব্য সারদামঙ্গল আর্য্যদর্শন পত্রিকায় ১২৮১ বঙ্গাব্দের ভাদ্র থেকে পৌষ সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। দীর্ঘদিন পরে ১২৮৬ বঙ্গাব্দে [29 Dec 1879 : ১৫ পৌষ] কাব্যটি গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হল। কবি লেখেন, "১২৭৭ সালে 'সারদামঙ্গলের' রচনা আরম্ভ হইয়া অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া থাকে, ১২৮১ সালে 'আর্য্যদর্শন' পত্রে তদবস্থাতেই প্রকাশিত হয়; এক্ষণে সম্পূর্ণ হইল।" মাঘ ১২৮৬-সংখ্যা ভারতী-তে [পৃ ৪৫৪-৬৩] কাব্যটির একটি দীর্ঘ রসগ্রাহী সমালোচনা প্রকাশিত হয় [আমাদের অনুমান, সমালোচনাটি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর লেখা]।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৭

আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে 'নানা বিদ্যার আয়োজন'-এর মধ্যে ড্রয়িং শিক্ষারও বিশেষ আয়োজন ছিল—এ-বিষয়ে কিছু তথ্য আমরা বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে দিয়েছি। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ও অধিকাংশ শিশুর বাল্য-শিক্ষায় চিত্রকলা-চর্চার প্রাথমিক আয়োজন থাকে-ই, সুতরাং সাধারণভাবে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু জীবনের শেষ পর্বে চিত্রকর-রূপে রবীন্দ্রনাথের যে বিস্ময়কর আবির্ভাব ঘটে, তার পরিপ্রেক্ষিতে এই ইতিহাসও জরুরি হয়ে উঠেছে। মধ্যবর্তী পর্বে মালতী-পুঁথি বা মজুমদার-পুঁথি [পকেট বুক] নামে খ্যাত পাণ্ডুলিপিগুলিতে তাঁর চিত্র-চর্চার কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলি 'ছবি আঁকার ইচ্ছাটাকে লইয়া আপন মনে খেলা করা'র অতিরিক্ত কিছু নয়। অথচ এরই অন্তর্বর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ যে সচেতনভাবে কিছু ছবি এঁকেছেন ও সেগুলি সযত্নে রক্ষিত হয়েছে, এই খবর আমাদের জানা ছিল না। সম্প্রতি ২০ শ্রাবণ ১৩৯৬ [5 Aug 1989]-সংখ্যা দেশ-এ অশোককুমার মুখোপাধ্যায় "রবির 'সৰ্ব্ব প্রথমোদ্যম'" প্রবন্ধে [পৃ ১৫-৩২] সেই অজ্ঞাত ইতিহাসটি উদ্‌ঘাটিত করেছেন, এজন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ।

রবীন্দ্রনাথ 1909-এ ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র মুকুলচন্দ্র দে-কে তাঁর আঁকা ছবি-সংবলিত 'একটি মোটা চামড়াবাঁধাই কালো খাতা' দান করেন [দ্র রবিজীবনী ৪।২৯৫] মুকুলচন্দ্র ছবিগুলি খাতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে কয়েকটি পৃথ্বীসিং নাহার-কে বিক্রয় করেন, কতকগুলি বিক্রয় করেন শেঠ হনুমানপ্রসাদ পোদ্দার-কে। শেঠ হনুমানপ্রসাদ ছবিগুলি হস্তান্তরিত করেন ইন্দ্রকিশোর কেজ্‌রিওয়াল-কে। শ্রীকেজ্‌রিওয়ালের সৌজন্যে শ্রীমুখোপাধ্যায় ছবিগুলি দেখে ও তাদের প্রতিলিপি প্রস্তুত করে বিস্তৃত বিবরণ-সহ আমাদের উপহার দিয়েছেন।

এই ছবিগুলির মধ্যে প্রথমতমটি 1880-এ আঁকা—'টাকমাথা, গোঁফওলা এক প্রৌঢ়ের প্রতিকৃতি'—ছবির ডান কোণে লেখা '১৮৮০', বাম কোণায় সম্ভবত রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে 'সৰ্ব্ব প্রথমোদ্যম', যা অবশ্যই পরবর্তী

কোনো সময়ে লেখা। রবীন্দ্রনাথ বিলেত থেকে কলকাতা ফিরে আসেন Mar 1880-র মাঝামাঝি সময়ে। ছবিটি তার পরেই অঙ্কিত হয়েছিল। শ্রীমুখোপাধ্যায় লিখেছেন :

একটু তির্যকভাবে প্রৌঢ়ের বাঁদিক থেকে প্রতিকৃতিটি আঁকা হয়েছে। ছবিটিতে রবার চালানোর ছাপ স্পষ্ট। রবার চালাতে হয়েছে থুতনি থেকে গলার অংশটি আঁকবার সময়। রবার ঘষতে হয়েছে নাক আঁকবার সময়। আমরা জানি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পেন্সিলে প্রতিকৃতি আঁকায় খুবই দক্ষ ছিলেন।...অনুমান করা যায় ঐ ড্রইংটি করবার সময় বা আঁকার পরে তিনি তাঁর নবযৌবনের 'সারথি' জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে তা দেখিয়েছিলেন এবং জ্যোতিদাদা হয়তো বা তাতে কিছু সংশোধনও করে দিয়েছেন। এমন অনুমানের কারণ হ'ল এই আঁকাটিতে নাকের অংশটি যত ভালো এসেছে পরবর্তীকালের আঁকা ছবিতে লক্ষ্য করা যায় নাকের ড্রইং তত ভালো নয়।

খাতাটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথও ব্যবহার করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির অন্তত দুটির পিছনের পৃষ্ঠায় তিনি পরবর্তীকালে স্কেচ করেছেন, ছবিগুলির উপরে 'রবির আঁকা' মন্তব্যগুলি সম্ভবত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে লেখা।

কেজ্‌রিওয়াল-সংগ্রহে উক্ত কালো খাতার অন্তর্ভুক্ত আরও কতকগুলি স্কেচ বা ড্রয়িং আছে, সেগুলি পরবর্তীকালে আঁকা হলেও আমরা তাদের সম্পর্কে এখানেই আলোচনা করে নিতে চাই। কালগত দিক দিয়ে দ্বিতীয় ছবিটি 1881-এ আঁকা—শ্রীমুখোপাধ্যায় এটিকে 'কোনো ছবি দেখে অথবা মন থেকে' আঁকা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্কেচ বলে অনুমান করেছেন, যা ঠিক না হতেও পারে।

তৃতীয় ড্রয়িংটি হল ছ'টি পেনসিল স্কেচ, মুকুলচন্দ্রের সংগ্রহ-তালিকায় এগুলি 'SIX PENCIL STUDIES, "avimana", "aparadha"; etc. 1885' আখ্যায় অভিহিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সহযোগিতায় বৈষ্ণবপদ-সংগ্রহ 'পদরত্নাবলী' সম্পাদনা করছেন, তারই কিছু ভাব ছবিগুলিতে রূপ পেয়ে থাকতে পারে।

1886-এ আঁকা চতুর্থ ড্রয়িংটি 'KRISHNA-RADHA' নামে অভিহিত, ছবির উপরে 'বাঁশরী বাজিল যমুনায়।/ শুনিয়ে শ্যামের বাঁশি/ চিত হইল উদাসী/ বাঁশি কুল মজাইতে চায়।' ছত্রগুলি উদ্ধৃত করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বৈষ্ণবপদ-চর্চার প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করেছেন।

এর পরের তিনটি ছবির বিষয়বস্তু 'MRINALINI DEVI. Rabindranath's wife in sick bed'—1886-এর 'সপ্তমী-পূজা' [১৯ আশ্বিন সোম 4 Oct], 'অষ্টমী-পূজা' ও 'নবমী-পূজা' পর-পর তিনদিনে অঙ্কিত। এই সময়ে মৃণালিনী দেবী অন্তঃসত্ত্বা—কয়েকদিন পরে ৯ কার্তিক ১২৯৩ [সোম 25 Oct 1886] তাঁর প্রথম সন্তান মাধুরীলতার জন্ম হয়।

উল্লেখপঞ্জী

১ য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র। ৪০

২ দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩

২ক 'ডন সোসাইটীতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতা' : ভাণ্ডার, কার্তিক ১৩১৩। ২৮৬

৩ য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র। ৪২

৪ ঐ। ৪৪

৫ দ্র পুরাতনী। ৪২
৬ য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র। ১৮৪
৭ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৬৫
৮ ঐ ১৭। ৩৬২
৯ ঐ ১৭। ৩৬২-৬৩
১০ ঐ ১৭। ৩৪৬
১১ ঐ ১৭। ৩৬৩
১২ য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র। ২১১
১৩ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৬৩
১৪ ছেলেবেলা ২৬। ৬৩০
১৫ য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র। ২০৪
১৬ রবীন্দ্রস্মৃতি। ১৩
১৭ ছেলেবেলা ২৬। ৬৩১
১৮ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৬৩-৬৪
১৯ ঐ ১৭। ৩৬৪
২০ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যসংগ্রহ [১৩৭৬]। ৬৬০
২১ 'কৈফিয়ৎ' : ভারতী, বৈশাখ ১৩২৩। ১৫
২২ দ্র ছেলেবেলা ২৬। ৬৩১
২৩ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৭০
২৪ ছেলেবেলা ২৬। ৬৩০-৩১
২৫ আলাপচারি : রবীন্দ্রনাথ [১৩৭৭]। ৮৭
২৬ ঐ। ৮৭-৮৮
২৭ *Rabindranath Tagore: Poet and Dramatist* [Riddhi, 1979], p. 31
২৯ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৭১
৩০ শব্দতত্ত্ব ১২। ৩৩৮
৩১ ঐ ১২। ৩৩৯
৩২ তীর্থংকর। ১৪৩
৩৩ দ্র P. N. Bose, *National Education and Modern Progress* [1921], p. 49
৩৪ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৬৪
৩৫ রবীন্দ্রজীবনী ১ [১৩৯২]। ৯৫

৩৬ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৬৪

৩৭ ঐ ১৭। ৩৬৯

৩৮ ঐ ১৭। ৩৬৪-৬৫

৩৯ রবীন্দ্রস্মৃতি। ১৪

৪০ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৫৮

৪১ য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র। ২১৭

৪২ রবীন্দ্রগ্রন্থ পরিচিতি ১ [১৩৮৫]। ১৩

৪৩ রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য। ২২৭

৪৪ ঐ। ২২৭

৪৫ ভারতী, আশ্বিন। ২৮৫-৮৬

৪৬ য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র। ১৫২

৪৭ ঐ। ১৫২-৫৩

৪৮ ঐ। ১১০

৪৯ প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩২৮। ৫৯৩

৫০ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৭২

৫১ ছেলেবেলা ২৬। ৬২৯

৫২ ঐ ২৬। ৬৩০

৫৩ ঐ ২৬। ৬৩১

৫৪ জীবনের ঝরাপাতা। ২১-২২

৫৫ ঐ। ২০৯

৫৬ আচার্য্য কেশবচন্দ্র ৩ [1938]। ১৫৩৬-৩৭

৫৭ আত্মচরিত। ১২৮

৫৮ দ্র Hansard's *Parliamentary Debates*, 3rd Series, Vol. CCXLVI, Coloumns 1142-46

৫৯ দ্র *Ibid*, Columns 1708-18

৬০ দ্র *Ibid*, Column 1723

৬১ বাংলা দেশের ইতিহাস ৩ [১৩৮১]। ৫৫০

৬২ দ্র *Parliamentary Debates*, Columns 1723-24 & 1739-53

৬৩ বাংলা দেশের ইতিহাস ৩। ৫৫২

৬৪ শিশির বসু, একশ বছরের বাংলা থিয়েটার [১৩৮০]। ৪৭-৪৮

৬৫ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি। ২৮-২৯

৬৬ জীবনের ঝরাপাতা। ২৯

৬৭ রবীন্দ্রস্মৃতি। ২৫

৬৮ ড পশুপতি শাশমল, স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য [১৩৭৮]। ৩০৩

---

* 'HANSARD'S/ PARLIAMENTARY DEBATES,/ THIRD SERIES: Vol. CCXLVI. 9 May 1879—16 June 1879/ *Fourth volume of the Session.*/ LONDON./ PUBLISHED BY CORNELIUS BOOK.'

* দ্র ঐ। ২১৭-১৮ [রবীন্দ্র-রচনাবলী ১ম খণ্ডে য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র-এর মুখবন্ধ হিসেবে 29 Aug 1936 [১৩৪৩] চারুচন্দ্র দত্তকে পত্রাকারে লিখিত]।

* বহু দিন পরে Jul 1920-তে রবীন্দ্রনাথ একবার ব্রিস্টলে গিয়ে রামমোহনের সমাধিতে পুষ্পার্ঘ্য দেন কিন্তু এই অনুষ্ঠানের কোনো বিস্তৃত বিবরণ এখনো পর্যন্ত সংগ্রহ করতে পারি নি। কৃষ্ণ কৃপালনী রামমোহনের সমাধিমন্দিরে রক্ষিত Visitors' Book-এর প্রতিলিপি রবীন্দ্রভবনে উপহার দিয়েছেন তাতে সত্যেন্দ্রনাথ [sep 1863], রথীন্দ্রনাথ [29 Sep 1912], প্রতিমা দেবী [11 Jul 1920] ও অন্যান্য অনেক বিশিষ্ট বাঙালি ও ভারতীয়ের স্বাক্ষর থাকলেও রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর নেই।

* পাঠকদের অবগতির জন্য এই পরীক্ষার নিয়মাবলী ও পাঠ্যতালিকাটি উদ্ধৃত করে দিচ্ছি:

'LONDON UNIVERSITY/Examinations,—Candidates for any degree in this University must pass the Matriculation Examination. There are two Examinations for the Matriculation each year, one in January and the other in June, for which no one under sixteen years of age is allowed to present himself.

SUBJECTS: (1) Latin

(2)...Any two of the following languages:—Greek, French, German, and either Sanskrit or Arabic.

(3) English Language, History and Geography.

(4) Mathematics, including Arithmetic, Algebra (as far as Equations) and Geometry (Books I-IV)

(5) Natural Philosophy, comprising the elements of Mechanics, Hydrostatics, Hydraulics, and Pneumatics, Optics, Laws of Refraction and Reflection and Formation of Images, and also Elements of Heat.

(6) Chemistry of the non-metallic elements, with their important compounds.'— *Journal of the National Indian Association,* Dec 1880, pp. 699-700.

* দ্র দেবীপদ ভট্টাচার্য, 'হেনরি মরলি ও তাঁর কয়েকজন ছাত্র', বি. ভা. প., কার্তিক-পৌষ ১৩৭০।১৫৫; এই প্রবন্ধে ড ভট্টাচার্য রবীন্দ্রনাথের ভর্তির নিদর্শনপত্রের ফোটোকপি-সহ বহু মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেছেন। প্রবন্ধটি তাঁর 'রবীন্দ্র-চর্যা' [২য় সং, ১৩৯২] গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে [প ২৫-৩১]।

* সত্যেন্দ্রনাথের প্রবন্ধটির প্রকৃত নাম 'ভারতবর্ষীয় ইংরাজ', ভারতী-র প্রথম বর্ষে অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন চারটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে প্রবন্ধটি 'বোম্বাই চিত্র' [1889] গ্রন্থে সংকলিত ও স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে [1908] প্রকাশিত হয়।

* এই পত্রটি নিয়ে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 'রবীন্দ্রনাথ ও স্কটকন্যা লুসি'-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেছেন, উদ্ধৃতিগুলি উক্ত প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত দ্র অ-চেনা রবীন্দ্রনাথ [১৩৯১]। ১১২-১৬

* "'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে'র ঘটা দেখে আমার পিতা ভাবলেন যে ছেলেটা মেম বিয়েই করে না কি, তাড়াতাড়ি লিখে পাঠালেন, তোমার ঢের পড়া হয়েছে, ফিরে এসো।"—দ্র সীতা দেবী, পূণ্যস্মৃতি [১৩৭১]। ১৭৫

* দ্র প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, 'রবীন্দ্র-বর্ষপঞ্জী', বিচিত্রা, বৈশাখ ১৩৩৯। ৪৪৬-৪৭। রবীন্দ্রনাথ ৯ পৌষ ১৩৪৩ শান্তা দেবীকে লিখিত একটি পত্রে এই মহিলাকে Mrs. Woodrow বলে উল্লেখ করেছেন দ্র চিঠিপত্র ১২ [১৩৯৩]। ২৬৬

* দ্র পাণ্ডুলিপি-চিত্র, সন্ধ্যাসংগীত, পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণ [1969]। ৮০; x x -চিহ্নের মধ্যবর্তী অংশ লিখে কেটে দেওয়া হয়েছে।

* রবীন্দ্রনাথ গানটি পরে কোনো-এক সময়ে অনুবাদ করেন : 'নিদাঘের শেষ গোলাপ কুসুম', দ্র 'সম্পাদকের বৈঠক', ভারতী, আষাঢ় ১২৮৮। ১৪৭; বিদেশী ফুলের গুচ্ছ', কড়ি ও কোমল [1886, ১ম সং] ৬২-৬৩; অপিচ শতবার্ষিক সং ৪। ৮৬৪

* বস্তুত মালতীপুঁথির 57/৩০ক ও 60/৩১খ পৃষ্ঠায় 1877 [১২৮৪]-এ লিখিত 'আমার এ মনোজ্বালা কে বুঝিবে সরলে', 'ছেলেবেলা হোতে বালা, যত গাঁথিয়াছি মালা' ['উপহারগীতি' শীর্ষনাম ও 'ভগ্নহৃদয়ের/উপরে' মন্তব্যযুক্ত], 'পাষাণ হৃদয়ে কেন সঁপিনু হৃদয়', 'ভেবেছি কাহারো সাথে মিশিবনা আর' ও 'হারে বিধি কি দারুণ অদৃষ্ট আমার' কবিতাগুলি আত্মভাবনা-মূলক হলেও ভগ্নহৃদয় কাব্যের মূল সুরের সঙ্গে সম্পকান্বিত।

* ঘরোয়া [১৩৭৭]। ৯৮-৯৯; অবনীন্দ্রনাথ নিজেকে 'ছয় বছরের শিশু' বলে বর্ণনা দিয়েছেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁর বয়স তখন আট বছর।

বিংশ অধ্যায়

১২৮৭ [1880-81] ১৮০২ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের বিংশ বৎসর

রবীন্দ্রনাথের জীবনবৃত্তান্ত-রচনায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির হিসাবপত্রের বিবরণ-সংবলিত ক্যাশবহিগুলির মূল্য কতখানি, পাঠকগণ অবশ্যই তা অবগত হয়েছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, বর্তমান বৎসর ১২৮৭ বঙ্গাব্দের ক্যাশবহি-টি আমাদের হাতে এসে পৌঁছয় নি—ফলে এটির সাহায্যে রবীন্দ্র-জীবনের তথ্যগত রূপরেখা অঙ্কনের যে সুযোগ আমরা পূর্ব-পূর্ব বৎসরে [১২৮৪ বঙ্গাব্দ ছাড়া] পেয়ে এসেছি, এ-বৎসর তা থেকে বঞ্চিত হয়ে আমাদের অন্যান্য উপকরণের উপর [যা স্বভাবতই খুব কম] নির্ভর করতে হবে। সুতরাং পূর্ব-অনুসৃত রীতির কিছু ব্যতিক্রম অপরিহার্য।

আমরা বলেছি, প্রায় দেড় বৎসর বিলাত-প্রবাসের পর চৈত্র ১২৮৬-র প্রথম সপ্তাহে রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতির সঙ্গে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। দীর্ঘ দু-বৎসর পরে [জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫-র শুরুতে তিনি আমেদাবাদ যাত্রা করেছিলেন] আত্মীয়বন্ধু-পরিবৃত জোড়াসাঁকোর বাড়িতে প্রত্যাবর্তনের সময় তাঁর মানসিক অবস্থা কীরূপ ছিল তার কোনো প্রত্যক্ষ বর্ণনা না পেলেও একটি পরোক্ষ উক্তি হয়তো আমরা সংকলন করতে পারি : 'একজন কাল্পনিক ব্যক্তি যখন বহুদিন পরে বিদেশ হইতে দেশাভিমুখে যাত্রা করে, তখন দেশে আসিলে তাহার আত্মীয় বন্ধুদিগের নিকট কিরূপ সমাদর পাইবে, তাহার এমন একটি জাজ্বল্যমান চিত্র তাহার কল্পনাপটে অঙ্কিত হয় যে, সে আনন্দে অধীর হইয়া পড়ে। সে চক্ষু মুদিয়া স্পষ্ট অনুভব করিতে পারে, যেন সে তাহার সেই পুরাতন বাটির প্রাঙ্গণে গিয়া পৌঁছিয়াছে,...কে তাহাকে কি প্রশ্ন করিবে তাহা সে কল্পনা করিতে থাকে এবং সে তাহার কি উত্তর দিবে তাহা পর্য্যন্ত ঠিক করিয়া রাখে।'[১] য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র-এর প্রথমটিতে তিনি নিজেকে 'কাল্পনিক' বলে অভিহিত করেছেন [দ্র পৃ ১৪], সুতরাং উপরের কল্পনাটি আমরা তাঁর উপরেও আরোপ করতে পারি।

দেশে ফিরে আসার পর আত্মীয়স্বজনের প্রতিক্রিয়ার যে বিবরণ রবীন্দ্রনাথ নিজে দিয়েছেন, তা তাঁর গানের গলা সম্পর্কে। বাড়িতে চিত্রবিচিত্র-করা টমাস ম্যূরের আইরিশ মেলডীজ্ গ্রন্থখানি দেখে ও অক্ষয় চৌধুরীর কাছে কবিতাগুলির মুগ্ধ আবৃত্তি শুনে তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল এগুলির সুর শিখে এসে তাঁকে গেয়ে শোনাবেন। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে এদের কতকগুলির সুর তিনি আয়ত্ত করেন, কিন্তু সবগুলি শেখার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন—'অনেকগুলি সুর মিষ্ট এবং করুণ এবং সরল, কিন্তু তবু তাহাতে আয়র্লণ্ডের প্রাচীন কবিসভার নীরব বীণা তেমন করিয়া যোগ দিল না।'* দেশে ফিরে এই গানগুলি ও অন্যান্য বিলাতি গান তিনি স্বজনসমাজে গেয়ে শোনালেন। 'সকলেই বলিলেন, রবির গলা এমন বদল হইল কেন, কেমন যেন বিদেশী রকমের, মজার রকমের, হইয়াছে। এমন-কি তাঁহারা বলিতেন, আমার কথা কহিবার গলারও একটু কেমন সুর

বদল হইয়া গিয়াছে।'[২] তিনি বিদেশে গিয়েছিলেন সতেরো বছরের কিশোর, ফিরে এলেন উনিশ বছরের যুবক—সুতরাং কণ্ঠস্বরের এই পরিবর্তন খুবই স্বাভাবিক; অবশ্য আরও অনেক পরিবর্তন তাঁর হয়েছিল, কিন্তু তা কণ্ঠস্বরের মতো এত সহজবোধ্য ছিল না!

কথিত আছে, দেশে ফেরার অব্যবহিত পরেই রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মানময়ী' গীতিনাট্যে অংশগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এই গীতিনাট্য কিংবা তাতে অভিনয় সম্বন্ধে কোথাও কোনো মন্তব্য করেন নি। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'ইতিপূর্বে এই দেশী ও বিদেশী সুরের ঘাত-প্রতিঘাতে সৃষ্ট হইয়াছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মানময়ী' নামে গীতিনাট্য।[*] রবীন্দ্রনাথ বিলাত হইতে আসিয়া দেখিলেন যে নাটকখানি প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে, তিনি শেষ দিকে একটি গান যোজনা করিয়া দিলেন—"আয় তবে সহচরী, হাতে হাতে ধরি ধরি" ইত্যাদি। নাটক রচনা করিয়া তাহার অভিনয়মূর্তি না দেখিতে পাইলে যথার্থ আর্টিস্ট-লেখকরা সুখী হইতে পারেন না; মানময়ীর অভিনয় হইল। ইহাতে রবীন্দ্রনাথ মদনের, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ইন্দ্রের ও তাঁহার পত্নী কাদম্বরী দেবী উর্বশীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন বলিয়া শুনিয়াছি। এই মানময়ীকে বাংলাসাহিত্যের গীতনাট্য রচনার প্রথম প্রচেষ্টা বলা যাইতে পারে [না]—কারণ ইহাতে গান ছাড়া গদ্যে কথাবার্তা ছিল।[*] সরলা দেবী লিখেছেন, 'তিনি আসার পর প্রথম যে একটি ছোট্ট গীতিনাট্যের অভিনয় হল—যাতে ইন্দ্র ও শচী সাজেন নতুনমামা নতুনমামী এবং বসন্ত সাজেন রবিমামা, তার নাম "মানময়ী" নতুনমামাই তার রচয়িতা।'[৩] খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'বহুপূর্ব্বে (১৮৭৬?) তিনি আত্মীয়দের সম্মুখে বাটিতে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের "মানময়ীতে" 'মদনের ভূমিকা' গ্রহণ করেছিলেন এই তথ্যের সঙ্গে একটি নতুন সংবাদ দিয়েছেন, 'এই গীতি-নাট্যে কবির সেজদাদা ইন্দ্রের ভূমিকা এবং তৎপত্নী নীপময়ী দেবী শচীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহাই বাড়ীর মেয়েদের লইয়া প্রথম অভিনয়।'[৪] ইন্দিরা দেবীর বর্ণনা : 'তাঁরই [জ্ঞানদানন্দিনী দেবী] প্ররোচনায় সম্ভবত মানময়ী নাটক...জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আপনাআপনির মধ্যে অভিনীত হয়। এটি কার রচনা সেকালে আমাদের অনুসন্ধান করবার কোনো প্রবৃত্তি হয় নি, তবে এখন মনে পড়ে রবিকাকা জ্যোতিকাকা স্বর্ণপিসিমা অনেকসময় মিলেমিশে গীতিনাট্য রচনা করতেন। মানময়ীর বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও আমার কেবলমাত্র একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে। দেবদেবীর মানভঞ্জন নিয়েই কারবার—তা নামেই প্রকাশ। মানময়ীর অভিনয়ে দেবতাদের মধ্যে রবিকাকা আর জ্যোতিকাকামশায় ছিলেন মনে আছে।'[৫] এই-প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'মানময়ী যে কার লেখা তা মনে নেই, কিন্তু গানের সুর জ্যোতিকাকার দেওয়া, ইংরেজি রকমের। এই সুরের অনেক আভাস 'বাল্মীকি-প্রতিভা'তেও আছে।'[৬] এটা খুবই স্বাভাবিক, কারণ যে 'দস্তুরভাঙা গীতবিপ্লবের প্রলয়ানন্দে' 'বাল্মীকি-প্রতিভা'-র জন্ম, সেই একই ভাবে মানময়ী-ও রচিত হয়ে ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায় আছে, "একদিন জ্যোতিবাবুরা কয়েকজন বন্ধুবান্ধবসহ স্টীমারে চন্দননগর যাইতেছিলেন। পথে অকস্মাৎ ঝড় জল তুফান আরম্ভ হইয়া স্টীমারখানিকে আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছিল। ইঁহাদের কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপও ছিল না। জ্যোতিবাবু সুর-রচনা করিতেছিলেনে, ও অক্ষয়বাবু ক্রমান্বয় তাহার সঙ্গে একটির পর একটি গান বাঁধিয়া যাইতেছিলেন। ইঁহারা গানবাজনায় একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া গিয়াছিলেন। এই একদিনকার রচিত গানগুলি হইতেই পরে 'মানভঙ্গ' নামে একখানি গীতিনাট্য প্রস্তুত

হইয়াছিল। ‘মানভঙ্গ’ প্রথমে জোড়াসাঁকো বাড়ীতে অভিনীত হয়।[৭] গীতিনাট্যটির নাম অবশ্য ‘মানভঙ্গ’ নয়—‘মানময়ী’।

বিভ্রান্তিমূলক বিভিন্ন স্মৃতিকথার মধ্য থেকে মোটামুটি নির্ভরযোগ্য তথ্য সম্ভবত এইটুকু—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সুরে কথা বসিয়ে গীতিনাট্যটি বস্তুত অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর লেখা [আখ্যাপত্রে রচয়িতা হিসেবে কারো নাম নেই, একথা স্মরণীয়]। শেষ গানটি—‘আয় তবে সহচরি, হাতে হাতে ধরি ধরি’—অবশ্য রবীন্দ্রনাথের লেখা। বিলেত থেকে ফিরে আসার পর, সম্ভবত জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর উৎসাহেই, জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ‘আপনাআপনির মধ্যে’ গীতিনাট্যটির অভিনয় হয়; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ বসন্ত ও মদনের ভূমিকায় [নাটিকায় এই দুটি পুরুষ চরিত্রই আছে] অবতীর্ণ হন। ফার্লো ছুটির শেষে [২৯ বৈশাখ সোম 10 May 1880] সত্যেন্দ্রনাথ সুরাটে তাঁর নতুন কাজে যোগদান করার জন্য যাত্রা করার পূর্বেই গীতিনাট্যটি অভিনীত হয়েছিল, এই অনুমান যথার্থ হলে বলতে হয় বৈশাখের প্রথমার্ধেই [Apr 1880] অভিনয় কার্য নিষ্পন্ন হয়।

এই নাটিকার আরও দুটি গান রবীন্দ্রনাথের লেখা বলে গৃহীত হয়েছে। সজনীকান্ত দাস লিখেছেন, ...মানময়ী’র গানগুলি রবীন্দ্রনাথকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলাম, তিনি ইহার মধ্যে মাত্র আর দুইটি গান নিজের বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।’[৮] গান দুটি হল:

১। ‘[রতির গান] ছিলে কোথায় বলো, কত কি যে হল’ দ্র গীতবিতান ৩।৯৫২

২। ‘[বসন্তের গান] চলো চলো, চলো চলো, চলো চলো, ফুলধনু’ দ্র ঐ ৩।৯৫২

—দুটি গানই এই দু-অঙ্কের গীতিনাট্যটির প্রথম অঙ্কের অন্তর্ভুক্ত [বস্তুত, এই দুটি গান দিয়েই প্রথম অঙ্কটি গঠিত] ও পরিবর্ধিত ‘পুনর্বসন্ত’তে অনেক পরিবর্তিত আকারে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু গানগুলির ভাষা দেখে এগুলিকে রবীন্দ্রনাথের লেখা বলে বিশ্বাস করা কঠিন।

ইংলণ্ডে থাকতেই রবীন্দ্রনাথ ভগ্নহৃদয় কাব্যটিকে প্রকাশযোগ্য রূপ দিতে আরম্ভ করেছিলেন। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় জাহাজে কয়েকটি সর্গ লিখে ফেলেন। আমরা আগেই বলেছি, ভগ্নহৃদয়-এর পাণ্ডুলিপিতে ষষ্ঠ সর্গে কবির উক্তি ‘আননের দুই পাশ অবদ্ধ কুন্তলরাশ’ ছত্রটির [দ্র অ-১।১৭০] পাশে ‘steamer’ কথাটি লেখা দেখে অনুমান করা যায় এই পর্যন্ত সমুদ্রপথে স্টীমারে লিখিত হয়েছিল। এর অব্যবহিত ১২টি ছত্রের পরে কবির উক্তি ‘একটি প্রাণের কথা রোয়েছে গোপনে’ ছত্রের পাশে পাণ্ডুলিপিতে ‘Bulpore May/1880’ উল্লেখটি পাওয়া যায়। এ থেকে অনুমান করতে পারি যে May 1880 অর্থাৎ বৈশাখের শেষ দিকে বা জ্যৈষ্ঠের গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন বোলপুরে অবস্থান করেন এবং উক্ত ছত্র থেকে পরবর্তী বেশ কিছুটা অংশ সেখানে থাকার সময়েই লিখেছিলেন। এই সময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবীও সেখানে ছিলেন। উক্ত পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠায় ‘হাঁ মুরলা, সেই নলিনী বালারে...’ [দ্র অ-১।১৭২] কবির এই উক্তিটির পাশে আড়াআড়ি ভাবে মেয়েলি হাতের গোটা গোটা অক্ষরে ‘শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্র নাথঠাকুর/শ্রীমতী কাদম্বরী দেবী/শ্রীযুক্ত বাবু’ এই তিনটি লাইন লেখা—আমাদের ধারণা এই হস্তাক্ষর কাদম্বরী দেবীর নিজের এবং এই অনুমান যদি সঠিক হয় তবে বিহারীলালকে উপহার দেওয়া ‘সাধের আসন’ ছাড়া এইটিই তাঁর দৃষ্টি-স্পর্শ-গ্রাহ্য একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন, যা কালের ভ্রূকুটি এড়িয়ে আজ পর্যন্ত বেঁচে আছে [অবশ্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আঁকা পেন্সিল স্কেচ বা

আলোকচিত্রগুলিকে আমরা এই হিসেব থেকে বাদ দিয়েছি]। কাদম্বরী দেবীর শোচনীয় মৃত্যুর পর তাঁর লেখা সমস্ত পত্রাদি নষ্ট করে ফেলার কথা আমরা শুনেছি, সুতরাং এই হস্তাক্ষর তাঁরই কিনা তা মিলিয়ে দেখা সম্ভব নয়—কিন্তু পাণ্ডুলিপির লেখাটি অন্য কারোর হওয়ার সম্ভাবনাও খুবই কম। বোলপুরে তাঁরা কতদিন ছিলেন জানা যায় না, কিন্তু ভগ্নহৃদয় কাব্যটি রবীন্দ্রনাথ অব্যাহত গতিতেই লিখে চলেছিলেন বলে মনে হয়। আমাদের ধারণা কার্তিক-সংখ্যা ভারতী-তে প্রথম সর্গটি প্রকাশের পূর্বেই সমগ্র কাব্যটি রচিত হয়ে গিয়েছিল। তা না হলে ভূমিকা, কাব্যের পাত্র, উপহার ইত্যাদি সহ প্রথম সর্গটি প্রকাশিত হত না। আর কাব্যরচনা আগেই সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল বলে সম্পূর্ণ গ্রন্থটির মুদ্রিত রূপ দেখার ব্যগ্রতাবশত পত্রিকার পাঁচটি সংখ্যায় মাত্র ছটি সর্গ প্রকাশিত হবার পরই পুরো বইটি ছাপার জন্য মুদ্রাকরের কাছে প্রেরিত হয় এবং দু-মাসেরও কম সময়ে চৌত্রিশটি সর্গে সম্পূর্ণ কাব্যটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় [এর অন্য কারণও থাকতে পারে, পরে সেই প্রসঙ্গ আমরা আলোচনা করব]।

'য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র' বৈশাখ ১২৮৬-সংখ্যা থেকে ভারতী-তে প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল। ঐ বৎসর মোট দশটি সংখ্যায় এই পত্রাবলী প্রকাশিত হয়েছিল। দেশে ফিরে আসার পর বর্তমান বৎসরেও এর প্রকাশ অব্যাহত থেকেছে। বৈশাখ ১২৮৭-সংখ্যা ভারতী [৪।১]-তে রবীন্দ্রনাথের দুটি রচনা দেখা যায়:

১ 'ভানুসিংহের কবিতা' ['দেখলো স্বজনী, চাঁদনি রজনী'] দ্র ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী। ২৩-২৪ [১৮ সংখ্যক, 'হম যব না রব সজনী'; পূর্ণাঙ্গ পাঠ : দ্র পাঠান্তর সংবলিত সংস্করণ। ৬৮-৭০।

২৯-৩৭ 'য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র' দ্র য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র। ১৬৮-৭৯ [১০ম পত্র]

'ভানুসিংহের কবিতা' শেষবারের মতো প্রকাশিত হয়েছিল বৈশাখ ১২৮৬ সংখ্যায়। পরে আবার এই কবিতার সাক্ষাৎ মেলে অগ্রহায়ণ ১২৮৭-সংখ্যায় ['সখিলো সখিলো নিকরুণ মাধব']। প্রকাশ-কালের এইরূপ ব্যবধান দেখে মনে হয় এই পদগুলি বিভিন্ন সময়ে লিখিত—হয়তো ভারতী-তে মুদ্রণের অব্যবহিত পূর্বে লেখা। কাব্য গ্রন্থাবলী-র [১৩০৩] ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'ভানুসিংহের অনেকগুলি কবিতা লেখকের ১৫।১৬ বৎসর বয়সে লেখা—আবার তাহার মধ্যে গুটিকতক পরবর্ত্তীকালের লেখাও আছে—', আমাদের ধারণা শ্রাবণ ১২৮৪ থেকে বৈশাখ ১২৮৫ পর্যন্ত ভারতী-তে প্রকাশিত আটটি কবিতা সেই '১৫।১৬ বৎসর বয়সের লেখা', এর পরে প্রকাশিত কবিতাগুলিকে 'পরবর্ত্তীকালের লেখা' বলে ধরা যেতে পারে। অবশ্য পত্রিকায় অপ্রকাশিত, অথচ প্রথম সংস্করণের [১২৯১] অন্তর্ভুক্ত আরও সাতটি কবিতা [আর একটি অপ্রকাশিত কবিতা 'গহির নীদমে বিবশ শ্যাম মম' মালতীপুঁথি-তে ১২৮৫ বঙ্গাব্দের প্রথম দিকে আমেদাবাদে রচিত] 'পুরাতন কালের খাতা হইতে সন্ধান' করে বার করা হয়েছে বলে মনে হয় অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের রচনা।

'দেখলো স্বজনি, চাঁদনি রজনী' ভারতী-তে প্রকাশের সময় ও প্রথম সংস্করণে এতে ৫৬টি ছত্র ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে কাব্যগ্রন্থাবলী-তে [১৩০৩] প্রথম ৩২টি ছত্র পরিত্যক্ত হয়ে ৩টি পুনর্লিখিত ছত্র সংযোজিত হয়; বর্তমানে কবিতাটির ছত্র-সংখ্যা ২৭। সুর হিসেবে 'বেহাগ' উল্লেখিত হয়েছিল, কিন্তু সুরটি স্বরলিপিতে সংরক্ষিত হয় নি।

বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত 'য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র'-এর কিস্তিটিকে ঠিক পত্র-শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা যায় না। পাঠকের স্মরণ আছে, অগ্র° ১২৮৬-সংখ্যার পত্রটিতে রবীন্দ্রনাথ প্রাসঙ্গিকভাবে স্ত্রীস্বাধীনতা-বিষয়ে যে মত প্রকাশ করেছিলেন পাদটীকায় সম্পাদক তার কোনো-কোনোটির সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মন্তব্য করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তার যে উত্তর দেন পুনশ্চ সম্পাদকীয় টীকা-সহ তা ফাল্গুন ১২৮৬-সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। বর্তমান কিস্তিটি তারই প্রত্যুত্তর। কিন্তু আমাদের ধারণা, এটি পত্রাকারে ইংলণ্ড থেকে লিখিত নয়। আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথ ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন ও চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। সুতরাং উক্ত সংখ্যাটি সম্ভবত কলকাতায় পৌঁছবার পর তাঁর হাতে আসে এবং এখানেই তিনি প্রত্যুত্তরটি রচনা করেন। এতেও দ্বিজেন্দ্রনাথ পাদটীকা যুক্ত করেন, তবে তা সংখ্যায় খুবই কম। রবীন্দ্রনাথের লেখাটি পড়লে বোঝা যায়, যদিও তিনি তরল পরিহাসের সুরে প্রত্যুত্তরটি রচনা করেছেন তবু 'মস্তিষ্কের দোষ', 'আমার মতো প্রকৃতিস্থ লোক', 'তাঁর কানের যদি এমন একটা সৃষ্টিছাড়া রোগ হয়ে থাকে...' প্রভৃতি মন্তব্যের যথেচ্ছ প্রয়োগে পরিহাস কোথাও কোথাও তীব্র রূপ ধারণ করেছে। সুদূর ইংলণ্ড থেকে লেখা পত্রে দেশকালের গুণে যে তীব্রতা কিছুটা সহনীয় ছিল, পরিবারের মধ্যে বসে লেখা রচনায় সেই তীব্রতাকে গুরুজনেরা যদি ঔদ্ধত্য মনে করে থাকেন তাকে অস্বাভাবিক বলা চলে না। এর অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল আষাঢ়-সংখ্যায় প্রকাশিত 'ইংলণ্ডে স্বাধীনতার উন্নতি' [প্রবন্ধটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা, দ্র প্রবন্ধ-মঞ্জরী (১৩১২)।১৯৭-২১৭] প্রবন্ধে, সেখানে কিছুটা তিক্ততার সঙ্গে লিখিত হয় : 'আজকাল আমাদিগের মধ্যে স্বাধীনতার একটা ধুয়া উঠিয়াছে। পুত্র পিতার অবাধ্য হইয়া স্বাধীন হইতে চাহে, শিষ্য গুরুকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীন হইতে চাহে, স্ত্রী স্বামীর শাসন কঠোর মনে করিয়া স্বাধীন হইতে চাহে।...কিন্তু ইংরাজেরা যে কত যুগযুগান্তর হইতে যুঝাযুঝি করিয়া কত রক্তপাতের পর অল্পে অল্পে সোপান-পরম্পরা অবলম্বন করিয়া তবে স্বাধীনতা-শিখরে আরোহণ করিয়াছেন তাহা আমরা অনুধাবন করিয়া দেখি না—আমরা বালকের ন্যায়, বাতুলের ন্যায় এক লম্ফে তদুপরি আরোহণ করিতে আকাঙ্ক্ষা করি, সুতরাং জগতের সমক্ষে হাস্যাস্পদ হইয়া পড়ি।'[৯] [প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশ অবশ্য সম্পূর্ণভাবে ইতিহাস আশ্রয় করেছে এবং পরবর্তী সংখ্যাতেও তার ক্রমানুসৃতি দেখা যায়।]

ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭ *[৪।২]:*

৫৯-৬০ 'দুদিন' ['শ্রী দিক্ শূন্য ভট্টাচার্য'] দ্র সন্ধ্যাসংগীত ১।৩২-৩৩

৬০-৬৭ 'য়ুরোপযাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র' দ্র য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র। ১৮০-৯০ [১১শ পত্র]

'দুদিন' কবিতাটি সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে, সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তির কোনো প্রয়োজন নেই। 'য়ুরোপযাত্রী...'-র বর্তমান কিস্তিটি ইংলণ্ডে অবস্থানকালেই লেখা —টন্‌ব্রিজ ওয়েলস্ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা এতে বর্ণিত হয়েছে। পত্রটির একটি সমালোচনা পাওয়া যায় দেওঘরে থাকার সময়ে লিখিত রাজনারায়ণ বসুর ডায়ারিতে : 'দেব গৃহে দৈনন্দিন লিপি/ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫১, শকাব্দা ১৮০২।/২০ জ্যৈষ্ঠ—১৫ই জ্যৈষ্ঠের "ভারতী" পাঠ করি। "ইউরোপ যাত্রী" শিরস্ক প্রস্তাবটি সুরসিকতা ও মনোরম চটুলতায় উপছিয়া পড়িতেছে। লণ্ডনের কশাই-এর দোকান, দরজির দোকান, নাপিতের দোকান, আমোদ-কাল (Season) সকল বিষয়ের বর্ণনা অতি সুন্দর ও প্রতিভাসূচক।'[১০] বিজ্ঞ রাজনারায়ণ রবীন্দ্রনাথের

বাল্যকাল থেকেই তাঁর প্রতিভার বিকাশ লক্ষ্য করে এসেছেন, এখানে তারই স্বীকৃতি রেখে গিয়েছেন [দোকানগুলির বর্ণনা অবশ্য টন্‌ব্রিজ ওয়েল্‌স্‌-এর, লণ্ডনের নয়]।

ভারতী, আষাঢ় ১২৮৭ *[৪।৩]:*

১৩০-৩৬ য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র' দ্র য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র। ১৯০-৯৯ [১২শ পত্র]

এই পত্রে ডেভনশায়ারের অন্তর্গত সমুদ্রতীরবর্তী টর্কী নগর-বাসের অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে। সে-প্রসঙ্গ আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৭ *[৪।৪]:*

১৯২-৯৯ য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র' দ্র য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র। ২০০-১১ [১৩শ পত্র]

এইটিই বর্তমান পত্রধারার শেষ পত্র। 1 Jan 1880 [বৃহ ১৮ পৌষ ১২৮৬] স্কট-পরিবারে বাস করার সময়ে এটি লেখা, চিঠির মধ্যেই তার উল্লেখ আছে। এর পরেও মাসাধিককাল রবীন্দ্রনাথ এখানে ছিলেন ও দীর্ঘ সমুদ্রপথ অতিক্রম করে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু এ সময়কার কোনো চিঠি পত্রধারায় প্রকাশিত হয় নি। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'রচনা শেষে 'ক্রমশঃ' শব্দ থাকায় মনে হয় রবীন্দ্রনাথ আরো পত্র লিখিয়াছিলেন যাহা সম্পাদক প্রকাশ করিতে চাহেন নাই, অথবা লেখক আরো লিখবেন এই কথা মনে করিয়া 'ক্রমশঃ' লিখিয়াছিলেন'[১১]—কিন্তু জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যায় পত্র-শেষে 'ক্রমশঃ' লেখা থাকলেও শ্রাবণ-সংখ্যায় তা নেই, সুতরাং 'সম্পাদক প্রকাশ করিতে চাহেন নাই' বা 'লেখক আরো লিখিবেন' এই ধরনের কোনো অনুমান এখানে করা চলে না। লেখা প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদক যথেষ্ট উদার ছিলেন, তাই বিরুদ্ধ মন্তব্য করা সত্ত্বেও বেশ কয়েকটি পত্র ও পরে 'পারিবারিক দাসত্ব' প্রবন্ধটি প্রকাশ করতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি; আর এই উদারতা তিনি শুধু কনিষ্ঠ ভ্রাতার ক্ষেত্রেই দেখান নি, অগ্রহায়ণ-মাঘ ১২৮৬ সংখ্যায় কালীপদ ঘোষের ধারাবাহিক প্রবন্ধ 'কালিদাস ও অভিজ্ঞান শকুন্তল' প্রকাশ করেছেন এবং মাঘ ১২৮৬ থেকে আষাঢ় ১২৮৭ এই ছ-টি সংখ্যায় 'শকুন্তলা সমালোচনার সমালোচনা' নামে উক্ত প্রবন্ধের দীর্ঘ প্রতিবাদও লিখেছেন। আসল বিতর্কের এই স্বাস্থ্যকর উত্তেজনা তাঁর অভিপ্রেত ছিল বলেই মনে হয়। সেইজন্য আমাদের ধারণা, অসময়ে বিলাত-ত্যাগের আদেশে ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী পত্রগুলিতে প্রকাশযোগ্য সাহিত্যরূপ সৃষ্টি করতে পারেন নি, কিংবা প্রত্যাবর্তন-পথে ভগ্নহৃদয়-রচনায় ব্যাপৃত থাকায় জাহাজ থেকে লিখিত পত্রে পত্রধারার বিশেষ প্রকৃতিটি অক্ষুণ্ণ ছিল না বলেই সেগুলিকে প্রকাশ করতে আগ্রহী হন নি। *The Sunday Mirror* [Vol. XX, No. 224, 19 Sep 1880, p. 6] পত্রিকায় পত্রটির সপ্রশংস উল্লেখ দেখা যায় : 'The interesting "Letters from Europe" are continued in this number also.' এর ঠিক এক বছর পরে 'বন্ধুদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া' পত্রগুলি গ্রন্থাকারে 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' [25 Jul 1881] নামে প্রকাশিত হয়। যথাসময়ে আমরা সে-প্রসঙ্গ উত্থাপন করব।

২৫ বৈশাখ ১২৮৭ [বৃহ 6 May 1880] রবীন্দ্রনাথ উনিশ বছর পূর্ণ করে কুড়ি বৎসরে পদার্পণ করেন। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বিলেত থেকে ফেরার পর তাঁর সন্তানদের জন্য জন্মদিন পালন আরম্ভ করেন, তাঁর দেখাদেখি ধীরে ধীরে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও জন্মদিন উদ্‌যাপন শুরু হয়—সরলা দেবী তাঁর

আত্মকাহিনীতে এমন কথা লিখেছিলেন [দ্র জীবনের ঝরাপাতা। ৪৯], সেটি সম্ভবত আরও পরবর্তী কালের ঘটনা। কিন্তু পিতা দেবেন্দ্রনাথ যে কনিষ্ঠ পুত্রের বয়ঃপ্রাপ্তি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় জ্যেষ্ঠ জামাতা সারদাপ্রসাদকে [দার্জিলিং থেকে] লেখা তাঁর ৮ আষাঢ় [সোম 21 Jun] তারিখের পত্রে : 'রবীন্দ্রের বয়ঃপ্রাপ্তির জন্য ছোট বৌ-র [নগেন্দ্রনাথের স্ত্রী ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী] ডীডে ও তদ্‌ঘটিত অন্য সকল ডীডে যাহা কিছু পরিবর্তন করিতে হইবে তাহার জন্য কি করিতেছ, আমাকে সংবাদ লিখিবে। সে সকল তো শীঘ্র সমাধা হওয়া চাই।'[১২] আমরা আগেই বলেছি, দেবেন্দ্রনাথ ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৬ [8 Jun 1869] তারিখে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও হেমেন্দ্রনাথকে একজিকিউটর নিযুক্ত করে একটি উইল করেন এবং 4 Sep 1876-এ হাইকোর্টের ডিক্রী অনুযায়ী ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী দ্বারকানাথ ঠাকুরের সম্পত্তিতে যে অধিকার লাভ করেন, এককালীন দশ হাজার টাকা ও মাসিক এক হাজার টাকা দেবার শর্তে নিজের ও গুণেন্দ্রনাথের হয়ে সেই স্বত্ব ক্রয় করেন। আমাদের আলোচ্য পর্বে উক্ত দলিলেরও কিছু পরিবর্তন করা হচ্ছিল। সুতরাং তারই মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বয়ঃপ্রাপ্তির জন্য যে-সব পরিবর্তন করা দরকার সুবিবেচক পিতা তারই আয়োজন করার জন্য জামাতাকে নির্দেশ দিয়েছেন। সম্ভবত এই সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথ মাসহারা হিসেবে ১০০ টাকা করে পেতে শুরু করেন। ১২৮৭ ও ১২৮৮ বঙ্গাব্দের ক্যাশবহি আমাদের হাতে এসে পৌঁছয় নি, সুতরাং এ-সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা শক্ত। কিন্তু ১২৮৯ বঙ্গাব্দের ক্যাশবহি-র শুরুতেই ওই পরিমাণ মাসহারার উল্লেখ পাওয়া যায়। যৌবনপ্রাপ্ত পুত্রদের জন্য মাসহারার বন্দোবস্ত ঠাকুরবাড়ির রীতি ছিল [বিকৃত-মস্তিষ্ক সোমেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে মাত্র ২০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল, সেইজন্য তাঁর বায়ুরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই Apr 1879-এ ব্যারিস্টার ইভান্‌স্ সাহেবের অভিমত গ্রহণ করা হয়]।

নবযৌবনে উপনীত হবার সময়কার মানসিকতা রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা করেছেন পরবর্তীকালে লেখা একটি পত্রে : 'যৌবনের আরম্ভ-সময়ে বাংলাদেশে ফিরে এলেম। সেই ছাদ, সেই চাঁদ, সেই দক্ষিণে বাতাস, সেই নিজের মনের বিজন স্বপ্ন, সেই ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে চারিদিক থেকে প্রসারিত সহস্র বন্ধন, সেই সুদীর্ঘ অবসর, কর্মহীন কল্পনা, আপন মনে সৌন্দর্যের মরীচিকা রচনা, নিষ্ফল দুরাশা, অন্তরের নিগূঢ় বেদনা, আত্মপীড়ক অলস কবিত্ব—এই-সমস্ত নাগপাশের দ্বারা জড়িত বেষ্টিত হয়ে চুপ করে পড়ে আছি।'[১৩] এই মানসিক অবস্থার মধ্যেই তিনি ভগ্নহৃদয় কাব্যকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করছিলেন।

কিন্তু কেবল কর্মহীন কল্পনা ও অন্তরের নিগূঢ় বেদনা নিয়েই তিনি এ-সময়ে মগ্ন হয়ে থাকতে পারেন নি, কিছু বাস্তব বেদনাও তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। সিভিল সার্ভিস বা ব্যারিস্টারি পাস না করেই ইংলণ্ড থেকে অসময়ে ফিরে আসার জন্য আত্মীয়বন্ধুদের মধ্যে হয়তো কিছু বিরূপ গুঞ্জনও দেখা দিয়েছিল। ঐহিক সার্থকতার মানদণ্ডে যাঁরা সব-কিছু বিচার করেন তাঁদের মধ্যেই সমালোচনার সুরটি তীব্র হয়ে ওঠা স্বাভাবিক [অথচ মজা এই যে হেমেন্দ্রনাথ বা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ এ-ধরনের কোনো প্রশ্নই তোলেন নি]। শুভানুধ্যায়ীরাও হয়তো এই প্রতিভাবান তরুণকে ঐহিক দিক দিয়ে কৃতী হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথ ঠিক করেন যে, তিনি আবার ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে আসবেন। তিনি লিখেছেন, 'ব্যারিস্টার হইব বলিয়া বিলাতে আয়োজন শুরু করিয়াছিলাম, এমন সময় পিতা আমাকে দেশে ডাকিয়া আনাইলেন। আমার কৃতিত্বলাভের এই সুযোগ ভাঙিয়া যাওয়াতে বন্ধুগণ কেহ কেহ দুঃখিত হইয়া আমাকে পুনরায় বিলাতে পাঠাইবার জন্য পিতাকে অনুরোধ করিলেন।'[১৪] রবীন্দ্রনাথ কথাগুলি

লিখেছেন পরবর্তী বৈশাখ ১২৮৮-তে যখন দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা করেন সেই প্রসঙ্গে। কিন্তু তার অনেক পূর্ব থেকেই 'বন্ধুগণ' এই ইচ্ছা প্রকাশ করে আসছিলেন। তারই ফলে দার্জিলিঙে অবস্থানরত পিতার কাছে লিখিত একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই সংকল্প ব্যক্ত ও অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাঁর এই পত্রটি পাওয়া যায় নি, কিন্তু প্রত্যুত্তরে লিখিত দেবেন্দ্রনাথের পত্র থেকে বিষয়টি জানা যায়। ৮ ভাদ্র [সোম 23 Aug] তারিখের এই পত্রে তিনি লেখেন :

'প্রাণাধিক রবি—

আগামী সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ডে যাওয়া স্থির করিয়াছ এবং লিখিয়াছ যে, আমি 'বারিষ্টার হইব'। তোমার এই কথার উপরে এবং তোমার শুভ বুদ্ধির উপরে নির্ভর করিয়া তোমাকে ইংলণ্ডে যাইতে অনুমতি দিলাম। তুমি সৎপথে থাকিয়া কৃতকার্য্য হইয়া দেশেতে যথাসময়ে ফিরিয়া আসিবে, এই আশা অবলম্বন করিয়া থাকিলাম। সত্যেন্দ্র পাঠাবস্থাতে যতদিন ইংলণ্ডে ছিলেন, ততদিন...টাকা করিয়া প্রতিমাসে পাইতেন। তোমার জন্য মাসে...টাকা নির্দ্ধারিত করিয়া দিলাম। ইহাতে যত পাউণ্ড হয় তাহাতেই তথাকার তোমার যাবদীয় খরচ নির্ব্বাহ করিয়া লইবে। বারে প্রবেশের ফী এবং বার্ষিক চেম্বার ফী আবশ্যকমতে পাইবে। তুমি এবার ইংলণ্ডে গেলে প্রতিমাসে ন্যূনকল্পে একখানা করিয়া আমাকে পত্র লিখিবে। তোমার থাকার জন্য ও পড়ার জন্য সেখানে যাইয়া যেমন ব্যবস্থা করিবে তাহার বিবরণ আমাকে লিখিবে। গতবারে সত্যেন্দ্র তোমার সঙ্গে ছিলেন, এবার মনে করিবে আমি তোমার সঙ্গে আছি। আমার স্নেহ জানিবে। ইতি ৮ ভাদ্র ৫১ [ব্রাহ্ম সংবৎ: ১২৮৭ বঙ্গাব্দ]।'[১৫]

[মূল পত্রটি পাওয়া যায় নি, 'পত্রাবলী'-তেই টাকার অঙ্কটি উহ্য রাখা হয়েছে; অবশ্য আমরা জানি, ইংলণ্ড-প্রবাসের শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথকে ২০ পাউণ্ড (কম-বেশি ২৪০ টাকা) করে পাঠানো হত, পত্রেও হয়তো এই-ধরনের অঙ্ক উল্লিখিত হয়েছিল। পত্রটির মধ্যে 'তোমার শুভ বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া' 'তুমি সৎপথে থাকিয়া' প্রভৃতি বাক্যাংশগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। প্রথমবার বিলাত-প্রবাসের সময় কোনো কারণে দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের শুভবুদ্ধির উপর নির্ভরতা হারিয়েছিলেন বলেই হয়তো তাঁকে ফিরে আসার জন্য আদেশ করেছিলেন।]

পিতার কাছ থেকে অনুমতি পাওয়া সত্ত্বেও কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথের ইংলণ্ড যাওয়া হয় নি। কী কারণে তা সম্ভব হল না প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাবে তা বলা বা অনুমান করা শক্ত। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, '...কাদম্বরী দেবী তাঁহার শেষ জীবনাহুতি-দানের পূর্বে আর একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন।...মনে হয় এই সময়ে কাদম্বরী দেবী আত্মঘাতী হইবার চেষ্টা করায় পারিবারিক বিশৃঙ্খলার প্রতিঘাতে রবীন্দ্রনাথের বিলাত যাওয়া স্থগিত হইল।'[১৬] এই অনুমানের সমর্থন বা বিরুদ্ধতা করার মতো কোনো তথ্য আমাদের কাছে নেই।

জীবনী-কার এর পরে লিখেছেন, 'কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুবরণের চেষ্টা ব্যর্থ হইলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পত্নীকে সুস্থ করিবার জন্য এবং কলিকাতার জোড়াসাঁকোর পরিবেশ হইতে সরিয়া থাকিবার জন্য দূরে কোথাও বেড়াইতে যান।' ১৪ কার্তিক [শুক্র 29 oct] জামাতা সারদাপ্রসাদকে একটি পত্রে দেবেন্দ্রনাথ লেখেন [দার্জিলিং থেকে লেখা], 'জ্যোতি বোম্বাই পর্য্যন্ত যাইতেছেন তাঁহার অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত সদর কাছারির যাবদীয় কার্য্য তুমি কলিকাতায় থাকিয়া নির্ব্বাহ করিবে।'[১৭] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বোম্বাই অঞ্চলে কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন এবং কতদিন সেখানে অবস্থান করেছিলেন তা অবশ্য জানা যায় না। কিন্তু কার্তিক ১২৮৭ সংখ্যা ভারতী-তে 'নিঃস্বার্থ প্রেম' [পৃ ৩৪৪-৪৯; চলিত ভাষায় য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র-এর ঢঙে লেখা] নাম একটি গদ্য-রচনায় সম্ভবত এই ভ্রমণের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়; 'আমার বড় ইচ্ছা ছিল যে, তুমি বোল্‌বে—"অমুক জায়গায় আমি একটি সুন্দর উপত্যকা দেখলুম; সেখেনে একটি নির্ঝর বোয়ে যাচ্ছিল, জায়গাটা দেখেই মনে

হ'লে [া], আহা ভা—যদি এখেনে থাক্‌ত তা'হলে তার বড় ভাল লাগ্‌ত!' [পৃ ৩৪৫] বলা নিষ্প্রয়োজন, 'ভা—' কাদম্বরী দেবীর দেওয়া আদরের ডাকনাম 'ভানু'-রই আদ্যক্ষর। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবী যে কোন পার্বত্য অঞ্চলেই বেড়াতে গিয়েছিলেন, তার সমর্থনে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি উদ্ধার করা যায় : 'জ্যোতিদারা সকলে পাহাড়ে গিয়াছেন। বাড়ীর যেদিকটা জ্যোতিদার সেই অংশটা তখন সম্পূর্ণ আমার দখলে। আমি একাকী থাকিতাম তেতলার ছাতে। অক্ষয়বাবু (চৌধুরী) শুধু মাঝেমাঝে আসিতেন।'[১৮] এই সময়েই সন্ধ্যা সংগীত-এর কবিতা লেখার সূত্রপাত, সে-কথা আমরা পরে আলোচনা করব।

ইতিমধ্যে ভারতী-তে প্রকাশিত রচনাগুলির একটি পর্যালোচনা করে নেওয়া যেতে পারে।

ভারতী, ভাদ্র ১২৮৭ *[৪।৫]*

২১৯-২৯ 'বাঙ্গালি কবি নয়' দ্র সমালোচনা অ-২।৭৯-৮৬ ['নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি']

এই প্রবন্ধটি আশ্বিন-সংখ্যায় প্রকাশিত 'বাঙ্গালী কবি নয় কেন?' প্রবন্ধটির সঙ্গে একত্রে আলোচনা করা উচিত। যদিও দ্বিতীয় প্রবন্ধটি গ্রন্থভুক্ত হয় নি, কিন্তু একই ভাবনার সূত্র দুটি প্রবন্ধকে একত্রে গ্রথিত করেছে। রবীন্দ্র-জীবনের প্রথম পর্বের ইতিহাসে প্রবন্ধ দুটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের আলস্যময় ধীরগতির জীবনধারায় বাল্য ও কৈশোর অতিক্রম করে এক বয়ঃসন্ধিকালে রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে গিয়ে দেড় বৎসর কাটিয়ে আসেন। এর ফলে তাঁর চিন্তাধারায় এক আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়। আমরা জানি, পড়াশুনোর জন্য ইংলণ্ডে গেলেও তিনি ঐহিক উন্নতির চিন্তায় মগ্ন নিতান্ত গ্রন্থকীটের জীবন যাপন করেন নি; ইংরেজ জাতির গুণ ও তার স্বভাব-বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত কাছে থেকে তীক্ষ্নভাবে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করেছেন, এর সঙ্গে ইংরেজি সাহিত্যজগতে গভীর অনুপ্রবেশও ঘটেছিল অনেকটা নিজের চেষ্টায় ও কিছুটা হেনরি মরলির শিক্ষকতাগুণে। ফলে স্ত্রী-স্বাধীনতা, পারিবারিক ও সামাজিক আচার-ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধে যেমন তাঁর স্বতন্ত্র মতামত গড়ে উঠেছিল, সাহিত্য সম্বন্ধেও তেমনই নতুনভাবে ভাবতে শুরু করেছিলেন। এরই মধ্যে যখন তিনি ভগ্নহৃদয় কাব্যকে সম্পূর্ণ রূপ দিলেন—যেটি সম্বন্ধে তাঁর তখনকার ধারণা হল 'লেখাটা খুব ভালো হইয়াছে'—তখন স্বভাবতই তাঁর নিজের ও অন্যদের পূর্ববরচিত কবিতার সঙ্গে তুলনার মাধ্যমে ও দেশে প্রচলিত বিভিন্ন সাহিত্যিক ধ্যান-ধারণার মাপকাঠিতে কাব্যটির গুণাগুণ বিচার করার আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে জাগতেই পারে। তাছাড়া পারিবারিক-বন্ধু ও তাঁর সাহিত্য-রসের দীক্ষাগুরু অক্ষয় চৌধুরীর সঙ্গে তর্কবিতর্ক তো ছিলই। আমাদের ধারণা, এই নবলব্ধ সাহিত্যতত্ত্ব-জিজ্ঞাসার প্রতিঘাতেই বর্তমান প্রবন্ধ দুটি এবং পরে 'বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা' 'কাব্যের অবস্থা পরিবর্ত্তন-প্রভৃতি প্রবন্ধ রচিত হয়।

দেশীয় সাহিত্যিক-ভাবনার পরিচয় নিতে গিয়েই সম্ভবত বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮২ [পৃ ৩৯৩-৪০৪]-তে মুদ্রিত 'বাঙ্গালী কবি কেন' [প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মনে করেছেন, প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা] ও মাঘ ১২৮১ [পৃ ১৮৫-৮৯]-র বান্ধব-এ মুদ্রিত কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'নীরব কবি' [১২৮৪-তে প্রকাশিত 'প্রভাত চিন্তা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত] প্রবন্ধ দুটির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তখনও পর্যন্ত বাংলায় সাহিত্যতত্ত্ব-বিষয়ক আলোচনা যথেষ্ট পরিমাণে শুরু হয় নি, সেই দিক থেকে প্রবন্ধ দুটির গুরুত্ব আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাঁদের বক্তব্য মেনে নেওয়া সম্ভব হয় নি। কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'নীরব কবি' ধারণার প্রতিবাদে তিনি লেখেন, 'কবিতা প্রকাশ না করিলে কাহাকেও কবি বলা যায় না।... যে ভাববিশেষ ভাষায় প্রকাশ হয় নাই তাহা কবিতা

নহে, ও যে ব্যক্তি ভাব বিশেষ ভাষায় প্রকাশ করে না, সেও কবি নহে।' অপরপক্ষে বঙ্গদর্শন-এ প্রকাশিত মত সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য : 'কল্পনা প্রবল হইলেই কবি হয় না। সুমার্জ্জিত, সুশিক্ষিত ও উচ্চ শ্রেণীর কল্পনা থাকা আবশ্যক।' সুপ্রসিদ্ধ কবিরাও যে শিক্ষিত কল্পনার অভাবে ত্রুটিপূর্ণ কবিতা লেখেন, তার উদাহরণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ Christopher Marlow[1564-93]-র 'The Passionate Shepherd to His Love' ['Come live with me and be my love'] নামক বিখ্যাত কবিতাটির সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করেন ও মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কমলে-কামিনীতে ষোড়শী সুন্দরীর হস্তী গ্রাস ও উদগারের বর্ণনায় 'পরিমাণ সামঞ্জস্যের অভাব' কিভাবে আমাদের সৌন্দর্যজ্ঞানে আঘাত করে সে-কথা উল্লেখ করেন।

দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে উদাহরণগুলি আধুনিক বাংলা সাহিত্য থেকে গৃহীত হয়েছে। তিনি লিখেছেন, 'এই মুহূর্ত্তে আমার হস্তে অবকাশরঞ্জিনী দ্বিতীয় ভাগ [নবীনচন্দ্র সেন-প্রণীত, প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১২৮৪] রহিয়াছে। সমস্ত বহি খুঁজিয়া দুই একটি মাত্র স্বভাব বর্ণনা দেখিলাম। তাহাও এমন নির্জ্জীব ও নীরস, যে, পড়িয়া স্পষ্ট মনে হয়, কবি যাহা বর্ণনা করিতেছেন, প্রাণের সহিত তাহা উপভোগ করেন নাই। লিখা আবশ্যক বিবেচনায় লিখিয়াছেন।' এর পর তিনি উক্ত গ্রন্থের 'কে তুমি?' [পৃ ২৭০], 'চিত্র' [পৃ ২৭২] ও 'কেন ভালবাসি?' [পৃ ২৭৩] কবিতা থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করেছেন এবং বিহারীলাল চক্রবর্তীর বঙ্গসুন্দরী কাব্যের 'সুরবালা' কবিতার দীর্ঘ অংশ [পৃ ২৭৩-৭৪] উদ্ধৃত করে লেখেন, 'ইহাতে নিবিড় কেশভার, ঘন কৃষ্ণ আঁখি তারা, সুগোল মৃণাল ভুজ নাই তাই বোধ করি ইহার কবি বঙ্গীয় পাঠক সমাজে অপরিচিত, তাঁহার কাব্য অপঠিত।' এছাড়াও ইংরেজ কবি Shelley-র 'Epipsychidion' [পৃ ২৬৭-৬৮], 'The Woodman and the Nightingle' [পৃ ২৬৯-৭০] প্রভৃতি কবিতা থেকে কয়েকটি অংশও উদ্ধৃত হয়েছে। এই উদ্ধৃতিগুলি ও তৎ-সংশ্লিষ্ট মন্তব্যগুলি থেকে রবীন্দ্রনাথের মানস-প্রবণতাটি ধরা পড়ে।

এই প্রবন্ধদ্বয়ে বিশ্লেষিত সাহিত্য-তত্ত্ব পরবর্তীকালেও রবীন্দ্রনাথের মনকে অধিকার করে ছিল, তার প্রমাণ আছে ছিন্নপত্রাবলী-র ১০৭ নং পত্রে [৩০ আষাঢ় ১৩০০, পৃ ২৩০] ও 'সাহিত্যের সামগ্রী' [বঙ্গদর্শন, কার্তিক ১৩১০। ৩১৭-২২, সাহিত্য ৮। ৩৪৩-৪৮] প্রবন্ধে। কিন্তু কেবলমাত্র এই কারণে আমরা প্রবন্ধ দুটিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি নি, এর প্রকৃত মূল্য বিচার করা উচিত ভগ্নহৃদয় কাব্যরচনার পটভূমিকায়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করেছেন জীবনস্মৃতি-র 'ভগ্নহৃদয়' অধ্যায়ে। তিনি লিখেছেন, 'তখনকার দিনে আমাদের সাহিত্যদেবতা ছিলেন শেক্‌সপীয়র মিল্‌টন ও বায়রন। ইঁহাদের লেখার ভিতরকার যে-জিনিসটা আমাদিগকে খুব করিয়া নাড়া দিয়াছে সেটা হৃদয়াবেগের প্রবলতা। এই হৃদয়াবেগের প্রবলতাটা ইংরেজের লোকব্যবহারে চাপা থাকে কিন্তু তাহার সাহিত্যে ইহার আধিপত্য যেন সেই পরিমাণেই বেশি। হৃদয়াবেগকে একান্ত আতিশয্যে লইয়া গিয়া তাহাকে একটা বিষম অগ্নিকাণ্ডে শেষ করা, এই সাহিত্যের একটা বিশেষ স্বভাব। অন্তত সেই দুর্দাম উদ্দীপনাকেই আমরা ইংরেজি সাহিত্যের সার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমাদের বাল্যবয়সের সাহিত্যদীক্ষাদাতা অক্ষয় চৌধুরী মহাশয় যখন বিভোর হইয়া ইংরেজি কাব্য আওড়াইতেন তখন সেই আবৃত্তির মধ্যে একটা তীব্র নেশার ভাব ছিল।'[১৯] বাঙালি সমাজের একঘেয়ে বেড়ার মধ্যে ঘেরা ছোটো ছোটো কর্মক্ষেত্রে হৃদয়ের লীলাবৈচিত্র্যের সুযোগ অল্প, 'এইজন্যই ইংরাজি সাহিত্যে হৃদয়াবেগের এই বেগ এবং রুদ্রতা আমাদিগকে এমন একটি প্রাণের আঘাত দিয়াছিল যাহা আমাদের হৃদয় স্বভাবতই প্রার্থনা করে।' অথচ 'য়ুরোপীয় চিত্তের এই চাঞ্চল্য, এই নিয়মবন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ' সেখানকার ইতিহাস থেকেই সাহিত্যে

প্রতিফলিত হয়েছিল, যা বাংলাদেশের ইতিহাস ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সর্বাংশে সত্য ছিল না। এই সত্যের অভাবকে বাঙালি কবিরা অসত্য ও অসংযমের দ্বারা পূর্ণ করার চেষ্টা করছিল, ভগ্নহৃদয় কাব্য সেই মানসিক অবস্থারই সৃষ্টি; অথচ সচেতন চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ শেলীর কবিতা উদ্ধৃত করেই তাঁর বক্তব্যকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, বায়রনের কবিতা দিয়ে নয়।

২২৯ 'কামিনী ফুল' ['রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।/ছি ছি সখা কি করিলে'] দ্র শৈশবসঙ্গীত অ-১। ৪৯৩

রবিচ্ছায়া [বিবিধ ৪৩]। ৪০-এ গানটির সুর-তাল 'মিশ্রছায়ানট—ঝাঁপতাল'; গীতবিতান [৩।৯৫০]-এও গানটি সংকলিত হয়েছে, কিন্তু সুরটি সংরক্ষিত না হওয়ায় স্বরলিপি পাওয়া যায় না। মনে হয়, গানটি ভগ্নহৃদয়-এর জন্যই রচিত হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাব্যে ব্যবহৃত না হওয়ায় স্বতন্ত্র কবিতা-রূপে প্রকাশিত হয়।

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ একটি সুন্দর উপহার লাভ করেছেন। 'সাশ্রু-সম্প্রদান' [ভারতী, বৈশাখ ১২৮৭], 'সাধের ভাসান' [ঐ, পৌষ ১২৮৬], 'খড়্গ-পরিণয়' [ঐ, চৈত্র ১২৮৬] এবং 'অভাগিনী' এই চারটি গাথা-কবিতা নিয়ে স্বর্ণকুমারী দেবীর 'গাথা' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।* ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা অনুযায়ী গ্রন্থটির প্রকাশ-তারিখ 20 Dec 1880 [৬ পৌষ] উল্লেখ করলেও এটি আশ্বিন ১২৮৭-র পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল, কারণ 19 Sep 1880 [৪ আশ্বিন] তারিখের *The Sunday Mirror* [Vol. XX, No. 244, p. 5] পত্রিকায় কাব্যটির একটি প্রশংসামূলক সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথকে 'উপহার' দিয়ে স্বর্ণকুমারী লেখেন :

'ছোট ভাইটি আমার,
যতনে গাথা হার কাহারে পরাব আর?
স্নেহের রবিটি, তোরে আয়রে পরাই,
যেন রে খেলার ভুলে ছিঁড়িয়ে ফেলোনা খুলে,
দুরন্ত ভাইটি তুই—তাইতে ডরাই।'

লক্ষণীয় এইটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের নামে এ-পর্যন্ত দুটি গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হল—প্রথমটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অশ্রুমতী' এবং দ্বিতীয়টি স্বর্ণকুমারী দেবীর 'গাথা'—[যদিও এই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত তাঁর দুটি গ্রন্থের একটিও কাউকে উৎসর্গ করা হয় নি।* প্রকাশিতব্য তৃতীয় গ্রন্থ ভগ্নহৃদয় প্রথমে ভারতী-তে ও পরে গ্রন্থাকারে কাদম্বরী দেবীকে উপহার দেওয়া হয়েছে, নাম উল্লেখ না করলেও আত্মীয়-বন্ধুদের পক্ষে বোঝা শক্ত ছিল না উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি কে]—সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি অগ্রজ ও অগ্রজার স্নেহোপহার হিসেবে এগুলিকে গণ্য করা যেতে পারে, অবশ্য এই উপহার আরও তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে তরুণ প্রতিভার স্বীকৃতি-রূপে এগুলিকে বিবেচনা করলে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অসংখ্য গ্রন্থের রচয়িতা হয়েও রবীন্দ্রনাথ স্বর্ণকুমারী দেবীর নামে কোনো গ্রন্থোৎসর্গ করে এই উপহারের প্রতিদান দেন নি!

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কৌতূহলজনক তথ্যের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। 'গাথা'-গুলিতে বিভিন্ন চরিত্রের নামকরণ করতে গিয়ে স্বর্ণকুমারী যে নামগুলি ব্যবহার করেছেন সেগুলি হল—নলিনী, অজিত, বিনোদ, পৃথ্বিরাজ, অলকা, চপলা, দামিনী ও বিপিন। এর প্রত্যেকটি নাম রবীন্দ্রনাথের

কৈশোরক রচনায় বার বার ব্যবহৃত হয়েছে—নলিনী ও দামিনী-র কথা তো বলাই বাহুল্য, তাঁর পরিণত রচনাতেও এ-দুটি নামের সাক্ষাৎ মেলে। এছাড়া অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর 'সাগর-সঙ্গমে' [ভারতী, অগ্র°-মাঘ ১২৮৫] গাথার নায়ক-নায়িকার নাম বিজয় ও দামিনী [রবীন্দ্রনাথের 'লীলা'-শীর্ষক গাথায় প্রতি-নায়কের নাম বিজয়] এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ব্রহ্মদেশীয় নাটক রজত-গিরি [ভারতী, কার্তিক-অগ্র° ১২৮৫] নামে অনুবাদ করতে গিয়ে নায়িকার নামকরণ করেছেন 'দামিনী'। খুব ঘনিষ্ঠ কয়েকজন লেখক-লেখিকা তাঁদের কাব্য-নাটকে [যাদের রচনাকালের ব্যবধান খুবই কম] মাত্র কয়েকটি নামের বৃত্তেই আবদ্ধ রয়েছেন, এই যোগাযোগটি কি নিতান্তই কাকতালীয়?

স্বর্ণকুমারী দেবীর 'খড়্গ-পরিণয়' গাথায় রবীন্দ্রনাথের 'তারে দেহ গো আনি' [ভারতী, চৈত্র ১২৮৬।৫৫৫] গানটি ব্যবহৃত হয়েছিল, গ্রন্থে অবশ্য সেটি পরিত্যক্ত হয়। গানটি পরে রবিচ্ছায়া। ৪৪ [বিবিধ ৪৯]-এ 'বেহাগ —আড়াঠেকা' সুর-তাল নির্দেশ-সহ সংকলিত হয়েছে, দ্র গীতবিতান ৩।৮৮৩; সুরটি ইন্দিরা দেবী-কৃত স্বরলিপিতে স্বরবিতান ৩৫ খণ্ডে সংরক্ষিত।

ভারতী, আশ্বিন ১২৮৭ *[৪।৬]:*

২৫৭-৭৫ 'বাঙ্গালী কবি নয় কেন?'

২৮৫-৮৬ 'শরতে প্রকৃতি' দ্র প্রভাতসংগীত-সং র°র° ১[প.ব.]। ১০৮-১০

কবিতাটি প্রভাতসঙ্গীত [বৈশাখ ১২৯০] কাব্যগ্রন্থের ১৭-সংখ্যক কবিতা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। 'বিজ্ঞাপন'-এ রবীন্দ্রনাথ লেখেন, ''শরতে-প্রকৃতি'' ''শীত'' ও গুটিকতক অনুবাদ ব্যতীত প্রভাত সঙ্গীতের আর সমুদয় কবিতাগুলিই সম্প্রতি লিখিত হইয়াছে।' এর থেকে পুলিনবিহারী সেন অনুমান করেছেন, 'এটিকে 'কৈশোরক' রচনা বলা যাইতে পারে।'[২০] অবশ্য কবিতাটি ভারতী-তে প্রকাশের সমকালবর্তী রচনা হওয়াও সম্ভব। প্রভাতসঙ্গীত-এর পরবর্তী সংস্করণসমূহে এটি বর্জিত হয়েছে।

২৮৭-৯১ 'অকারণ কষ্ট' [?]।

প্রবন্ধটিকে সজনীকান্ত দাস, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সকলেই রবীন্দ্রনাথের রচনা বলে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আমরা এ-সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করি। এই প্রবন্ধে বর্ণিত মনোভাবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন মানসিকতার সাদৃশ্য আছে, নিজের গভীর অনুভূতি নিয়ে শ্লেষ বা পরিহাসও তাঁর রচনায় দুর্লভ নয় —কিন্তু তা করতে গিয়ে নিজের রচনাই সম্পূর্ণ উদ্ধৃত ও বিশ্লেষণ করা[*] একটু অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। সেইজন্য আমাদের অনুমান, প্রবন্ধটি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর রচনা—এই অসমবয়সী বন্ধু বহুবারই বয়সের ব্যবধান ঝেড়ে ফেলে কবিতায় বা প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হাস্য-পরিহাস-ব্যঙ্গ-শ্লেষ প্রভৃতিতে মেতে উঠেছেন এমন উদাহরণ আমরা আগেও পেয়েছি, পরেও খুব দুর্লভ নয়—বায়রনের কবিতার কাব্যানুবাদটিও ['যদিও বা ত্যজি বিরামের আশা', পৃ ২৮৯] তাঁর কাব্যভাষার চিহ্ন বহন করে। [বস্তুত, অক্ষয়চন্দ্রও যে ভারতী-র একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন, যে দুই কবি-বিহঙ্গের জন্য নীড় বেঁধে দেওয়ার তাগিদে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ভারতী প্রকাশের পরিকল্পনা করেন অক্ষয়চন্দ্র ছিলেন তাঁর অন্যতম—একথা আদৌ মনে রাখা হয় নি, ফলে অনেক কবিতা ও আত্মভাবনামূলক প্রায় সমস্ত গদ্যরচনাই নির্বিচারে রবীন্দ্রনাথের বলে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে।]

২৯১ 'হর-হৃদে কালিকা' ['কে তুই লো হরহৃদি আলো করি দাঁড়ায়ে'] দ্র শৈশবসঙ্গীত অ-১।৪৯৭-৯৮

অপৌত্তলিক ব্রাহ্মধর্মের আবহাওয়ায় পরিবর্ধিত তরুণ রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কবিতার বিষয়টি একটু অভিনব। এর আগে ভারতীর প্রথম বর্ষে যদিও তিনি 'আগমনী', ও 'ভারতীবন্দনা' লিখেছেন, কিন্তু সেগুলি ছিল ফরমায়েশি-ধরনের রচনা—বিশেষ উদ্দেশ্যের তাগিদে রচিত। বর্তমান কবিতাটিও শারদীয়া পূজার মাসে প্রকাশিত, সুতরাং ফরমায়েশের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু কবিতাটি নিজস্ব কাব্যমূল্যে তার সাময়িকতার সীমাকে অতিক্রম করেছে। পরবর্তীকালে বহুকথিত তাঁর নটরাজ শিবের ধারণার পূর্বাভাস হিসেবে কবিতাটির একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা আছে।

২৯২-৯৩ 'সম্পাদকের বৈঠক। (ডাকিনী। ম্যাকবেথ্)' দ্র জীবনস্মৃতি [১৩৬৮]। ১৭৪-৭৫

এই অনুবাদ কাব্যাংশটি রবীন্দ্রজীবনের 'ঘরের পড়া' অধ্যায়ের রচনা। এটি সম্পর্কে আমরা পূর্বে যথাস্থানে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

বিষয়ান্তরে যাবার আগে এখানে রবীন্দ্রজীবনের আর-একটি প্রসঙ্গ আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে ভারতী-র বর্তমান সংখ্যায় [আশ্বিন ১২৮৭।২৯৮] বিহারীলাল চক্রবর্তীর "চাঁদা আয় আয় আয়!" ['রাগিণী পরজ কালাংড়া/বালা খেলা করে চাঁদের কিরণে'] শিরোনামে একটি গান[২১] প্রকাশিত হয়, রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি-তে সেটির উল্লেখ করেছেন। বিহারীলালের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা ছিল, সেই সূত্রে ঠাকুরবাড়িতেও তাঁর যাতায়াত ছিল। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তথা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের সূত্রপাত ভারতী পত্রিকার সূত্রে ১২৮৪ বঙ্গাব্দের শেষ দিকে, এ-কথা আমরা আগেই বলেছি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তখন বিলাত যাত্রার ভূমিকা-স্বরূপ আমেদাবাদে যাওয়ার আয়োজনে ব্যস্ত, সুতরাং কবির সঙ্গে পরিচয় হলেও তা যথেষ্ট গভীর হবার অবসর লাভ করে নি। সেই সুযোগটি ঘটল ইংলণ্ড থেকে প্রত্যাবর্তনের পর। আমরা জানি, বাল্যকালে অবোধবন্ধু পত্রিকায় প্রকাশিত বঙ্গসুন্দরী কাব্য ও ১২৮১ বঙ্গাব্দে আর্য্যদর্শন-এ প্রকাশিত সারদামঙ্গল কাব্যের বিমুগ্ধ পাঠক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ইতিমধ্যে পৌষ ১২৮৬-তে সারদামঙ্গল গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ও পরের মাসেই ভারতী-তে সম্ভবত অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী কাব্যটির একটি সুদীর্ঘ রসগ্রাহী সমালোচনা লেখেন। এর মধ্যে বিহারীলালও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'নন্দন-কানন'-এ সাহিত্য ও সংগীতের আসরে নিয়মিত অভ্যাগত হয়ে উঠেছেন। রবীন্দ্রনাথ এতদিন দূর থেকে একলব্যের মতো তাঁকে কাব্যগুরুর আসনে বসিয়ে কাব্যসাধনা করে যাচ্ছিলেন। সুতরাং তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুযোগ তিনি পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করবেন এইটাই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। দিনে-দুপুরে যখন-তখন তাঁহার বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইতাম। তাঁহার দেহও যেমন বিপুল তাঁহার হৃদয়ও তেমনি প্রশস্ত।... তাঁহার মধ্যে পরিপূর্ণ একটি কবির আনন্দ ছিল। যখনই তাঁহার কাছে গিয়াছি, সেই আনন্দের হাওয়া খাইয়া আসিয়াছি। তাঁহার তেতালার নিভৃত ছোটো ঘরটিতে পঙ্খের-কাজ-করা মেজের উপর উপুড় হইয়া গুন্ গুন্ আবৃত্তি করিতে করিতে মধ্যাহ্নে তিনি কবিতা লিখিতেছেন, এমন অবস্থায় অনেকদিন তাঁহার ঘরে গিয়াছি—আমি বালক হইলেও এমন একটি উদার হৃদ্যতার সঙ্গে তিনি আমাকে আহ্বান করিয়া লইতেন। যে, মনে লেশমাত্র সংকোচ থাকিত না। তাহার পরে ভাবে ভোর হইয়া কবিতা শুনাইতেন, গানও গাহিতেন।... তাঁহার কণ্ঠের সেই গানগুলি এখনো মনে পড়ে—'বালা খেলা করে চাঁদের কিরণে', 'কে রে বালা কিরণময়ী ব্রহ্মরন্ধ্রে

বিহরে’[২২]। তাঁহার গানে সুর বসাইয়া আমিও তাঁহাকে কখনো কখনো শুনাইতে যাইতাম।’[২৩] দ্বিতীয় গানটির উল্লেখ বুঝিয়ে দেয় যে, তাঁদের সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।

ভারতী, কার্তিক ১২৮৭ *[৪।৭]:*

৩৩৬-৪৪ ‘ভগ্ন-হৃদয়।/(গীতি কাব্য)’

৩৩৬ ‘ভূমিকা।’

৩৩৬-৩৭ ‘কাব্যের পাত্র’

৩৩৭ ‘উপহার/রাগিণী—ছায়ানট।/তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।’

৩৩৭-৪৪ ‘ভগ্ন-হৃদয়।/ প্রথম সর্গ’ দ্র ভগ্নহৃদয়। অ-১।১২৫-৩৯

আমরা আগেই বলেছি, সম্ভবত সমগ্র কাব্যটি রচনা সমাপ্ত হয়ে যাবার পরই রবীন্দ্রনাথ ‘ভগ্নহৃদয়’ ভারতী-তে প্রকাশ করার জন্য দেন—‘ভূমিকা’, ‘কাব্যের পাত্র’, ‘উপহার’ ইত্যাদি সহ পত্রিকায় মুদ্রিত হওয়া তারই প্রমাণ। ‘ভূমিকা’য় তিনি লেখেন, ‘নিম্ন-লিখিত কাব্যটিকে কাহারো যেন নাটক বলিয়া ভ্রম না হয়। দৃশ্যকাব্য ফুলের গাছের মত; তাহাতে ফুল ফুটে, কিন্তু সে ফুলের সঙ্গে শিকড়, কাণ্ড, শাখা, পত্র, কাঁটাটি পর্য্যন্ত থাকা আবশ্যক। নিম্ন-লিখিত কাব্যটি ফুলের তোড়া। গাছের আর সমস্ত বাদ দিয়া কেবল মাত্র ফুলগুলি সংগ্রহ করা হইয়াছে। নাটকাকারে কাব্য লিখিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, দৃষ্টান্ত স্বরূপেই ফুলের কথা উল্লেখ করা হইল।’ গ্রন্থে অবশ্য ভূমিকার ভাষায় কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথও প্রথমে নাটকের মতো ‘অঙ্ক’ লিখেছিলেন, পরে কেটে দিয়ে ‘সর্গ’ লেখেন।

‘উপহার’ হিসেবে যে গানটি ব্যবহৃত হয়েছে, তার আদি রূপটি পাওয়া যায় মালতীপুঁথির 26/১৪খ পৃষ্ঠায় —এই পৃষ্ঠায় ভগ্নহৃদয়-এ ব্যবহৃত আরও কতকগুলি গানের খসড়া রয়েছে, যা থেকে মনে হয় উক্ত গানটিও এই কাব্যে ব্যবহারের জন্যই রচিত হয়েছিল; পূর্বপৃষ্ঠায় [25/১৪ক] পেত্রার্কার কয়েকটি কবিতার অনুবাদ দেখে অনুমান করা যায় গানগুলি আমেদাবাদ বা বোম্বাইতে রচিত। অবশ্য পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত পাঠের সঙ্গে আরও দুটি ছত্র—‘চরণে দিনু গো আনি—এ ভগ্নহৃদয়খানি/চরণ রঞ্জিবে তব হৃদিশোণিত ধারা’-যুক্ত করে ‘উপহার’টি রচিত হয়েছিল; আবার এই দুটি ছত্র বাদ দিয়ে এবং একটি ছত্র ও সামান্য কয়েকটি শব্দ পরিবর্তন করে তিন মাস পরে ব্রহ্মসংগীত হিসেবে ১১ মাঘে একপঞ্চাশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের সায়ংকালীন উপাসনায় গীত হয়—সেখানে সুরটিও অবশ্য সামান্য আলাদা—‘রাগিণী আলাইয়া—তাল ঝাঁপতাল’ [দ্র তত্ত্ববোধিনী, ফাল্গুন ১৮০২ শক। ২১১]। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় গানটি পরিত্যক্ত হয়ে একটি দীর্ঘ কবিতা ‘উপহার’ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আসলে কাব্যটির উপহার-কবিতা নির্বাচনে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট দ্বিধার পরিচয় দিয়েছেন। এর আগে প্রকাশিত তাঁর দুটি কাব্যগ্রন্থ ‘কবি-কাহিনী’ ও ‘বনফুল’ কাউকে উৎসর্গ করা হয়নি এবং এগুলির মুদ্রণের সঙ্গে তাঁর বিশেষ কোনো সম্পর্ক ছিল না, সুতরাং অনুরূপ কোনো সমস্যার দ্বারা তিনি পীড়িত হননি। কিন্তু বর্তমান কাব্যটির ক্ষেত্রে সমস্যাটিকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। প্রথমে তিনি বহু পূর্বে আশ্বিন ১২৮৪-র শেষ সপ্তাহে[*] রচিত ‘ছেলেবেলা হোতে বালা, যত গাঁথিয়াছি মালা’ [মালতীপুঁথি, পৃষ্ঠা 57/৩০ক] কবিতাটিই সম্ভবত নির্বাচন করেছিলেন, এর শীর্ষনাম ‘উপহার গীতি’ ও তার ডানপাশে ‘ভগ্নহৃদয়ের/উপরে’

মন্তব্য লেখা আছে। কবিতাটির শেষ ছত্রে 'ভগ্নহৃদয়ের এই প্রীতি উপহার' লেখা থাকায় নির্বাচনটি সহজ হয়েছিল। কিন্তু ভারতী-তে প্রকাশের সময়ে উপহার-টিকে কিছুটা নৈর্ব্যক্তিক করে তুললেন গানটি ব্যবহার করে। তবুও 'আঁধার হৃদয়মাঝে দেবীর প্রতিমা-পারা' এই ষষ্ঠ ছত্রটিতে ব্যক্তিগত হৃদয়াবেগের যে স্পর্শটুকু থেকে গিয়েছিল, সেটুকুকেও মুছে দেওয়া হয়েছে উক্ত ব্রহ্মসংগীতে ছত্রটিকে 'তিলেক অন্তর হলে না হেরি কূলকিনারা'-রূপে পরিবর্তিত করে। অবশ্য গ্রন্থে যে দীর্ঘ কবিতাটি উপহাররূপে ব্যবহৃত হয়েছে, সেটিতে রবীন্দ্রনাথ সমস্ত দ্বিধাই কাটিয়ে উঠেছেন, আমরা যথাস্থানে সে-সম্পর্কে আলোচনা করব।

ভারতী-র বর্তমান সংখ্যায় ভগ্নহৃদয় কাব্যের প্রথম সর্গটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু গ্রন্থপ্রকাশের সময় কিছু কিছু অতিরিক্ত অংশ সংযোজিত হয় এবং শেষ গানটি ['কেগো বোলে দেবে এ কেমন ভাব/উঠেছে হৃদয়ে মোর?'] বর্জন করে মালতীপুঁথি [পৃষ্ঠা 70/৩৬খ] থেকে পূর্বলিখিত 'কত দিন এক সাথে ছিনু ঘুমঘোরে' [দ্র রবিচ্ছায়া। ৯০, বিবিধ ১০৮, ভৈরবী—কাওয়ালি; গীতবিতান ৩।৭৭০; সুরটি রক্ষিত হয়নি] গানটি যুক্ত হয়। ভারতী-তে প্রকাশিত গানটি আর কোথাও সংকলিত হয়নি।

প্রথম সর্গের আর দুটি গান হল:

১. মুরলার গান। 'ক্ষমা কর মোরে সখি, শুধায়ো না আর' [৩৪০] দ্র রবিচ্ছায়া। ৮৯, বিবিধ ১০৬, ঝিঁঝিট—কাওয়ালি; গীতবিতান ৩।৭৬৯; মালতীপুঁথি 26/১৪খ পৃষ্ঠা। স্বরবিতান ৫১-তে ইন্দিরা দেবী-কৃত ২+৩ মাত্রার তালে নিবদ্ধ একটি স্বরলিপি পাওয়া যায়।

২. কবি। 'সখি, আর কত দিন সুখহীন শান্তিহীন' [৩৪৩] দ্র রবিচ্ছায়া। ৯০, বিবিধ ১০৭, জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল; গীতবিতান ৩।৭৬৯; স্বরলিপি নেই।

ভগ্নহৃদয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত [১২৮৮] হওয়ার পর দীর্ঘদিন এর পুনর্মুদ্রণ না হলেও কিছু কিছু অংশ [গান ছাড়াও] কবিতা রূপে শিরোনাম-সহ কাব্যগ্রন্থাবলী-র [১৩০৩] 'কৈশোরক' অংশে মুদ্রিত হয়েছিল। প্রথম সর্গে মুরলার উক্তি 'সূর্য্যমুখী ফুল, সখি, আমি ভালবাসি বড়' [১২৮-২৯] 'বাসকসজ্জা' নামে উক্ত গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় [পৃ ৫]।

৩৪৪-৪৯ 'নি[ঃ]স্বার্থ প্রেম'

চলিত ভাষায় য়ুরোপপ্রবাসীর পত্রের ঢঙে লেখা এই পত্র-প্রবন্ধটি এতদিন কারোর দৃষ্টি আকর্ষণ না করলেও, আমাদের ধারণা এটি রবীন্দ্রনাথের রচিত। এই অধ্যায়েই অন্যত্র আমরা প্রবন্ধটি থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করেছি, তাতে 'ভা—' কথাটি নিঃসন্দেহে ভানুসিংহ অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথকে লেখক হিসেবে চিনিয়ে দেয়। আর একটু খুঁটিয়ে বিচার করলে ভগ্নহৃদয় কাব্য কাদম্বরী দেবীকে উৎসর্গ করার জন্য খানিকটা আত্মপক্ষসমর্থনের ভাবও হয়তো প্রবন্ধটির মধ্যে পাওয়া যায়। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর লেখা 'অকারণ কষ্ট' প্রবন্ধের শ্লেষাত্মক উক্তির প্রত্যুত্তরও দুর্লক্ষ্য নয়। তাছাড়া এখানে প্রেমতত্ত্বের যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বয়ঃসন্ধিকালের প্রেমচেতনার সঙ্গে তার সাদৃশ্যটিও লক্ষণীয়। প্রবন্ধের শেষাংশ থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করছি : 'তোমার চিঠি পোড়ে একটা কারণে বড় হাসি পে'লে। ভাবে বোধ হয় যে, তোমার মতে যারা নিঃস্বার্থ ভালবাসে তারা ভালবাসার পাত্রের কাছে যে আদর না পেয়েও কেবল সুখী থাক্‌বে তা' নয়, অনাদর পেয়েও তারা কষ্ট পাবে না। যে রকম অবস্থা হোক্ না তারা কেবল নিজে ভাল বেসেই সুখী থাক্‌বে। ভালবাসার লোকের মিষ্টি হাসি মুখখানি দেখ্‌লে যদি নিঃস্বার্থ প্রেমিকের আনন্দ হয় তবে তার কাছে আদর

পেলেই বা কেন না হবে। তার মুখখানি না দেখলে যদি কষ্ট হয় তবে আদর গেলেই বা কষ্ট না হবে কেন? আমি কাকে স্বার্থপর ভালবাসা বলি জান? যে ভালবাসা খাঁটি ভালবাসা নয়। ভালবাসার গিল্টি করা ইন্দ্রিয়-বিকার। সে ভালবাসায় ভালবাসার চাকচিক্য আছে, ভালবাসার সুবর্ণ বর্ণ আছে, কেবল ভালবাসা নেই। সে রকম ভালবেসে যে তোমার ভালবাসার পাত্রকে তোমার চক্ষে অত্যন্ত নীচ কোরে ফেল্‌চ তা'তে তোমার বুকে লাগে না। তোমার চক্ষে সে যে রক্তমাংসের সমষ্টি একটা উপভোগ্য সামগ্রী বই আর কিছুই দাঁড়াচ্ছে না, তা'তে তোমার কিছুমাত্র আত্মগ্লানি উপস্থিত হয় না!...' [পৃ ৩৪৮-৪৯]

ভারতী, অগ্র° ১২৮৭ *[৪।৮]:*

৩৫১-৫৭ 'ভগ্নহৃদয়'।

৩৫১-৫৪ দ্বিতীয় সর্গ দ্র ভগ্নহৃদয় অ-১। ১৩৯-৪৬

৩৫৪-৫৭ তৃতীয় সর্গ দ্র ঐ। ১৪৬-৫২

আমরা আগেই বলেছি, ভগ্নহৃদয়-এর পাণ্ডুলিপিতে দ্বিতীয় সর্গের সূচনাতেই পাতার উপরে 'S. S. Oxus/February/1880' লেখা আছে—যার থেকে বোঝা যায় বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তন-কালে অন্তত এই অংশটি সমুদ্রপথে স্টীমারে বসে লেখা। ওই পৃষ্ঠাতেই 'কাপি ফেরত চাই/নষ্ট করা না হয়/R.T.' নির্দেশ দেখে বুঝতে পারি পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাগুলিই প্রেসকপি হিসেবে মুদ্রাকরের কাছে প্রেরিত হয়েছিল, অন্যত্রও এইরূপ কিছু কিছু নির্দেশ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় সর্গে নলিনীর 'শ্যামার প্রতি গান'—'নাচ্‌, শ্যামা, তালে তালে' সমালোচকদের মুগ্ধ করেছিল এবং এর দীর্ঘ অংশ গ্রন্থ-সমালোচনায় উদ্ধৃত হয়েছিল, তা আমরা পরে দেখতে পাব। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গীতগ্রন্থেও এটি অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত আকারে সংকলিত হয়েছে, দ্র 'বিবাহ-উৎসব' গীতিনাট্য [১২৯০]; রবিচ্ছায়া। ৯১ [বিবিধ ১০৯]; গানের বহি [১৩০০]। ২০১, খাম্বাজ; গীতবিতান ৩।৭৭০; কাব্যগ্রন্থাবলী-তে [১৩০৩] 'কৈশোরক' অংশে 'শ্যামা' নামে কবিতা হিসেবে মুদ্রিত [পৃ ৫-৬]। 'বিবাহ-উৎসব/(গীতিনাট্য।)/(মহিলা শিল্পমেলায় অভিনীত।)/প্রথম দৃশ্য' শিরোনামায় ভারতী ও বালক পত্রিকার ভাদ্র ১২৯৯-সংখ্যার ২৪৬ পৃষ্ঠায় গানটি মুদ্রিত হয় ও পরবর্তী কার্তিক সংখ্যার ৩৯৫-৯৭ পৃষ্ঠায় সরলা দেবী-কৃত গানটির স্বরলিপি [স্বরবিতান ৫১-তে স্বরলিপিকার 'অনুল্লিখিত' কেন লেখা হয়েছে বোঝা যায় না] প্রকাশিত হয়। ৫৪ ছত্রের মূল গানটির মাত্র ১৩টি ছত্র সেখানে গৃহীত হয়েছে এবং সেই আকারেই এটি গীতবিতান-এর অন্তর্ভুক্ত হয়।

এই সর্গ সম্বন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য হল, এর প্রথমেই নলিনীর উক্তিটি [সখি! অলকচিকুরে কিশলয়-সাথে/একটি গোলাপ পরায়ে দে।/... শিথিল কুন্তল দেখ্‌ বার বার/কপোল দুলিয়া পড়িছে আমার,/একটু এপাশে সরায়ে দে।'] অল্পদিনের মধ্যেই, সম্ভবত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পিয়ানোর সুরে কথা বসাতে গিয়ে 'দেশ'-রাগে নিবন্ধ 'দে লো সখি দে পরাইয়ে চুলে' [দ্র স্বপ্নময়ী। ৪৯৪] এই রূপান্তর লাভ করে ও আরও পরে 'মায়ার খেলা' [১২৯৫] গীতিনাট্যে আরও পরিবর্তিত হয়—সেখানে সাদৃশ্যটি আরও স্পষ্ট।*

এছাড়া মাধবী-র উক্তি 'মৃদু হাসি হাসি কত কহে কথা...এমন মোহিনী মেয়ে!' [১৪৪] অংশটি কাব্যগ্রন্থাবলী-র 'কৈশোরক' অংশে 'চাঞ্চল্য' শিরোনামে মুদ্রিত হয়েছে [পৃ ৬]।

ভগ্নহৃদয়-এর তৃতীয় সর্গটিও, আমাদের ধারণা, প্রত্যাবর্তন-পথে জাহাজে বসে লেখা।

৩৮৪-৮৫ 'ভানুসিংহের কবিতা' ['সখিলো সখিলো নিকরুণ মাধব'] দ্র ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ২।২১-২২ [১৬ সংখ্যক]

ভারতী ও প্রথম সংস্করণে কবিতাটির মোট ছত্র-সংখ্যা ছিল ৬৭; দুটি ছত্র পরিবর্তিত ও ২০টি ছত্র বর্জিত হয়ে বর্তমানে ছত্র সংখ্যা ৪৭। অন্যান্য পরিবর্তনের পরিমাণও যথেষ্ট, দ্র পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণ। ৬১-৬৪। কাব্যগ্রন্থাবলী-তে কবিতাটির নামকরণ করা হয়েছে 'বিদায়'। প্রথম সংস্করণে সুর হিসেবে 'দেশ' উল্লিখিত হলেও সুরটি রক্ষিত হয় নি।

৩৯৮ 'গোলাপ-বালা। (গোলাপের প্রতি বুল্‌বুল্‌)/রাগিণী-বেহাগ' ['বলি ও আমার গোলাপ-বালা'] দ্র শৈশব সঙ্গীত অ-১। ৪৯৫-৯৬

গানটি বিলাত যাত্রার প্রাক্কালে ১২৮৫ বঙ্গাব্দের প্রথম দিকে আমেদাবাদে রচিত হয়েছিল। যথাস্থানে এ-সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ভারতী, পৌষ ১২৮৭ *[৪।৯]:*

৪০৩-০৬ 'ভগ্নহৃদয়' চতুর্থ সর্গ দ্র ভগ্নহৃদয় অ-১। ১৫২-৫৭

'কবি'-র আটটি গান দিয়ে এই সর্গটি গঠিত হয়েছে। এর সবগুলিই যদিও গান বলে আখ্যাত, তবু এদের মধ্যে মাত্র দুটি রবিচ্ছায়া গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে; চারটি গান কবিতা হিসেবে কাব্যগ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত। প্রথম গান। 'বিপাশার তীরে ভ্রমিবারে যাই' দ্র রবিচ্ছায়া। ৩ [বিবিধ ৩], খট্‌-একতালা; গীতবিতান

৩।৭৭০; স্বরলিপি নেই। কাব্যগ্রন্থাবলী-র 'কৈশোরক' অংশে নাম 'প্রথম দর্শন' [পৃ ৬]।

দ্বিতীয় গান। 'প্রতিদিন যাই সেই পথ দিয়া' দ্র কাব্যগ্রন্থাবলী। ৬-৭-'মোহ'।

চতুর্থ গান। 'কাল যবে দেখা হ'ল পথে যেতে যেতে চলি' দ্র ঐ।৭—'আন্দোলন'।

সপ্তম গান। 'দু জনে মিলিয়া যদি ভ্রমি গো বিপাশা-পারে' দ্র রবিচ্ছায়া। ৭০-৭১ [বিবিধ, ৮৫], সুর অনুল্লিখিত; গীতবিতান-এ গৃহীত হয় নি।

অষ্টম গান। 'শুনেছি—শুনেছি কি নাম তাহার' দ্র কাব্যগ্রন্থাবলী। ৭—'উল্লাস'।

কাব্যগ্রন্থাবলী-তে গানগুলির এই রূপ নামকরণের ফলে 'কবি'র মানসিক বিবর্তনের সূত্রটি স্পষ্টতর হয়েছে।

৪২৭-৩৩ 'পথিক' দ্র শৈশবসঙ্গীত অ-১। ৫১৪-২৬

রবীন্দ্রকাব্যের ইতিহাসে কবিতাটির একটি বিশেষ মূল্য আছে। যদিও রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কবিতাটি সম্বন্ধে পরে কোনো মন্তব্য করেন নি, কিন্তু এটি যে তাঁর কাছেও অবহেলিত ছিল না তার প্রমাণ কাব্যগ্রন্থাবলী-তে [পৃ ১৫-১৮] এবং মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ প্রথম ভাগ প্রথম খণ্ডে [১৩১০] 'যাত্রা' বিভাগে কবিতাটির অন্তর্ভুক্তি। উল্লেখযোগ্য যে, কাব্যগ্রন্থ-তে শৈশবসঙ্গীত থেকে গৃহীত এইটিই একমাত্র কবিতা [যদিও অনেক অংশই বর্জিত]—ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ও কয়েকটি গান ছাড়া এর পূর্ববর্তী কোনো রচনাই সেখানে স্থান পায় নি। কবিতাটি ঠিক কোন্‌ সময়ে রচিত হয়েছিল, তা আমাদের জানা নেই; কিন্তু মনে

হয় দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রার সংকল্প, পিতার কাছ থেকে অনুমতি লাভ এবং কোনো কারণে যাত্রা স্থগিত হওয়া কবিতাটির মধ্যে প্রকাশিত আশা ও নৈরাশ্যের মানসপটভূমিটি রচনা করেছে। যদিও দার্শনিকতার দিক দিয়ে কোনো তুলনাই করা চলে না, তবু রূপকল্পের দিক থেকে 'শিশুতীর্থ' কবিতাটির কথা পাঠককে স্মরণ করতে বলি।

[ভারতী-র বর্তমান সংখ্যার ৪৩৪-৪৮ পৃষ্ঠায় কৈলাসচন্দ্র সিংহের লেখা 'বাঙ্গালার দ্বাদশ ভৌমিকের ইতিহাস' নামে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আমাদের ধারণা, রবীন্দ্রনাথ 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাস লেখার প্রেরণা পেয়েছিলেন এই প্রবন্ধটি থেকে। পরে আমরা এ-সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করব।]

অতি শিশুকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ ১১ই মাঘের সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজে প্রধানত গায়ক হিসেবে অংশ গ্রহণ করে এসেছেন। ছ-বছর আগে ১২৮১ বঙ্গাব্দের [১৭৯৬ শক] পঞ্চচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজে গুরু নানকের ভজন অবলম্বনে রচিত তাঁর 'গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে' গানটি গীত হয়েছিল। এর মধ্যে কবি, গীতিকার ও সুরকার হিসেবে অন্তত জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে তাঁর অবিসংবাদিত প্রতিষ্ঠা অর্জিত হয়েছিল। ফলে এই বৎসরের একপঞ্চাশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে গানের ডালি সাজাবার দায়িত্ব স্বভাবতই তাঁর উপর অর্পিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কাদম্বরী দেবীকে নিয়ে কার্তিক মাসের কোনো সময়ে বোম্বাই অঞ্চলে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তিনি কতদিন সেখানে ছিলেন আমাদের তা জানা নেই, কিন্তু আশা করা যায় পৌষ মাসের পূর্বেই তিনি কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। তিনি তখন আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক এবং রবীন্দ্রনাথের সংগীতসাধনায় অন্যতম উৎসাহদাতা। সুতরাং তাঁরই প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মসংগীত রচনায় প্রবৃত্ত হন, এমন অনুমান সহজেই করা যেতে পারে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণ থেকে জানা যায় মোট ১১টি ব্রহ্মসংগীত এই উৎসবে গীত হয়, তার ৭টিই রবীন্দ্রনাথের রচনা—এই দিক দিয়ে তাঁর ক্রমিক প্রাধান্যের এটিকে সূচনা বলা যেতে পারে। সরলা দেবী লিখেছেন, 'এর আগে ১১ই মাঘের গানের অভ্যাস বড়মামা, নতুনমামা বা বোম্বাইপ্রবাস প্রত্যাগত মেজমামা—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহ-নেতৃত্বাধীনে থাকত। রবিমামা বিলেত থেকে ফেরার পর তিনিই নেতা হলেন। দাদাদের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও নতুন নতুন ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করা, ওস্তাদদের কাছ থেকে সুর নিয়ে সুরভাঙ্গা, নিজের মৌলিক ধারার সুর তখন থেকেই তৈরি করা ও শেখান—এ সবের কর্তা হলেন রবিমামা। বাড়ির সব গাইয়ে ছেলেমেয়েদের ডাকও এই সময় থেকে পড়ল। আগে শুধু অক্ষয়বাবু[মজুমদার] প্রমুখ ওস্তাদের দল ১১ই মাঘের গায়ক ছিলেন; তাঁদের মধ্যে একমাত্র প্রতিভাদিদির—সেজমামার কন্যার—কখনো কখনো স্থান হত।'[২৪] ব্যাপক ভাবে বালক-বালিকাদের সংগীতে অংশগ্রহণের কারণেই 'তুমি কি গো পিতা আমাদের' 'আমরা যে শিশু অতি, অতি ক্ষুদ্র মন' প্রভৃতি গানগুলি রচিত হয়ে থাকতে পারে।

গান শেখানোর পদ্ধতিরও পরিবর্তন ঘটল। আগেও প্রতি বৎসর মাঘোৎসবের 'গানের কাগজ' ছাপানো হত অনুষ্ঠানের দিন শ্রোতাদের মধ্যে বিতরণের জন্য। এখনও তাই হল, কিন্তু অন্য প্রয়োজনও সিদ্ধ করে নেওয়ার তাগিদে। সরলা দেবীর ভাষায় : 'আর শেষদিন পর্যন্ত ছাপান কাগজের জন্যে অপেক্ষা নয়। দিন দুয়েক হাতে হাতে নকল করা দু-একখানা কাগজ ভাগাভাগি করে গান অভ্যাসের পর প্রায় তৃতীয় দিনের মধ্যেই সকাল-সন্ধ্যা দুবেলার গানের বইয়ের বিশ-পঁচিশখানি প্রুফ আদিব্রাহ্মসমাজ প্রেস থেকে তুলিয়ে

আনিয়ে প্রত্যেক গায়কের হাতে একখানি করে বই বেঁটে দিয়ে স্বয়ং আসরে বসে শেখান কার্যে ব্রতী হতে থাকলেন রবিমামা।'[২৫]

রবীন্দ্রনাথের আমলে এসে ব্রহ্মসংগীতের ভাব ও ভাষার প্রকৃতিও অল্প-বিস্তর পরিবর্তিত হল। পার্থক্যটি সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন সরলা দেবী : 'আগেকার ব্রহ্মসংগীতগুলির ভাব অদ্বৈতমূলক, উপনিষদের শ্লোকাবলীর প্রায় অনুবৃত্তি, আমাদের পক্ষে তার মর্মে প্রবেশ দুরূহ ছিল। কিন্তু রবিমামার আমলের সঙ্গীত গাম্ভীর্য ও মাধুর্য মিশিয়ে শিশুচিত্তেও একটা অব্যক্ত আলোড়ন আনতে থাকল। কিছু বুঝি, কিছু বুঝি না, কিন্তু হৃদয় যেন কোনো সুদূর আনন্দের আঁচল ছুঁয়ে আসে।'[২৬] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বয়ং একথা স্বীকার করেছেন : 'ইহার পরেই শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথের আমল। তাঁহার অসামান্য কবি-প্রতিভা এখন ব্রহ্মসঙ্গীতকে প্রায় পূর্ণতায় পৌঁছাইয়া দিয়াছে। নানা সুর, নানা ভাব, নানা ছন্দ, নানা তাল, ব্রহ্মসঙ্গীতে আজ তাঁহারই দেওয়া।'[২৭]

আমরা আগেই বলেছি ১১ মাঘ [রবি 23 Jan 1881].'একপঞ্চাশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ' উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ-রচিত সাতটি ব্রহ্মসংগীত গীত হয়—চারটি প্রাতঃকালীন উপাসনায় আদি ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে ও তিনটি সায়ংকালীন উপাসনায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে:

[১] 'তুমি কি গো পিতা আমাদের' দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২০৬, ভয়রোঁ কাওয়ালি; রবিচ্ছায়া। ১৩১ [ব্রহ্ম ৩৯], ভয়রোঁ—কাওয়ালি; নরেন্দ্রনাথ দত্ত [স্বামী বিবেকানন্দ]-সম্পাদিত সঙ্গীত কল্পতরু। ৩৮; গীতবিতান। ৮৩১-৩২। ইন্দিরা দেবী বীণাবাদিনী পত্রিকার পৌষ ১৩০৪-সংখ্যায় গানটির স্বরলিপি প্রকাশ করেন, এইটিই স্বরবিতান ৪৫-এ সংকলিত হয়েছে—কিন্তু সেখানে সুর-তাল : 'রামকেলি। ত্রিতাল'।

[২] 'মহা সিংহাসনে বসি শুনিছ হে' দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২০৬, ভৈরবী-ঝাঁপতাল; রবিচ্ছায়া। ১০৫ [ব্রহ্ম ৩], ভৈরবী-ঝাঁপতাল; গীতবিতান ৩।৮২৮, ইন্দিরা দেবী-কৃত স্বরলিপি স্বরবিতান ৮-এ সংকলিত।

[৩] 'আমরা যে শিশু অতি' দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২১১, খট্-ঝাঁপতাল; রবিচ্ছায়া। ১৩১ [ব্রহ্ম ৪০], খট্-ঝাঁপতাল; গীতবিতান ৩।৮২৭-২৮। ইন্দিরা দেবী-কৃত স্বরলিপি স্বরবিতান ৪৫-এ সংকলিত হয়েছে—কিন্তু সেখানে সুর-তাল : 'যোগিয়া-ঝাঁপতাল'।

[৪] 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা' দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২১১, আলাইয়া-ঝাঁপতাল; রবিচ্ছায়া। ১৩২ [ব্রহ্ম ৪১], আলাইয়া-ঝাঁপতাল; গীতবিতান ২।৩১৮-১৯। স্বরবিতান ২৩ [আষাঢ় ১৩৮৩]-এ গানটির তিনটি স্বরলিপি আছে। মূল স্বরলিপিটি [পৃ ২৪-২৬] কে করেছেন তা 'অনুল্লিখিত', 'প্রকাশকাল' শিরোনামায় লেখা 'আলাপিনী, অগ্রহায়ণ ১৩০৫'; এর পরেই মুক্ত-তালে গ্রথিত সম্ভবত ইন্দিরা দেবী-কৃত একটি স্বরলিপি [পৃ ২৬-২৭] মুদ্রিত হয়েছে; কাঙ্গালীচরণ সেন-কৃত ও ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩ [১৩১৩]-এ প্রকাশিত স্বরলিপিটি 'সুরভেদ/ছন্দোভেদ' [পৃ ৭৫-৭৬] অংশে স্থানলাভ করেছে। লক্ষণীয়, গীতবিতান-এ ব্রহ্মসঙ্গীতটি 'প্রেম' পর্যায়ে সংকলিত হয়েছে। গানটির সম্পর্কে অন্যান্য তথ্য আমরা এই অধ্যায়েরই অন্যত্র দিয়েছি।

[৫] 'এ কি এ সুন্দর শোভা' দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২১২, ইমন ভূপালি-কাওয়ালি; রবিচ্ছায়া। ১৩৩ [ব্রহ্ম ৪২], ইমনভূপালি-কাওয়ালি; গীতবিতান ১।২১৪। বালক পত্রিকায় [শ্রাবণ ১২৯২।১৯২-৯৩] 'গান অভ্যাস' শিরোনামে প্রতিভা দেবী-কৃত স্বরলিপি প্রথম প্রকাশিত হয়। স্বরবিতান ২৩-এ সুর-তাল; 'মিশ্র ভূপালি।

ত্রিতাল'। ইন্দিরা দেবীর মতে হিন্দি 'বাজু রে মন্দর বাজু' গানটি ভেঙে এটি রচিত হয়েছে দ্র রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম। ২১

[৬] 'দিবানিশি করিয়া যতন' দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২১২, ধুন্-কাওয়ালি; রবিচ্ছায়া। ১৩৩ [ব্রহ্ম ৪৩], ধুন-কাওয়ালি; গীতবিতান ৩।৮২৮-২৯। ইন্দিরা দেবী-কৃত স্বরলিপি স্বরবিতান ৪৫-এ সংকলিত হয়েছে, কিন্তু সুরটি এখানে 'ত্রিতাল'-এ নিবদ্ধ।

[৭] 'কোথা আছ প্রভু? এসেছি দীনহীন' দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২১৫-১৬, গুজরাটি ভজন-একতালা; রবিচ্ছায়া। ১৩৫ [ব্রহ্ম ৪৪], গুজরাটি ভজন-একতালা; গীতবিতান ৩।৮২৯। কাঙ্গলীচরণ সেন-কৃত স্বরলিপি ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি গ্রন্থের ৩য় ভাগে প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু স্বরবিতান ২৩-এর মূল অংশে কিঞ্চিৎ সংশোধিত একটি স্বরলিপি দেখা যায়। ইন্দিরা দেবী লিখেছেন,...মাথায় 'গুজরাটী ভজন' লেখা আছে, তার মূল কথাগুলি আমি জানি নে। তবে ঐ শিরোনামার সাক্ষ্যের জোরে ভাঙা গানটির উল্লেখ করে গুজরাটের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করছি। এটি এখন চলিত না থাকলেও আমরা ছেলেবেলায় খুব শুনতুম। এ গানটিতে সুরের বিশেষ চটক না থাকুক, বেশ একটি ধীর শান্ত ভাব আছে, যা ভজনের উপযোগী।'[২৮] গুজরাটের আমেদাবাদে থাকবার সময় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই সুরটি সংগ্রহ করেন নি তো?

রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম ব্রহ্মসংগীত-গুচ্ছের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, এই সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পিয়ানো যন্ত্রের মধ্যে ওস্তাদি গানগুলোকে ফেলে যথেচ্ছা মন্থন করে যে সাংগীতিক পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী, এই গানগুলি তা থেকে মুক্ত। সম্ভবত মাঘোৎসবের গাম্ভীর্য বৈঠকী গানের সুরে গাঁথা গানেই যথাযথ ফুটে উঠবে এই ভাবনা এর পিছনে কার্যকরী ছিল কিংবা গানগুলির রচনা ও সুরসংযোগ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিকালেই সমাপ্ত হয়েছিল।

এই গীতিগুচ্ছ সম্পর্কে আরও একটি প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে। রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দ [বর্তমানে নরেন্দ্রনাথ দত্ত]-এর পারস্পরিক সম্পর্কের পরিমাণ ও প্রকৃতি নির্ণয় করা বাংলা সাহিত্যের ও সামাজিক ইতিহাসের একটি অন্যতম বিচার্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আধুনিক যুগের এই দুই খ্যাতনামা মনীষীর পরস্পরের সম্পর্কে আপেক্ষিক নীরবতা ও ঔদাসীন্য বিতর্কের অন্যতম কারণ। প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩-এ আমরা কেবলমাত্র সংগীতের ক্ষেত্রে উভয়ের যোগাযোগের কয়েকটি দিক নিয়ে আলোচনা করেছি।

৫১শ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উৎসব উপলক্ষে বৃহত্তর জনসমাজে সংগীতকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের অভিষেক হল। এর আগেও তিনি গান লিখেছেন, কিন্তু সুর-সংযোগে জন-সাধারণের সামনে 'গগনের থালে রবিচন্দ্র দীপক জ্বলে' গানটি ছাড়া সেগুলি পরিবেশিত হয় নি, সেগুলির প্রচার সীমাবদ্ধ ছিল আত্মীয়-বন্ধুর সংকীর্ণ গণ্ডীতে। অবশ্য গায়ক হিসেবে ইতিপূর্বে মাঘোৎসব, বেহালার সাংবৎসরিক, রামপুর বোয়ালিয়া, হিন্দু মেলা প্রভৃতি স্থানে তিনি জনসম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন, কিছু সুখ্যাতিও পেয়েছিলেন, তার পরিচয় আমরা আগেই দিয়েছি। অভিনেতা হিসেবেও তাঁর আত্মপ্রকাশ পূর্বেই ঘটেছে। কিন্তু একাধারে গীতিকার গায়ক ও অভিনেতা রূপে বিদগ্ধসমাজে তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করলেন 'বাল্মীকি-প্রতিভা' রচনা ও অভিনয় করে।

আমরা জানি, 'বৎসরে একবার দেশের সমস্ত সাহিত্যিকগণকে একত্র করিবার অভিপ্রায়ে' জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে 'বিদ্বজ্জন সমাগম' নামে একটি সভা স্থাপিত হয়েছিল—যার প্রথম অধিবেশন হয় ৬ বৈশাখ

১২৮১ [শনি 18 Apr 1874] তারিখে; দ্বিতীয় অধিবেশনের তারিখ ২৭ বৈশাখ ১২৮২ [রবি 9 May 1875],* রবীন্দ্রনাথ এখানে 'প্রকৃতির খেদ' কবিতাটি পাঠ করেন; ১২৮৩-র অধিবেশনের কোনো সংবাদ আমরা জানতে পারি নি, কিন্তু ৫ ফাল্গুন ১২৮৪ [শনি 16 Feb 1878] তারিখে 'বিদ্বজ্জন সমাগম'-এর একটি অধিবেশন হয় সে-কথা যথাস্থানে উল্লিখিত হয়েছে। আমাদের ধারণা, অনুষ্ঠানটি একটি বার্ষিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল, কিন্তু সব-ক'টি অধিবেশনের বিবরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি।

বর্তমান বৎসরেও অনুরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জীবনস্মৃতি-র দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি-তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'দ্বিতীয় বৎসরে [স্পষ্টতই তথ্যটি যথার্থ নয়, আমাদের ধারণানুযায়ী এটি সপ্তম বৎসর হবে] দাদারা এই সম্মিলনে একটি নাট্যাভিনয় করিবার ইচ্ছা করিলেন। কোন্ বিষয় অবলম্বন করিয়া নাটক লিখিলে এই সভার উপযুক্ত হইবে তাহারই আলোচনাকালে দস্যুরত্নাকরের কবি হইবার কাহিনীই সকলের চেয়ে সংগত বলিয়া বোধ হইল। ইহার কিছু পূর্বেই আর্যদর্শনে বিহারীলাল চক্রবর্তী মহাশয়ের সারদামঙ্গল সংগীত বাহির হইয়া আমাদের সকলকেই মাতাইয়া তুলিয়াছিল। এই কাব্যে বাল্মীকির কাহিনী যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহারই সঙ্গে দস্যু রত্নাকরের বিবরণ জড়াইয়া দিয়া এই নাটকের গল্পটা একরূপ খাড়া হইল।'[২৯]

সারদামঙ্গল-এর প্রভাবের কথা মুদ্রিত গ্রন্থে না থাকলেও প্রথম পাণ্ডুলিপিতে ছিল : 'এই সারদামঙ্গলের আরম্ভ-সর্গ হইতেই বাল্মীকিপ্রতিভার ভাবটা আমার মাথায় আসে এবং সারদামঙ্গলের দুই-একটি কবিতাও রূপান্তরিত অবস্থায় বাল্মীকিপ্রতিভায় গান রূপে স্থান পাইয়াছে।'[৩০] বিহারীলালের গানে সুর বসিয়ে কখনো কখনো তাঁর বাড়িতে গিয়ে শুনিয়ে আসতেন এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উক্তি আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি, তার মধ্যে সারদামঙ্গল-এর অংশবিশেষও থাকা অসম্ভব ছিল না—এই পরিপ্রেক্ষিতে বাল্মীকিপ্রতিভা-য় উক্ত কাব্যের কয়েকটি কবিতা সুর-সহযোগে গানে রূপান্তরিত ও ব্যবহৃত হয়েছে এতে অস্বাভাবিকত্ব কিছু নেই।

সারদামঙ্গল-এর প্রথম সর্গের কয়েকটি অংশ অবিকৃতভাবে অথবা সামান্য পরিবর্তিত আকারে বাল্মীকিপ্রতিভা-য় পাওয়া যায়:

[১] 'কমলা ঠমকে হাসি
ছড়ান রতনরাশি' —১৮শ স্তবক

'কমলা দিতেছে আসি রতন রাশি রাশি',
—বাল্মীকি প্রতিভা অ-১।৫৩৯

[২] 'যাও লক্ষ্মী অলকায়,
যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এস না এ যোগি জন-তপোবন-স্থলে!' —২০শ স্তবক

'যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এ বনে এস না, এস না, এস না এ দীনজনকুটীরে!'
—ঐ অ-১। ৫৪০

[৩] 'ভক্তি ভাবে এক তানে
মজেছি তোমার ধ্যানে;
কমলার ধন-মানে নহি অভিলাষী। —৩১শ স্তবক

'যে বীণা শুনেছি কানে, মনপ্রাণ আছে ভোর—
আর কিছু চাহি না, চাহি না!'
—ঐ অ-১। ৫৪০

[৪] 'এস মা করুণারাণী,
ও বিধু-বদনখানি
হেরি, হেরি, আঁখি ভরি হেরি গো আবার!...
এস আদরিণী বাণী সমুখে আমার। —২০শ স্তবক

'এস, মা করুণারাণী, ও বিধু-বদনখানি
হেরি হেরি আঁখি ভরি হেরিব আবার।
এস আদরিণী বাণী সমুখে আমার।
—ঐ অ-১। ৫৪১

[৫] 'অদর্শন হ'লে তুমি,
ত্যজি লোকালয় ভূমি,
অভাগা বেড়াবে কেঁদে নিবিড় গহনে;
হেরে মোরে তরুলতা
বিষাদে কবে না কথা,
বিষণ্ণ কুসুমকুল বন-ফুল-বনে!
'হা দেবী, হা দেবী', বলি
গুঞ্জরি কাঁদিবে অলি; —৩৩শ স্তবক

'অদর্শন হ'লে তুমি ত্যেজি লোকালয়ভূমি
অভাগা বেড়াবে কেঁদে নিবিড় গহনে—
হেরে মোরে তরুলতা বিষাদে কবে না কথা
বিষণ্ণ কুসুমকুল বনফুল-বনে।
'হা দেবী' 'হা দেবী' বলি গুঞ্জরি কাঁদিবে অলি,'
—ঐ অ-১। ৫৪১

[—বাল্মীকি প্রতিভা থেকে সংকলিত ৪র্থ ও ৫ম উদ্ধৃতি দুটি 'হৃদয়ে রাখ, গো দেবি, চরণ তোমার' গানটির অন্তর্গত, "'গান' গ্রন্থের প্রকাশকালে (সেপ্টেম্বর ১৯০৮) উহা বাল্মীকিপ্রতিভা হইতে বর্জিত হয়"[৩১] রবীন্দ্র-রচনাবলী-১, গীতবিতান-৩ বা স্বরবিতান ৪৯-এও গানটি অন্তর্ভুক্ত হয় নি। অবশ্য ইন্দিরা দেবী-কৃত গানটির স্বরলিপি স্বরবিতান ৫১-তে সংকলিত হয়েছে।]

সারদামঙ্গল-এর প্রথম সর্গ থেকে সরস্বতীর আবির্ভাবের পরিকল্পনাটি গ্রহণ করলেও রবীন্দ্রনাথের চিন্তার স্বাতন্ত্র্য বাল্মীকিপ্রতিভা-তে সুস্পষ্ট ভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। বিহারীলালের বাল্মীকি প্রথমাবধিই কবি-স্বভাব তপস্বী—'নিরখি লোচনলোভা/পুলিন বিপিন-শোভা/ভ্রমেণ বাল্মীকি মুনি ভাব-ভোলা মনে।' তাঁর 'তপোবনে একদিকে যেমন তিমির-রাত্রি ভেদ করিয়া তরুণ উষার অভ্যুদয় হইল তেমনি অপরদিকে নিষ্ঠুর হিংসাকে বিদীর্ণ করিয়া কিরূপে করুণাময় কাব্যজ্যোতি প্রকাশ পাইল'[৩২] সারদামঙ্গল-এর উল্লিখিত অংশে সেইটিই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু বাল্মীকিপ্রতিভা-য় এই অনৈসর্গিক আবির্ভাবের ভূমিকা রচিত হয়েছে মানবসম্পর্ক ও

মনস্তত্ত্বের ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'একটা সময় এসেছিল যখন আমার গীতিকাব্যিক মনোবৃত্তির ফাঁকের মধ্যে মধ্যে নাট্যের উঁকিঝুঁকি চলছিল। তখন সংসারের দেউড়ি পার হয়ে সবে ভিতর-মহলে পা দিয়েছি; মানুষে মানুষে সম্বন্ধের জালবুনোনিটাই তখন বিশেষ করে ঔৎসুক্যের বিষয় হয়ে উঠেছিল। বাল্মীকিপ্রতিভাতে দস্যুর নির্মমতাকে ভেদ করে উচ্ছ্বসিত হল তার অন্তর্‌গূঢ় করুণা। এইটেই ছিল তার স্বাভাবিক মানবত্ব যেটা ঢাকা পড়েছিল অভ্যাসের কঠোরতায়। একদিন দ্বন্দ্ব ঘটল, ভিতরকার মানুষ হঠাৎ এল বাইরে।'[৩৩] এই বিশ্লেষণ অবশ্যই পরিণত মনের, কিন্তু উক্তিটির প্রথম অংশের প্রমাণ আছে ভগ্নহৃদয় কাব্যে, পরবর্তী অংশের পরিচয়ও তাঁর সমকালীন রচনায় দুর্লক্ষ্য নয়, 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' তো ঘটেছিল প্রাত্যহিক জড়তার আবরণ উন্মোচিত হয়েই। দাদাদের সঙ্গে আলোচনাও নাট্যকাহিনীর রূপরেখা রচনায় সাহায্য করেছিল, সে-কথা তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন।

এরপর একটি গুরুতর প্রশ্ন দেখা দেয় গীতিনাট্যটির সুর ও কথা রচনা প্রসঙ্গে। জীবনস্মৃতি-র দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি-তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'তাহার পর জ্যোতিদাদা বাজাইতে লাগিলেন, আমি গান তৈরি করিতে লাগিলাম এবং অক্ষয়বাবুও মাঝে মাঝে যোগ দিলেন।'[৩৪] প্রথম পাণ্ডুলিপি-র বর্ণনাটি ছিল এইরূপ : 'সেই সময় জ্যোতিদাদার পিয়ানো যন্ত্রের উত্তেজনায়, কতক বা তাঁহার রচিত সুরে কতক বা হিন্দুস্থানি গানের সুরে বাল্মীকিপ্রতিভা গীতিনাট্য রচনা করিয়াছিলাম।[৩৫] এই প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের একটি উক্তি প্রায়শই উদ্ধৃত হয় : 'এই সময়ে আমি পিয়ানো বাজাইয়া নানাবিধ সুর রচনা করিতাম। আমার দুই পার্শ্বে অক্ষয়চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ কাগজ পেন্সিল লইয়া বসিতেন। আমি যেমনি একটি সুর রচনা করিলাম, অমনি ইঁহারা সেই সুরের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ কথা বসাইয়া গান রচনা করিতে লাগিয়া যাইতেন। একটি নূতন সুর তৈরি হইবামাত্র, সেটি আর কয়েকবার বাজাইয়া ইঁহাদিগকে শুনাইতাম।'[৩৬] এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথেরও স্বীকৃতি রয়েছে। কিন্তু আমরা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আর একটি উক্তির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই : 'সাহিত্য এবং সঙ্গীত চর্চায় আমাদের তেতলা মহলের আবহাওয়া তখন দিবারাত্রি সমভাবে পূর্ণ থাকিত। রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম রচনা 'কালমৃগয়া' গীতিনাট্য এবং তাঁহার দ্বিতীয় রচনা 'বাল্মীকি-প্রতিভা' গীতিনাট্যেও উক্তরূপে রচিত সুরের অনেক গান দেওয়া হইয়াছিল।'[৩৭] আমরা অবশ্যই জানি যে, বাল্মীকিপ্রতিভা-ই রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম গীতিনাট্য ও কালমৃগয়া দ্বিতীয় রচনা—কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে সুরস্মৃতির কথা এখানে বলেছেন, আমাদের ধারণা, সেদিক দিয়ে তাঁর বর্ণিত ক্রম সঠিক। প্রথম সংস্করণ বাল্মীকিপ্রতিভা-র গানগুলির সুর বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় 'Nancy Lee'-এর সুরভাঙা 'কালী কালী বলো রে আজ' এবং দস্যুদলের কয়েকটি গান ছাড়া অন্যান্য গানগুলি ঠিক পিয়ানোর সুরে বসানো বলে মনে হয় না; অপরপক্ষে কালমৃগয়া-র বহু গানে পিয়ানোর গতের প্রতিধ্বনি শোনা যায়, যার অনেকগুলিই পরবর্তীকালে বাল্মীকিপ্রতিভা-র দ্বিতীয় সংস্করণে গৃহীত হয়েছিল—যেগুলি নতুন রচনা তারও কয়েকটির মধ্যে পিয়ানোর টুংটাং ধ্বনি অস্পষ্ট নয়। সেইজন্যই আমাদের অনুমান, বাল্মীকিপ্রতিভা-র প্রথম সংস্করণের গানগুলির সুরারোপে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহযোগিতা থাকলেও সুরসৃষ্টির সম্পূর্ণ কৃতিত্ব তাঁকে অর্পণ করা ঠিক নয়। পাঠককে আবার প্রথম পাণ্ডুলিপি-র পূর্বোদ্ধৃত বর্ণনাটি স্মরণ করতে বলি—কয়েকটি গানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সুর দিয়েছিলেন ও কতকগুলি গানে ওস্তাদি হিন্দিগানের সুর ব্যবহার করা হয়েছিল। যেমন, দ্বিতীয় দৃশ্যে বালিকার কণ্ঠে 'গারা ভৈরবী' রাগে 'কি দশা হ'ল

আমার, হায়' গানটি মহর্ষির কাছ থেকে পাওয়া 'ভৈরবী—একতালা' সুর-তালে নিবদ্ধ নিম্নোদ্ধৃত ফার্সি গানের অনুসরণ করেছে:

রবীন্দ্রনাথের আঁকা স্কেচ : রবির 'সর্ব্ব প্রথমোদ্যম'
আনুমানিক তারিখ : ১৮৮০
[রবীন্দ্রভবনের সৌজন্যে]

হাল মে রবে রবা
তু আপনে ফজল করি, দমমে রবসাঁই॥
সুপ্রদস্ব তোর মাহি খেসরা
তুদানি হিসাবে কমো বেসরা॥[৩৮]

অনুরূপ ভাবেই 'বাহার-টিমা ত্রিতাল'-এ নিবদ্ধ 'মনকি কমলদল খোলিয়াঁ সব বাগিয়াঁ' [সঙ্গীত-প্রকাশিকা, ফাল্গুন ১৩১৪] গানটির সুর ব্যবহৃত হয়েছে তৃতীয় দৃশ্যে বাহার রাগে গাওয়া বাল্মীকির 'এই যে হেরি গো

দেবী আমারি' গানটিতে।[৩৯] অন্য কিছু গানেও এইরূপ হিন্দি-ভাঙা সুর ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে। অবশ্য এ সব-কিছু সত্ত্বেও 'জ্যোতিদাদার পিয়ানো যন্ত্রের উত্তেজনা'ই সর্বাধিক কার্যকরী হয়েছিল একথা অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'জ্যোতিদাদা তখন প্রত্যহই প্রায় সমস্তদিন ওস্তাদি গানগুলো পিয়ানো যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছা মন্থন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে রাগিণীগুলির এক-একটি অপূর্বমূর্তি ও ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইত। যে-সকল সুর বাঁধা নিয়মের মধ্যে মন্দগতিতে দস্তুর রাখিয়া চলে তাহাদিগকে প্রথাবিরুদ্ধ বিপর্যস্তভাবে দৌড় করাইবামাত্র সেই বিপ্লবে তাহাদের প্রকৃতিতে নূতন নূতন অভাবনীয় শক্তি দেখা দিত এবং তাহাতে আমাদের চিত্তকে সর্বদা বিচলিত করিয়া তুলিত। সুরগুলা যেন নানা প্রকার কথা কহিতেছে এইরূপ আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাইতাম। আমি ও অক্ষয়বাবু অনেক সময়ে জ্যোতিদাদার সেই বাজনার সঙ্গে সঙ্গে সুরে কথাযোজনার চেষ্টা করিতাম।'[৪০] এই বক্তব্যের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতির বক্তব্যও মেলে, কিন্তু এর থেকে অনুমান করা ঠিক হবে না যে বাল্মীকিপ্রতিভা-র সুর আগে রচিত হয়েছিল এবং সেই সুরের বাহন হিসেবে কথার সৃষ্টি। সারদামঙ্গল থেকে আহৃত কবিতাগুলি এবং 'এ কেমন হ'ল মন আমার', 'জীবনের কিছু হল না, হায়', 'কেন গো আপনমনে ভ্রমিছ বনে বনে', 'আমার কোথায় সে উষাময়ী প্রতিমা', 'এই যে হেরি গো দেবী আমারি' প্রভৃতি গানগুলির কাব্যমূল্যও যথেষ্ট—এগুলি কবিতা হিসেবেই রচিত হয়েছিল, ভাব অনুযায়ী সুর-যোজনা পরে হয়েছে এমন সিদ্ধান্তই যুক্তিসংগত।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'দস্তুরভাঙা গীতবিপ্লবের প্রলয়ানন্দ' ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের বিলাতবাসের অভিজ্ঞতাও বাল্মীকিপ্রতিভা-র রচনা ও সুরসৃষ্টির উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল বলে মনে হয়। ব্রাইটনে থাকার সময়ে সেখানকার সংগীতশালায় তিনি মাডাম নীলসনের গান শুনতে গিয়েছিলেন, সেদিন অবশ্য সে-গান তাঁর ভালো লাগে নি—তাঁর মনে হয়েছিল 'যেন কণ্ঠস্বরে সার্কাসের ঘোড়া হাঁকাইতেছে', স্থানে স্থানে পাখির ডাকের নকল অত্যন্ত হাস্যজনক লেগেছিল। কিন্তু তার পরে আরও অনেক গান শুনে ও শিখে তাঁর মনে হয়েছিল 'য়ুরোপের সংগীত যেন মানুষের বাস্তবজীবনের সঙ্গে বিচিত্রভাবে জড়িত।...সকলরকমেরই ঘটনা ও বর্ণনা আশ্রয় করিয়া য়ুরোপে গানের সুর খাটানো চলে,...ইহা মানবজীবনের বিচিত্রতাকে গানের সুরে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছে।'[৪১] অপরদিকে ভারতীয় সংগীত সম্পর্কে তাঁর ধারণা : 'আমাদের গান যেন জীবনের প্রতিদিনের বেষ্টন অতিক্রম করিয়া যায়, এইজন্য তাহার মধ্যে এত করুণা এবং বৈরাগ্য,—সে যেন বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবহৃদয়ের একটি অন্তরতর ও অনির্বচনীয় রহস্যের রূপটিকে দেখাইয়া দিবার জন্য নিযুক্ত,...সেখানে কর্মনিরত সংসারীর জন্য কোনোপ্রকার সুব্যবস্থা নাই।'[৪২] অথচ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যখন এই দিশি সুরগুলিকেই পিয়ানোর মধ্যে বিপর্যস্তভাবে দৌড় করিয়ে তাদেরই মধ্যে অভাবনীয় শক্তির সমাবেশ ঘটালেন, তখন সেই অভিজ্ঞতাই বাল্মীকিপ্রতিভা-রচনার প্রধান প্রেরণা হয়ে দাঁড়াল। সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য : 'বাল্মীকিপ্রতিভা পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে, উহা সংগীতের একটি নূতন পরীক্ষা', এর সঙ্গে দেশে প্রচলিত কথকতার রীতির মিল দেখেছেন : 'তাহাতে বাক্য মাঝে মাঝে সুরকে আশ্রয় করে, অথচ তাহা তালমানসংগত রীতিমতো সংগীত নহে। ...ইহাতে তালের কড়াক্কড় বাঁধন নাই, একটা লয়ের মাত্রা আছে,—ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য কথার ভিতরকার ভাবাবেগকে পরিস্ফুট করিয়া তোলা—কোনো বিশেষ রাগিণী বা

তালকে বিশুদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা নহে। বাল্মীকিপ্রতিভায় গানের বাঁধন সম্পূর্ণ ছিন্ন করা হয় নাই, তবু ভাবের অনুগমন করিতে গিয়া তালটাকে খাটো করিতে হইয়াছে। অভিনয়টাই মুখ্য হওয়াতে এই তালের ব্যতিক্রম শ্রোতাদিগকে দুঃখ দেয় না।'[৪৩]

বাল্মীকিপ্রতিভা-কে রবীন্দ্রনাথ 'সুরে নাটিকা' নামে অভিহিত করে বলেছেন যে, য়ুরোপীয় 'অপেরা'র সঙ্গে তার পার্থক্য আছে। য়ুরোপে অপেরা-র ইতিহাস যথেষ্ট পুরোনো। নাটকে অভিনয়ই মুখ্য হওয়ায় পাত্রপাত্রীরা কথা বলার ঢঙে সংলাপ উচ্চারণ করেন, কিন্তু অপেরার সংলাপে সুরেরই প্রাধান্য। তাই বিভিন্ন অপেরায় নাট্যবিষয়ের গুরুত্বের ইতর-বিশেষ ঘটলেও দেখা যায় অপেরা-কারের মূল লক্ষ্য সুর-রচনার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা। ইংরেজ আমলের প্রথম থেকেই বহু বিখ্যাত বিদেশী অপেরা-দল কলকাতায় এসেছে, রবীন্দ্রনাথের বাল্য ও কৈশোরেও তাদের আনাগোনা অব্যাহত ছিল। এইরূপ কোনো অভিনয় তিনি ফ্যান্সি-ফেয়ার বা অনুরূপ কোনো অনুষ্ঠানে এদেশে দেখেছিলেন কিনা নিশ্চিত করে বলা না গেলেও, ইংলণ্ডে অবস্থানকালে তিনি অবশ্যই বেশ-কিছু অপেরার দর্শক ছিলেন এ-বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। বাংলা দেশে 'গীতাভিনয়' নামে যে সংগীতমুখর নাটকের প্রবর্তন হয়েছিল তার সঙ্গে অবশ্য অপেরার অনেক পার্থক্য ছিল, গীতাভিনয়-এ গদ্য সংলাপের ব্যবহার ও নাট্যরসের আপেক্ষিক প্রাধান্য দেখা যায়। হরিমোহন [কর্মকার] রায়ের 'জানকী-বিলাপ' [১২৭৪]-এর মধ্যে অপেরার ঢঙটি প্রথম অনুসৃত হয়, এতে গদ্যাংশ একেবারেই নেই। হরিমোহন-এর নামকরণ করেছিলেন 'গীতিকা'। এর পরেও তিনি 'গীতিকা' লেখেন 'মানিনী' [১২৮১]। এই বছরেই গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে ৪ আশ্বিন [19 Sep 1874] নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত 'সতী কি কলঙ্কিনী?' [এতে অবশ্য কিছু-কিছু গদ্য-সংলাপ আছে] অপেরা অভিনীত হয়। শান্তিদেব ঘোষ Jan [18] 1879-এ ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-রচিত 'কামিনীকুঞ্জ'-কে পথিকৃতের মর্যাদা দিয়ে লিখেছেন, "...১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে অভিনীত এই নাটকটি বাংলার নাট্য ইতিহাসের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তার একটি কারণ হল, এই প্রকারের গীত-নাটক বাংলাদেশের রঙ্গমঞ্চে এই প্রথম। আর দ্বিতীয় কারণ হল যে, এই নাটকই পূজনীয় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের গীতিনাটক 'বাল্মীকিপ্রতিভা' রচনার পথ সহজ করেছিল।'[৪৪] আমাদের ধারণা, এই মন্তব্যে গীতিনাট্যটি [লেখক এটিকে 'হরিগুণানুরঞ্জিত গীতিকাব্য' আখ্যা দিয়েছেন] তার প্রাপ্যের অতিরিক্ত মর্যাদা পেয়েছে। বস্তুত, 1876-এ Dramatic Performances Act বিধিবদ্ধ হবার পর এই শ্রেণীর গীতনাট্য অনেকগুলিই অভিনীত হয়েছে। মোটামুটি বলা যায় যে, সেই সময়ে অপেরা-ধর্মী গীতিনাট্যাভিনয়ের একটি আবহাওয়া দেশে গড়ে উঠেছিল। এই সূত্রেই ঠাকুরবাড়িতে স্বর্ণকুমারী দেবীর বসন্ত-উৎসব ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মানমরী-র রচনা ও অভিনয় হয়। এই সব রচনার সঙ্গে বাল্মীকিপ্রতিভা-র পার্থক্য এইখানে যে, অন্যগুলি যেখানে রাধাকৃষ্ণ লীলা বা রূপকথা-জাতীয় প্রণয়মূলক কাহিনী আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল, বাল্মীকিপ্রতিভা সেখানে দস্যু রত্নাকরের কবি বাল্মীকিতে উত্তরণের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণভিত্তিক একটি মহান বিষয়কে অবলম্বন করেছিল। তাছাড়া সংলাপ ও কাব্যগুণের দিক দিয়ে পূর্ববর্তী গীতিনাট্যগুলির মধ্যে কেবলমাত্র বসন্ত-উৎসব-এর সঙ্গেই এর তুলনা করা যেতে পারে; অন্তত একটি ক্ষেত্রে ভাষার প্রভাবও দেখা যায়:

কুমার। আ মরি, লাবণ্যময়ী কে ও স্থির-সৌদামিনী,
পূর্ণিমা-জোছনা দিয়ে মার্জ্জিত বদনখানি!...

—বসন্ত-উৎসব, ২য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক

বাল্মীকি। একি এ, একি এ, স্থিরচপলা!
কিরণে কিরণে হল সব দিক উজলা।
কি প্রতিমা দেখি এ,
জোছনা মাখিয়ে
কে রেখেছে আঁকিয়ে
আ মরি কমলপুতলা!
—বাল্মীকিপ্রতিভা অ-১।৫৩৯

বাল্মীকিপ্রতিভা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ফাল্গুন ১৮০২ শক [১২৮৭]-এ; বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় প্রকাশের তারিখ 12 Feb 1881 [শনি ২ ফাল্গুন], মুদ্রণসংখ্যা ১০০০, প্রকাশক হিসেবে প্রসন্নকুমার বিশ্বাসের নাম মুদ্রিত হয়েছে। আখ্যাপত্র-বিহীন গ্রন্থটির মলাটে লেখা : 'বাল্মীকি প্রতিভা।/গীতি-নাট্য।/বিদ্বজ্জন সমাগম উপলক্ষে।/ রচিত ও অভিনীত।/ কলিকাতা।/আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে/শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তি দ্বারা/মুদ্রিত। ফাল্গুন ১৮০২ শক। মূল্য ।০ চারি আনা।' ভারতী-র মলাটে ব্যবহৃত ত্রৈলোক্যনাথ দেব-কৃত কাঠ-খোদাই সরস্বতীর চিত্রটিই বাল্মীকিপ্রতিভা-র মলাটে মুদ্রিত হয়েছে, [অবশ্য 'ভারতী' শব্দটি বর্জিত]—এতে অন্যায় কিছুই হয়নি, কারণ বাল্মীকিপ্রতিভা বিদ্বজ্জন-সমাগম উপলক্ষে মুদ্রিত হয়েছিল এবং এই অনুষ্ঠান 'ভারতী উৎসব' নামেও অভিহিত হত। মুদ্রিত গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের নাম নেই, বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায়ও লেখক বা স্বত্বাধিকারী-রূপে দ্বিজেন্দ্রনাথের নাম ছাপা হয়েছে। সেই জন্যই 1881-এ প্রকাশিত বাংলা বই সম্বন্ধে বার্ষিক রিপোর্ট দিতে গিয়ে বেঙ্গল লাইব্রেরির তদানীন্তন লাইব্রেরিয়ান চন্দ্রনাথ বসু গ্রন্থটি সম্পর্কে লেখেন, 'Valmiki Prativa by Baboo Dwijendra Nath Tagore was an exceedingly good opera published during the year under review.'[৪৫]

তেরো পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটির সঙ্গে বর্তমানে প্রচলিত গ্রন্থের অনেক পার্থক্য আছে। কিছু পরিবর্জন ও যথেষ্ট পরিবর্ধনের ফলে ফাল্গুন ১২৯২ [Feb 1886]-তে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ আকারে অনেক বড়ো। বর্তমান সংস্করণে নিম্নোক্ত গানগুলি ছিল:

'প্রথম দৃশ্য/অরণ্য'

১ কাফি/আজকে তবে মিলে সবে

২ খাম্বাজ/এক ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে

১২৮৩ বঙ্গাব্দে সঞ্জীবনী সভা-র যুগে রচিত 'এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন' গানটির [1879-এ পুরুবিক্রম নাটকের ২য় সংস্করণে গৃহীত ও ১৩০৩ বঙ্গাব্দের ৩য় সংস্করণে বর্জিত] সুরে রচিত।

৩ পিলু/এখন কর্ব্ব' কি বল্!

ড সুকুমার সেন অনুমান করেছেন, গানটি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর রচনা।[৪৬]

৪ ঝিঁঝিট/শোন্ তোরা তবে শোন্!

৫ রাগিণী বেলাবতী/তবে আয় সবে আয়

এই গানটিকেও ড সেন অক্ষয়চন্দ্রের রচনা বলে অনুমান করেছেন।[৪৬]

৬ জংলা ভূপালি/কালী কালী বলো রে আজ

ড সেনের অনুমান, এটিও অক্ষয়চন্দ্রের রচনা,[৪৬] কিন্তু এ-বিষয়ে আমরা দ্বিমত পোষণ করি। গানটি Stephen Adams-এর 'Nancy Lee-র সুরে বসানো। মূল গানটি রবীন্দ্রনাথই বিলেত থেকে সংগ্রহ করেছিলেন, সুতরাং ভাঙা-গানটিও তাঁরই রচনা বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। গানটির কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করছি:

> Of all the wives as ever you know
>
> Yes ho! Lads Ho! Yes ho! Yes ho!
>
> There's none like Nancy Lee, I trow,
>
> Yes ho! Lads Ho! Yes ho!

এই রূপান্তর প্রসঙ্গে সুধীর চক্রবর্তী যথার্থই লিখেছেন, 'তাঁর বাংলাগান ভাব ও ভাষা কোন দিক থেকে মূলকে অনুসরণ করেনি।....এ ক্ষেত্রে সুরের উদ্দীপনাটুকু দস্যুদলের মনের উত্তেজনার ভাবপ্রকাশে কাজে লেগেছে।....কিন্তু সতর্ক পাঠক লক্ষ করবেন Yes hoএবং 'বলো হো' এই ধ্বনিনির্মাণের সমতাটুকু। বলা বাহুল্য, 'বলো হো' ধ্বনি বাঙালী বা ভারতীয় দস্যুদের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। ধ্বনিটি এসে গেছে মূলের প্রভাবে"।[৪৭]

৭ দেশ-বেহাগ/এ কি ঘোর বন! এনু কোথায়!

৮ পিলু/পথ ভুলেছিস্ সত্যি বটে?

দ্বিতীয় দৃশ্য/অরণ্যে কালীপ্রতিমা

৯ কানাড়া/নিশুম্ভমর্দ্দিনী অম্বে

এটি দ্বিতীয় সংস্করণে বর্জিত হয়ে পরিবর্তে অক্ষয়চন্দ্র-রচিত 'রাঙা-পদ-পদ্মযুগে প্রণমি গো ভবদারা' গানটি ব্যবহৃত হয়। 'নিশুম্ভমর্দ্দিনী অম্বে' গানটির সুর রক্ষিত হয় নি, শব্দ-ব্যবহারের ধরন দেখে মনে হয় সুরটি হয়তো কোনো হিন্দি গান থেকে নেওয়া হয়েছিল।

১০ কাফি/দেখ, হো ঠাকুর, বলি এনেছি মোরা

১১ কানাড়া/নিয়ে আয় কৃপাণ

১২ গারা ভৈরবী/কি দশা হ'ল আমার, হায়!

গানটি সম্পর্কে ইন্দিরা দেবী লিখেছেন, "শ্যামার 'হায়, এ কী সমাপন' গানটির সুর বাল্মীকিপ্রতিভার 'হা, কী দশা হল আমার' থেকে নেওয়া। এই সুরটির মূল আবার কর্তাদাদা মশায়ের মুখে শোনা একটি ফার্সী গান—'হালমে রবে রবা'।"[৪৮]

১৩ সিন্ধু ভৈরবী/এ কেমন হ'ল মন আমার

১৪ পরজ/আরে, কি এত ভাবনা, কিছু ত বুঝি না

১৫ বাঙ্গালী/শোন্ তোরা শোন্, এ আদেশ

তৃতীয় দৃশ্য/অরণ্য

১৬ খাম্বাজ/ব্যাকুল হয়ে বনে বনে

এই গানটির সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'ব্যাকুল হয়ে তব আশে' ব্রহ্মসংগীতটির সাদৃশ্য আছে। পরবর্তী সংস্করণে গানটির পাঠে সামান্য পরিবর্তন করা হয়।

১৭ নটনারায়ণ/আর না, আর না, এখানে আর না

১৮ হাম্বির/জীবনের কিছু হল না, হায়!

১৯ সিন্ধু ভৈরবী/থাম্ থাম্! কি করিবি বধি পাখীটির প্রাণ!

২০ বাহার/কি বলিনু আমি!—একি সুললিত বাণী রে!

২১ ভূপালি/একি এ, একি এ, স্থিরচপলা!

২২ টোড়ী/ কোথা লুকাইলে?

২৩ সিন্ধু/কেন গো আপনমনে

২৪ টোড়ী/আমার কোথায় সে উষাময়ী প্রতিমা!

২৫ বাহার/এই যে হেরি গো দেবী আমারি!

এটি একটি হিন্দি-ভাঙা গান, যার কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। অনেকে বলেন, দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের 'জয় জয় পরব্রহ্ম' গানের নিম্নোদ্ধৃত অংশের কিছু প্রভাব গানটিতে রয়েছে:

> ছন্দে উঠে শশি-রবি,
> ছন্দে পুন' অস্তাচলে যায়॥
> তারকা কনক-কুচি
> জ্বলদ্-অক্ষর-রুচি
> গীত-লেখা নীলাম্বর-পাতে।
>
> ছন্দে উঠিছে চন্দ্রমা, ছন্দে কনকরবি উদিছে,
> ছন্দে জগমণ্ডল চলিছে,
> জ্বলন্ত কবিতা তারকা সবে—
> —বাল্মীকিপ্রতিভা অ-১। ৫৪০

২৬ গৌড় মল্লার/হৃদয়ে রাখ, গো দেবি, চরণ তোমার

এই গানটির অনেকগুলি ছত্র বিহারীলালের সারদামঙ্গল কাব্যের প্রথম সর্গ থেকে নেওয়া, সম্ভবত এই কারণেই গান [Sep 1908] গ্রন্থে বাল্মীকিপ্রতিভা থেকে বর্জিত হয় এবং বর্তমানেও রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রথম খণ্ডে বা স্বরবিতান ৪৯-এ গানটি বা তার স্বরলিপি অন্তর্ভুক্ত হয় নি। অবশ্য পরে গীতবিতান ৩য় খণ্ড [১৩৮০]-এর 'নাট্যগীতি' বিভাগে [পৃ ৭৬৭-৬৮] গানটি এবং স্বরবিতান ৫১-তে ইন্দিরা দেবী-কৃত স্বরলিপিটি মুদ্রিত হয়েছে।

২৭ দীনহীন বালিকার সাজে

এটি গান নয়; সরস্বতীর আশীর্বাণী রূপে আবৃত্তি-যোগ্য।

বাল্মীকিপ্রতিভা রবীন্দ্রনাথ কোন্ মাসে রচনা শেষ করেছিলেন নিশ্চিত করে বলা শক্ত; কিন্তু মাঘ মাসের মধ্যেই অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্বাচন করা ও মহলা দেওয়া আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল তা জোর করেই বলা যায়। ২ ফাল্গুন গ্রন্থটির প্রকাশের তারিখ, সুতরাং কমপক্ষেও সপ্তাহখানেক আগে পাণ্ডুলিপিটি আদি ব্রাহ্মসমাজ

প্রেসে পাঠাতে হয়েছিল এবং তখনই গীতিনাট্যটির নামকরণ হয়ে গিয়েছিল যার ইতিহাস রবীন্দ্রনাথ নিজেই ব্যক্ত করেছেন : 'আমি বাল্মীকি সাজিয়াছিলাম এবং ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা [হেমেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা, তখন তাঁর বয়স ১৪।১৫] সরস্বতী সাজিয়াছিল—বাল্মীকিপ্রতিভা নামের মধ্যে সেই ইতিহাসটুকু রহিয়া গিয়াছে।'[৪৯]

প্রধান দুটি চরিত্রের ভূমিকায় যাঁরা অভিনয় করেছিলেন, তাঁদের নাম জানা গেলেও অন্যান্যদের সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু জানা যায় না। লক্ষ্মীর ভূমিকা সম্বন্ধে ইন্দিরা দেবী লিখেছেন, 'বোধ হয় সুশীলাদিদি [শরৎকুমারী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা, তখন বয়স ১৩ বৎসর] লক্ষ্মী সেজেছিলেন।'[৫০] আরও একটু ইঙ্গিত হয়তো পাওয়া যায় অবনীন্দ্রনাথের লেখায় : 'সারদা-পিসেমশায়, কেদারদাদা [কেদারনাথ মজুমদার], অক্ষয়বাবু [অক্ষয় মজুমদার], এঁরা সব সেজেছিলেন বড়ো বড়ো ডাকাত।'[৫১] সারদাপ্রসাদ নব-নাটক-এও অভিনয় করেছিলেন, আর কমিক-চরিত্রের বিখ্যাত অভিনেতা অক্ষয় মজুমদার নব-নাটক থেকে আরম্ভ করে রাজা ও রানী পর্যন্ত বিভিন্ন নাটকে বহুবার অভিনয় করেছেন—ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে তিনি আবদ্ধ ছিলেন, মহর্ষি তাঁর কন্যার বিবাহে এবং মাতা ও স্ত্রীর শ্রাদ্ধে অর্থসাহায্য করেছেন এমন উল্লেখও পাওয়া যায়—বাল্মীকিপ্রতিভা-য় অনেক দিন পর্যন্ত প্রথম দস্যুর ভূমিকাটি তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। এঁর সম্বন্ধে ইন্দিরা দেবী লিখেছেন, '...অভিনয় ও সংগীত দুয়েতেই জোড়াসাঁকোর বাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।...বড়ো অক্ষয়বাবুর খুব দরাজ গলা ছিল, যেটি মাঘোৎসবের উঠোনে ধ্রুপদ গাইবার সময় বিশেষ কাজে লাগত। তাঁর আর-একটি অভ্যাস ছিল যে, তাঁর যে চড়া সুর গলায় কুলোত না সেটি ঊর্ধ্বে ইঙ্গিত করে দেখিয়ে দিয়ে কাজ সারতেন।'[৫২]

বিদ্বজ্জন সমাগম-এ বাল্মীকিপ্রতিভা প্রথম অভিনীত হয় শিবরাত্রির দিন ১৬ ফাল্গুন ১২৮৭ শনিবার [26 Feb 1881]-এ। এই উপলক্ষে যে মুদ্রিত আমন্ত্রণপত্রটি বিদ্বজ্জনদের কাছে প্রেরিত হয় তাতে লেখা ছিল:

বিদ্বজ্জন সমাগম।

শূন্যমাপূর্ণতামেতি মৃত্যুশ্চাপ্যমৃতায়তে
বিপৎ সম্পদিবাভাতি বিদ্বজ্জন সমাগমাৎ।*

সবিনয় নিবেদন

১৬ ফাল্গুন শনিবার সন্ধ্যা ৭ ॥০ ঘটিকার সময় আমাদিগের যোড়াসাঁকোস্থ ভবনে ভারতী উৎসব হইবে; এবং সেই উপলক্ষে "বাল্মীকি প্রতিভা" নামক অভিনব গীতি-নাট্য অভিনীত হইবে। আপনি যথা সময়ে উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে সুখী করিবেন।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৭ ॥০ ঘটিকার সময় উৎসব আরম্ভ।
৮ ॥০ ঘটিকার সময় অভিনয় আরম্ভ।

এই পত্র প্রবেশ পত্র স্বরূপে দ্বার-দেশে গৃহীত হইবে।

সংস্কৃত শ্লোকটি কার রচনা আমাদের জানা নেই, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ 'বিদ্বজ্জন সমাগম' নামকরণ করেছিলেন—তিনিও এটি রচনা করে থাকতে পারেন। অন্য কোনো অধিবেশনের আমন্ত্রণপত্র পাওয়া যায়নি, অনুমান করা যায় প্রতিবারই এই শ্লোকটি শিরোভূষণ রূপে কার্ডে মুদ্রিত হত।

উল্লেখ করা দরকার, পুরো কার্ডটি মুদ্রিত হলেও '১৬' সংখ্যাটি হাতে লেখা। এর থেকে বোঝা যায় ফাল্গুন মাসের কোনো-এক শনিবার অনুষ্ঠানটি হবে একথা পূর্বেই নির্দিষ্ট হয়ে গেলেও মহলা ও অন্যান্য আয়োজন সম্পূর্ণ করার ব্যাপারে অনিশ্চয়তা থাকায় তারিখটি মুদ্রিত হয় নি। এমন-ও হতে পারে যে, ২রা ফাল্গুন শনিবার [বাল্মীকিপ্রতিভা প্রকাশের তারিখ]-ই অভিনয় হবে বলে গোড়ায় ঠিক হয়েছিল, সেই অনুযায়ী অভিনয়পত্রী হিসেবে মুদ্রিত গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, কিন্তু কোনো কারণ-বশত তা একপক্ষকাল পেছিয়ে যায়।

অভিনয় হয় মহর্ষিভবনের বহির্বাটীর তেতলার ছাদে। জীবনস্মৃতি-র প্রথম পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'তেতালার ছাদের উপর পাল খাটাইয়া স্টেজ বাঁধিয়া এই বাল্মীকিপ্রতিভার অভিনয় হইল। তাহাতে আমি বাল্মীকি সাজিয়াছিলাম। রঙ্গমঞ্চে আমার এই প্রথম অবতারণ। দর্শকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন, তিনি এই গীতিনাট্যের অভিনয় দেখিয়া তৃপ্তিপ্রকাশ করিয়াছিলেন।'[৫৩] রঙ্গমঞ্চে ভূমিকাভিনেতা হিসেবে রবীন্দ্রনাথ আগেও অবতীর্ণ হয়েছেন কিন্তু সে-অভিনয় আত্মীয়-বন্ধুর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, বাইরের দর্শকের সামনে এইটিই তাঁর প্রথম অভিনয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের তৃপ্তির কথা রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি-র দুটি পাণ্ডুলিপি ও প্রবাসী-তে বিভিন্ন ভাষায় উল্লেখ করেছেন [মুদ্রিত গ্রন্থে সে-কথা নেই], বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর তৃপ্তি প্রকাশ করেছেন বঙ্গদর্শন-এর আশ্বিন ১২৮৮ সংখ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লেখা বাল্মীকির জয় [১২৮৮] গ্রন্থের সমালোচনায় : 'পরের প্রতি প্রীতিমান্ হইয়া বাল্মীকি হৃদয়ে কবি হইয়াছিলেন—ভারতীর কৃপায় তিনি বাক্যেও কবি হইলেন। যাঁহারা বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বাল্মীকিপ্রতিভা"—পড়িয়াছেন, বা তাহার অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা কবিতার জন্মবৃত্তান্ত কখন ভুলিতে পারিবেন না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই পরিচ্ছেদে [৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ] রবীন্দ্রনাথবাবুর অনুগমন করিয়াছেন।'[৫৪] এই অংশটিকে আমরা বাল্মীকিপ্রতিভার-র সমালোচনা হিসেবেই গ্রহণ করতে পারি।

তখন ঠাকুরবাড়ির অভিনয়েও বিলিতি রঙ্গমঞ্চের অনুকরণ করা হত। সামনে যবনিকা তো থাকত-ই পিছনে অঙ্কিত দৃশ্যপটও থাকত; স্বর্ণকুমারী দেবীর বসন্ত উৎসব-এর মঞ্চনির্দেশে এর প্রমাণ আছে।[*১] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই নাটকে কোনো ভূমিকায় অবতীর্ণ হন নি, তাঁর উপর ছিল কনসার্টের ভার। কিন্তু মঞ্চসজ্জাকে স্বাভাবিক করার আকাঙক্ষায় তিনি যে কৌতুককর ঘটনার অবতারণা করেন তার বর্ণনা আছে তাঁর জীবনস্মৃতি-তে : 'প্রথম যখন ইঁহাদের বাড়ীতে "বাল্মীকি-প্রতিভা" অভিনয় হয়, তখন জ্যোতিবাবু নূতন শিকারী [এ-কথা অবশ্য ঠিক নয়, 1877-এ সঞ্জীবনী-সভার সময়েই আমরা তাঁকে ধাপার মাঠে শিকারী হিসেবে দেখেছি]; বন্দুক-চালনা প্রভৃতিতে তখন তাঁহার প্রবল ঝোঁক; অভিনয়-উপলক্ষে তিনি নিজেই শিকার করিতে বাহির হইলেন, সত্যিকারের একটা পাখী অভিনয়ে দেখাইবেন, এই অভিপ্রায়। কিন্তু বিধাতার এমনি পরিহাস যে, সারাদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, তবু একটা পাখিও মারিতে পারিলেন না। শেষে সন্ধ্যার পর হতাশ হইয়া যখন বাড়ী ফিরিতেছিলেন তখন দেখিলেন যে, এক ব্যক্তি কতকগুলি জীবন্ত বক লইয়া যাইতেছে। তাহার নিকট হইতে তিনি দুইটি বক ক্রয় করিয়া, পথে মারিয়া বাড়ী আনেন—তাহাই অভিনয়ে প্রদর্শিত হইয়াছিল।[*২] মঞ্চ ও রূপসজ্জা সম্পর্কে ইন্দিরা দেবী লিখেছেন, 'হ. চ. হ.—হরিশ্চন্দ্র হালদার আমাদের দৃশ্যপটগুলি অতি নিকৃষ্ট বিলিতি অনুকরণে আঁকতেন। বাস্তবের যথাসাধ্য অনুকরণ করাই ছিল তখনকার আদর্শ।...রবিকাকার বাল্মীকি সাজে পিঠের দিকে যে লম্বা জোব্বা মতো ঝুলিয়ে দেওয়া

হয়েছিল তাতে বিলিতি রাজরাজড়াদের mantle-এর আভাস পাওয়া যায়। তার সঙ্গে রুদ্রাক্ষের মালা।... তখনকার ডাকাতদের কাবুলিওয়ালা-সাজে কেন সাজানো হত বলতে পারি নে।...লক্ষ্মী-সরস্বতীকে তো মামুলি পৌরাণিক রীতি অনুসারে লাল ও সাদা জরির বেশে সাজানো হত।'[৫৫] প্রথম অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথের রূপসজ্জা হয়তো ওইরকমই ছিল, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের বর্ণনা থেকে জানা যায় দস্যুদের কাবুলিওয়ালার সাজ অনেক পরে প্রবর্তিত হয়েছিল : 'আগে ছিল ডাকাতদের খালি গা, বুকে সরু শালুর ফেটি।'[৫৬] বালিকা-রূপিণী প্রতিভা দেবীর রূপসজ্জার খানিকটা আভাস পাওয়া যায় রাজকৃষ্ণ রায়ের 'বালিকা-প্রতিভা' কবিতায়:

পরণে গেরুয়া বাস,   আলু থালু কেশ-পাশ
কি এক অপূর্ব্ব প্রভা উথলে ও বরাননে!
অলঙ্কার বলে কারে,   ও বালিকা জানে নারে,
প্রকৃতির অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা অযতনে।[৫৭]

পরের দিন সাধারণী [১৭ ফাল্গুন রবি 27 Feb] সাপ্তাহিকে অনুষ্ঠানটির একটি বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়: 'কল্য শনিবার সন্ধ্যার পর কলিকাতার জোড়াসাঁকোস্থ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবনে "বিদ্বজ্জন সমাগম" হইয়াছিল। ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু প্যারীমোহন [? চাঁদ] মিত্র, বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, বাবু শীতলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মিষ্টার বি, এল, গুপ্ত, মিষ্টার টি, এন, পালিত, আচার্য্য শ্রীক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, রাজা শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ডাক্তার কানাইলাল দে, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, বাব কৃষ্ণবিহারী সেন প্রভৃতি বহুতর আহূত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। ঠাকুর বাড়ীর ছোট ছোট গুটিকতক বালক বালিকা সঙ্গীত-যন্ত্রের সুরের সঙ্গে বেশ সুস্বরে গান করিয়াছিলেন। তাহার পর "বাল্মীকি প্রতিভা" নামে একখানি অভিনব গীতিকাব্য অভিনীত হয়। বাল্মীকি সরস্বতী কৃপায় দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া কিরূপে অমর কবিত্ব লাভ করেন তাহা প্রদর্শন করাই এই কাব্যের উদ্দেশ্য। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং বাল্মীকি হন আর "প্রতিভা" নাম্নী প্রতিভাসম্পন্না তাঁহার দ্বাদশ বর্ষীয়া ভ্রাতুষ্কন্যা বাগ্‌দেবী রূপে অভিনয় করেন। বঙ্গ কুল-কুমারী কর্ত্তৃক রঙ্গ-বেদী এই প্রথম উজ্জ্বলীকৃত হইল। বঙ্গ রঙ্গ-ভূমির নব কলেবরের এই অভিষেক ক্রিয়ার প্রতিভা উপযুক্ত অধিষ্ঠাত্রী দেবী বটেন। তিনি সুকণ্ঠা, গীতি নিপুণা, সতেজ-নয়না এবং ধীরপদ বিক্ষেপ-কারিণী। তাঁহার গীতাভিনয়ে দর্শক বৃন্দের অনেকে বিস্মিত এবং প্রীত হইয়াছিলেন।'[৫৮]

উপরের প্রতিবেদনে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও সাধারণী-সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার, নববিভাকর-সম্পাদক গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসক লালমাধব মুখোপাধ্যায় ও তিনি নিজে উপস্থিত ছিলেন তা জানা যায় খ্যাতনামা ব্যঙ্গরসিক সাহিত্যিক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি রচনা থেকে [দ্র 'বিদ্বজ্জন সমাগম', পাঁচুঠাকুর প্রথম কাণ্ড (১২৯১)]। রাজকৃষ্ণ রায়ের উপস্থিতি 'আর্য্য-দর্শন'-এ লিখিত কবিতা থেকে জানতে পারি; ড গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও দর্শকদের মধ্যে ছিলেন, এই উপলক্ষে তিনি একটি গান লেখেন:

উঠ বঙ্গভূমি মাতঃ, ঘুমায়ে থেকো না আর
অজ্ঞান তিমিরে তব সুপ্রভাত হল হের।
উঠেছে নবীন রবি, নব জগতের ছবি,

নব ‘বাল্মীকি প্রতিভা’, দেখাইতে পুনর্ব্বার।
হের তাহে প্রাণ ভরে, সুখতৃষ্ণা যাবে দূরে,
ঘুচিবে মনের ভ্রান্তি, পাবে শান্তি অনিবার।
‘মণিময় ধূলিরাশি’, খোঁজ যাহা দিবা নিশি,
ওভাবে মজিলে মন, খুঁজিতে চাবে না আর॥’

—দীর্ঘকাল পরে ১৪ মাঘ ১৩১৮ [রবি 28 Jan 1912] তারিখে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশত্তম বর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে যে সংবর্ধনার আয়োজন করেন, সেখানে তিনি এটি পাঠ করেন।

Hindoo Patriot[Vol. XXVIII, No.9, Feb 28, p. 103] পত্রিকা অনুষ্ঠানটির সংবাদ প্রকাশ করে, কিন্তু অভিনয়-সম্পর্কে বিশেষ বর্ণনা সেখানে নেই : Babu Dijendranath Tagore holds an annual festival under the name of Bharutiutsab, to which he invites literary and scientific gentlemen of this city [,] on Saturday last this festival was held; there was a good attendance of Bengali authors and others. They were entertained with recitations, music, and theatricals. Some cherubs of the house poured forth angelic music. Babu Dijendranath was very attentive to his guests.

বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, “‘বাল্মীকি প্রতিভা’র পুনরভিনয় বিদ্বজ্জনসমাগম সভার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে ৫ মার্চ ১৮৮১ (২৩ ফাল্গুন ১২৮৭)। অভিনয় হয় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতেই।’[৫৯] আমরা জানি বিদ্বজ্জন সমাগম-এর বার্ষিক অধিবেশন হয় এক সপ্তাহ আগে ১৬ ফাল্গুন তারিখে, তাছাড়া তথ্যটি কোন সূত্রে সংগৃহীত সে-কথা শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেন নি।[*] এই রকমই একটি তথ্য পরিবেশন করেছেন ড সুকুমার সেন—‘কিছু টিকিট বিক্রয়ও হইয়াছিল।’[৬০] অনুষ্ঠানটি ছিল আমন্ত্রণমূলক, সুতরাং তার জন্য টিকিট বিক্রয় করা স্বাভাবিক বলে মনে হয় না।

এইবার আমরা পুনরায় ভারতী-তে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার প্রসঙ্গে ফিরে যাই:

ভারতী, মাঘ ১২৮৭ *[৪।১০]:*
৪৫৫-৫৬ ‘শীত’ [‘পাখী বলে, আমি চলিলাম’] দ্র শিশু ৯।৮৪-৮৬

কবিতাটি প্রভাত সঙ্গীত [1883] কাব্যগ্রন্থে প্রথম সংকলিত হয়, কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণ [1892]-এ বর্জিত হয়ে অনেকদিন পরে মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ ৭ম ভাগে [1903] ‘শিশু’ পর্যায়ে গৃহীত হয়েছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, ‘কবিতাটি পড়িয়া মনে হয় বিলাতের স্মৃতি বহন করিতেছে’[৬১] —আমরাও এই অনুমান সমর্থন করি। প্রভাত সঙ্গীত-এর সুরের সঙ্গে কবিতাটি ঠিক খাপ খায় না বলেই হয়তো দ্বিতীয় সংস্করণে এটি বর্জিত হয়েছিল, পরে বালক, বৈশাখ ১২৯২ সংখ্যায় [পৃ ৫৬-৫৭] প্রকাশিত ‘ফুলের ঘা’ [কাব্যগ্রন্থ-তে এর নাম ‘শীতের বিদায়’] কবিতাটির ভাবানুষঙ্গে এটি ‘শিশু’ পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হয়।
৪৭৩-৭৮ ‘ভগ্নহৃদয়’ ৫ম সর্গ দ্র ভগ্নহৃদয় অ-১। ১৫৮-৬৮

এই সর্গে কতকগুলি গান আছে, তাদের মধ্যে কয়েকটি অনেক পূর্ব কালের রচনা।

[১] ‘খেলা কর, খেলা কর কামিনীকুসুমগুলি’ দ্র রবিচ্ছায়া। ৮৮ [বিবিধ ১০৫], কালাংড়া-কাওয়ালি; গীতবিতান ৩।৭৭১; রবিচ্ছায়া-য় সুরের উল্লেখ থাকলেও স্বরলিপি-বদ্ধ হয় নি।

[২] ‘কে আমার সংশয় মিটায়’ দ্র রবিচ্ছায়া। ৮৭ [বিবিধ ১০৪]; এখানে সুরের উল্লেখ নেই বলে গান হিসেবে গীতবিতান-এও সংকলিত হয় নি। মালতীপুঁথি-র 26/১৪খ পৃষ্ঠায় ভগ্নহৃদয়-এ ব্যবহৃত আরও কয়েকটি গানের সঙ্গে এরও আদিরূপটি পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ গানটি সম্ভবত অন্যভাবে রচনা করতে শুরু করেছিলেন, ‘বল সখা সে কি ভালবাসে/দারুণ সংশয় এই কে মোর বিনাশে’ ছত্র দুটি প্রথমে লিখে কেটে দেন।

[৩] ‘আঁধার শাখা উজল করি’ দ্র স্বপ্নময়ী। ৪৫৬-৫৭ [২য় অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্ক, স্বপ্নময়ীর গান] গৌড়সারং-কাওয়ালি; রবিচ্ছায়া। ১৭ [বিবিধ ২৩] গৌড়সারং-যৎ; কাব্যগ্রন্থাবলী। ৭, ‘একাকিনী’ শিরোনামায় গৃহীত; গীতবিতান ৩।৭৭১; স্বরবিতান ২০-তে ‘গৌড়সারং। ঝাঁপতাল’ সুর-তালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি-গীতমালা-ধৃত স্বরলিপিটি মুদ্রিত হয়েছে। গানটি বিলাতযাত্রার প্রাক্কালে আমেদাবাদে থাকার সময়ে রচিত।

ভারতী, ফাল্গুন ১২৮৭ *[৪।১১]:*

৫০৭-১৩ ‘ভগ্নহৃদয়’ ষষ্ঠ সর্গ দ্র ভগ্নহৃদয় অ-১। ১৬৯-৮১

এই সর্গটির পরে কাব্যটির আর কোনো অংশ ভারতী-তে মুদ্রিত হয় নি, সমগ্র কাব্যটি বাকি অংশ সমেত বৈশাখ ১২৮৮-তে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বর্তমান সর্গটির কিয়দংশ সম্ভবত স্টীমারে ও বাকি অংশ বোলপুরে লিখিত, একথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। এই সর্গেও গান আছে, যার কয়েকটি অনেক আগে লেখা—তাছাড়া কয়েকটি কাব্যাংশ সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা করা দরকার।

[১] ‘নীরব রজনী দেখ মগ্ন জোছনায়’—আমেদাবাদে থাকার সময়ে সর্বপ্রথম নিজের সুর দেওয়া যে গানগুলি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, এটি তার অন্যতম। গানটি সম্পর্কে অন্যান্য তথ্য আমরা পূর্বেই দিয়েছি।

[২] ‘শুধু যদি বলি, সখি, ভাল বাসি তায়’—কবিতাটি কাব্যগ্রন্থাবলী-তে ‘ভাবাবেগ’ [পৃ ৭-৮] শিরোনামায় সংকলিত হয়েছে। কবিতাটির আদিরূপ আছে মালতীপুঁথি-র 26/১৪খ পৃষ্ঠায়, সেখানে অবশ্য ‘সখি’-গুলিকে ‘সখা’-রূপে পাওয়া যায়।

[৩] ‘পূর্ণিমারূপিনী বালা! কোথা যাও, কোথা যাও!...ঘুমময় জাগরণে করিব রজনী ভোর’—কবির এই দীর্ঘ উক্তিটি কাব্যগ্রন্থাবলী-তে অনেক পরিবর্জিত ও পরিবর্তিত আকারে ‘উচ্ছ্বাস’ [পৃ ৮] শিরোনামায় সংকলিত হয়েছে।

[৪] ‘সখি, ভাবনা কাহারে বলে?’ দ্র রবিচ্ছায়া। ৮৫ [বিবিধ ১০৩], বেহাগ-খাম্বাজ—একতালা; কাব্যগ্রন্থাবলী-তে এটির শিরোনাম ‘সমস্যা’ [পৃ ৮], গীতবিতান ৩।৭৭১; ইন্দিরা দেবী-কৃত উপরোক্ত সুরতালে বাঁধা স্বরলিপিটি স্বরবিতান ২০-তে সংকলিত হয়েছে।

৫৪২-৪৪ ‘দুঃখ আবাহন’ দ্র সন্ধ্যাসংগীত ১।১৫-১৭ [‘দুঃখ-আবাহন’]

ভারতী-তে প্রকাশের সময় কবিতাটিতে ১০৯টি ছত্র ছিল, বিভিন্ন সংস্করণে বর্জিত হয়ে [কাব্যগ্রন্থাবলী-তেই ৫২টি ছত্র বর্জিত] রবীন্দ্র রচনাবলী-তে মাত্র ৫৪টি ছত্র রক্ষিত হয়। পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণ [1969]-এ বর্জিত ছত্রগুলি সংকলিত হয়েছে।

এই কবিতাটিকে রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের পক্ষে আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। সন্ধ্যাসংগীত সম্বন্ধে তিনি জীবনস্মৃতি-র পাণ্ডুলিপিতে লিখেছিলেন, 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে আমি সর্বপ্রথম নিজের সুরে নিজের কবিতা লিখিয়াছিলাম।'[৬২] সন্ধ্যাসংগীত-এর যে-কবিতাগুলি ভারতী-তে প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যে প্রকাশ-সূচী অনুসারে জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭-সংখ্যায় মুদ্রিত 'দুদিন'-এর পরই 'দুঃখ আবাহন' কবিতাটির স্থান। বিলাত-ত্যাগের মুহূর্তে বা তার অব্যবহিত পরে 'দুদিন' কবিতা রচিত হয়েছিল—বাস্তব বেদনার অব্যবহিত অভিঘাত কবিতাটির সর্বাঙ্গে, ফলে কাব্যরসের দিক দিয়ে এটি খুব উচ্চস্তরের নয়। এর পরেই 'দুঃখ আবাহন'—আমাদের ধারণা এটির রচনাকাল কার্তিক ১২৮৭-র কোনো সময়ে, যখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবী বোম্বাই অঞ্চলে দীর্ঘদিনের জন্য বেড়াতে গিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'এক সময়ে জ্যোতিদাদারা দূরদেশে ভ্রমণ করিতে গিয়েছিলেন—তেতালার ছাদের ঘরগুলি শূন্য ছিল। সেই সময় আমি সেই ছাদ ও ঘর অধিকার করিয়া নির্জন দিনগুলি যাপন করিতাম/ এইরূপে যখন আপন মনে একা ছিলাম তখন, জানি না কেমন করিয়া, কাব্যরচনার যে-সংস্কারের মধ্যে বেষ্টিত ছিলাম সেটা খসিয়া গেল। আমার সঙ্গীরা যে-সব কবিতা ভালোবাসিতেন [অর্থাৎ বিহারীলালের আদর্শে লিখিত কবিতা] ও তাঁহাদের নিকট খ্যাতি পাইবার ইচ্ছায় মন স্বভাবতই যে-সব কবিতার ছাঁচে লিখিবার চেষ্টা করিত, বোধকরি তাঁহারা দূরে যাইতেই আপনাআপনি সেই-সকল কবিতার শাসন হইতে আমার চিত্ত মুক্তিলাভ করিল।'[৬৩]

এই সময়ে তিনি একটি শ্লেট নিয়ে কবিতা লিখতেন। এই অভ্যাস তাঁর আগে-পরেও ছিল, ভানুসিংহের প্রথম কবিতা 'গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে' শ্লেটে লেখা, পরেও মায়ার খেলা-র অনেক গান শ্লেটের উপর লেখা ইন্দিরা দেবীর সাক্ষ্য[৬৪] থেকে তা জানা যায়। কিন্তু বর্তমান সময়ে শ্লেটে লেখাই মুক্তির লক্ষণ হিসেবে দেখা দিল। খাতায় লেখা কবিতার মধ্যে রীতিমত কাব্য লেখার একটা পণ ছিল, কবিযশের ভাণ্ডারে সেগুলি জমা হচ্ছে ভেবে অন্যের সঙ্গে তুলনা করে মনে মনে হিসাব মেলাবার চিন্তা নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু শ্লেটের লেখা লেখবার খেয়ালেই লেখা। 'এমনি করিয়া দুটো-একটা কবিতা লিখিতেই মনের মধ্যে ভারি-একটা আনন্দের আবেগ আসিল।...এই স্বাধীনতার প্রথম আনন্দের বেগে ছন্দোবন্ধকে আমি একেবারেই খাতির করা ছাড়িয়া দিলাম। নদী যেমন কাটাখালের মতো সিধা চলে না—আমার ছন্দ তেমনি আঁকিয়া বাঁকিয়া নানামূর্তি ধারণ করিয়া চলিতে লাগিল। আগে হইলে এটাকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করিতাম কিন্তু এখন লেশমাত্র সংকোচ বোধ হইল না। স্বাধীনতা আপনাকে প্রথম প্রচার করিবার সময় নিয়মকে ভাঙে, তাহার পরে নিয়মকে আপন হাতে সে গড়িয়া তুলে—তখনই সে যথার্থ আপনার অধীন হয়।'[৬৫] এই রকম স্বাধীনতা তিনি আগেও 'প্রলাপ' কবিতাগুচ্ছে, 'অপ্সরাপ্রেম' গাথার 'কেন গো সাগর এমন চপল' এবং অন্যান্য কয়েকটি গানে নেবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু অচিরেই আবার বাঁধা-ছন্দের পথে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু বাল্মীকিপ্রতিভা-য় যেমন 'দস্তুরভাঙা গীতবিপ্লবের প্রলয়ানন্দে'র পরিচয় আছে, 'দুঃখ আবাহন'-এ তেমনি ছন্দভাঙা আনন্দের সাক্ষাৎ মেলে। এই 'উচ্ছৃঙ্খল কবিতা'র একমাত্র শ্রোতা ছিলেন অক্ষয় চৌধুরী, তিনি এই নতুন ধরনের কবিতায় খুশি ও বিস্ময় প্রকাশ করেন : 'তাঁহার কাছ হইতে অনুমোদন পাইয়া আমার পথ আরও প্রশস্ত হইয়া গেল।'[৬৫]

অবশ্য ভাবের দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তখনও ভগ্নহৃদয়-এর জগতেই অবস্থান করছিলেন—'বাহিরের সঙ্গে যখন জীবনটার যোগ ছিল না, যখন নিজের হৃদয়েরই মধ্যে আবিষ্ট অবস্থায় ছিলাম, যখন কারণহীন আবেগ ও লক্ষ্যহীন আকাঙক্ষার মধ্যে আমার কল্পনা নানা ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতেছিল।'[৬৬] 'দুঃখ-আবাহন' সেই সময়েরই লেখা। সন্ধ্যাসংগীত-এ এই কবিতাটির পরেই আছে 'শান্তিগীত'—এটি ভারতী-তে প্রকাশিত হয় নি, কিন্তু ভাবের দিক থেকে কবিতাটিকে আগেরটিরই অনুবৃত্তি বলে মনে হয়; মুদ্রিত গ্রন্থে যদিও কবিতাগুলি কালানুক্রমে সজ্জিত নয়, তবু কবিতা-দুটির একত্র অবস্থান এইরূপ সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে। 'পথিক' কবিতাটিও সম্ভবত এই সময়ে লেখা—'আবার নূতন করি জীবনের খেলা আরম্ভ' করার আকাঙ্ক্ষা সেখানে আছে, কিন্তু হৃদয়-অরণ্য থেকে মুক্তির পথ তখনও খুঁজে পান নি।

ভারতী, চৈত্র ১২৮৭ *[৪।১২]:*

৫৫৩-৬৪। 'পারিবারিক দাসত্ব'

প্রবন্ধটি সম্বন্ধে প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সজনীকান্ত দাস লিখেছিলেন : "'য়ুরোপ যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র' ধারাবাহিক ভাবে 'ভারতী'তে বাহির হয়। শেষের দিকে কোনও কোনও উগ্র মতামতের দরুন সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ লেখক রবীন্দ্রনাথকে পাদটীকায় কঠিন সমালোচনা করেন। এই প্রবন্ধটি সম্ভবতঃ জ্যেষ্ঠে-কনিষ্ঠে মতান্তরের ফল। সদ্য বিলাতফেরত রবীন্দ্রনাথ এদেশীয় সমাজ-ব্যবস্থাকে আক্রমণ করিতে চাহিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধের পরেও সম্পাদকীয় প্রতিবাদ-মন্তব্য যোগ করেন।'[৬৭] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রবন্ধটিকে রবীন্দ্র-রচনা বলে কোথাও স্বীকৃতি না দিলেও, আমাদের নিশ্চিত ধারণা এটি রবীন্দ্রনাথের লেখা। পাঠকের অবশ্যই মনে আছে ইংলণ্ড থেকে লেখা একটি পত্রে [ভারতী, পৌষ ১২৮৬। ৩৯৪-৪১১, য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র। ১৪১-৬৭ (৯)] রবীন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ ও প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁর তৎকালীন ধারণা ব্যক্ত করতে গিয়ে লিখেছিলেন, 'আমরা পারিবারিক দাসত্বকে দাসত্ব নাম দিই নে' এবং পত্রটির উপর দীর্ঘ সম্পাদকীয় টীকা প্রকাশিত হয়। স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ে যে বিতর্ক দেখা দিয়েছিল বৈশাখ ১২৮৭-সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ তার প্রত্যুত্তর দিলেও উপরোক্ত বিষয়ে তাঁর মতামত পত্রাকারে প্রকাশিত হয় নি। আমাদের ধারণা, এই উত্তরটিই 'পারিবারিক দাসত্ব' প্রবন্ধের আকারে রচিত হয়েছিল এবং এটির রচনাকাল সম্ভবত শ্রাবণ-ভাদ্র মাস অর্থাৎ ভারতী-তে 'য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র' প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাবার ঠিক পরেই। তবে সেটি এত দিন পরে ঠিক এই সময়েই প্রকাশিত হল কেন তা বলা শক্ত। ভগ্নহৃদয় গীতিকাব্যের আংশিক প্রকাশ, মাঘোৎসবের সংগীত-মালা, বাল্মীকি প্রতিভা রচনা ও অভিনয় প্রভৃতির দ্বারা রবীন্দ্রনাথ এইসময় পারিবারিক ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন। অসময়ে বিলাত-প্রত্যাগত রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে যদি হীনমন্যতায় আক্রান্ত হয়ে থাকেন-ও, বর্তমানে সেই বোধ তাঁর না থাকাই স্বাভাবিক—বিশেষত দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রার আয়োজন যখন প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

প্রচণ্ড বিদ্রূপ মনোভাব ও সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ প্রবন্ধটির অন্যতম বিশেষত্ব। উপযুক্ত কাব্যভাষার সন্ধানে যখন রবীন্দ্রনাথ নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যাপৃত, সেই সময়েই গদ্যভাষা তাঁর ইচ্ছামতো ভাবপ্রকাশে কতখানি অনুগত হয়ে এসেছে প্রবন্ধটিতে তার পরিচয় প্রায় সর্বত্র। রচনাটি অপরিচিত, সুতরাং একটু বেশি অংশই উদ্ধৃত করছি:

'সম্প্রতি স্বাধীনতা নামে একটি শব্দ আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।..."স্বাধীনতা স্বাধীনতা" বলিয়া ঢাকের একটা বোল তৈরি হইয়া গিয়াছে, এবং কবিবর, মহাকবি ও সুপ্রসিদ্ধ কবি নামক যত বড় বড় সাহিত্য ঢাকীগণ ঐ বোলে বাজাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। শুনিতেছি না কি বড় মিঠা বাজিতেছে,...

'...একথা আমরা কবে বুঝিব যে, যত দিনে না আমাদের হৃদয়ের অস্থিমজ্জাগত দাসত্বের ভাব দূর না হইবে, ও স্বাধীনতা-প্রিয়তার ভাব হৃদয়ের শোণিত স্বরূপে হৃদয়ে না বহমান হইবে ততদিন আমরা দাসই থাকিব। আমরা যে প্রতি পরিবারে এক একটি করিয়া দাসের দল সৃষ্টি করিতেছি। আমরা যে আমাদের সন্তানদের—আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের শৈশব কাল হইতে চব্বিশ ঘণ্টা দাসত্ব শিক্ষা দিতেছি! ...ইহারাও বড় হইলে স্বাধীনতা স্বাধীনতা করিয়া একটা তুমুল কোলাহল করিতে থাকিবে, অথচ অধীনতাকে আপনার পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে স্থাপন করিয়া তাহাকে দুধ কলা সেবন করাইবে! প্রাণের মধ্যে অধীনতার আসন ও রসনার উপর স্বাধীনতার আসন। অমন একটা নর্ত্তনশীল আসনের উপরে স্বাধীনতাকে বসাইয়া আমরা দিবানিশি ঐ শব্দটার নৃত্যই দেখিতেছি। বড় আমোদেই আছি!'[৬৮]

প্রবন্ধটি যে রবীন্দ্রনাথেরই লেখা এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। রচনাটির শেষ দিকে তার প্রায় স্পষ্ট উল্লেখই আছে : 'যাহারা আপনার কনিষ্ঠদের নিজের সম্পত্তি মনে করে, তাহারা যে, নিজের ভৃত্যদেরও তাহাই মনে করিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে। লেখক ইংলণ্ড্ হইতে চিঠিতে লিখিয়াছিলেন যে, "এখানে চাকরকে গালাগালি দেওয়া ও মারাও যা...তাকে কিছু আজ্ঞা করবার সময় 'please' বলা আবশ্যক।" [দ্র য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র। ১৫৩] ইহাতে কেহ কেহ এইরূপ বলিয়াছেন,—"চাকরদের সঙ্গে পদে পদে সম্মানসূচক ব্যবহার করা...এরূপ কাষ্ঠসভ্যতা কাষ্ঠহৃদয়ের উপরেই গুণ করিতে পারে, সহজ হৃদয়কে আগুন করিয়া তোলে।" [দ্র ঐ। ১৬৩, পাদটীকা ১৬-১৭] জাতীয় ভাব এমন একটি যুক্তি বিহীন অন্ধ বধির ভাব যে, সে নিতান্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তিকেও অযৌক্তিক করিয়া তুলে। আমাদের দেশে একটা সাধারণ সংস্কার আছে যে, ইংরাজদের সমস্ত আচার ব্যবহার কাষ্ঠসভ্যতা প্রসূত, এরূপ সংস্কার সাধারণ লোকেদের মধ্যেই বদ্ধ থাকা স্বাভাবিক, যাহারা কিছু বিবেচনা করে না, প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, কেবল তাড়াতাড়ি বিশ্বাস করিতেই জানে, তাহাদেরই মুখে এরূপ কথা শোভা পায়, কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তি অত শীঘ্র একটা সংস্কারে উপনীত হন না।...জাতীয় ভাব এইরূপ একটা অদূর-দৃষ্টি, যুক্তিহীন অথচ গোঁ-বিশিষ্ট ভাব। উহা দ্বারা অতিমাত্র বিচলিত হওয়া সাধারণ লোকেদের কাজ, চিন্তাশীল লোকদের নহে!'[৬৯]

কনিষ্ঠের এই ধরনের বাগ্‌বিন্যাস 'অমৃতং বালভাষিতম্' বলে উড়িয়ে দেওয়া শক্ত, তবু 'উপরের প্রস্তাব উপলক্ষে সম্পাদকের মন্তব্য' [পৃ ৫৬৪-৬৮] অংশে সম্পাদকের যথেষ্ট ধৈর্য ও সংযমের পরিচয় পাওয়া যায়।

বাল্মীকি প্রতিভা অভিনয়ের পর থেকে পরবর্তী বৈশাখ মাসে দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রার জন্য জাহাজে আরোহণ করা পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে খুব ব্যস্ত সময় কাটাতে হয়েছে। এর মধ্যে তিনটি কাজ সর্বপ্রধান —'সংগীত ও ভাব' প্রবন্ধ রচনা এবং ভগ্নহৃদয় ও রুদ্রচণ্ড গ্রন্থ দুটির মুদ্রাঙ্কনের আয়োজন করা। বাল্মীকি প্রতিভা-য় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহযোগিতায় রবীন্দ্রনাথ সংগীতের যে নতুন পরীক্ষা করেন বিদ্বজ্জন-মণ্ডলী তার যথেষ্ট প্রশংসা করলেও তাঁদের যে-কটি মন্তব্যের উল্লেখ আমরা আগে করেছি সেগুলি প্রধানত নাট্য-

বিষয় এবং প্রতিভা দেবীর অভিনয় সম্বন্ধে আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ থেকেছে, সংগীতের বিশেষ প্রয়োগ সম্বন্ধে কেউ কোনো কথা লেখেন নি। বিশিষ্ট সংগীত-বেত্তা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী দর্শকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তাঁদের প্রতিক্রিয়া বিষয়ে কিছু জানা যায় না। উক্ত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সংগীতের এই নতুন ভূমিকার তত্ত্ব-ভিত্তি রচনা করার চেষ্টা করেছেন। জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮ সংখ্যা ভারতী-তে প্রকাশিত প্রবন্ধটির পাদটীকায় উল্লিখিত হয়েছে, বেথুন সোসাইটির সভায় সেটি পাঠ করার সময় 'বহু সংখ্যক গান গাহিয়া কি কি সুর-বিন্যাস দ্বারা কি-কি ভাব প্রকাশিত হয়' তার দৃষ্টান্তও দেওয়া হয়েছিল। কাজটি খুব সহজ ছিল না, সুর ও গান নির্বাচন এবং তার যথোপযুক্ত ভাষ্য রচনা করা যথেষ্ট পরিশ্রমসাধ্য; সুতরাং অনুমান করা যায়, উক্ত প্রবন্ধ ও বক্তৃতার প্রস্তুতিতে ফাল্গুন-চৈত্র মাসের অনেকটাই ব্যয়িত হয়েছে। তাছাড়া রুদ্রচণ্ড ও ভগ্নহৃদয় দুটি গ্রন্থই বৈশাখ ১২৮৮-তে প্রকাশিত হয় [ভগ্নহৃদয়-এর প্রকাশকাল সাধারণত আষাঢ় ১২৮৮ বলে ধরা হয়, এ-প্রসঙ্গে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করব], সেগুলি মুদ্রণের আয়োজনেও তাঁকে যথেষ্ট সময় দিতে হয়েছিল। তাছাড়া বিলাতযাত্রার জন্য প্রস্তুতি তো ছিল-ই। এই সময়ের একটি সুন্দর জীবন-চিত্র আমাদের উপহার দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ : 'তখন আমার অল্প বয়স, গান গাহিতে আমার কণ্ঠের ক্লান্তি বা বাধামাত্র ছিল না;—তখন বাড়িতে দিনের পর দিন, প্রহরের পর প্রহর সংগীতের অবিরলবিগলিত ঝরনা ঝরিয়া তাহার শীকরবর্ষণে মনের মধ্যে সুরের রামধনুকের রং ছড়াইয়া দিতেছে; তখন নবযৌবনে নব নব উদ্যম নূতন নূতন কৌতূহলের পথ ধরিয়া ধাবিত হইতেছে; তখন সকল জিনিসই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই, কিছু যে পারিব না এমন মনেই হয় না, তখন লিখিতেছি, গাহিতেছি, অভিনয় করিতেছি, নিজেকে সকল দিকেই প্রচুরভাবে ঢালিয়া দিতেছি—আমার সেই কুড়িবছরের বয়সটাতে এমনি করিয়াই পদক্ষেপ করিয়াছি।'[৭০] আমাদের ধারণা, এই বর্ণনা বর্তমান বৎসরের পৌষ থেকে চৈত্র—এই চার মাসের পক্ষে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন, তখন তাঁর 'সমস্ত শক্তিকে এমন দুর্দাম উৎসাহে দৌড়' করাবার সারথি ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

৩০ চৈত্র [সোম 11 Apr 1881] সাবিত্রী লাইব্রেরির দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বাঙ্গালা সাহিত্য/(বর্ত্তমান শতাব্দী)' শীর্ষক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটি আশ্বিন ১২৯৩ [1886]-তে 'সাবিত্রী' সংকলন-গ্রন্থে মুদ্রিত হয় তখন রবীন্দ্রনাথ ও স্বর্ণকুমারী দেবী সম্বন্ধে দুটি অতিরিক্ত অনুচ্ছেদ তাতে যুক্ত হয়; 'ভূমিকা'য় উল্লিখিত হয়েছে : "ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য" যে বৎসরে লিখিত হয়, তাহার পর এই কয় বৎসরের মধ্যে কয়েক জন বিখ্যাত লেখক জন্মিয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান লেখক ও কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখিকা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। ইঁহাদের পুস্তক সমালোচনা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইল।' মূল বক্তৃতাটি বঙ্গদর্শন ফাল্গুন ১২৮৭ সংখ্যার ৪৮৯-৫১২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল [বঙ্গদর্শন-যে যথাসময়ে প্রকাশিত হত না এটি তারই একটি প্রমাণ]। এই প্রবন্ধে কিন্তু হরপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের নাম না করেও তাঁর কথা উল্লেখ করেছিলেন, ভারতী-র আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি লেখেন, '...আর একখানি সাময়িকপত্র ভারতী, এখানি যোড়াসাঁকস্থ ঠাকুর-পরিবার কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ইহার রুচি মার্জ্জিত, ভাষা ললিত। ইহার কার্য্যপ্রণালী সুন্দর, ইহা কখন বাকী পড়ে না, সকল কাগজ একবৎসর দুই বৎসর বাকী পড়িয়াছে, কিন্তু ভারতীর বাকী নাই। এই পত্রের সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইঁহার নিজের গ্রন্থাবলী অতি সুন্দর। স্বপ্নপ্রয়াণে ইঁহার কল্পনাশক্তির অনেক দূর দৌড় দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারও সহকারী কে কে আমরা জানি না, কিন্তু

শুনিয়াছি, দ্বিজেন্দ্রবাবুর ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকেন। যেখান হইতে পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে সরোজিনী, পুরুবিক্রম, বাল্মীকিপ্রতিভা প্রভৃতি দশ বারোখানি সুরুচিসঙ্গত সুললিত পাঠ্য ও উপাদেয় গ্রন্থ বাহির হইয়াছে, তাঁহাদিগকে অল্পক্ষমতাশালী বলিয়া বোধ হয় না।' [পৃঃ ৫০৭] উদ্ধৃতিটিতে বাল্মীকিপ্রতিভা-র উল্লেখটি লক্ষণীয়, তবে এ-ও মনে হয় তিনি তখন ঠাকুরপরিবারের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন না।

আমাদের ধারণা, রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত সাবিত্রী লাইব্রেরির উক্ত বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। লাইব্রেরিটির প্রতিষ্ঠাতা বউবাজারের ১৮নং অক্রূর দত্তের গলির বাসিন্দা গোবিন্দলাল দত্তের পরিবারের সঙ্গে ঠাকুরপরিবারের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। এই পরিবারের গৃহবধূ কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী স্বর্ণকুমারী দেবীর অভিন্নহৃদয়া সখী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে সাবিত্রী লাইব্রেরির বার্ষিক অধিবেশনে প্রবন্ধপাঠ করেন। এঁদের দ্বারা আয়োজিত মহিলাদের জন্য রচনাপ্রতিযোগিতায় ১২৮৯ বঙ্গাব্দ থেকে রবীন্দ্রনাথ অন্যতম বিচারক নির্বাচিত হয়েছিলেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ১

১২৮৭ বঙ্গাব্দের ক্যাশবহি ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-র উল্লেখ-সমূহের অভাবে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির এই বৎসরের পারিবারিক বিবরণটি আমাদের কাছে যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। তা সত্ত্বেও যতটুকু তথ্য পাওয়া যায় আমরা সেগুলি সংকলন করে দিচ্ছি।

সত্যেন্দ্রনাথ যখন গত বৎসরের চৈত্র মাসে ফ্রান্স থেকে সপরিবারে কলকাতা প্রত্যাবর্তন করেন, তখনও তাঁর ফার্লো ছুটি শেষ হতে প্রায় দুমাস বাকি ছিল। ছুটির বাকি সময় কলকাতায় কাটিয়ে তিনি 11 May 1880 [মঙ্গল ৩০ বৈশাখ] তারিখে সুরাটে তাঁর নতুন কর্ম্মস্থলে স্থানাপন্ন সিভিল ও সেশন জজ হিসেবে যোগ দেন। কলকাতায় থাকার সময় ১৫ বৈশাখ [সোম 26 Apr] তিনি প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট বিহারীলাল গুপ্তের লোয়ার সার্কুলার রোডের বাসভবনে মাদ্রাজের বিখ্যাত গণিতজ্ঞ পণ্ডিত রঙ্গ আচার্য শতবধানীর বিস্ময়কর প্রতিভার প্রদর্শনমূলক উদ্যানসভায় যোগ দেন। এই অনুষ্ঠানে দ্বিজেন্দ্রনাথ, মনোমোহন ঘোষ, তারকনাথ পালিত, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন [দ্র *Bengalee*, 1 May, p. 207]। সম্ভবত সদ্য বিলাত-প্রত্যাগত রবীন্দ্রনাথও সেখানে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বিহারীলাল গুপ্ত ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

সত্যেন্দ্রনাথ কর্মস্থলে যাওয়ার সময় স্ত্রী ও সন্তানদের কলকাতাতেই রেখে যান। ইন্দিরা দেবী লরেটো কনভেন্ট স্কুল ও সুরেন্দ্রনাথ সেন্ট জেভিয়ার্সে ভর্তি হন। এঁদের আচার-আচরণ ও তাঁদের সঙ্গে বাড়ির অন্যান্য ছেলেমেয়ের সম্পর্ক বর্ণনা করে সরলাদেবী লিখেছেন : 'মেজমামীর ছেলেমেয়ে সুরেন বিবির ইংরেজী ভাষণ ও ইংরেজী চালচলনের সঙ্গে সঙ্গে সাহেবী পোশাক-পরা বোম্বাইয়ের "রামা" চাকরের অভ্যুদয় সকলের পক্ষে ভারি আমোদজনক হল।...আরও একটি সঙ্গী ছিল তাঁদের—ফ্রান্সের নিস্ শহর থেকে সংগৃহীত "নিসুয়া" নামের কুকুর,—ছোট ছোট সাদা লোমওয়ালা একটি তুলতুলে জাপানী lap-dog।...সুরেন বিবিদের পরিধান খাস বিলেতের কোট ও ফ্রক। এ বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের বাড়ির পরিধান তখনও সেই ইজের জামা, আর

বাইরে স্কুলাদিতে যেতে হলে দিশী দর্জির হাতের যেমন-তেমন cut-এর ফ্রক।...বিলেত ফেরৎ সুরেন বিবিরা রামার সঙ্গে রোজ ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে যেত। পালা করে এক একদিন বাড়ির এক একটি ছেলেমেয়ে তাদের সঙ্গে যেতে পেত।'[৭১] প্রধানত ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ইংরেজ পাড়ায় বাড়ি ভাড়া করেন। ইন্দিরা দেবী তাঁর অপ্রকাশিত স্মৃতিকথায় লিখেছেন : 'কোন্ ভাড়াটে বাড়ীতে প্রথম উঠে আসি তা সঠিক মনে নেই। তবে আমার মনে হয় লোয়ার সার্কুলার রোডে ভুবনমোহন দাসের বাড়ীটাই প্রথম।...আমরা সংক্ষেপে তাকে ভবানীপুরের বাড়ী বলতুম, বোধহয় একাধিকবার সেখানে ছিলুম। নম্বরটা এখনো মনে হচ্ছে যেন ২৩৪ না ৩৫। বাড়ী খানা মস্ত, দোতলা, ও সেকালের বিলাতী নমুনায় মাঝে একটা বড় হল আর চারদিকে চারটে ঘর; তাছাড়া গাড়িবারান্দার উপরেও একখানা ঘর।' বাড়িটির কথা পাঠকদের স্মরণ রাখতে বলি, এটির কথা আমরা পরেও উল্লেখ করব।

স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী জানকীনাথ ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য 1878-এর শেষ দিকে ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন; *Journal of the National Indian Association*-এর Jan 1880 সংখ্যা থেকে জানা যায়, তিনি প্রাথমিক পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হন। উক্ত পত্রিকার Mar সংখ্যায় লিখিত হয় যে, তিনি Inner Temple-এ যোগ দিয়েছেন; কিন্তু Jun 1880 সংখ্যার সংবাদে দেখি যে, 5 May [বুধ ২৪ বৈশাখ] তিনি সাউদাম্পটন বন্দর থেকে *Ancona* জাহাজে কলকাতার উদ্দেশে যাত্রা করেছেন। হিরণ্ময়ী দেবী লিখেছেন, কনিষ্ঠা কন্যা ঊর্মিলার মৃত্যুই তাঁর আকস্মিক প্রত্যাবর্তনের কারণ। উক্ত পত্রিকা থেকেই জানা যায়, বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অ্যাবারডীন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. বি. ডিগ্রী লাভ করেছেন।

তত্ত্ববোধিনী-র পৌষ সংখ্যায় আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্তিক মাসের আয়ব্যয়ের বিবরণে হেমেন্দ্রনাথের নামে 'শুভকর্মের দান' হিসেবে ৫ টাকা আয়ের উল্লেখ দেখা যায় [পৃ ১৮০]। শুভকর্মটি কি জানার উপায় নেই, সম্ভবত তাঁর কোনো কন্যার [? সুনৃতা দেবী] অন্নপ্রাশন উপলক্ষেই এই দানটি করা হয়েছিল।

বৎসরের প্রথম থেকেই মহর্ষি দার্জিলিঙে অবস্থান করছিলেন। এখান থেকেই তিনি ১৪ কার্তিক [শুক্র 29 Oct] জামাতা সারদাপ্রসাদকে পত্র লিখে ১ অগ্রহায়ণ সারা ঘাটে বোট পাঠাবার নির্দেশ দেন। এর পরে তত্ত্বকৌমুদী [৩।১৫, ১৬ পৌষ] পত্রিকা থেকে জানা যায়, 'ভক্তি ভাজন প্রধান আচার্য্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় নৌকাযোগে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অভিমুখে গমন করিতেছেন। সাহেবগঞ্জ হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, যে তিনি একদিবস উক্ত ষ্টেশনে থাকিয়া একটী ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন।' ২৬ পৌষ মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজে তিনি উপদেশ দান করেন [দ্র তত্ত্ববোধিনী, ফাল্গুন। ২০২-০৬]। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নবনির্মিত মন্দিরের উদ্বোধন দিবসে পৌরোহিত্য করার জন্য তাঁকে আহ্বান করা হয়। কিন্তু পত্রটি দেরিতে পাওয়ার জন্য তিনি পাটনা থেকে পত্র লিখে তাঁর অক্ষমতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। ৪ চৈত্র [বুধ 16 Mat 1881] তাঁকে আমরা মুসৌরী পাহাড়ে অবস্থানরত দেখতে পাই। এরপর দীর্ঘদিন তিনি মুসৌরী ও দেরাদুন অঞ্চলে বাস করেন। কার্তিক ১২৯০ [Nov 1883]-তে তিনি এই পার্বত্য অঞ্চল ত্যাগ করেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ২

১১ মাঘ [রবি 23 Jan 1881] যথারীতি প্রাতে আদি ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে ও সন্ধ্যায় দেবেন্দ্রভবনে একপঞ্চাশ সাংবৎসরিক উপাসনা অনুষ্ঠিত হয়। আমরা আগেই বলেছি রবীন্দ্রনাথ এবারই প্রথম মাঘোৎসবে ব্রহ্মসংগীত-রচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। বস্তুত তত্ত্ববোধিনী-তে [ফাল্গুন। ২০৬-১৬] অনুষ্ঠানের বিবরণে যে ১১টি গান মুদ্রিত হয়েছে, তার মধ্যে ৭টিই রবীন্দ্রনাথের রচনা। অপর ৪টি গান হল:

ভজন—ঝাঁপতাল। অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি প্রণমি চরণে তবক [দ্বিজেন্দ্রনাথ]।

ভূপালি—কাওয়ালি। ছাড়িব না কভু চরণ তোমার

ইমন কল্যাণ—কাওয়ালি। সবে মিলে বিভুগুণ গাওরে

সোহিনীবাহার—কাওয়ালি। আজি কি হরষ-সমীর বহে প্রাণে [দ্বিজেন্দ্রনাথ]

প্রাতঃকালীন উপাসনায় প্রথম যে গানটি গীত হয় সেটি রবীন্দ্রনাথের 'তুমি কি গো পিতা আমাদের'। গানটি সম্পর্কে তত্ত্ববোধিনী-তে লিখিত হয় : 'বালিকাদিগের সরল-পবিত্র-মুখ-নির্গত বলিয়াই হউক সঙ্গীতের অন্তঃস্পর্শী কবিত্ব বশতই হউক অথবা উপাসকদিগের ভাবশুদ্ধি নিবন্ধনই হউক সঙ্গীতকালে অনেকেরই হৃদয় অদৃশ্যরূপে অশ্রুপাত করিয়া ছিল। এবং এই সঙ্গীতের বলেই তৎকালে অনেকেই উপাসনার জন্য বিশেষ রূপ প্রস্তুত হইতে পারিয়াছিলেন।'

৪ মাঘ [রবি 16 Jan] আদি ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে মহর্ষিভবনে রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণ-সভা অনুষ্ঠিত হয়। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রামমোহনের মহত্ত্ব বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

১০ মাঘ [শনি 22 Jan] সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নবনির্মিত উপাসনামন্দিরের দ্বারোদঘাটন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য মহর্ষিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি ইতিপূর্বে নৌকাযোগে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করেছিলেন। আমন্ত্রণটি যথাসময়ে তাঁর কাছে পৌঁছয় নি বলে তিনি ৯ মাঘ পাটনা থেকে লিখিত একটি পত্রে তাঁর অনুপস্থিতির জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন। উল্লেখ্য যে, মন্দির-নির্মাণের জন্য তিনি ৭০০০ টাকা দান করেছিলেন। এই বৎসরের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, 17 Jan [সোম ৫ মাঘ] সিটি স্কুলের কলেজ শাখার উদ্বোধন। আপাতত সেখানে ফার্স্ট আর্টস পর্যন্ত পড়ানোর বন্দোবস্ত করা হয় এবং কিছুদিনের মধ্যেই বেসরকারী কলেজগুলির মধ্যে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করে। ছাত্রসমাজের কাজকর্ম সন্তোষজনকভাবেই পালিত হচ্ছিল, তদুপরি 31 Jan 1880 থেকে যুবকদের মধ্যে ধর্মীয় ও নীতি শিক্ষার প্রচারের জন্য একটি সমিতি স্থাপিত হয় যা পরে Theological Institution-এ পরিণত হয়। আলোচ্য সময়ে সমিতিটি কলকাতার বিভিন্ন কলেজের ছাত্রদের একটি বড় অংশকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল—আমাদের ধারণা, নরেন্দ্রনাথ দত্ত [স্বামী বিবেকানন্দ] তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

কেশবচন্দ্র নানাধরনের উৎসব-অনুষ্ঠানে খুবই আগ্রহী ছিলেন এবং প্রচারমুখী প্রবণতার জন্য ভারতবর্ষীয় [নববিধান] ব্রাহ্মসমাজে বিভিন্ন নূতন কার্যক্রম গ্রহণ করেন। এ-সম্পর্কে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র তত্ত্বকৌমুদী [৩।১৯, ১৬ ফাল্গুন। ২১৭] লেখে : 'আমাদের নববিধানী বন্ধুগণ এবারকার উৎসবের সময় এক নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। তাঁহারা নববিধানের চিহ্নস্বরূপ একটী নিশানকে প্রকাশ্য উপাসনালয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ করা, তাহার সমীপে প্রণাম করা, তাহাকে আরতি করা, তাহাকে চামর দ্বারা ব্যজন করা, প্রভৃতি নানা উপায়ে অর্চ্চনা করিয়াছেন।' এই বর্ণনা প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজের অপপ্রচার নয়, ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকাতেও অনুরূপ আচরণের দীর্ঘ বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু মূর্তিপূজার এই নূতন রূপান্তর নববিধান

সমাজের পক্ষে খুব শুভ হয় নি। কেশবচন্দ্রের মস্তকমুণ্ডন, সন্ন্যাসগ্রহণ, ভিক্ষাব্রতধারণ [15 Mar 1881] ইত্যাদি এবং প্রচারকদের 'প্রেরিত' [Apostle] ও তাঁদের সভার 'Durbar' নামকরণ এমন এক মানসিকতাকে প্রকাশ করে যা কোনো নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের পক্ষে অস্বস্তিকর বিবেচিত হতে পারে।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩

স্বামী বিবেকানন্দ [নরেন্দ্রনাথ দত্ত] উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতের বিভিন্ন শাখায় যথেষ্ট পারঙ্গম ছিলেন, তাঁর জীবনবৃত্তান্তে এর পরিচয় সুপ্রচুর। এইরূপ সংগীত-পরিবেশনের সূত্রে তিনি অনেক ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ-রচিত গান বেছে নিয়েছেন, 'শ্রীম'-[মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 1854-1932] কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত গ্রন্থের পাঁচটি ভাগে তার অনেকগুলি বিবরণ আছে, অন্যদের বর্ণনাতেও কয়েকটি উল্লেখ দেখা যায়। স্বামীজীর সম্পাদিত সঙ্গীত-কল্পতরু [১২৯৪] গ্রন্থেও রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি গান সংকলিত হয়েছে। প্রশ্ন ওঠে যে, এই গানগুলি তিনি কোথা থেকে শিখেছিলেন? প্রশ্নটি বর্তমান অধ্যায়েই তোলার কারণ এই যে, তিনি যে-গানগুলি গাইতেন তার অধিকাংশই এই বছরে মাঘোৎসবে গীত হয়েছিল। সুতরাং অনুমান করা যায় যে তিনি উক্ত উৎসবে উপস্থিত ছিলেন এবং অসামান্য সুরজ্ঞান ও স্মৃতিশক্তির জন্য একবার শুনেই গানগুলির সুর আয়ত্ত করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয় নি—গানের কথার জন্য অসুবিধা হবার কথা নয়, শ্রোতাদের মধ্যে বিতরণের জন্য 'গানের কাগজ' তো ছাপা হত-ই, তত্ত্ববোধিনীতেও সেগুলি মুদ্রিত হত।[*১]

কথিত আছে, নরেন্দ্রনাথ মেট্রোপলিটান স্কুলে দ্বিপেন্দ্রনাথের সহপাঠী ছিলেন। এই তথ্য যদি যথার্থ হয় তাহলে Jan 1876 [জ্যৈষ্ঠ ১২৮৩]-এর পূর্বেই তাঁদের সহপাঠী থাকা সম্ভব, কারণ 16 Jun [৩ আষাঢ়] দ্বিপেন্দ্রনাথ ও অরুণেন্দ্রনাথকে উক্ত স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনে সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি করে দেওয়া হয়—নরেন্দ্রনাথের বয়স তখন সাড়ে বারো বছর। দ্বিপেন্দ্রনাথ মেট্রোপলিটান স্কুলে ভর্তি হন Jan 1875-এ [নরেন্দ্রনাথ তখন সেখানে ফিফ্‌থ্ ক্লাসে পড়ছেন] সুতরাং তাঁরা প্রায় দেড় বছর একসঙ্গে পড়েছিলেন। এর পরে 1877-এ নরেন্দ্রনাথ পিতার সঙ্গে রায়পুর চলে যান এবং 1879-এ কলকাতায় ফিরে এসে পুনরায় স্কুলে ভর্তি হয়ে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। সুতরাং সহপাঠী দ্বিপেন্দ্রনাথের সূত্রে 1875-76-এ তিনি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে যাওয়া-আসা করে থাকতে পারেন, রায়পুর থেকে ফিরে আসার পরও এই যোগাযোগ অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা। দ্বিপেন্দ্রনাথই হয়তো তাঁকে আদি ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চাশ [১২৮৬] ও একপঞ্চাশ [১২৮৭] সাংবৎসরিক উৎসবে আমন্ত্রণ করেছিলেন।[*২]

রবীন্দ্রনাথের যে গানগুলি নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে গেয়ে শুনিয়েছিলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত গ্রন্থের বিভিন্ন ভাগে[*] সেগুলির বিস্তৃত বিবরণ আছে। কালানুক্রমিক ভাবে গানগুলির একটি তালিকা দেওয়া হল:

[১] ২৫ চৈত্র ১২৮৯ [শনি 7 Apr 1883] 'গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে' [দ্র ৪র্থ ভাগ, ৩য় খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ। ১৪]। উল্লেখযোগ্য যে, গানটি ১২৮১ বঙ্গাব্দের মাঘোৎসবে গীত হয়েছিল; তাছাড়া সঙ্গীত-কল্পতরু গ্রন্থে নানকের মূল রচনা সহ [পৃ ১৩৫-৩৬] সংকলিত হয়। ২৭ বৈশাখ ১২৯২ [শনি 9 May 1885] তারিখে নরেন্দ্রনাথ গানটি পুনরায় পরিবেশন করেন [দ্র ৩য় ভাগ, ১৫শ খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ। ১৬৭]

[২] ৩০ ভাদ্র ১২৯১ [রবি 14 Sep 1884] 'দিবানিশি করিয়া যতন' [দ্র ৪র্থ ভাগ, ১৯শ খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ। ১৫০]; গানটি বর্তমান বৎসরের মাঘোৎসবে গীত হয়েছিল।

[৩] ২৯ ফাল্গুন ১২৯১ [বুধ 11 Mar 1885] 'দুখ দূর করিলে দরশন দিয়ে' [দ্র ১ম ভাগ, ১৪শ খণ্ড ৯ম পরিচ্ছেদ। ২০৪]; গানটি ৫ বৈশাখ ১২৯৩ [শনি 17 Apr 1886] তারিখেও গাওয়া হয়েছিল [দ্র ৪র্থ ভাগ, ৩৩শ খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ। ২৯১]। উল্লেখযোগ্য যে, কথামৃত গ্রন্থে দু-জায়গাতেই 'সব দুঃখ দূর করিলে দরশন দিয়ে' পাঠ দেখা যায় এবং এই কারণেই অনেক গবেষক এটিকে রবীন্দ্রসংগীত বলে চিনতে পারেন নি। গানটি ১২৯১ বঙ্গাব্দের মাঘঘাৎসবে গীত হয়েছিল। ১১ মাঘে গাওয়া গান ২৯ ফাল্গুন নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে উঠে এসেছে—রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা ও আগ্রহের এই দৃষ্টান্তটি অবশ্যই লক্ষ্য করবার মতো।

[৪] ৩১ আষাঢ় ১২৯২ [14 Jul 1885] 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা' [দ্র ৪র্থ ভাগ, ২৩শ খণ্ড ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ। ২২৫]; গানটি দ্বিতীয়বার গাওয়া হয় ৯ কার্তিক ১২৯২ [শনি 24 Oct 1885] তারিখে [দ্র ৪র্থ ভাগ, ২৮শ খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ। ২৬৮]। এটি বর্তমান বৎসরের মাঘোৎসবে গীত হয়েছিল। শ্রীম ২৯ ফাল্গুন ১২৯১ তারিখের বিবরণে [দ্র ১ম ভাগ, ১৪শ খণ্ড ১০ম পরিচ্ছেদ। ২০৫] অন্য প্রসঙ্গে গানটির প্রথম দুটি ছত্র উদ্ধৃত করেছেন। এ থেকে মনে হয়, নরেন্দ্রনাথ এই দিন বা এর আগে কোনো দিন হয়তো এটি গেয়ে শুনিয়েছিলেন [অবশ্য অন্য সূত্রেও শ্রীম গানটির সঙ্গে পরিচিত হয়ে থাকতে পারেন]।

[৫] ৯ কার্তিক [শনি 24 Oct 1885] 'মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ' [দ্র ৪র্থ ভাগ, ২৮ খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ। ২৬৮]। এটি বর্তমান বৎসরের মাঘোৎসবে গীত হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনীকার প্রমথনাথ বসু উল্লেখ করেছেন, নরেন্দ্রনাথ বি. এ. পরীক্ষার প্রথম দিন [31 Dec 1883 সোম ১৭ পৌষ ১২৯০] প্রত্যুষে চোরবাগানে বন্ধু হরিদাস ও দাশরথির বাসার সামনে গানটি গেয়ে শুনিয়েছিলেন।[৭২]

[৬] ১২ কার্তিক ১২৯২ [মঙ্গল 27 Oct 1885] 'এ কি এ সুন্দর শোভা' [দ্র ১ম ভাগ, ১৮শ খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ। ২৪৬], গানটি বর্তমান বৎসরের মাঘোৎসবে সায়ংকালীন অধিবেশনে গাওয়া হয়েছিল। ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছেন, তিনি এই গানটি কাশীতে স্বামী বিবেকানন্দকে গাইতে শুনেছিলেন।[৭৩]

[৭] ২৫ বৈশাখ ১২৯৪ [শনি 7 May 1887] 'আমরা যে শিশু অতি, অতি ক্ষুদ্র মন' [দ্র ২য় ভাগ, পরিশিষ্ট ২য় পরিচ্ছেদ। ২৫৮-৫৯]। এই গানটি দিয়েই বর্তমান বৎসরে মাঘোৎসবের প্রাতঃকালীন উপাসনা শুরু হয়েছিল। নরেন্দ্রনাথ গানটি গেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের প্রায় ন-মাস পরে বরাহনগর মঠে, এর পূর্বেই [Jan 1887,? মাঘ ১২৯৩] তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন।

কথিত আছে, ১৫ শ্রাবণ ১২৮৮ [29 Jul 1881] তারিখে রাজনারায়ণ বসুর কন্যা লীলাবতীর সঙ্গে কৃষ্ণকুমার মিত্রের বিবাহানুষ্ঠানে নরেন্দ্রনাথ 'দুই হৃদয়ের নদী' প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথ-রচিত বিবাহ-সংগীত গেয়েছিলেন। প্রসঙ্গটি নিয়ে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। উল্লেখ্য, গানটি সঙ্গীত-কল্পতরু-তে সংকলিত হয়।

ক্ষিতিমোহন সেন সাক্ষ্য দিয়েছেন, পরিব্রাজক জীবনে স্বামী বিবেকানন্দ কাশীতে [? 1888, ১২৯৫] যজ্ঞেশ্বর তেলীর বাড়িতে উপরোক্ত 'এ কি এ সুন্দর শোভা' গানটির সঙ্গে 'মরি লো মরি, আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে' এবং 'সখী আমারি দুয়ারে কেন আসিল নিশিভোরে যোগী ভিখারি' গান দুটিও গেয়েছিলেন।[৭৩] 'মরি লো মরি' গানটি প্রকৃতির প্রতিশোধ [১২৯১] নাট্যকাব্যের অন্তর্ভুক্ত, রবিচ্ছায়া [১২৯২]-তেও সংকলিত

হয়েছিল; কিন্তু পরবর্তী গানটি প্রথম মুদ্রিত হয় গানের বহি [বৈশাখ ১৩০০]-তে, রচনাকাল অজ্ঞাত।[৭৪] আচার্য সেনশাস্ত্রীর স্মৃতি যদি প্রতারণা না করে থাকে তাহলে সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, গানটি ১২৯৫-এর পূর্বেই রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল।

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ স্বামীজীর গানের খাতার ৫৭ পৃষ্ঠার একটি গান উদ্ধৃত করেছেন উদ্বোধন পত্রিকার অগ্র° ১৩৮৩ সংখ্যায়। গানটি হল তত্ত্ববোধিনী, কার্তিক ১৮০৬ শক [১২৯১] সংখ্যায় প্রকাশিত 'তাঁহারে আরতি করে চন্দ্রতপন' [রবিচ্ছায়া। ১০৩-০৪]—বিবেকানন্দ এটি নানাভাবে চিহ্নিত করে লিখে রেখেছিলেন। সুতরাং এটির সুর তিনি জানতেন এবং মাঝে মাঝে গেয়েও থাকতে পারেন।

তাছাড়া সংগীত-কল্পতরু-র ভূমিকায় 'সঙ্গীত ও বাদ্য' প্রবন্ধে 'স্বর সাধনা' অনুচ্ছেদে তিনি ভৈরব রাগের সরগম দিয়ে ভৈরব কাওয়ালিতে রবীন্দ্রনাথের 'তুমি কি গো পিতা আমাদের' গানটির প্রথম দু-কলি স্বরলিপি দিয়েছেন। এই গানটিও বর্তমান বৎসরের মাঘোৎসবে গীত হয়েছিল।

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি গানের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, কয়েকটি গান গেয়ে শোনানোর বিবরণও পাওয়া যায়। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তথ্য হল উপরে উল্লিখিত বারোটি গানের মধ্যে ছ'টিই বর্তমান বৎসরের মাঘোৎসবে গীত হয়েছিল, যা তাঁর উক্ত উৎসবে উপস্থিতির সম্ভাবনাটিকে স্পষ্ট করে তোলে।

সঙ্গীত-কল্পতরু গ্রন্থের 'সঙ্গীত সংগ্রহ' [পৃ ৯১-৪৭৯] অংশে রবীন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত সঙ্গীতগুলি সংকলিত হয়েছিল:

জাতীয় সঙ্গীত

[১] পৃ ১০০-০১ রাগিণী—বাহার। অয়ি বিষাদিনী বীণা আয় সখি দ্র গীতবিতান ৩।৮১৬

[২] ১০৩ রাগিণী জয়জয়ন্তী। তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ দ্র গীতবিতান ৩।৮১৯

[৩] ১১০-১১ অহং-একতালা। দ্যাখরে জগৎ মেলিয়া নয়ন [সরোজিনী নাটকের 'জ্বল্ জ্বল্ চিতা, দ্বিগুণ দ্বিগুণ' গানটির শেষ ১৬টি ছত্র, স্বভাবতই 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর' নামাঙ্কিত]

[৪] ১১১-১৩ রাগিণী-ভৈরবী। ভারতরে তোর কলঙ্কিত পরমাণু রাশি দ্র গীতবিতান ৩।৮১৫

[৫] ১৩০-৩১ ঝিঁঝিট—একতালা। একবার তোরা মা বলিয়া ডাক দ্র ঐ ৩।৮২০

ধর্ম্মবিষয়ক সঙ্গীত।/ব্রহ্মসঙ্গীত।

[৬] ১৩৬ জয়জয়ন্তি-ঝাঁপতাল। গগনের থালে রবিচন্দ্র দীপক জ্বলে দ্র ঐ ৩।৮২৭ [১৩৫ পৃষ্ঠায় নানকের মূল গানটি সংকলিত হয়েছে]

[৭] ১৪৮-৪৯ সাহানা—ঝাঁপতাল। দুই হৃদয়ের নদী, একত্রে মিলিল যদি দ্র গীতবিতান ৩।৬০৯

[৮] ১৭৮-৭৯ রাগিণী জঙ্গলা ভূপালী। কালী কালী বলোরে আজ দ্র ঐ ৩।৬৩৮

প্রণয়-সঙ্গীত

[৯] ৩৭৯-৮০ ঝিঁঝিট—একতালা। গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে দ্র গীতবিতান ৩।৭৫৬-৫৭ [গানটি 'ভানুসিংহ ঠাকুর' নামাঙ্কিত]।

বিবিধ সঙ্গীত

[১০] ৪০০ পিলু—খেম্‌টা। বল, গোলাপ মোরে বল্ দ্র ঐ ২।৪২২-২৩

এই গানগুলির মধ্যে 'দিবানিশি করিয়া যতন', 'দুখ দূর করিলে দরশন দিয়ে', 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা', প্রভৃতি যে গানগুলি স্বামীজী এক বা একাধিকবার শ্রীরামকৃষ্ণকে গেয়ে শুনিয়েছিলেন, সেগুলির অনুপস্থিতি খুবই স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। এমন নয় যে, এই গানগুলির ভাব, ভাষা বা সুর সংকলিত অন্যান্য গানের তুলনায় নিকৃষ্টতর—তবু যে গানগুলি সংগীত সংগ্রহে স্থান পেল না তার কারণটি একটু ভেবে দেখা উচিত। রবীন্দ্রনাথ-রচিত গান 'জাতীয় সঙ্গীত' [২য় সং, 1878], নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়-সংগৃহীত 'সংগীত সংগ্রহ' [1883], 'ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী' প্রথম [1884] ও দ্বিতীয় ভাগ [Apr 1886], আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রকাশিত ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তকের পঞ্চম থেকে অষ্টম ভাগ ও রবিচ্ছায়া [১২৯২] গ্রন্থে সঙ্গীত-কল্পতরু-র পূর্বেই যথেষ্ট প্রচার লাভ করেছিল। সুতরাং সঙ্গীত-কল্পতরু-তে তাঁর মাত্র দশটি গানের সংকলন তাঁর সংগীতের বহুল প্রচারের পক্ষে যে যথেষ্ট ছিল না একথা মানতেই হবে। কিন্তু দুই মনীষীর পারস্পরিক যোগাযোগের অন্যতম ক্ষেত্র হিসেবে গ্রন্থটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য—রবীন্দ্রজীবনী রচনায় এই গ্রন্থটির বিস্তারিত আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা এইখানেই।

উল্লেখপঞ্জী

১ 'বাঙ্গালী কবি নয় কেন?' ভারতী, আশ্বিন। ২৬১

২ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৮১

৩ জীবনের ঝরাপাতা। ৩০

৪ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্র কথা [১৩৪৯]। ১৯২

৫ রবীন্দ্রস্মৃতি। ২৪

৬ ঘরোয়া। ১০২-০৩

৭ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি। ৬১

৮ 'রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী' : শনিবারের চিঠি, ফাল্গুন ১৩৪৬। ৭৬১

৯ ভারতী, আষাঢ়। ১৪৬

১০ তত্ত্ব°, চৈত্র ১৮০৫ শক [১২৯০]। ২৩৪

১১ 'রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা : কালানুক্রমিক সূচী' : রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা ১। ২৪৮, পাদটীকা ৮

১২ বি. ভা. প., বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৪। ২৫৭, পত্র ২১

১৩ জীবনস্মৃতি, গ্রন্থপরিচয় ১৭। ৪৮১; প্রথম পাণ্ডুলিপিতে 'গঙ্গাতীর' অধ্যায়ে উদ্ধৃত

১৪ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৮৭-৮৮

১৫ পত্রাবলী। ২০৮-০৯, পত্র ১৩৬

১৬ রবীন্দ্রজীবনী ১[১৩৯২]। ১১৯

১৭ বি. ভা. প., বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৪। ২৫৭, পত্র ২২

১৮ ‘জীবনস্মৃতির জন্মকথা’, শারদীয়া আনন্দবাজার ১৩৮৩। ১১

১৯ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৭৪

২০ রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী [১৩৮০]। ৯৬

২১ দ্র ‘কবিতা ও সঙ্গীত’, বিহারীলালের কাব্যসংগ্রহ [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় : 1950]। ৪৩৮-৩৯, গীত ৪৭ নং ৫ ‘রাগিণী কালাংড়া-তাল খেম্‌টা’।

২২ দ্র ‘মায়াদেবী’, ঐ। ২৭৩, ভৈরোঁ—একতালা, ভজনের সুর’; অপিচ, ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৯। ১৬৫

২৩ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৪৩

২৪ জীবনের ঝরাপাতা। ৩০

২৫ ঐ। ৩০-৩১

২৬ ঐ। ৩১

২৭ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি। ৪০

২৮ রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম [১৩৮০]। ৫

২৯ জীবনস্মৃতি, গ্রন্থপরিচয় ১৭। ৪৭২

৩০ ঐ ১৭। ৪৭১

৩১ বাল্মীকি প্রতিভা, গ্রন্থপরিচয় ১। ৬৩১

৩২ ‘বিহারীলাল’, আধুনিক সাহিত্য ৯। ৪২২

৩৩ ‘সূচনা’, বাল্মীকিপ্রতিভা ১। ২০৭

৩৪ জীবনস্মৃতি, গ্রন্থপরিচয় ১৭। ৪৭২

৩৫ ঐ। ৪৭১

৩৬ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি। ৬১

৩৭ ঐ। ৬১

৩৮ সুভাষ চৌধুরী, ‘শতবর্ষে বাল্মীকিপ্রতিভা’ : দেশ বিনোদন ১৩৮৭। ১১

৩৯ দ্র ঐ। ১১; হিন্দি গানটির একটি পাঠান্তর ইন্দিরা দেবীর ‘গানের খাতা’-য় পাওয়া যায়।

৪০ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৮৩

৪১ ঐ ১৭। ৩৭৯-৮০

৪২ ঐ ১৭। ৩৭৯

৪৩ ঐ ১৭। ৩৮২

৪৪ ‘বাঙ্গালী জীবনে বিলিতি সংস্কৃতির প্রভাব’, দেশ 21 Jun 1969—একশ বছরের বাংলা থিয়েটার [পৃ ২০৫] গ্রন্থে উদ্ধৃত

৪৫ দ্র চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সরকারী দলিলে রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনা' : বি. ভা. প., মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯। ২৮৫

৪৬ দ্র বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ৩ [১৩৭৬]। ২৪৭

৪৭ 'গানের দুই রাজা : রবীন্দ্রনাথ, রবার্ট বার্নস', গানের লীলার সেই কিনারে [১৩৯২]। ৪২

৪৮ রবীন্দ্রস্মৃতি। ১৭

৪৯ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৮২

৫০ রবীন্দ্রস্মৃতি। ২৮

৫১ ঘরোয়া। ১০৩

৫২ রবীন্দ্রস্মৃতি। ২৯

৫৩ জীবনস্মৃতি, গ্রন্থপরিচয় ১৭। ৪৭২

৫৪ ড সত্যজিৎ চৌধুরী প্রভৃতি সম্পাদিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ ১ [1980]। ৫৬১ থেকে উদ্ধৃত

৫৫ রবীন্দ্রস্মৃতি। ৩৫

৫৬ ঘরোয়া। ১২৪

৫৭ দ্র আর্য্যদর্শন, বৈশাখ ১২৮৮ [৭।১]। ১-৬

৫৮ রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী। ১৬ থেকে উদ্ধৃত

৫৯ 'রবীন্দ্র-গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য : রবীন্দ্র-প্রযোজনা' : রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য-সম্পাদিত 'মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ' [1978]। ৭৫

৬০ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ৩। ২৪৭

৬১ রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা ১। ২৫৩

৬২ জীবনস্মৃতি [১৩৬৮]। ২১০

৬৩ ঐ ১৭। ৩৮৫

৬৪ দ্র রবীন্দ্রস্মৃতি। ৩৩

৬৫ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৮৬

৬৬ ঐ ১৭। ৩৮৫

৬৭ রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য। ২৩০

৬৮ ভারতী, চৈত্র ১২৮৭। ৫৫৩-৫৫

৬৯ ঐ। ৫৬২-৬৪

৭০ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৮৪

৭১ জীবনের ঝরাপাতা। ২৬-২৭

৭২ প্রমথনাথ বসু, স্বামী বিবেকানন্দ [১৩২৬]। ৯০-৯১

৭৩ দ্র 'বিবেকানন্দের কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত' : শারদীয়া আনন্দবাজার ১৩৬৫

৭৪ দ্র গীতবিতান : কালানুক্রমিক সূচী ১ [১৩৮০]। ৮০

---

* জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৮০-৮১; এই শিক্ষা অবশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নি তার প্রমাণ আমরা এই অধ্যায়েই লাভ করব।

* 'মানময়ী/গীতি-নাটিকা।/ কলিকাতা/ বাল্মীকি যন্ত্রে/ শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তি দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।/ ১৮০২'; গ্রন্থটির পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১২।

* রবীন্দ্রজীবনী ১ [১৩৬৭]। ৯৪-৯৫; রবীন্দ্রজীবনী-কার সম্ভবত 'মানময়ী'-র পরিবর্ধিত রূপ 'পুনর্বসন্ত' [১৩০৫] গ্রন্থটি দেখে এই বিভ্রান্তিকর মন্তব্যটি করেছেন, কারণ 'মানময়ী'তে কোন গদ্য কথাবার্তা নেই এবং ইন্দ্র চরিত্রটিও সেখানে অনুপস্থিত; 'পুনর্বসন্ত' গ্রন্থপ্রকাশের সমকালে 'ভারত সংগীত-সমাজ'-এ অভিনীত হয়, সুতরাং তাতে কাদম্বরী দেবীর অংশগ্রহণের প্রশ্নই ওঠে না। এই একই ধরনের বিভ্রান্তি অন্যদের উক্তিতেও দেখা যায়।

* 'গাথা/দীপ-নির্ব্বাণ-রচয়িত্রী-প্রণীত/কলিকাতা/বাল্মীকি যন্ত্রে/শ্রীকালিকিঙ্কর চক্রবর্ত্তি কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।/সন ১২৮৭ সাল।'

* এর একটি সম্ভাব্য কারণ হল, গ্রন্থ দুটি অনেকটা তাঁর অজ্ঞাতসারে অন্যদের আগ্রহাতিশয্যে প্রকাশিত হয়েছিল।

* 'ভারতীর তৃতীয় খণ্ডে একটি গান প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে এই ভাব সংক্ষেপে ব্যক্ত হইয়াছে।/ "ওকথা বোল না, তারে, কভু সে কপট নারে...সে যে আপনারি মন।" ['প্রেম-মরীচিকা', ফাল্গুন ১২৮৬। ৫১২]/ অর্থাৎ যথার্থ ভালবাসা না হইতেই অকারণ-কষ্টগ্রস্তেরা কল্পনা করে যে, তাহারা ভালবাসিতেছে। তাহারা মনে করে এই ভালবাসা পাওয়ার অভাবেই তাহাদের যত কষ্ট।' [পৃ ২৯০] [এই সংখ্যা ভারতী-তে ২৮৯, ২৯০ পৃষ্ঠা-সংখ্যা দুটি দুবার ব্যবহৃত হয়েছে, অনুসন্ধিৎসু পাঠককে এটি লক্ষ্য করতে বলি।]

* প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রগ্রন্থ পরিচিতি'। ৬-তে উল্লেখ করেছেন '[উপহার গীতি' নামে কবিতাটি জোড়াসাঁকো বাড়ীতে ১ কার্তিক (১২৮৭[?]) মঙ্গলবার রচিত।]'—এখানে ১ কার্তিক ১২৮৭-সংখ্যাটি যদি মুদ্রণ-প্রমাদ না হয় তবে ইঙ্গিতটি অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। অবশ্য ১ কার্তিক ১২৮৭ [16 Oct 1880] শনিবার ছিল, মঙ্গলবার নয়।

রবীন্দ্রজীবনী ১ [১৩৭৭]-এ তিনি আলোচ্য কবিতাটি সম্পর্কে লিখেছেন, "আমরা মনে করি কবিকাহিনীর খসড়া প্রস্তুতের সময়ে এইটি লিখিত হয়, এবং কবিকাহিনীকে 'ভগ্নহৃদয়' আখ্যা দিবেন ভাবিয়াছিলেন। এই কাব্যের নামকরণ করা হয় ভারতীতে প্রকাশকালে।...আমাদের মতে তরুণ 'কবি'র ভগ্নহৃদয়-'কাহিনী' 'কবি-কাহিনী' রূপে ভারতীতে প্রকাশিত হইল। রচনাকালে ইহার নামকরণ হয় নাই এবং প্রথমে ভাবিয়াছিলেন 'ভগ্নহৃদয়' নামকরণ করিবেন; কিন্তু এই শব্দের দ্বারা বিষয়বস্তু বা মনোভাব এতই স্পষ্টভাবে প্রকট হয় যে, তাহা করিতে সাহস পান নাই। কিন্তু বিলাত প্রবাসকালে যে প্রগল্‌ভতা য়ুরোপপ্রবাসীর পত্রে প্রকাশ করিতে দ্বিধা করেন নাই, সেই উদ্ধত মনোভাব হইতে নূতন কাব্যের নামকরণ করেন 'ভগ্নহৃদয়'।" [পৃ ৬৪-৬৫] এই যুক্তি খুব গ্রহণযোগ্য বলে আমাদের মনে হয় না।

* ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'তাঁহার 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যে "দে লো, সখি, দে, পরাইয়ে গলে" গানটিও অক্ষয়চন্দ্রের রচিত বলিয়া শুনিয়াছি।' [অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, সা-সা-চ ৭। ৭৬। ১২] উপরোক্ত আলোচনার সূত্রে কথাটি যথার্থ নয় বলেই মনে হয়।

* রবিজীবনী ১। ২৭১-এ প্রবোধচন্দ্র সেনের অনুসরণে আমরা অনুষ্ঠানের তারিখটি ২০ বৈশাখ ১২৮২ রবি 2 May 1875 বলে গ্রহণ করেছিলাম। সম্প্রতি সনৎকুমার গুপ্ত এডুকেশন গেজেট-এর ১ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা থেকে সঠিক তারিখটি উদ্ধার করেছেন : 'গত ২৭ শে বৈশাখ ১২৮২ রবিবার সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়দিগের ভবনে বিদ্বজ্জন সমাগম হইয়া গিয়াছে।' দ্র 'ভূমিকা', জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি [প্রজ্ঞাভারতী, ১৩৮৯]। চ

* অধ্যাপক ড দীপক ঘোষ-কৃত অনুবাদ : বিদ্বজ্জনের সমাগমের ফলে শূন্যতা পরিপূর্ণতা লাভ করে, মৃত্যুও হয়ে ওঠে অমৃত, আর বিপদ প্রতিভাত হয় সম্পদরূপে।

*১ দ্র তৃতীয় গর্ভাঙ্কের মঞ্চনির্দেশ : 'নদী কূলে পর্বত-উপত্যকায় উদ্যান'...(সকলের দেবী-মন্দিরে অগ্রসর; মন্দির ঢাকিয়া উদ্যানের পটক্ষেপ;)' [১ম সং। ১৭]

*২ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি। ১৬২; রথীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন, '১৮৮১ সালের ফেব্রুয়ারীমাসে প্রথম অভিনয়ের সময় একটু দুর্ঘটনা ঘটেছিল, মনে হয়। স্টেজ বাঁধা হয়েছিল জোড়াসাঁকোর বাড়ীর ছাদে। ঝড় উঠে সমস্ত বাঁশের কাঠামো ভেঙে চুরে একেবারে তছ্‌নছ্ করে দেয়, তবু অভিনয় বন্ধ হয়নি।' —'অতীতের স্মৃতি', গীতবিতান বার্ষিকী ১৩৫০। ৬০

* প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত 'নাট্যকলা ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে লিখছেন, [বাল্মীকি প্রতিভা] 'বিদ্বজ্জন-সমাগম-সভা'র বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে ১৮৮১, ৫ মার্চ, শনিবার (২৩ ফাল্গুন, ১২৮৭) শ্রীপঞ্চমীতিথিতে পুনরভিনীত।"-গীতবিতান বার্ষিকী [১৩৫০]। ১৭৬; শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় সম্ভবত এই সূত্র থেকে উক্ত সংবাদটি সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু শ্রীগুপ্তও তাঁর তথ্য-সূত্রটি উল্লেখ করেন নি। তাছাড়া ২৩ ফাল্গুন পঞ্চমী তিথি হলেও শ্রীপঞ্চমী বা সরস্বতীপূজা হয়েছিল ২২মাঘ বৃহ 3 Feb তারিখে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ১৬ ফাল্গুন বাল্মীকিপ্রতিভা-র অভিনয়ের দিন শিবরাত্রির ছুটি ছিল।

*১ অবশ্য এই অনুমান একেবারে নিচ্ছিদ্র নয়। নরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও আদি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত অন্য গীতি-রচয়িতাদের—দ্বিজেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, বেচারাম চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি—গানও বিভিন্ন সময়ে গেয়েছেন। অন্তত এই গানগুলির কথা ও সুর তাঁকে অন্য সূত্রে সংগ্রহ করে নিতে হয়েছে। সেই ভাবে রবীন্দ্রনাথের গানও আয়ত্ত করা অসম্ভব ছিল না।

*২ শঙ্করীপ্রসাদ বসু প্রমথনাথ বসুর 'স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থ অবলম্বনে লিখেছেন, "মহর্ষির কথায় নরেন্দ্রনাথ ধ্যানগোষ্ঠী তৈরী করেছিলেন, মহর্ষি তাঁদের 'প্রত্যহ কিয়ৎক্ষণের জন্য ধ্যানাভ্যাস-প্রণালী' শিক্ষা দিতেন। ধ্যানান্তে কে কেমন উপলব্ধি করেছে, তার পরিচয় নেবার সময়ে মহর্ষি নরেন্দ্রনাথের উপলব্ধির গভীরতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন।" —বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ ৪ [১৩৮৭]। ১৬৯-৭০; মহর্ষি কলকাতায় খুব কম সময়ই থাকতেন, সুতরাং তাঁর সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের যোগাযোগের যথেষ্ট সুযোগ ছিল না। মনে হয়, ফাল্গুন ১২৮৬ [Feb 1881]-তে দ্বিপেন্দ্রনাথ ও অরুণেন্দ্রনাথের ব্রহ্মদীক্ষা উপলক্ষে মহর্ষি যখন প্রায় এক মাস কলকাতায় ছিলেন, সেই সময়েই এই ধ্যানাভ্যাস-প্রণালী শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি ঘটনা ঘটেছিল।

* পৃষ্ঠাসংখ্যা ইত্যাদি নির্দেশ করার জন্য আমরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত গ্রন্থের ১৩৮৫ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত সংস্করণগুলি ব্যবহার করেছি।

একবিংশ অধ্যায়

১২৮৮ [1881-82] ১৮০৩ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের একবিংশ বৎসর

এই বৎসরে রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কলকাতার মেডিকেল কলেজের হলে বেথুন সোসাইটির উদ্যোগে সংগীত বিষয়ে তাঁর প্রথম 'পাবলিক' ভাষণ। বক্তৃতাটি হয় ৯ বৈশাখ [বুধ 20 Apr 1881][*] সন্ধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'দ্বিতীয়বার বিলাতে যাইবার পূর্বদিন সায়াহ্নে বেথুন-সোসাইটির আমন্ত্রণে মেডিকাল কলেজ হলে আমি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। সভাস্থলে এই আমার প্রথম প্রবন্ধ পড়া। সভাপতি ছিলেন বৃদ্ধ রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবন্ধের বিষয় ছিল সংগীত। যন্ত্রসংগীতের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমি গেয় সংগীত সম্বন্ধে ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, গানের কথাকেই গানের সুরের দ্বারা পরিস্ফুট করিয়া তোলা এই শ্রেণীর সংগীতের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমার প্রবন্ধে লিখিত অংশ অল্পই ছিল। আমি দৃষ্টান্ত দ্বারা বক্তব্যটিকে সমর্থনের চেষ্টায় প্রায় আগাগোড়াই নানাপ্রকার সুর দিয়া নানাভাবের গান গাহিয়াছিলাম। সভাপতি মহাশয় 'বন্দে বাল্মীকি-কোকিলং' বলিয়া আমার প্রতি যে প্রচুর সাধুবাদ প্রয়োগ করিয়াছিলেন আমি তাহার প্রধান কারণ এই বুঝি যে, আমার বয়স তখন অল্প ছিল এবং বালককণ্ঠে নানা বিচিত্র গান শুনিয়া তাঁহার মন আর্দ্র হইয়াছিল।'[১] আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, বাল্মীকি প্রতিভা-র প্রথম অভিনয় রজনীতে কৃষ্ণমোহন উপস্থিত ছিলেন—অভিনয় দর্শনে তাঁর প্রতিক্রিয়ার কথা আমরা জানতে পারি নি, কিন্তু এখানে 'বাল্মীকি-কোকিল' আখ্যা দিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের সুমধুর কণ্ঠ এবং তাঁর কবিপ্রতিভা ও অভিনয়-ক্ষমতাকেই সূত্রাকারে বন্দনা করলেন বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু সভাপতির ভাষণে তিনি আর কী বলেছিলেন তা জানা যায় না। বেথুন সোসাইটির উদ্যোগে বহু বক্তৃতার আয়োজন করা হত, সংবাদপত্রে তার বিস্তৃত বিবরণও মুদ্রিত হত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বর্তমান বক্তৃতাটি সম্পর্কে কোনো খবর *Hindoo Partriot*, *Bengalee*, *Friend of India*, সাধারণী, সোমপ্রকাশ প্রভৃতি যে-কটি পত্রিকা আমরা দেখেছি তাতে প্রকাশিত হয় নি। প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয় ভারতী-য় জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় [পৃ ৬২-৬৯]; পাদটীকায় লেখা হয়; 'এই বক্তৃতাতে বক্তার মত উদাহরণ দ্বারা সমর্থিত হইয়াছিল। এই বক্তৃতায় বহু সংখ্যক গান গাহিয়া কি-কি সুর-বিন্যাস দ্বারা কি-কি ভাব প্রকাশিত হয়, তাহারই দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছিল। বিভিন্ন ভাব-ব্যঞ্জক গানের ভাবকে ও তৎসঙ্গে সুরকে বিশ্লেষণ করিয়া বক্তা নিজ-মত সমর্থন করিয়াছিলেন। সে সকল উদাহরণে কণ্ঠের সাহায্য আবশ্যক, এ নিমিত্ত সমস্তই পরিত্যাগ করিতে হইল, কেবল মাত্র ভূমিকা ও উপসংহার প্রকাশিত হইতেছে।—সং।' পত্রিকায় শিরোনামের নীচেই

মুদ্রিত হয় '(বেথুন সোসাইটিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতা)'—ভারতী-তে এইটিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম নামাঙ্কিত রচনা।

আমরা আগেই বলেছি, 'সঙ্গীত ও ভাব' প্রবন্ধটি ১৬ ফাল্গুন ১২৮৭-তে বাল্মীকি প্রতিভা অভিনয়ের পরেই লেখা, উক্ত গীতিনাট্যে সংগীতের যে নূতন পরীক্ষা করা হয়েছিল প্রধানত তারই সমর্থনে রচিত। দুঃখের বিষয়, আজ আর জানার উপায় নেই কোন্ গানগুলি বক্তৃতার সঙ্গে গীত হয়। অবশ্য আমরা কিছুটা অনুমানের আশ্রয় নিতে পারি। বাল্মীকি প্রতিভা-র গানগুলির আলোচনায় আমরা দেখেছি, তার অনেকগুলিতেই ভারতীয় রাগরাগিণীর কাঠামোটিকে আশ্রয় করা হয়েছে, কিন্তু 'তাহাকে তাহার বৈঠকি মর্যাদা হইতে অন্যক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে; উড়িয়া চলা যাহার ব্যবসায় তাহাকে মাটিতে দৌড় করাইবার কাজে লাগানো গিয়াছে।...বাল্মীকিপ্রতিভার অনেকগুলি গান বৈঠকি-গান-ভাঙা,...আমাদের বৈঠকি গানের তেলেনা অঙ্গের সুরগুলিকে সহজেই এইরূপ নাটকের প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাইতে পারে—এই নাট্যে অনেকস্থলে তাহা করা হইয়াছে।'[২] এইজন্য আমাদের ধারণা, কিছু হিন্দুস্থানী বৈঠকি-গান ও কিছু তেলেনা অঙ্গের গানের সঙ্গে বাল্মীকি প্রতিভা থেকে কয়েকটি গান গেয়ে রবীন্দ্রনাথ উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যটি স্পষ্ট করে তোলার প্রয়াস পেয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে আমরা পুনরায় সভাপতির ভাষণে উক্ত 'বন্দে বাল্মীকিকোকিলং' কথাটি স্মরণ করিতে পারি। তাছাড়া বৈষ্ণব পদাবলী, রামপ্রসাদী, নিধুবাবুর টপ্পা-জাতীয় কিছু বাংলা গান—যেখানে সুর কথাকেই অনুসরণ করেছে—হয়তো গেয়ে শোনানো হয়েছিল। বক্তৃতার মূল কথাটিও ছিল তাই : 'সঙ্গীতের উদ্দেশ্যই ভাব প্রকাশ করা। যেমন কেবল মাত্র ছন্দ, কানে মিষ্ট শুনাক্ তথাপি অনাবশ্যক, ভাবের সহিত ছন্দই কবিদের ও ভাবুকদের আলোচনীয়, তেমনি কেবল মাত্র সুর সমষ্টি, ভাব না থাকিলে জীবনহীন দেহ মাত্র; সে দেহের গঠন সুন্দর হইতে পারে কিন্তু তাহাতে জীবন নাই।...গায়কেরা সঙ্গীতকে যে আসন দেন, আমি সঙ্গীতকে তদপেক্ষা উচ্চ আসন দিই; তাঁহারা সঙ্গীতকে কতকগুলা চেতনাহীন জড় সুরের উপর স্থাপন করেন, আমি তাহাকে জীবন্ত অমর ভাবের উপর স্থাপন করি। তাঁহারা গানের কথার উপরে সুরকে দাঁড় করাইতে চান, আমি গানের কথাগুলিকে সুরের উপরে দাঁড় করাইতে চাই। তাঁহারা কথা বসাইয়া যান্ সুর বাহির করিবার জন্য, আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করিবার জন্য।'[৩] এই মত অবশ্য পরবর্তীকালে তিনি পরিত্যাগ করেছেন, কিন্তু সে-প্রসঙ্গ পরে আলোচ্য।

রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি-তে লিখেছেন, দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রার পূর্বদিন সায়াহ্নে তিনি এই বক্তৃতা করেন। সেই হিসেবে তাঁর বিলাতযাত্রার তারিখ হয় ১০ বৈশাখ [বৃহ 21 Apr]। কিন্তু এই তারিখ সম্পর্কে সন্দেহের কারণ আছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ৯ বৈশাখ একটি পত্রে গুণেন্দ্রনাথকে লেখেন : 'রবিরা শুক্রবার এখান থেকে যাত্রা করিবে। আজ রবি Bethune Society-তে 'গান ও ভাব' এই বিষয়ে বক্তৃতা দেবে—with practical illustrations।'[৪] শুক্রবার অর্থাৎ ১১ বৈশাখ [22 Apr] তারিখটিই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। *Friend of India* পত্রিকার বিজ্ঞাপনেও দেখা যায় : "The Peninsular and Oriental Steamer Navigation Co...will despatch the following steamer from Calcutta/ Kaisar-i-Hind/R Methven/4020/700/April 22nd.' [বৃহস্পতিবার এইরূপ কোনো জাহাজ ছাড়ার উল্লেখ নেই।] এই বিজ্ঞাপন থেকে অনুমান করা যায় P.

& 0. Company-র কাইজার-ই-হিন্দ নামক জাহাজে 22 Apr [শুক্র ১১ বৈশাখ] রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডের উদ্দেশ্যে কলকাতা বন্দর ত্যাগ করেন, R. Methven ছিলেন জাহাজের ক্যাপ্টেন।

এই যাত্রায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী ছিলেন ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ। কয়েকদিন আগে ৭ বৈশাখ ৫২ [ব্রাহ্ম সংবৎ] 'মসূরী পর্ব্বত' থেকে মহর্ষি জামাতা সারদাপ্রসাদকে একটি পত্রে [অপ্রকাশিত] লেখেন : 'সত্য বিলাত যাইতেছে, সেখানে কি করিবে, কি শিখিবে তাহার এখনো কিছুই সে ঠিকানা করিতে পারে নাই। অথচ তাহার জন্য তোমার অনেক টাকা খরচ পড়িবে। সকল বিফল না হয়, ইহা কেবল এক সত্যপ্রসাদের উপর নির্ভর। যদি তাহার অধ্যবসায় থাকে, তবে তাহার স্বাধীন জীবিকার একটা না একটা সদুপায় অবশ্য...[?] আসিবে। এই আশার উপরে তুমি অবলম্বন করিয়া থাক। ঈশ্বর তোমার এই আশা পূর্ণ করুন, এই আমার আশীর্ব্বাদ।' মহর্ষির আশঙ্কাকে সত্য করে বৃথা অর্থহানি ঘটিয়ে সত্যপ্রসাদ মাদ্রাজ থেকেই বাড়ি ফিরে এসেছিলেন, রবীন্দ্রনাথকেও তাঁর সঙ্গে ফিরতে হয়েছিল। সোমপ্রকাশ [২৪।২৫, ২১ বৈশাখ] একটি ভুল সংবাদ প্রকাশ করে : বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আশুতোষ চৌধুরী, এস সি গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমতী ও, সি, মল্লিক ও ব্যারিষ্টার [উমেশচন্দ্র] বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী পুত্র ও কন্যাগণ বিলাতে পৌঁছিয়াছেন।' এই ক-দিনের মধ্যে বিলাত পৌঁছানো সম্ভব ছিল না, সুতরাং বোঝা যায় কোনো উৎসাহী সাংবাদিক জাহাজের যাত্রী-তালিকা অবলম্বনে সংবাদটি 'রচনা' করেছিলেন। কিন্তু এই সংবাদ থেকে জাহাজে রবীন্দ্রনাথের বাঙালি সহযাত্রী কারা ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায়।

এঁদের মধ্যে আশুতোষ চৌধুরীর [1860-1924] সঙ্গে পরিচয় এক দীর্ঘকালীন সম্পর্কের সূচনা করে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'দ্বিতীয়বার বিলাত যাইবার জন্য যখন যাত্রা করি তখন আশুর সঙ্গে জাহাজে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পাশ করিয়া কেমব্রিজে ডিগ্রি লইয়া ব্যারিস্টর হইতে চলিতেছেন। কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ পর্যন্ত কেবল কয়টা দিন মাত্র আমরা জাহাজে একত্র ছিলাম। কিন্তু দেখা গেল, পরিচয়ের গভীরতা দিনসংখ্যার উপর নির্ভর করে না। একটি সহজ সহৃদয়তার দ্বারা অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি এমন করিয়া আমার চিত্ত অধিকার করিয়া লইলেন যে, পূর্বে তাঁহার সঙ্গে যে চেনাশোনা ছিল না সেই ফাঁকটা এই কয়দিনের মধ্যেই যেন আগাগোড়া ভরিয়া গেল।'[৫] পাঁচ বছর পরে ৩০ শ্রাবণ ১২৯৩ [শনি 14 Aug 1886] তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা দেবীর সঙ্গে আশুতোষ চৌধুরীর বিবাহ হয়, এই বিবাহের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

যে কারণে মাদ্রাজ থেকে তাঁদের ফিরে আসতে হল সে-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : ব্যারিস্টার হইয়া আসাটা আমার ভাগ্য এমনি সম্পূর্ণ নামঞ্জুর করিয়া দিলেন যে, বিলাত পর্যন্ত পৌঁছিতেও হইল না—বিশেষ কারণে মাদ্রাজের ঘাটে নামিয়া পড়িয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে হইল। ঘটনাটা যত বড়ো গুরুতর, কারণটা তদনুরূপ কিছুই নহে; শুনিলে লোকে হাসিবে এবং সে-হাস্যটা ষোলো-আনা আমারই প্রাপ্য নহে।'[৬] রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন : 'কলিকাতা হইতে জাহাজে করিয়া মাদ্রাজ গিয়া সেখান হইতে বিলাতযাত্রী জাহাজ ধরিবার কথা। মাদ্রাজে পৌঁছিয়া নববিবাহিত সত্যপ্রসাদ আর অগ্রসর হইতে নারাজ; অথচ একা ফিরিতে সাহস নাই, পাছে মহর্ষি বিরক্ত হন। অবশেষে রবীন্দ্রনাথকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন;... সত্যপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথ ফিরতি জাহাজে কলিকাতায় ফিরিয়া মসূরিতে মহর্ষির সহিত দেখা করিতে গেলেন।

মহর্ষি কাহাকেও র্ভৎসনা করিলেন না।'[৭] প্রভাতকুমার তথ্যগুলি কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন তার কোনো হদিশ দেন নি, কিন্তু আমরা জানি নরেন্দ্রবালা দেবীর সঙ্গে সত্যপ্রসাদের বিবাহ হয় ফাল্গুন ১২৮৩-তে [Feb 1877] এবং ইতিমধ্যেই তিনি একটি কন্যা-সন্তানের পিতা হয়েছেন—সুতরাং এইসময়ে তাঁকে আক্ষরিক অর্থে ঠিক 'নববিবাহিত' বলা যায় না! অবশ্য ঠিক অনুরূপ তথ্য রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তিতেও পাওয়া যায়—এই ভ্রান্ত উক্তির কারণ [বিস্মরণ না কৌতুক?] কী বলা শক্ত, কিন্তু অন্য কয়েকটি প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য উক্তিটি উদ্ধারযোগ্য : 'ইতিমধ্যে আবার তার পালিত পিতাকে ধরিলেন, বলিলেন, "রবিকে কি বিলাত হইতে ফিরাইলেন? ব্যারিষ্টার হইলে চমৎকার হইত।"/আবার বিলাত চলিলাম। সঙ্গে চলিল সত্য...। সে নব-বিবাহিত ফিরিতে একান্ত ব্যাকুল। ভান করিল অসুখ-রক্ত আমাশয়। সব কথাই বিশ্বাস করিয়াছিলাম। মাদ্রাজে গিয়াই বলিল, "চলো, ফেরো।" তাহার সঙ্গেই ফিরিলাম। জাহাজের পার্সার বাধা দিলেন। সত্যর এই আচরণে বিরক্ত হইয়াছিলাম কিন্তু কিছু বলি নাই। আরও ফিরিলাম রাগে, সকলেই অবাক, খুবই স্পষ্ট বাক্য শুনিলাম। পিতা মুসৌরী হইতে ডাকাইয়াছিলেন। মাদ্রাজ হইতে কল্যাণ হইয়া সোজা পিতার নিকট গেলাম। ভয়ে ভয়ে দেখা করিলাম। তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। এখন মনে হয় আমার য়ুরোপ-প্রবাসী পত্রে তিনি চিন্তিত হইয়াছিলেন।'[৮] উক্তিটির বাক্যগঠনে ও বক্তব্যে কিছু কিছু অসংলগ্নতা পাঠকের অবশ্যই চোখে পড়বে, সুতরাং অনুমান করা ভুল হবে না যে অনুলেখনটি রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়ে সংশোধিত ও অনুমোদিত করিয়ে নেওয়া হয় নি। কথাগুলি তাঁরই, কিন্তু মনে হয় তার ক্রমবিন্যাসটি এখানে বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। আমাদের ধারণা, মাদ্রাজে জাহাজ থেকে নেমে রবীন্দ্রনাথ সংবাদটি টেলিগ্রাম মারফৎ মুসৌরীতে অবস্থানরত পিতাকে জানালে তিনি তাঁকে বা তাঁদের দুজনকেই সেখানে গিয়ে দেখা করতে বলেন। তখন কলকাতায় না ফিরে মাদ্রাজ থেকে বোম্বাইয়ের কল্যাণ স্টেশন হয়ে [সত্যেন্দ্রনাথ তখন সুরাটের সেশন্‌স্ জজ, তাঁর পরামর্শ নেবার জন্যই কি এতটা পথ পরিভ্রমণ?] মুসৌরীতে গিয়ে তাঁর পিতার সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু সেখান থেকে যখন কলকাতায় ফিরে এলেন তখন এখানকার অভিভাবকগণ ঘটনাটিকে খুব প্রসন্নমনে গ্রহণ করেন নি এবং 'খুবই স্পষ্ট বাক্য'তে তাঁদের মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তখন সস্ত্রীক চন্দননগরে 'তেলেনিপাড়ায় বাড়ুজ্যেদের বাগান'-এ অবস্থান করছিলেন। যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ৭ জ্যৈষ্ঠ [বৃহ 19 May] একটি পত্রে [অপ্রকাশিত] মহর্ষিকে জানিয়েছেন, 'জ্যোতিবাবুরা ফরাশডাঙ্গার বাগানে আছেন।' রবীন্দ্রনাথ তাঁদের কাছে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

কিন্তু সে-প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে তাঁর দুটি গ্রন্থ প্রকাশের বিষয় আলোচনা করে নেওয়া দরকার। গ্রন্থ দুটি হল—'ভগ্নহৃদয়' গীতিকাব্য ও 'রুদ্রচণ্ড' নাটিকা। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগে এদের প্রকাশ-তারিখ যথাক্রমে 23 Jun 1881 [বৃহ ১০ আষাঢ়]এবং 25 Jun 1881 [শনি ১২ আষাঢ়]। কিন্তু দুটি তারিখই ভুল। বস্তুত দুটি গ্রন্থই বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়, তবে তাঁর দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রার পূর্বেই এগুলির মুদ্রণ হয়েছিল কিনা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়।

The Bengalee পত্রিকায় 7 May [শনি ২৬ বৈশাখ; Vol. XXII, No 19] সংখ্যায় '15. Roodrachondra, by Babu Rabindranath Thakoor' লিখে গ্রন্থটির প্রাপ্তিস্বীকার করা হয়, দুদিন পরে 9 May [সোম ২৮ বৈশাখ] *Hindoo Patriot* [Vol XXVIII, No. 19. p. 219] পত্রিকাতেও অনুরূপ স্বীকৃতি দেখা যায় : '12. Rudrachundra—a drama. By Rubindranath Tagore'। আবার সোমপ্রকাশ-এর ৪

জ্যৈষ্ঠ [16 May; ২৪।২৭, পৃ ৪২৭] সংখ্যায় লিখিত হয় : 'নিম্নলিখিত পুস্তক ও মাসিক পত্রগুলি সমালোচনার্থ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। যথা— ভগ্ন হৃদয়,...রুদ্রচণ্ড,...। আগামী সপ্তাহে আমরা ইহার কতকগুলির সমালোচনা করিবার চেষ্টা করিব।' রুদ্রচণ্ড-এর সমালোচনা উক্ত পত্রিকায় ১৮ জ্যৈষ্ঠ [30 May] তারিখে মুদ্রিত হয়, অবশ্য ভগ্নহৃদয়-এর সমালোচনা প্রকাশিত হয় অনেক পরে ১১ শ্রাবণ [25 Jul] সংখ্যায়।

রুদ্রচণ্ড গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি এইরূপ:

রুদ্রচণ্ড।/(নাটিকা)/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/প্রণীত। কলিকাতা/বাল্মীকি যন্ত্রে/ শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।/শকাব্দ ১৮০৩।

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ গ্রন্থটির পরিচয় দিয়ে লিখেছেন : "রুদ্রচণ্ডের" আকার $৭^{৫}/_{৮}$ ইঞ্চি $৪^{১}/_{২}$ ইঞ্চি (১৮.৫ মিমি ১১.৫ মিমি) ১ পৃষ্ঠা উপহার + ৫৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। উপহার ১৩ লাইন, চতুর্দশ সর্গে ৭৮৭ লাইন, মোট ৮০০ লাইনে গ্রন্থ সম্পূর্ণ।

'প্রথম সংস্করণে ১০০০ কপি ছাপা হয়, মূল্য ॥০ (আট আনা)।...দুইটি গান কাব্যগ্রন্থাবলীর ১৩০৩ সনের সংগ্রহে "কৈশোরকের" মধ্যে ছাপা হইয়াছিল; প্রচলিত সংস্করণে কিছুই নাই।

'বেঙ্গল লাইব্রেরীর তালিকায়—No. 1268 (3rd Quarter of 1881) ইংরেজিতে সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে।'[*]

রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থটি 'উপহার' দেন 'ভাই জ্যোতিদাদা'কে

যাহা দিতে আসিয়াছি কিছুই তা নহে ভাই!
কোথাও পাই নে খুঁজে যা তোমারে দিতে চাই!
আগ্রহে অধীর হ'য়ে ক্ষুদ্র উপহার ল'য়ে
যে উচ্ছ্বাসে আসিতেছি ছুটিয়া তোমারি পাশ,
দেখাতে পারিলে তাহা পূরিত সকল আশ।
ছেলেবেলা হ'তে, ভাই, ধরিয়া আমারি হাত
অনুক্ষণ তুমি মোরে রাখিয়াছ সাথে সাথ।
তোমার স্নেহের ছায়ে কত না যতন ক'রে
কঠোর সংসার হ'তে আবরি রেখেছ মোরে।
সে স্নেহ-আশ্রয় ত্যজি যেতে হবে পরবাসে
তাই বিদায়ের আগে এসেছি তোমার পাশে।
যতখানি ভালবাসি, তার মত কিছু নাই—
তবু যাহা সাধ্য ছিল যতনে এনেছি তাই।

—তাঁর জীবনগঠনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যে দানের কথা রবীন্দ্রনাথ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে জীবনস্মৃতি-তে স্বীকার করেছেন, এই উপহার-কবিতার প্রায় প্রতি ছত্রে তার প্রকাশ দেখা যায়।

'সে স্নেহ-আশ্রয় ত্যজি যেতে হবে পরবাসে'—এই ছত্রটি থেকে বোঝা যায় বিলাতযাত্রার কথাই তিনি এখানে উল্লেখ করেছেন। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ অনুমান করেছেন : 'প্রবাসে যাইবার কথা উল্লেখ থাকায় মনে হয় যে ইহা বিলাতযাত্রা করিবার পূর্ব্বে লেখা। রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথমবার বিলাতযাত্রা করেন তখন তাঁহার বয়স সতেরো বৎসর, তাহার পূর্ব্বে লেখা হইয়া থাকিলে, 'রুদ্রচণ্ড' নাটিকাটিকে যোল সতেরো বৎসর বয়সের লেখা বলা যায়।'[৯] ড সুকুমার সেন এ-বিষয়ে অন্য ধারণা পোষণ করেন : 'ইহা রবীন্দ্রনাথের আমেদাবাদ থাকা

কালে প্রথমবার বিলাতযাত্রার আগে লেখা এমন অনুমান অপরিহার্য নয়। দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রার প্রারম্ভে ইহা রচিত ও মুদ্রিত হইয়াছিল, এই অনুমানই সঙ্গততর।'[১০] গ্রন্থটি সম্পর্কে তাঁর অপর মূল্যায়ন : 'নামপত্রে "নাটিকা" ছাপ এবং গ্রন্থমধ্যে "দৃশ্য" বিভাগ থাকিলেও 'রুদ্রচণ্ড' গাথা-কাব্যই। ইহাই রবীন্দ্রনাথের শেষ গাথা-কাব্য, বিলুপ্ত বাল্য-রচনা পৃথ্বীরাজের-পরাজয়ের কৈশোর সংস্করণ।' রবীন্দ্রজীবনী-কারও প্রায় একই মত ব্যক্ত করেছেন : 'আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে বোলপুর আসিয়া 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' নামে যে কাব্য রচনা করেন (মার্চ ১৮৭৩) এই রুদ্রচণ্ড তাহারই নাট্যরূপ। নাটকের ভাষা অপরিণত। আমাদের মনে হয় বিলাত যাইবার পূর্বে তাড়াতাড়িতে নূতন কিছু সৃষ্টি-প্রেরণার অভাবে পুরাতন। রচনাটাকে নূতন কলেবরে সাজাইয়া 'জ্যোতিদাদা'কে উপহার দিলেন।'[১১]

মতামতগুলি সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করা দরকার। বোলপুরের 'তৃণহীন কঙ্করশয্যায়' যে 'পৃথ্বীরাজের-পরাজয়' লিখিত হয়েছিল, সেটি ছিল একটি 'বীররসাত্মক কাব্য', কিন্তু রুদ্রচণ্ড 'নাটিকা'য় চাঁদকবি ও রুদ্রচণ্ডের দ্বন্দ্বযুদ্ধ এবং পৃথ্বীরাজ ও মহম্মদ ঘোরীর মহাসংগ্রামের পটভূমিকা থাকা সত্ত্বেও এর আগাগোড়া করুণরসের একটি অন্তঃশীলা প্রবাহ অনুভব করা যায়। পৃথ্বীরাজের পরাজয়ের কাহিনী এখানে থাকলেও তিনি নেপথ্যেই রয়ে গেছেন, রুদ্রচণ্ডের ট্র্যাজিক পরিণতিই নাটিকাটির মূল বিষয়—রুদ্রচণ্ডই এর নায়ক, তারই নামে গ্রন্থটির নামকরণ করা হয়েছে। সুতরাং একে পূর্বলিখিত কাব্যটির নাট্যরূপান্তর ভাবা খুব যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। ড সেন 'বৌঠাকুরাণীর-হাটের সঙ্গে রুদ্রচণ্ডের বিষয়বস্তুর মর্মগত মিল' লক্ষ্য করেছেন, চরিত্রগত দিক দিয়ে আমরা বরং বিসর্জন-এর রঘুপতির সঙ্গে রুদ্রচণ্ডের অধিকতর সাদৃশ্য দেখতে পাই।

রবীন্দ্রজীবনী-কার 'নূতন কিছু সৃষ্টি-প্রেরণার অভাবে পুরাতন রচনাটাকে নূতন কলেবরে' সাজানোর যে-কথা লিখেছেন, আমাদের কাছে সেটিও খুব গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রার অব্যবহিত পূর্বের কয়েকটি মাস রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সৃষ্টিশীল সময়—সন্ধ্যাসংগীত-এর প্রাথমিক কয়েকটি কবিতা, মাঘোৎসবের গান, বাল্মীকি প্রতিভা এবং 'সঙ্গীত ও ভাব' প্রবন্ধ রচনা ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁর সৃজনশক্তিকে এই সময়ে তিনি বিশেষভাবে অনুভব করেছেন। সুতরাং অন্যতম প্রিয়জন 'জ্যোতিদাদা'কে উপহার দেবার জন্য তাড়াহুড়োয় পুরোনো রচনাকে নতুন রূপ দিলেন এমন কথা মেনে নেওয়া শক্ত। সেইজন্যই উপহার-কবিতায় 'পরবাসে' যাওয়ার উল্লেখটিকে অবলম্বন করে প্রথমবার বিলাতযাত্রার কথাই ভাবতে হয়। ড সেন রুদ্রচণ্ড-এর মধ্যে গাথা-কাব্যের লক্ষণ দেখেছেন। প্রথমবার বিলাতযাত্রার পূর্ববর্তী কালটি রবীন্দ্রনাথের গাথা-কাব্য রচনারই পর্ব—সেদিক দিয়ে রুদ্রচণ্ড আমেদাবাদ বাসের সময় রচিত হলে এর মধ্যে গাথার লক্ষণ থাকা অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া একথাও মনে রাখা দরকার, নাটিকার তৃতীয় দৃশ্যের অন্তর্গত 'বসন্তপ্রভাতে এক মালতীর ফুল' ও 'তরুতলে ছিন্নবৃন্ত মালতীর ফুল' গান দুটির পাণ্ডুলিপি মালতীপুঁথির 15/৮ক, 16/৮খ এবং 13/৭ক পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়; 13/৭ক পৃষ্ঠার বিপরীত দিকে 14/৭খ পৃষ্ঠার 'দেখি দেখি মুখানি' গীতাংশটি বলো দেখি সখী লো' [দ্র গীতবিতান ২।৪১৭] গানটিরই প্রাথমিক রূপ—যেটি নিঃসন্দেহে আমেদাবাদ-বোম্বাই বাস-পর্বে রচিত। রবীন্দ্রনাথের এরূপ অভ্যাসের দৃষ্টান্ত আমরা ভগ্নহৃদয়-এর গানগুলির ক্ষেত্রেও দেখেছি; সেখানেও গানগুলি প্রথমে মালতীপুঁথি-র পৃষ্ঠায় লেখা, পরে প্রয়োজনমতো কাব্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

মালতীপুঁথি-র ওই বিশেষ পৃষ্ঠাগুলিতে লেখা রুদ্রচণ্ড-এর গান দুটি উক্ত নাটিকার রচনাকালের অন্যতম ইঙ্গিতবাহী। গান দুটি যে নাটিকারই প্রয়োজনে লিখিত, সেগুলি পড়লেই তা বোঝা যায়। 'বসন্তপ্রভাতে এক

মালতীর ফুল'-এর 'তরুতলে ছিন্নবৃন্ত মালতীর ফুল'-এ রূপান্তরের মধ্যে যথেষ্ট নাটকীয়তা আছে, অনেক জায়গায় সামান্য পরিবর্তন-সহ একই ধরনের শব্দ-বিন্যাস এই নাটকীয়তা সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক হয়েছে। এই কারণেই আমাদের ধারণা, গান দুটি রচনার সমকালেই রুদ্রচণ্ড গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল প্রথমবার বিলাতযাত্রার পূর্বেই এবং সম্ভবত 'উপহার' কবিতা-সহ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে প্রেরিত হয়েছিল। আর হয়তো এরই প্রতিদানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর য়ুরোপ-প্রবাসী ভ্রাতাকে অশ্রুমতী নাটক উৎসর্গ করেছিলেন।

প্রথমবার বিলাতযাত্রার প্রাক্কালে রচিত ও উপহৃত নাটিকাটি তখনই মুদ্রিত হয় নি, সেটি উপহার-সহ মুদ্রণের উপযুক্ত অবসর এল দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রার সময়। প্রকাশের পর গ্রন্থটির কয়েকটি সমালোচনা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রথম সমালোচনাটি বেরোয় হিন্দু পেট্রিয়ট-এর [Vol. XXVIII, No. 21, p. 247] 23 May [১১ জ্যৈষ্ঠ] সংখ্যায়, দ্বিতীয়টি ১৮ জ্যৈষ্ঠের সোমপ্রকাশ-এ [২৪।২৯]*, তৃতীয়টি কালীপ্রসন্ন ঘোষ-সম্পাদিত বান্ধব-এর আষাঢ় ১২৮৮ [পৃ ১৪২-৪৪] সংখ্যায়। এদের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়টি পুলিনবিহারী সেন-কৃত রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী-তে [পৃ ৪০-৪১] পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। অন্যান্য কোনো কোনো পত্রিকাতেও হয়তো গ্রন্থটি সমালোচিত হয়েছিল, কিন্তু সেগুলি আমরা সংগ্রহ করতে পারি নি।

ভগ্নহৃদয়-ও বৈশাখ ১২৮৮তেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। কাব্যটির প্রথম ছ'টি সর্গ ইতিপূর্বে ভারতী-র কার্তিক থেকে ফাল্গুন সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল। সম্ভবত এর পরেই দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রার সিদ্ধান্তটি পাকা হয়ে যাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ কাব্যটি ভারতী-তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের পরিকল্পনাটি ত্যাগ করেন এবং সম্পূর্ণ গ্রন্থটি মুদ্রণের জন্য প্রেসে দেন। যন্ত্রাধ্যক্ষ বা কম্পোজিটারের উদ্দেশ্যে লিখিত বিভিন্ন মন্তব্য-সহ মূল পাণ্ডুলিপিটি ইন্দিরা দেবী শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে দান করেন, সেখানকার অভিলেখাগারে সেটি সংরক্ষিত আছে [অভিজ্ঞান-সংখ্যা: ৯৩]। পাণ্ডুলিপির পাঠ, ভারতী-র পাঠ ও মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠে যৎসামান্য পার্থক্য আছে, কিন্তু সেগুলির পরিমাণ বেশি নয়।

ভগ্নহৃদয়-এর আখ্যাপত্রটি নিম্নরূপ:

ভগ্নহৃদয়।/ (গীতি-কাব্য)/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ প্রণীত।/ কলিকাতা/ বাল্মীকি যন্ত্রে/ শ্রী কালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।/ শকাব্দা ১৮০৩।

পৃষ্ঠাসংখ্যা : আখ্যাপত্র+ভূমিকা+কাব্যের পাত্রগণ+উপহার+১৯৬।

আমরা আগেই বলেছি, বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী গ্রন্থটির প্রকাশ তারিখ 23 Jun, কিন্তু সম্ভবত এই তারিখে বইটি সেখানে জমা দেওয়া হয়; ৪ জ্যৈষ্ঠ [16 May] সোমপ্রকাশ-এ গ্রন্থটির প্রাপ্তিস্বীকার দেখে মনে হয় বৈশাখ মাসেই এটি প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত ক্যাটালগ অনুসারে ভগ্নহৃদয়-এর মুদ্রণসংখ্যা ১০০০ ও মূল্য এক টাকা।

ভারতী-তে মুদ্রিত 'ভূমিকা'টি গ্রন্থে কিছুটা পরিবর্তিত এবং 'উপহার'-গীতিটি ['তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা'] মাঘোৎসবে ব্রহ্মসংগীত-রূপে [সামান্য পরিবর্তিত ও সংক্ষিপ্ত আকারে] গীত হওয়ার পর গ্রন্থে একেবারেই বর্জিত হয়েছে। পরিবর্তে ৫টি স্তবকে বিভক্ত ৩০টি ছত্রের একটি দীর্ঘ কবিতা 'শ্রীমতী হে'-র উদ্দেশে 'উপহার'-রূপে উৎসর্গীকৃত। সজনীকান্ত দাস লিখেছেন : "হে" কে, কবিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করিলেন, তোমার কি মনে হয়? বলিলাম, হেমাঙ্গিনী। 'অলীকবাবু'তে আপনি অলীকবাবু ও কাদম্বরী দেবী হেমাঙ্গিনী সাজিয়াছিলেন। এই নামের আড়ালের সুযোগ আপনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি

স্বীকার করিলেন, ইহাই সত্য, অন্য সব অনুমান মিথ্যা।'[১২] এ-সম্পর্কে রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন : 'আমরা ইন্দিরা দেবীর নিকট শুনিয়াছি' 'হে'—কাদম্বরী দেবীর কোনো ছদ্মনামের আদ্যক্ষর। তাঁহার ডাকনাম ছিল 'হেকেটি'।—ইনি প্রাচীন গ্রীকদের ত্রিমুণ্ডী দেবী। অন্তরঙ্গেরা রহস্যচ্ছলে এই নামটিতে ডাকিতেন।'[১৩] 'হেকেটি' নামের উৎস সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য পূর্বেই উপস্থাপিত হয়েছে [দ্র রবিজীবনী ১।২২৬, ৩৩৭-৩৮]।

যাই হোক, ভগ্নহৃদয় কাব্যটি যে কাদম্বরী দেবীকেই উপহার দেওয়া হয়েছিল, এ-সম্পর্কে সন্দেহ নেই। উপহার-গীতিটির পরিবর্তে দীর্ঘ কবিতাটির সংযোজন ঘটলেও গানের মূল ভাবটি কবিতার তৃতীয় স্তবকে বর্ণিত হয়েছে:

হয়ত জান না, দেবি, অদৃশ্য বাঁধন দিয়া
নিয়মিত পথে এক ফিরাইছ মোর হিয়া।
গেছি দূরে, গেছি কাছে, সেই আকর্ষণ আছে,
পথভ্রষ্ট হই নাক তাহারি অটল বলে।
নহিলে হৃদয় মম ছিন্নধূমকেতু-সম
দিশাহারা হইত সে অনন্ত আকাশতলে!

বিদেশযাত্রার প্রসঙ্গ এই কবিতার মধ্যেও রয়েছে :

আজ সাগরের তীরে দাঁড়ায়ে তোমার কাছে;
পরপারে মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার দেশ আছে।
দিবস ফুরাবে যবে সে দেশে যাইতে হবে,
এ পারে ফেলিয়া যাব আমার তপন শশী—...

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা ভারতী-তে প্রকাশিত ভগ্নহৃদয়-এর 'উপহার' প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত হৃদয়াবেগের প্রকাশ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দ্বিধার কথা উল্লেখ করেছিলাম—বর্তমান কবিতাটিতে তিনি সেই দ্বিধা সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠেছেন। গানে উদ্দিষ্টার পরিচয়টি ছিল আভাসে, কিন্তু এখানে 'শ্রীমতী হে'—লিখে অন্তত আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে গোপনীয়তার আবরণটি উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। কবিতার শেষ স্তবকে নিবেদনের সুরটিও অকুণ্ঠ:

স্নেহের অরুণালোকে খুলিয়া হৃদয় প্রাণ
এ পারে দাঁড়ায়ে, দেবি, গাহিনু যে শেষ গান
তোমারি মনের ছায় সে গান আশ্রয় চায়—
একটি নয়নজল তাহারে করিও দান।
আজিকে বিদায় তবে, আবার কি দেখা হবে—
পাইয়া স্নেহের আলো হৃদয় গাহিবে গান?

আমরা জানি না ব্যারিস্টারি পড়ার ঘোষিত উদ্দেশ্য ছাড়া রবীন্দ্রনাথের মনে অন্য কোনো পরিকল্পনা ছিল কিনা, কিন্তু উক্ত কবিতার শেষ দুটি ছত্রে যে-ধরনের বিদায়ের সুর ধ্বনিত করে তোলা হয়েছে, তা মাত্র দু'তিন বছর প্রবাসজীবন যাপনের সম্ভাবনার সঙ্গে যথেষ্ট সংগতিপূর্ণ নয়।

ভগ্নহৃদয় কাব্যটি চৌত্রিশটি সর্গে সম্পূর্ণ। এর মধ্যে প্রথম ছ'টি সর্গ ভারতী-তে প্রকাশিত হয়েছিল, বাকি আঠাশটি সর্গ গ্রন্থাকারেই প্রথম মুদ্রিত হয়। এটির আর-কোনো সংস্করণ হয় নি, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্র-রচনাবলী-র অচলিত সংগ্রহ প্রথম খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত হয়। অবশ্য একসময়ে গ্রন্থটির পুনর্মুদ্রণের আয়োজন হয়েছিল—পুলিনবিহারী সেন লিখেছেন : 'মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় যে-সময় ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের

সহিত যুক্ত হন (১৯০৮?—) এবং যে কালে (১৯১১) ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে সন্ধ্যাসংগীত প্রভাতসংগীত প্রভৃতি পুরাতন গ্রন্থ কলিকাতা কান্তিক প্রেসে পুনর্মুদ্রিত হয় এই পর্বে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে ভগ্নহৃদয় পুনর্মুদ্রণেরও আয়োজন হইয়াছিল। ইহার সম্পূর্ণ প্রুফ [প্রথম ফর্মার প্রুফ মাত্র] শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে। এই প্রুফ রবীন্দ্রনাথ প্রথমে সংশোধন করিয়া পরিশেষে মন্তব্য করেন —"Rubbish!" মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্দেশে লেখেন "দোহাই ধর্ম্মের এটা ছাপিয়োনা!"[১৪] সম্ভবত এর পরেই পুনঃপ্রকাশের পরিকল্পনাটি পরিত্যক্ত হয়। কানাই সামন্তের সম্পাদনায় ভগ্নহৃদয়-এর 'রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি-আধারিত' একটি স্বতন্ত্র সংস্করণ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়েছে [মাঘ ১৩৮৮]।

অথচ গ্রন্থটি যখন প্রকাশিত হয়েছিল, 'তখন মনে হইয়াছিল লেখাটা খুব ভালো হইয়াছে। লেখকের পক্ষে এরূপ মনে হওয়া অসামান্য নহে। কিন্তু তখনকার পাঠকদের কাছেও এ-লেখাটা সম্পূর্ণ অনাদৃত হয় নাই।'[১৫] [পাণ্ডুলিপি-তে এই অংশের পাঠ : 'তখন এই কাব্যটির প্রতি আমার বিশেষ একটা সগর্ব্ব মমত্ব জন্মিয়াছিল তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।'] এই সমাদর সম্পর্কে খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন : 'এই পুস্তক প্রকাশের পর যুবক মহলে, ছাত্র মহলে, রবীন্দ্রনাথের নাম পড়িয়া গেল। তিনি বাংলার "শেলী" হইলেন—তাঁহার বেশ, তাঁহার কেশ, তাঁহার চসমা সবই অনুকৃত হইতে লাগিল। তাহাই ফ্যাসন হইয়া দাঁড়াইল। আকাশে বাতাসে তখন 'রবিবাবু', কাব্যে এলো নূতন ছন্দ, উদাস ভাব'।[১৬]

এই কাব্যের মাধ্যমে ত্রিপুরার রাজপরিবারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি সুচিরস্থায়ী সম্পর্কের সূচনা হয়। তিনি লিখেছেন : 'মনে আছে, এই লেখা বাহির হইবার কিছুকাল পরে কলিকাতায় ত্রিপুরার স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের মন্ত্রী আমার সহিত দেখা করিতে আসেন। কাব্যটি মহারাজের ভালো লাগিয়াছে এবং কবির সাহিত্য সাধনার সফলতা সম্বন্ধে উচ্চ আশা পোষণ করেন, কেবল এই কথাটি জানাইবার জন্যই তিনি তাঁহার অমাত্যকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।'[১৭] কর্ণেল মহিমচন্দ্র দেববর্মা এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'প্রিয়তমা প্রধানা মহিষীর অকালমৃত্যুতে* প্রৌঢ় বীরচন্দ্রের হৃদয় অসহনীয় প্রিয়া-বিরহ-শোকাকুল'হইয়া পড়ে!...কবি বীরচন্দ্রের তখনকার মানসিক ভাবের সহিত 'ভগ্ন হৃদয়ে'র কবিতাগুলি সায় দিয়াছিল। গুণগ্রাহী বীরচন্দ্র...তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী স্বর্গীয় রাধারমণ ঘোষকে কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট প্রেরণ করেন, 'ভগ্ন হৃদয়' কাব্যগ্রন্থ মহারাজকে প্রীত করিয়াছে, তজ্জন্য তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতে। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের বা তাঁহার পরিবারের কাহারো সহিত মহারাজ বীরচন্দ্রের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না'।[১৮]

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রিয়নাথ সেন [1854-1916] ভগ্নহৃদয় কাব্যের যথেষ্ট সমাদর করেননি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'ভগ্নহৃদয় পড়িয়া তিনি আমার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন।'[১৯] অথচ তাঁর কাছে প্রিয়নাথের মতামতের মূল্য অনেকখানি, কারণ 'সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক তিনি। দেশী ও বিদেশী প্রায় সকল ভাষার সকল সাহিত্যের বড়োরাস্তায় ও গলিতে তাঁহার সদাসর্বদা আনাগোনা। তাঁহার কাছে বসিলে ভাবরাজ্যের অনেক দূর দিগন্তের দৃশ্য একেবারে দেখিতে পাওয়া যায়। সেটা আমার পক্ষে ভারি কাজে লাগিয়াছিল।' তাঁদের উভয়ের বন্ধু নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত [1861-1940] লিখেছেন : 'It was in deference to his unfavourable opinion that Rabindranath Tagore withdrew one of his early works from circulation and it has never been reprinted.* পুলিনবিহারী সেন অনুমান করেছেন, "উক্ত 'early work'

সম্ভবতঃ 'ভগ্নহৃদয়'।"[২০] তাঁর আরও অনুমান : 'সম্ভবতঃ ১৮৮০ সালে প্রথমবার বিলাতবাস হইতে প্রত্যাবর্তনের পর উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হয়। প্রিয়নাথ সেনের প্রতিবেশী বিহারীলাল চক্রবর্তী, বিহারীলাল ঠাকুরবাড়িতেও বিশেষ পরিচিত ও সমাদৃত ছিলেন, পরিচয়ের সূত্র সম্ভবতঃ তিনিই'।[২১]

ভগ্নহৃদয়-এর কয়েকটি অংশ স্বতন্ত্র কবিতারূপে শিরোনামাঙ্কিত হয়ে কাব্যগ্রন্থাবলী-র [১৩০৩] 'কৈশোরক' ভাগে [পৃ ৫-১৫] গৃহীত হয়েছিল [দ্র রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী। ৩৪-৩৮]। এই কাব্যের গান বা গান-জাতীয় রচনার [যেগুলি রবিচ্ছায়া বা গীতবিতান-এ সংকলিত হয়েছে] মোট সংখ্যা কুড়িটি, এদের মধ্যে মাত্র দশটির সুর পাওয়া গেছে।

রবীন্দ্রকাব্যের ভাব ও ভাষার বিরুদ্ধে যে অস্পষ্টতার অভিযোগ পরবর্তী কালে সমালোচকদের মুখর করে তুলেছে, ভগ্নহৃদয় থেকেই তার সূত্রপাত। সাধারণী-র ১০ আশ্বিন [১৬।২৪, পৃ ২৮০]-সংখ্যায় সমালোচক [অক্ষয়চন্দ্র সরকার] লেখেন : "...রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতর কাব্য রুদ্রচণ্ড সমালোচনায় আমরা বলিয়াছিলাম যে 'ইহার কোন কোন কবিতায় ফল্গু নদীর মত, কেমন এক খানি ধীরবাহিনী, নির্ম্মলা, অন্তঃসলিলা স্রোতস্বিনী থাকে, তবে কি না বালি খুঁড়িয়া, কোথাও পাথর ঠেলিয়া, কোথাও দলদাম সরাইয়া, স্রোত বাহির করিতে হয়।' এ কাব্য সম্বন্ধেও আমরা তাহাই বলিতেছি। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত কবি। কিন্তু তাঁহার ভাষা সকল স্থানে প্রাঞ্জল নহে।...

২৮ পৃষ্ঠায়—

> বিষণ্ণ অধর দুটি অতি ধীরে ধীরে টুটি
> অতি ধীরে ধীরে ফুটে হাসির কিরণ। [৩য় সর্গ অ-১।১৪৬]

৩৬ পৃষ্ঠায়—

> অধর দুটির শাসন টুটিয়া
> রাশি রাশি হাসি পড়িছে ফুটিয়া, [৪র্থ সর্গ অ-১।১৫৩]

অধরোষ্ঠের যোগ ভঙ্গ করাকে অধর টুটা—বা অধরের শাসন টুটা—বলা ভাষার উপর একরূপ জবরদস্তি করা।

২৯ পৃষ্ঠায়—

> মেঘের দুঃস্বপ্নে মগ্ন দিনের মতন
> কাঁদিয়া কাটিবে কিরে সারাটি যৌবন? [৩য় সর্গ অ-১।১৪৭]

নায়িকার হৃদয়ের কুহেলিকা বর্ণন করিতে গিয়া কবি প্রথম পঙ্‌ক্তির ভাষা সম্পূর্ণ প্রহেলিকাময়ী করিয়াছেন। শেলী প্রভৃতি ইংরাজ কবির ঐরূপ কুহেলিকা কোথাও কোথাও প্রশংসনীয় হয় বলিয়া—বাঙ্গালা ভাষায় ঐরূপ আবছায়া যে আদরের বস্তু তাহা নহে। কবি রবীন্দ্র স্বভাবের এই আধ ফুটন্ত ভাব বড় ভাল বাসেন। তাঁহার কাব্যের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় যে "জোছনা" আছে—তাহা ফুটফুটে জ্যোৎস্না নহে; মিটি মিটি ঘুমন্ত জোচ্ছনা—তাহা কবি বড় ভাল বাসেন। কবির এই প্রকৃতি হইতে তাহার কাব্যের ভাষাও স্থানে স্থানে কুহেলিকাময়ী হইয়া থাকে। তাহার পর, ৩১ পৃষ্ঠার [অ-১।১৪৯] "অস্তমান যামিনীর" মত দুঃসাহসের

উদাসীনতা আছে। একে তো যামিনী অস্ত যায় না; তাহার উপর "অস্তমান যামিনী"—ভাষার উপর আর একরূপ জবরদস্তি।..."[*]

ভারতী-র বৈশাখ ১২৮৮ [৫।১]-সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের একটিমাত্র রচনা প্রকাশিত হয়:

১৮-২৭ 'বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা' দ্র সমালোচনা অ-২।৯২-৯৬

ভারতী-র প্রবন্ধটি অনেক সংক্ষিপ্ত আকারে সমালোচনা [১২৯৪] গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। সাধারণী-র পূর্বোদ্ধৃত সমালোচনাটি যদি আগেই প্রকাশিত হত, বর্তমান প্রবন্ধটিকে অনায়াসেই তার প্রত্যুত্তর রূপে গণ্য করা যেত—'জ্যোৎস্নারাত্রে কেবলমাত্র যে নয়নের পরিতৃপ্তি হয় তাহা নহে, জ্যোৎস্নায় একটা কি অপরিস্ফুট ভাব মনে আনয়ন করে। যতটুকু সম্মুখে আছে কেবল ততটুকু মাত্রই যে উপভোগ করি তাহা নহে, একটা অবর্ত্তমান রাজ্যে গিয়া পৌঁছাই। তাহার কারণ এই যে, জ্যোৎস্না উপভোগ করিয়া আমাদের তৃপ্তি হয় না। চারি দিকে জ্যোৎস্না দেখিতেছি, অথচ জ্যোৎস্নাকে আমরা পাইতেছি না'[২২] —রবীন্দ্র-কাব্যের 'জোছনা' কেন-যে 'ফুটফুটে জ্যোৎস্না' নয়, 'মিটিমিটি ঘুমন্ত জোচ্ছনা', রবীন্দ্রনাথ সেইটিই যেন এখানে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রবন্ধটি কোন্ সময়ে রচিত তা আমাদের জানা নেই, কিন্তু মনে হয় কার্তিক-অগ্র° ১২৮৭-তে পত্রিকায় ভগ্নহৃদয় প্রকাশের ও সন্ধ্যাসংগীতের প্রথম কবিতাগুলি লেখার সময়েই এটি রচিত হয়েছিল। উক্ত কাব্য ও কবিতাগুলিতে ভাব ও ভাষার যে পরীক্ষা তিনি করছিলেন, যুক্তির মাধ্যমে তার একটি তত্ত্বভূমিকা রচনায় প্রয়াস প্রবন্ধটিতে লক্ষ্য করা যায়। এখানে তাঁর সিদ্ধান্ত : 'পৃথিবীর দ্রব্যে নাকি নানাপ্রকার অসম্পূর্ণতা দেখা যায়।...সেই জন্যই দূর হইতে আমরা আধখানা ভাল দেখিলে তাড়াতাড়ি আশা করিয়া বসি বাকিটুকু নিশ্চয়ই ভাল হইবে। ইহা যদি সত্য হয় তবে দূরেই থাকি না কেন, কল্পনায় পূর্ণতার প্রতিষ্ঠা করি না কেন—রক্ত মাংসের অত কাছে ঘেঁষিবার আবশ্যক কি? শরীর ও আয়তন যতই কম দেখি, অশরীরী ভাব যতই কল্পনা করি, বস্তুগত কবিতা যতই কম আহার করি ও ভাবগত কবিতা যতই সেবন করি, ততই ত ভাল।'[২৩]

প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ বর্তমান প্রবন্ধে শেলির *Queen Mab* কাব্য থেকে কয়েকটি দীর্ঘ অংশ, ওয়ার্ডসওয়ার্থের একটি কবিতা ও কয়েকটি কাব্যানুবাদ ব্যবহার করেছেন। মধুসূদনের মেঘনাদবধকাব্য সম্পর্কে তাঁর আবাল্য বিরূপতা, এখানেও স্থূল বস্তুগত কবিতার উদাহরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে তিনি উক্ত কাব্য থেকেই উদ্ধৃতি সংগ্রহ করেছেন : 'মেঘনাদবধ কাব্যে নরকের বর্ণনায় যে বীভৎস রসের অবতারণা করা হইয়াছে তাহা অত্যন্ত নিন্দনীয়। বর্ণনাগুলি নিতান্ত ইন্দ্রিয়গত হইয়াছে, এরূপ বর্ণনায় কল্পনার আবশ্যক অত্যন্ত কম। যে কেহ ইচ্ছা, এমন অশ্রাব্য ভাষায় বীভৎস ভাব বর্ণনা করিতে পারে, যে ঘৃণায় সকলকে কানে আঙুল দিতে হয়।

"অজীর্ণ ভোজন দ্রব্য উগরি দুর্ম্মতি
পুনঃ পুনঃ, দুই হস্তে তুলিয়া গিলিছে
সুখাদ্য!" [৮ম সর্গ, ২২৮-৩০ ছত্র]

আর এক স্থলে উন্মত্ততার বর্ণনা করিতে গিয়া কবি বলিয়াছেন—

"—মল মূত্র, না বিচারি কিছু,
অন্ন সহ মাখি, হায়, খায় অনায়াসে!" [ঐ, ২৫৭-৫৮ ছত্র]

হইতে পারে, উন্মাদগ্রস্ত লোকেরা এইরূপ করিয়া থাকে কিন্তু তাহাই কি কবিতায় বর্ণনীয়। উন্মত্ততার একটা বিকট ভাব মাত্র কবিতায় বর্ণনীয়, তাহার বস্তুগত খুঁটিনাটিগুলি নহে।'[২৪]

আমরা আগেই বলেছি, দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রার অকাল পরিসমাপ্তি ঘটায় রবীন্দ্রনাথ চন্দননগরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন, সম্ভবত জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমে। এ-সম্পর্কে পরে তিনি বলেছেন : 'তেলেনিপাড়ায় বাড়ুজ্যেদের বাগান। জ্যোতিদাদা সেখানে কিছুকাল থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। ...কিছুদিন পরে বাড়ী বদল করা হইল।'[২৫] দীর্ঘদিন পরে ৯ ফাল্গুন ১৩৪৩ [21 Feb 1937] চন্দননগরে জাহ্নবীনিবাসে বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, 'সেই সময় এই শহরের এক প্রান্তে একটা জীর্ণ-প্রায় বাড়ি ছিল; সেইখানে আমি আমার দাদার সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলাম।'[২৬] ১৩৪২-এর জ্যৈষ্ঠ মাসে 'পদ্মা' বোটে করে চন্দননগরে এসে পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে লিখেছেন, 'এখন যেখানে আছি ঠিক এর সামনেই সেই দোতলা বাড়ি, যেখানে একদা জ্যোতিদাদার সঙ্গে অনেকদিন কাটিয়েছি। সে বাড়িটা অত্যন্ত বেমেরামতী অবস্থায়।'[২৭] এই ভ্রমণে তাঁর সহযাত্রিণী রানী চন্দ লিখেছেন : 'এই গঙ্গার ধারেই আর-একটু ওদিকে এক বাড়িতে—...সে বাড়ি ভেঙে গিয়ে বনজঙ্গলে ঢেকেছে এখন। গুরুদেব বলতেন, সে বাড়িতে জ্যোতিদাদা নতুন বউঠান আর আমি এলাম থাকতে। গঙ্গা সাঁতরে তখন এপার ওপার হতাম। নতুনবউঠান দেখে আতঙ্কে শিউরে উঠতেন। কত বেড়িয়েছি নতুনবউঠান আর আমি বন জঙ্গলে, কত কুল পেড়ে খেয়েছি। বিদ্যাপতির অনেকগুলি গানে সুর দিই আমি সে সময়ে। 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর'—এ গানে এখানেই সুর দিই। সুর দিয়েই নতুনবউঠানকে শোনাতুম।'[২৮] ছেলেবেলা-তেও রবীন্দ্রনাথ গঙ্গার ধারের দোতলা বাড়ি ও বিদ্যাপতির গানে সুর দেওয়ার কথা লিখেছেন [দ্র ২৬।৬২৩-২৪]। সম্ভবত এই বাড়িটিকেই তিনি 'বাড়ুজ্যেদের বাগান' বলে উল্লেখ করেছেন। তেলেনিপাড়ার 'বাঁড়ুজ্জে জমিদার' [সত্যবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়]-এর কাছ থেকে পাথরের টেবিল ধার করে আনার কথা তিনি প্রতিমা দেবীকে উপরোক্ত পত্রেও লিখেছেন। ক্যাশবহি থেকে জানা যায়, মাঘ-চৈত্র ১২৯১ এই তিন মাস মহর্ষি চন্দননগরে হাটখোলায় সত্যপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথও বহুবার সেই বাড়িতে যাতায়াত করেন। দুটি বাড়ি সম্ভবত আলাদা, কিন্তু উক্ত জমিদার-পরিবারই হয়তো তাদের মালিক ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ এই 'ফরাশডাঙার বাগান' ও রবীন্দ্রনাথের 'ভরা বাদর' গান গাওয়ার কথা বলেছেন [দ্র ঘরোয়া। ১৩২-৩৩], যদিও নিজেদের বয়স ও অন্যান্য কয়েকটি বিবরণে স্মৃতিবিভ্রমের পরিচয় আছে।

তেলেনিপাড়ার এই বাগানবাড়িতে তাঁরা কতদিন ছিলেন বলা সম্ভব নয়। এখানে থাকার সময়ে বিদ্যাপতির গানে সুর দেওয়ার স্মৃতি রবীন্দ্রনাথ প্রায় সারাজীবন মনে রেখেছেন। ছেলেবেলা-য় লিখেছেন : 'নতুন বর্ষা নেমেছে। মেঘের ছায়া ভেসে চলেছে স্রোতের উপর ঢেউ খেলিয়ে, মেঘের ছায়া কালো হয়ে ঘনিয়ে রয়েছে ও পারে বনের মাথায়। অনেকবার এইরকম দিনে নিজে গান তৈরি করেছি, সেদিন তা হল না। বিদ্যাপতির পদটি জেগে উঠল আমার মনে, 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর।' নিজের সুর দিয়ে ঢালাই করে রাগিণীর ছাপ মেরে তাকে নিজের করে নিলুম। গঙ্গার ধারে সেই সুর দিয়ে মিনে-করা এই বাদল-দিন আজও রয়ে গেছে আমার বর্ষাগানের সিন্ধুকটাতে।'[২৯] স্বরবিতান ১১ ['কেতকী']-তে গানটির দিনেন্দ্রনাথ-কৃত তেওরা তালে নিবদ্ধ স্বরলিপিটি রক্ষিত হয়েছে।[*] গানটির সম্বন্ধে আর-একটি কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য হল

এই যে, বৎসরখানেক পরে কালমৃগয়া গীতিনাট্য রচনা কালে রবীন্দ্রনাথ এই সুরে কথা বসিয়ে বনদেবীদের গান 'কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে' [মিশ্র মল্লার-তেওরা] রচনা করেন, এবং শুধু সুরের সাদৃশ্য নয়, 'সঘনে খর শর সন্ধিয়া' [হন্তিয়া>'সন্ধিয়া'] ও 'তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী' ছত্র দুটি বিদ্যাপতির পদ থেকেই তুলে আনা হয়েছে।

ঠাকুরপরিবারকে এই সময়ে একটি তীব্র শোকের আঘাত সহ্য করতে হয়। প্রিয় কনিষ্ঠ পুত্র 'র‍্যাট' [কুমারেন্দ্র]-এর মৃত্যুর পর গুণেন্দ্রনাথ সপরিবারে জোড়াসাঁকোর বাড়ি ত্যাগ করে পলতায় [?] নতুন কেনা বাগানবাড়িতে কয়েক মাস ধরে অবস্থান করছিলেন। কত যত্ন ও অর্থব্যয় করে সেই বাগান তিনি সাজিয়ে তুলেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন জোড়াসাঁকোর ধারে [পৃ ৫৯-৬৩] গ্রন্থে। জ্যেষ্ঠা কন্যা বিনয়িনী দেবীর বিবাহের আয়োজন উপলক্ষে গুণেন্দ্রনাথ এই বাগানে বিরাট পার্টির আয়োজন করেন। অবনীন্দ্রনাথের বর্ণনা থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথও এই পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন :'ও দিকে বৈঠকখানায় শুরু হয়েছে পার্টি, নাচ গান। রবিকা, জ্যাঠামশায় [দ্বিজেন্দ্রনাথ] ওঁরাও ছিলেন; রবিকার গান হয়েছিল।'[*১] এর কয়েক দিন পরেই ২২ জ্যৈষ্ঠ [শুক্র 3 Jun] মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে গুণেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়।[*২] এই শোচনীয় মৃত্যুর কথা রবীন্দ্রনাথ কোথাও উল্লেখ না করলেও গুণেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর সানুরাগ বর্ণনা পাওয়া যায় জীবনস্মৃতি-তে [দ্র ১৭।৩৩৫]।

ভারতী-র জ্যৈষ্ঠ [৫।২]-সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন ধরনের কয়েকটি রচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় : ৫৮-৬২ 'জুতা ব্যবস্থা/(১৮৯০ খৃষ্টাব্দে লিখিত।)'

প্রবন্ধটির শেষে ৬২ পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় পাদটীকায় লিখিত হয় : "This evening's Englishman has discovered the secret of correctly treating the people of Bengal. It says 'Kick them first and then speak to them'—Indian Mirror. **যে** সমগ্র জাতিকে কোন বিজাতীয় কাগজ হাটের মধ্যে এরূপ জুতা মারিতে সাহস করে, সে জাতি উপরি-প্রকাশিত প্রবন্ধ পড়িয়া বিস্মিত হইবে না। বোধ হয়, লেখক রহস্যচ্ছলে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, কিন্তু উহা সত্যের এত কাছ ঘেঁসিয়া গিয়াছে যে বাঙ্গালী জাতির পক্ষে উহা রহস্যাত্মক হইবে না। আজ অন্য কোন দেশে যদি কোন কাগজ ঐরূপ অপমানের আভাস মাত্র দিত, তাহা হইলে দেশ-বাসীরা তৎক্ষণাৎ নানা উপায়ে তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করিত। কিন্তু এত দিন হইতে আমরা জুতা হজম করিয়া আসিতেছি যে, আজ উহা আমাদের নিকট গুরু পাক বলিয়া ঠেকিতেছে না—সং।" মন্তব্যটি *Englishman* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 30 Apr [শনি ১৯ বৈশাখ] তারিখে। *Hindoo Patriot* [Vol. XXVIII, No. 18, 2 May, p. 207] ওই তারিখটি দিয়ে লেখে : 'This evening's Englishman has discovered the secret of correctly treating the people of Bengal. It says "KICK THEM FIRST AND THEN SPEAK TO THEM." *Age lat, pechoo bat.* It is so throughly gentlemanly to kick a whole nation before speaking to them that none can question its propriety. We congratulate the leading Anglo-Indian paper in Calcutta on having publicly laid down this sound principle of good conduct. Alas! that the churls of the nation should wince under the treatment!' উক্ত মন্তব্যটিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দেশীয় পত্রিকায় যে আলোড়ন চলছিল, রবীন্দ্রনাথ মুসৌরী থেকে সম্ভবত সেই

উত্তেজনার মধ্যেই ফিরে আসেন ও তারই প্রতিক্রিয়ায় প্রবন্ধটি রচিত হয়। কুড়ি বছরের তরুণ রবীন্দ্রনাথের লেখনী তখনই কী পরিমাণ তীব্র ব্যঙ্গ-বর্ষণে সক্ষম হয়ে উঠেছিল, রচনাটি তারই একটি নিদর্শন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'ভুলক্রমে রচনার কাল ১৮৯০ মুদ্রিত হইয়াছিল, উহা ১৮৮০ হইবে'[৩০] —একথা সঠিক মনে করার কোনো কারণ নেই, '১৮৯০ খৃষ্টাব্দে লিখিত' এই উল্লেখটিও রচনার ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিরই অন্তর্গত। ইংলিশম্যানের মন্তব্যকে সরকারী নীতি ধরে নিয়ে তিনি প্রবন্ধের শুরুতেই লিখেছেন : 'গবর্ণমেণ্ট একটি নিয়মজারী করিয়াছেন যে, "যে হেতুক বাঙ্গালীদের শরীর অত্যন্ত বে-যুৎ হইয়া গিয়াছে, গবর্ণমেণ্টের অধীনে যে যে বাঙ্গালী কর্ম্মচারী আছে, তাহাদের প্রত্যহ কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে জুতাইয়া লওয়া হইবে"!' [পৃ ৫৮] এরপর বাঙালী জাতির দাস-মনোভাবকে ব্যঙ্গ করে দশ বছর পরের একটি কল্পচিত্র রচনা করেছেন : 'আজ কাল ট্রেনে হউক্, সভায় হউক্, লোকের সহিত দেখা হইলেই জিজ্ঞাসা করে "মহাশয়ের নাম? মহাশয়ের নিবাস? মহাশয়ের কয় ঘা করিয়া জুতা বরাদ্দ?" আজকালকার বি-এ এম-এরা না কি বিশ ঘা পঁচিশ ঘা জুতা খাইবার জন্য হিমসিম খাইয়া যাইতেছে।' [পৃ ৬০] যে-যুগে জুতার বরাদ্দ অনুসারে সামাজিক কৌলীন্য নির্ধারিত হয়, সেই আমলের শ্রেষ্ঠ আশীর্বচন : "পুত্র পৌত্রানুক্রমে গবর্ণমেণ্টের জুতা ভোগ করিতে থাক আমার মাথায় যত চুল আছে, তত জুতার তোমার ব্যবস্থা হউক।" [পৃ ৬২] এর আগে য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গক্রমে কিছু রাজনৈতিক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন, আমরা যথাস্থানে সে-বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, কিন্তু 'জুতা-ব্যবস্থা'কেই তাঁর প্রথম রাজনৈতিক প্রবন্ধ রূপে গণ্য করা যেতে পারে।

৬২-৬৯ 'সঙ্গীত ও ভাব/ (বেথুন সোসাইটিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতা)'

দ্র সংগীত ১৪ [শতবার্ষিক সং]। ৮৭৫-৮০

প্রবন্ধটি সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

[বর্তমান সংখ্যার 'জাপানের বর্ত্তমান উন্নতির মূল পত্তন' (পৃ ৭০-৭৭) ও আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত 'জাপানের বর্ত্তমান উন্নতি' (পৃ ১২২-২৩) প্রবন্ধ দুটিকে ড সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্ররচনা ধরে নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন[৩১], প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রথম প্রবন্ধটির উল্লেখ না করলেও দ্বিতীয়টিকে রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা ১ম খণ্ডে (পৃ ২৫৯) তাঁর সংকলিত তালিকায় স্থান দিয়েছেন। কিন্তু দুটি প্রবন্ধই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা, দ্র প্রবন্ধ-মঞ্জরী (১৩১২)। ১৬৯-৭৯, ১৮০-৯৬। অবশ্য দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে একটি ৪০ ছত্রের দীর্ঘ অনুবাদ-কবিতা ব্যবহৃত হয়েছে—'বাতাসে অশথ পাতা পড়িছে খসিয়া'—সেটি রবীন্দ্রনাথ-কৃত; 'কড়ি ও কোমল' প্রথম সংস্করণে (১২৯৩) 'বিদেশী ফুলের গুচ্ছ' অংশে 'কোন জাপানী কবিতার ইংরাজী অনুবাদ হইতে' উল্লেখ-সহ সংকলিত হয়। শতবার্ষিক সংস্করণের চতুর্থ খণ্ডে থাকলেও বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলী-তে কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত হয় নি, দ্র প. ব. (১৩৮৭)। ২১৪-১৫। আমরা আগে সত্যেন্দ্রনাথের 'তুকারাম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ-কৃত 'অভঙ্গ'-এর অনুবাদ ব্যবহৃত হতে দেখেছি, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রবন্ধে জাপানী কবিতার অনুবাদটি ব্যবহার করা অনুরূপ একটি উদাহরণ। প্রবন্ধটি রচনা ও উক্ত কাব্যানুবাদ সম্ভবত চন্দননগরে অবস্থানের সময় করা হয়েছিল।]

৭৭-৭৮ 'তারকার আত্মহত্যা' ['জ্যোতির্ম্ময় তীর হতে'] দ্র সন্ধ্যাসংগীত ১।৬-৭

রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন : ‘এই তারকা কে?...তারকা হইতেছেন কাদম্বরী দেবী। এই কাদম্বরী দেবী তাঁহার শেষ জীবনাহুতি-দানের পূর্বে আর একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তারকার আত্মহত্যা কবিতার উৎস সেইখানে অনুসন্ধনীয়।...তারকার আত্মহত্যা কবিতাটি লিখিত হয়, আমাদের মতে ঘটনার অব্যবহিত পরেই—বোধ হয় সেপ্টেম্বর মাসে; এবং ভগ্নহৃদয়ের উৎসর্গগীতি সমন্বিত প্রথম সর্গ অক্টোবর মাসের ভারতীতে প্রকাশিত হইবার পূর্বে। তারকার আত্মহত্যা কবিতাটির মধ্যে লেখকের অসংবৃত উচ্ছ্বাস প্রকাশ পাইয়াছিল; সেইজন্য বহুমাস পরে ভারতীতে সামান্য রূপক কবিতা-রূপে প্রকাশিত হয়, (জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮) তখন তিনি বিলাত-যাত্রার পথে মাদ্রাজ হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন।’[৩২] কিন্তু রবীন্দ্রনাথ চন্দননগরে অবস্থানের দিনগুলির বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন : ‘দায়িত্বহীন কর্মহীন দিনগুলি। তখনও বিবাহ হয় নাই। গান আরম্ভ—কবিতা এখানেই লেখা। সেইরূপ বিনা-কষ্টের কষ্ট—অনির্দিষ্ট বেদনা, তারকার আত্মহত্যা।’[৩৩] এই হিসেবে জীবনী-কারের ব্যাখ্যা অত্যন্ত অসংগত বলে মনে হয়। যদি কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যার প্রচেষ্টা ও তার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দায়িত্বের কথা সত্যও হয়, তাহলেও তাঁর কাব্য ও সংগীত-চর্চার প্রধান সঙ্গী জ্যোতিদাদার নাম ব্যবহার করে অভিযোগের সুরে এই ধরনের কবিতা লেখা ও ভারতী-তে তার প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের পক্ষে একেবারেই সম্ভব ছিল না। এই প্রসঙ্গে কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পরে লেখা ‘পুষ্পাঞ্জলি’ নামক গদ্যরচনাটির কথা আমরা স্মরণ করতে পারি—যেখানে বেদনা আছে, অভিযোগও আছে, কিন্তু সে অভিযোগ কোনো ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে নয়—অভিযোগ প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে, যে-নিয়মে ‘যতদিন কাজ করিবে প্রকৃতি তোমাকে মাথায় করিয়া রাখিবে।....কিন্তু যেই তোমা দ্বারা আর কোনো কাজ পাওয়া যায় না, যেই তুমি মৃত হইলে, অমনি সে তাড়াতাড়ি তোমাকে সরাইয়া ফেলে—....তোমাকে এই জগৎ-দৃশ্যের নেপথ্যে দূর করিয়া দেয়।’[৩৪] তাই আমাদের মনে হয়, একটি অনির্দিষ্ট শোনা-কথার উপর ভিত্তি করে এতখানি কষ্টকল্পনা নিরর্থক, কবিতাটিতে কোনো অতিরিক্ত ব্যক্তিগত তাৎপর্য আরোপ না করে সন্ধ্যাসংগীত-এর অন্যান্য কবিতার মতো এটিকেও একটি অনির্দিষ্ট মানসিক বেদনার পটভূমিতে দেখাই ভালো।

৭৮-৮৫ ‘যথার্থ দোসর’

ভারতী-র প্রথম বর্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথ [এবং অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী] একধরনের আত্মভাবনামূলক প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত করেছিলেন, বর্তমান প্রবন্ধটির মধ্যে সেই শ্রেণীর লক্ষণ কিছুটা থাকলেও প্রধানত ইংরেজি রোম্যান্টিক কাব্যের একটি বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করে রচনাটি অগ্রসর হয়েছে। ‘বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা’ প্রবন্ধের মতোই এখানেও রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত তাঁর তৎকালীন মানসিকতা ও কবিতার সমর্থন খোঁজবার চেষ্টা করেছেন। শেলীর একটি কবিতার অনুবাদ দিয়ে প্রবন্ধটি শুরু করে তিনি লিখেছেন : ‘আধুনিক ইংরাজি কবিতার মধ্যে আশ্রয়-প্রয়াসী হৃদয়ের বিলাপ-সঙ্গীত প্রায় শুনা যায়। আধুনিক ইংরাজ কবিরা অসন্তোষ ও অতৃপ্তির রাগিণীতেই অধিকাংশ গান গাহিয়া থাকেন।...এখনকার কবিরা দেখিতেছেন, প্রেমে তৃপ্তি নাই, সে অতৃপ্তি নিরাশার অতৃপ্তি নহে, অভাবের অতৃপ্তি। তাঁহারা কাহাকে ভাল বাসিবেন খুঁজিয়া পান না, অথচ হৃদয়ে ভালবাসার অভাব নাই।...ভাল বাসিবার জন্য তাঁহাদিগকে কাল্পনিক প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।’ [পৃ ৭৯] তাঁর মতে পূর্বকার কবিদের প্রেম ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক—‘তাঁহাদের প্রেমের ধর্ম্মে পৌত্তলিকতার উন্মত্ততা ছিল।’

[পৃ ৭৯] কিন্তু এখনকার কবিরা অনুভব করেন 'হৃদয় প্রেমের অতিথিশালা নহে, হৃদয় প্রেমের জন্মভূমি; প্রেম একটি পাত্র অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে।' [পৃ ৮০] সেই প্রেমপাত্রই 'যথার্থ দোসর', ঘটনাচক্রে তারা পরস্পর-বিচ্ছিন্ন—কিন্তু তাদের মধ্যে 'অনন্ত দাম্পত্য'। এই বক্তব্য সুপরিস্ফুট করার জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটির মধ্যে Edwin Arnold ও Christina Rossetti-র দুটি কবিতার বঙ্গানুবাদ ও Arthur O'shaughnessy-র একটি ইংরেজি কবিতা উদ্ধৃত করে দিয়েছেন। যে নতুন ধরনের কবিতা তিনি লিখছিলেন, সাধারণী-র সমালোচক শেলী প্রভৃতি কবির ক্ষেত্রে তা প্রশংসনীয় মনে করলেও তাকে আদর করতে প্রস্তুত ছিলেন না—হয়তো সেই কারণেই আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কিংবা নিজেরই অস্পষ্ট ভাবনাকে একটি সংহত রূপ দেবার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি রচনা করেছিলেন। ৯৩-১০০ 'চীনে মরণের ব্যবসায়'

ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি রবীন্দ্রনাথের মতো না হলেও এটি যে রবীন্দ্র-রচনা তার অন্যতম প্রমাণ *The Modern Review* পত্রিকায় [Vol. XXXVII, No. 5, May 1925, pp. 504-07] 'The Death Traffic' শিরোনামায় প্রবন্ধটির একটি ইংরেজি অনুবাদ। চীন দেশে আফিম রপ্তানী করে ইংরেজরা নিজেদের বাণিজ্যিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে গিয়ে সেখানকার অধিবাসীদের নৈতিক সর্বনাশ ডেকে আনছে, এইটিই প্রবন্ধের মূল বক্তব্য। পাদটীকায় উল্লিখিত হয়েছে : 'The Indo-British Opium Trade by Theodore Christlieb DD. PH. D.Translated from German by David B. Croom, M.A. প্রবন্ধ অবলম্বনে রচিত।' বিষয়টি পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ-লিখিত অনেক রাজনৈতিক প্রবন্ধে গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে।

[প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : 'ভারতী, ১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে ভারতের জাতীয়তা সম্পর্কে তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়; যথা ১. জাতীয়তা ও বিজাতীয়তার উপদ্রব, ২. জাতীয়তার নিবেদন ও ৩. জাতীয়তার নিবেদনে বিজাতীয়তার বক্তব্য; এগুলি রবীন্দ্রনাথের রচনা কি না বলা যায় না।'[৩৫] এর মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়টি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-মঞ্জরী গ্রন্থে (পৃ ২৫৮-৬৮, ২৬৯-৮২) সংকলিত হয়েছে, দ্বিতীয়টি সম্ভবত অক্ষয় চৌধুরীর লেখা।]

ভারতী, আষাঢ় ১২৮৮ *[৫।৩]:*

১১২-১৫ 'গোলাম চোর'

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত 'যথার্থ দোসর' প্রবন্ধে রোম্যান্টিক কাব্যসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গক্রমে বিবাহ-ব্যবস্থার কতকগুলি ত্রুটির কথা লিখেছিলেন। বর্তমান প্রবন্ধটি উক্ত বিষয় অবলম্বনে লিখিত একটি লঘু ধরনের রচনা। আগের প্রবন্ধটিতে তিনি লিখেছিলেন : 'সামাজিক বিবাহ, অনন্তকালস্থায়ী বিবাহ নহে। সচরাচর বিবাহে হয় একতর পক্ষে নয় উভয় পক্ষে প্রেমের অভাব দেখা যায়, এমন কি হয়ত স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আমরণস্থায়ী ঘৃণার সম্পর্ক'[৩৬]—এখানে লিখলেন : 'আমাদের দেশের বিবাহ-প্রণালীর মত গোলাম-চোর খেলা আর নাই। প্রজাপতি তাস বিলি করিয়া দিয়াছেন। আন্দাজ করিয়া টানিতে হয়, আগে থাকিতে জানিবার উপায় নাই।' [পৃ ১১৪] পরে রহস্যচ্ছলে লিখেছেন : 'এইখানে সাধারণকে বিদিত করিতেছি, আমি একটি অবিবাহিত তাস আছি, আমার মিল কাহার হাতে আছে জানিতে চাই। আমার বন্ধু বান্ধবেরা আমাকে বলেন, গোলাম। বলেন, আমার মিল ত্রিজগতে নাই। যে কন্যাকর্তা টানিবেন তিনি গোলামচোর হইবেন। কিন্তু, বোধ করি, তাঁহারা রহস্য করিয়া থাকেন, কথাটা সত্য নহে।' [পৃ ১১৪]

১১৫-২২ 'সঙ্গীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা। (হর্ব্বার্ট্ স্পেন্‌সরের মত।)'

আমরা জানি, বেথুন সোসাইটির সভায় রবীন্দ্রনাথ 'সঙ্গীত ও ভাব' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করে সংগীত সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন ও বাল্মীকি প্রতিভা-য় সুরের যে নতুন পরীক্ষা করা হয় তার সমর্থনে যুক্তি প্রয়োগ করেন—বর্তমান প্রবন্ধটি তারই অনুবৃত্তি। এখানে একটি বদ্ধমূল ধারণার সংশোধন করে নেওয়া দরকার। অনেকেরই ধারণা—এবং রবীন্দ্রনাথই সেই ধারণা সৃষ্টিতে সহায়তা করেছেন—হার্বার্ট স্পেন্‌সরের রচনা পড়েই বাল্মীকি প্রতিভা-য় 'আগাগোড়া সুর করিয়া নানা ভাবকে গানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া অভিনয়' করার চিন্তা তাঁর মনে আসে। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধটির শুরুতেই তিনি লিখেছেন : '"সঙ্গীত ও ভাব" নামক প্রবন্ধ রচনার পর হর্বার্ট্ স্পেন্সরের রচনাবলি পাঠ করিতে করিতে দেখিলাম, "The Origin and Function f Music"[৩৭] নামক প্রবন্ধে যে সকল মত অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা আমার মতের সমর্থন করে, এবং অনেক স্থলে উভয়ের কথা এক হইয়া গিয়াছে।' এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, বাল্মীকি প্রতিভা রচনা ও অভিনয় এবং তারই সমর্থনে 'সঙ্গীত ও ভাব' প্রবন্ধ রচনা করার পর রবীন্দ্রনাথ স্পেন্‌সরের সঙ্গীত-বিষয়ক মতামতের সঙ্গে পরিচিত হন, সুতরাং বাল্মীকি প্রতিভা ও সংগীত সম্বন্ধে তাঁর প্রাথমিক ভাবনার উপর স্পেন্‌সরের প্রভাব না-থাকারই কথা।

বর্তমান প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রথমে সংগীতের শরীরগত কারণ ও তার উপযোগিতার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্পেন্‌সরের অনুসরণ করেছেন [এ-প্রসঙ্গে আমরা ১২৮৭ বঙ্গাব্দের ভারতী-র শ্রাবণ, ভাদ্র, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ সংখ্যায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত দ্বিজেন্দ্রনাথের লেখা 'স্বর রহস্য' নামক দীর্ঘ প্রবন্ধটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি]। প্রবন্ধটির শেষ দিকে ভারতীয় সংগীতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর আশা ব্যক্ত করে লিখেছেন : 'এমন একদিন আসিতেছে, যখন আমরা সঙ্গীতেই কথাবার্ত্তা কহিব। সভ্যতার যখন এতদূর উন্নতি হইবে যে, আমাদের হৃদয়ের অঙ্গহীন, রুগ্ন, মলিন বৃত্তি গুলিকে সশঙ্কিত ভাবে আর ঢাকিয়া বেড়াইতে হইবে না, তাহারা পরিপূর্ণ, সুস্থ ও সুমার্জ্জিত হইয়া উঠিবে, যখন সমবেদনার এতদূর বৃদ্ধি হইবে যে, পরস্পরের নিকট আমাদের হৃদয়ের অনুভাব সকল অসঙ্কোচে ও আনন্দে প্রকাশ করিব, তখন অনুভাব প্রকাশের চর্চ্চা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিবে, তখন সঙ্গীতই আমাদের অনুভাব প্রকাশের ভাষা হইয়া দাঁড়াইবে।' [পৃ ১২০]

সংগীত-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ভারতী মাঘ ১২৮৮-সংখ্যায় 'সঙ্গীত ও কবিতা' নামে। এই প্রবন্ধটি 'সমালোচনা' [১২৯৪] গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হলেও আগের প্রবন্ধ দুটি উক্ত গ্রন্থে সংকলিত হয় নি। দীর্ঘকাল পরে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ-প্রকাশিত সংগীতচিন্তা [বৈশাখ ১৩৭৩] গ্রন্থে এবং রবীন্দ্ররচনাবলী জন্মশতবার্ষিক সংস্করণের চতুর্দশ খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথও যে প্রবন্ধ দুটি পুনর্মুদ্রণের কথা চিন্তা করছিলেন, তার প্রমাণ রয়েছে রবীন্দ্রভবনের অভিলেখাগারে রক্ষিত ভারতী-র পঞ্চম বর্ষের একটি বাঁধানো খণ্ডে [অভিজ্ঞান-সংখ্যা : Ms 430 (i)]। এই খণ্ডটি যে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছিলেন, সেটি বোঝা যায় তাঁর স্বহস্ত-লিখিত সংশোধন ও সংযোজন থেকে। বর্তমান প্রবন্ধ দুটিতেও এইরূপ ব্যাপক বর্জন ও কিছু কিছু সংযোজনের চিহ্ন রয়েছে। মনে হয় তিনি দুটি প্রবন্ধের বক্তব্যকে একত্রিত করে একটি প্রবন্ধের আকার দিতে চেয়েছিলেন, যদিও নতুন কোনো শিরোনাম নির্দেশ করেন নি। এই সব সংশোধন ও সংযোজনের বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত প্রবন্ধটির পাঠ সংকলন করেছেন চিত্তরঞ্জন দেব 'রবীন্দ্রনাথের প্রথম

পাবলিক ভাষণ' [দ্র দেশ, ৪৭। ১৩, মাঘ ১৩৮৬। ১১-১৬] রচনায়। সম্ভবত সমালোচনা [চৈত্র ১২৯৪] গ্রন্থ সংকলন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য প্রবন্ধ দুটির সংস্কার-সাধন করেন, কিন্তু পরে কোনো কারণবশত গ্রন্থভুক্তির পরিকল্পনাটি পরিত্যক্ত হয়।

১৩৩-৩৫ 'সুখের বিলাপ' ['অবশ নয়ন নিমীলিয়া'] দ্র সন্ধ্যাসংগীত ১।১১-১৩

ভারতী-তে মুদ্রিত ৮৯ ছত্রের দীর্ঘ কবিতাটির অনেকগুলি ছত্র বিভিন্ন সংস্করণে বর্জিত হয়ে রবীন্দ্র-রচনাবলী-তে মাত্র ৫৫টি ছত্রে পরিণত হয়েছে [পরিবর্তনগুলি পাঠভেদ-সংবলিত সংস্করণে আনুপূর্বিক সংকলিত]। 'যথার্থ দোসর' প্রবন্ধ ও এই কবিতাটির মধ্যে ভাবের সাদৃশ্য দেখা যায়।

১৩৯-৪৫ 'নিমন্ত্রণ সভা'

অন্যত্র আমরা এই প্রবন্ধটিকে য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র-এর ষষ্ঠ পত্রটির পরিশিষ্ট বলে গণ্য করেছি। মনে রাখা দরকার, এই সময়ে গ্রন্থটি মুদ্রণের কাজ চলছে এবং কিছুদিন পরে 25 Jul [১১ শ্রাবণ] তারিখে প্রকাশিত হয়।

১৪৬-৪৮	'সম্পাদকের বৈঠক'	
১৪৬	'ওই যেতেছেন কবি কাননের পথ দিয়া'	[Victor Hugo]
১৪৬	'যে তোরে বাসে রে ভাল'	["]
১৪৬-৪৭	'কাল সন্ধ্যাকালে ধীরে সন্ধ্যার বাতাস'	["]
১৪৭	'মহীয়সী মহিমার আগ্নেয় কুসুম'	["]
১৪৭	'ওই আদরের নামে ডেকো সখা মোরে'	[Mrs Browning]
১৪৭	'নিদাঘের শেষ গোলাপ কুসুম'	[Moore]
১৪৭-৪৮	'দিনরাত্রি নাহি মানি'	["]
১৪৮	'দামিনীর আঁখি কিবা'	["]

এই অনুবাদ-কবিতাগুলির মধ্যে প্রথম চারটি প্রভাত সঙ্গীত-এ [বৈশাখ ১২৯০] সংকলিত হয়, পরের দুটি গৃহীত হয় কড়ি ও কোমল [১২৯৩] কাব্যের 'বিদেশী ফুলের গুচ্ছ' বিভাগে—শেষ দুটি কোনো গ্রন্থভুক্ত হয় নি। বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী-তে 'একটি স্বতন্ত্র অনুবাদ-বিভাগে' সংকলনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দুটি গ্রন্থে মুদ্রিত অনুবাদ-কবিতাগুলি বর্জিত হয়, কিন্তু অদ্যাবধি সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয় নি। অবশ্য শতবার্ষিক সংস্করণের চতুর্থ খণ্ডে এবং স্বতন্ত্র আকারে প্রচলিত গ্রন্থে কবিতাগুলি আছে; পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী-র নতুন সংস্করণে [১৩৮৮] কবিতাগুলি প্রভাতসংগীত এবং কড়ি ও কোমল-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েই প্রকাশিত হয়েছে। প্রভাতসংগীত-এ গৃহীত কবিতা চারটির শিরোনাম : 'কবি', 'বিসর্জন', 'তারা ও আঁখি' এবং 'সূর্য্য ও ফুল'। কড়ি ও কোমল-এ স্বতন্ত্র কোনো নাম না থাকলেও কাব্যগ্রন্থাবলী-তে [১৩০৩] ষষ্ঠ কবিতাটির নাম 'শেষ ফুল', পঞ্চম কবিতাটি সম্ভবত ভ্রমবশত উক্ত গ্রন্থে সংকলিত হয় নি। শেষ দুটি কবিতা কোনো গ্রন্থে সংকলিত না হওয়ায় প্রশ্ন জাগতে পারে সেগুলি রবীন্দ্রনাথ-কৃত কি না। কিন্তু এ প্রশ্নের আংশিক উত্তর আছে মালতীপুঁথি-তে, সেখানে 55/২৯ক পৃষ্ঠায় [রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা ১।৮১-৮৩] 'দামিনীর আঁখি কিবা'

অনুবাদ-কবিতাটির সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া যায়; এর থেকে অনুমান করা চলে 'দিনরাত্রি নাহি মানি' অনুবাদটিও রবীন্দ্রনাথই করেছিলেন।

য়্যুগোর কাব্যানুবাদগুলি সম্পর্কে একটু আলোচনা করা দরকার। য়্যুগোর *Les Contemplations* নামক মূল ফরাসী কাব্যগ্রন্থের দুটি খণ্ড* রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে [অভিজ্ঞান-সংখ্যা : 394 (i) ও 394 (ii)]; দুটি খণ্ডেরই প্রথম পাতায় 'PRAMATHA CHOUDHURI-KAMALALAYA BALLYGUNGE' রবার স্ট্যাম্প দেওয়া। কিন্তু বই দুটি যে এক সময়ে ঠাকুরপরিবারেই গ্রন্থসংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তার প্রমাণ উপরোক্ত চারটি অনুবাদেরই পাণ্ডুলিপি এই গ্রন্থদ্বয়ে পাওয়া যায় মূল কবিতার পৃষ্ঠায় বা সম্মুখবর্তী পৃষ্ঠার সাদা অংশে; তাছাড়া আরও কয়েকটি অনুবাদও রয়েছে যেগুলি পরবর্তীকালে মুদ্রিত হয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে একটি অনুবাদের খসড়াও [যেটি রবীন্দ্রনাথ পরে 'জীবনমরণ' নামে আবার অনুবাদ করেন] প্রথম খণ্ডের একটি পৃষ্ঠায় দেখা যায়। ড ভূদেব চৌধুরী 'রবীন্দ্রনাথের ফরাসী-চর্চা' প্রবন্ধে [দ্র দেশ, ৫ আষাঢ় ১৩৭৭। ৮৫১-৬০] এই তথ্যগুলির উল্লেখ করে এগুলিকে রবীন্দ্রনাথেরই স্বাধীন অনুবাদ-চর্চার নিদর্শন এবং তৎসূত্রে ফরাসী ভাষায় তাঁর যথেষ্ট অনুপ্রবেশ ঘটেছিল বলে মনে করেছেন। এর স্বপক্ষে তিনি প্রিয়নাথ সেন-লিখিত 'গীদে মোপাসাঁ' প্রবন্ধ থেকে দীর্ঘ অংশ উদ্ধৃত করে দিয়েছেন, যেখানে প্রিয়নাথ পাদটীকায় 'প্রভাত সঙ্গীতে "তারা ও আঁখি" এবং "সূর্য্য ও ফুল" দেখ।' নির্দেশ দিয়ে লিখেছেন : '....বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবি আশ্চর্য্য প্রতিভাবলে, অসাধারণ নৈপুণ্যের সহিত ফ্রান্সের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবির কয়েকটি কবিতার চমৎকার অনুবাদ করিয়াছেন। তাহাতে ছন্দের সুষমা, ভাবের মাধুর্য্য এবং পদের মহত্ত্ব, সকলই রক্ষিত হইয়াছে। কোন্‌টি অনুবাদ, কোন্‌টি মূল, তুমি বলিতে পারিবে না। যেন দুইখানি সমুজ্জ্বল মুকুরে একই সুন্দর মূর্ত্তি প্রতিফলিত হইয়াছে।'[৩৮] এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের ফরাসী-চর্চা প্রসঙ্গে ড চৌধুরী বহু তথ্য উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ফরাসীভাষাবিদ্ রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক সৌরীন্দ্র মিত্র ফরাসী ভাষার জগতে রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রবেশের গভীরতা ও অনুবাদগুলি তিনি স্বাধীনভাবে করেছিলেন কি না এ-বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে অনুমান করেছেন, এগুলি "অপর কারো সহায়তায় অনুবাদকের জানা কোনো একটি আক্ষরিক অনুবাদের 'crib'-অবলম্বনে"ও রচিত হয়ে থাকতে পারে। এছাড়া ড চৌধুরীর বক্তব্যের বিরুদ্ধে অন্যান্য যুক্তিও তিনি প্রদর্শন করেছিলেন [দ্র 'আলোচনা', দেশ, ২ শ্রাবণ ১৩৭৭। ১৩২৭-৩১]। দেশ পত্রিকার পৃষ্ঠায় এ নিয়ে কয়েক সপ্তাহ ধরে উভয়ের মধ্যে দীর্ঘ বিতর্ক চলেছিল। আমাদের পক্ষে বিতর্কটি আজও খুব কৌতূহলপ্রদ হলেও তার খুঁটিনাটির মধ্যে প্রবেশ করা অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়। বস্তুত ঠাকুরপরিবারে ফরাসী ভাষা-চর্চার একটি দীর্ঘ ঐতিহ্য পূর্বেই গড়ে উঠেছিল—সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন, এমন-কি ফ্রান্সের Nice শহরে বাস করার সময়ে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীও Ollendorf-এর বইয়ের সহায়তায় কথাবার্তা চালানোর মতো ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেছিলেন, এ-কথা তাঁর আত্মকথা-য় উল্লেখ করেছেন [দ্র পুরাতনী। ৪১]। তাছাড়া আমাদের আলোচ্য সময়ে প্রিয়নাথ সেনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, যিনি ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের একজন অনুরাগী বোদ্ধা ছিলেন। সুতরাং এই পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও ফরাসী ভাষা-চর্চায় আগ্রহী হয়ে ওঠা অসম্ভব ছিল না এবং হয়তো কিছুটা পারদর্শিতাও তিনি অর্জন করেছিলেন। তাছাড়া 'সম্পাদকের বৈঠক'-এ মুদ্রিত চারটি অনুবাদ সম্ভবত চন্দননগর-বাসের প্রথম পর্বে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাসে বা আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহেই নিষ্পন্ন হয়েছিল, যখন ফরাসী-

ভাষাভিজ্ঞ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর প্রতি মুহূর্তের সঙ্গী। আমাদের মনে হয়, ফরাসী ভাষা-শিক্ষার অনুষঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ য়্যুগোর কবিতাগুলি অনুবাদ করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। বস্তুত তাঁর এ-ধরনের প্রবণতার সঙ্গে আমরা পূর্বেই পরিচিত হয়েছি। বিলাতযাত্রার পূর্বে যখন তিনি আমেদাবাদে বাস করছিলেন, তখন তাঁর ইংরেজি ভাষাজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অভিধানের সাহায্যে 'টেন্ প্রভৃতি গ্রন্থকার-রচিত ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসসংক্রান্ত' গ্রন্থগুলি তাদের দুরূহতা সত্ত্বেও পাঠ করেছেন এবং সেগুলি অবলম্বনে বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখেছেন, যার মধ্যে অ্যাংলো-স্যাক্সন কবিতার কাব্যানুবাদও ছিল। তাছাড়া ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে দান্তে ও পেত্রার্কার কবিতা পাঠ ও অনুবাদ তিনি এই সময়েই করেছিলেন, তার প্রমাণ সমসাময়িক ভারতী-র পৃষ্ঠাতেই আছে। মূল গ্রন্থের পৃষ্ঠাতেই অনুবাদ করার অভ্যাসের নিদর্শন রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক ব্যবহৃত দান্তের কাব্যগ্রন্থ ও হেবর্লিনের কাব্যসংগ্রহ গ্রন্থের পৃষ্ঠাতে রয়েছে, অথচ এই সময়ে ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষার উপর তাঁর অধিকার প্রশ্নাতীত ছিল না। অন্য ভাষার জগতে প্রবেশের এইটিই ছিল তাঁর নিজস্ব পদ্ধতি, যা পরবর্তী কালে তাঁর শিক্ষাদর্শের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছিল। সুতরাং ফরাসী ভাষার প্রাথমিক জ্ঞান সম্বল করে য়্যুগোর কবিতা স্বাধীনভাবে অনুবাদ করার চেষ্টা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না, আর প্রয়োজনবোধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হওয়ার সুযোগ তো ছিল-ই। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদের উপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হস্তক্ষেপের দৃষ্টান্তও উক্ত গ্রন্থের 174-75 পৃষ্ঠায় দেখা যায়, যেখানে য়্যুগোর '*Aimons tonjours! aimons encore!'* কবিতাটি 'ভালবাসো চিরকাল ভালোবাসো x অনিবার x' প্রভৃতি রূপে অনুবাদ করতে শুরু করে প্রচুর কাটাকুটি-সহ ২৮।২৯ ছত্র লিখে শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়েছে। আবার য়্যুগোর QUIA PULVISES/*Ceux-ci partent, ceux-là demeurent* [pp. 227-28] কবিতাটির রবীন্দ্রনাথ-কৃত দুটি অসম্পূর্ণ প্রচেষ্টা [p. 226] ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কৃত একটি সম্পূর্ণ অনুবাদ [p. 227] দেখা যায়, যার সব কটিই বর্জিত হয়ে 'জীবন মরণ' ['ওরা যায়, এরা করে বাস'] নামে একটি স্বতন্ত্র অনুবাদ আলোচনা [কার্তিক ১২৯১।৯৫] পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।* এটি এবং আর-একটি য়্যুগো-কবিতার অনুবাদ ['বেঁচেছিল হেসে হেসে', ভারতী শ্রাবণ ১২৯১। ১৬৯-৭০; কড়ি ও কোমল-এ সংকলিত] সম্ভবত পরবর্তী কালে করা হয়েছিল।

সুতরাং অন্তত বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথ প্রধানত স্বাধীনভাবে ও কিছুটা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহায়তায় য়্যুগোর চারটি কবিতার পদ্যানুবাদ করেছিলেন, যাদের মধ্যে অন্তত দুটি ফরাসী কাব্য-রসিক প্রিয়নাথ সেনের প্রশংসা লাভ করেছিল।

এখানে আমরা রবীন্দ্রনাথ-কৃত য়্যুগো-কবিতার অনুবাদগুলির একটু বিস্তৃত পরিচয় উদ্ধার করে দিচ্ছি।

প্রথম খণ্ড:

Pp. 13-14 'Le poete s'en vadansles champs; it admire,/Les Roches, juin 1831

গ্রন্থের 12 পৃষ্ঠার সাদা অংশে রবীন্দ্রনাথ কবিতাটির সম্পূর্ণ অনুবাদ করেছেন; প্রথম ছত্র : 'ওই যেতেছেন কবি কাননের পথ দিয়া'। প্রভাত সঙ্গীত-এ কবিতাটির নামকরণ করা হয় : 'কবি'। এডুকেশন গেজেট-এ [২ আষাঢ় ১২৯০] ভূদেব মুখোপাধ্যায় কাব্যটি সম্পর্কে 'অনুকূল মন্তব্য' করে সম্পূর্ণ কবিতাটি উদ্ধার করেছিলেন। এই কবিতাটি সম্পর্কে একটি প্রশ্ন মনে জাগে যে, এটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পূর্বেই পরিচিত হয়েছিলেন কি না। মালতীপুঁথি-র 57/৩০ক পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ যেখানে 'বাড়িতে/১লা কার্ত্তিক [১২৮৪]

মঙ্গলবার' কবি-কাহিনী রচনা শুরু করেছেন, তার সূচনাতেই লিখেছিলেন 'Les Poetes হইতে/অনুবাদিত'— কবি-কাহিনী অবশ্যই অনুবাদ-কাব্য নয়, কিন্তু য়্যুগোর কবিতার কবি-র সঙ্গে উক্ত কাব্যের কবি-র একটি দূরান্বিত সাদৃশ্য আছে বলে মনে হয়। এই সাদৃশ্যটি আরও তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে, যখন স্মরণ করি যে মাত্র এক সপ্তাহ আগে রবীন্দ্রনাথ বোটে থাকার সময়ে 'শৈশবসঙ্গীত' কবিতাটি রচনা করেন—সম্ভবত সেই বোট-যাত্রায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবী তাঁর সহযাত্রী ছিলেন।

P. 103 'UNITÉ/*Par-dessus I'horizon aux collines brunies,*'/Granville, juillet 1836

গ্রন্থের 102 পৃষ্ঠার সাদা অংশে রবীন্দ্রনাথ কবিতাটির অনুবাদ করেন; প্রথম ছত্র : 'মহিয়সী মহিমার আগ্নেয় কুসুম'। পাণ্ডুলিপিতে কবিতাটির শিরোনাম 'সাম্য', কিন্তু প্রভাত সঙ্গীত-এ নতুন নাম দেওয়া হয় 'সূর্য্য ও ফুল'—প্রথম ছত্রটি ভারতী-তে পাণ্ডুলিপির অনুরূপ হলেও গ্রন্থে সামান্য পরিবর্তিত : 'পরিপূর্ণ মহিমার আগ্নেয় কুসুম'। মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ সপ্তম খণ্ডে কবিতাটি 'শিশু' বিভাগে সংকলিত হয়।

Pp. 133-34 'HIER AU SOIR/*Heir,le vent du soir, dont le souffle caresse.*'

গ্রন্থের 132 পৃষ্ঠার সাদা অংশে কবিতাটি অনূদিত হয় [বেশ কিছু কাটাকুটি আছে]; প্রথম ছত্র : 'কাল সন্ধ্যাকালে ধীরে সন্ধ্যার বাতাস'। প্রভাত সঙ্গীত-এ কবিতাটির নামকরণ করা হয় 'তারা ও আঁখি' [সূচীপত্রে 'আঁখি ও তারা']। ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর সমালোচনায় এই কবিতাটিরও কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করেন।

দ্বিতীয় খণ্ড:

P. 7'15 FÉVRIER 1843/*Aime celui qui ta'ime, et sois heureuse en hui.*'

গ্রন্থের 6 পৃষ্ঠার সাদা অংশে রবীন্দ্রনাথ পুরো কবিতাটির অনুবাদ করেছেন [দ্র পাণ্ডুলিপি-চিত্র, দেশ, ৫ আষাঢ় ১৩৭৭।৮৫২]; প্রথম ছত্র :'যে তোরে বাসেরে ভাল, তারে ভালবেসে বাছা'। প্রভাত সঙ্গীত-এ কবিতাটির নাম 'বিসর্জ্জন'। কাব্যগ্রন্থ সপ্তম খণ্ডে এটি 'শিশু' বিভাগে সংকলিত হয়েছে।

'সম্পাদকের বৈঠক'-এর শেষ তিনটি কবিতা অনুবাদ করা হয়েছে টমাস মূরের আইরিশ মেলডীজ্ থেকে; তাঁদের বাড়িতে 'পাতায় পাতায় চিত্রবিচিত্র করা' যে গ্রন্থটি ছিল, সেইটি অবলম্বন করেই রবীন্দ্রনাথ অনুবাদগুলি করেছিলেন। মূল কবিতাগুলির উপরে টিক্-চিহ্ন দেওয়া আছে, অবশ্য য়্যুগোর কাব্যগ্রন্থের মতো বইয়ের পৃষ্ঠাতেই অনুবাদ করা হয় নি, সম্ভবত সুন্দর চিত্রগুলির প্রতি মমতা-বশতই তাঁর অভ্যাসের ব্যতিক্রম হয়েছিল! পৃষ্ঠাসংখ্যা সহ মূল কবিতার প্রথম ছত্রগুলি উল্লেখ করছি:

Pp. 95-96 "Tis the last rose of summer'—'নিদাঘের শেষ গোলাপ কুসুম'

151-52 'Ne'er ask the Hour'—'দিন রাত্রি নাহি মানি, আয় তোরা আয়রে'

68-69 'Lesbin hath a beaming eye'—'দামিনীর আঁখি কিবা'

ইন্দিরা দেবীর সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, প্রথমোক্ত মূল গানটি তিনি বিলেত থেকে ফেরার সময়ে জাহাজের কাপ্তানকে গেয়ে শুনিয়েছিলেন [দ্র রবীন্দ্রস্মৃতি। ১৪], সুতরাং গানটি রবীন্দ্রনাথের জানা ছিল বলে মনে করা যায়। কিন্তু অনুবাদটিতে সুর সংযোজিত হয়েছিল কি না তা জানা যায় না। প্রথম দুটি অনুবাদের রচনাকাল অজ্ঞাত। শেষোক্ত অনুবাদটির পাণ্ডুলিপি আছে মালতীপুঁথি-র 55/২৯ক পৃষ্ঠায়, এ-কথা আমরা আগেই বলেছি। এই অনুবাদটি সম্ভবত আষাঢ় ১২৮৫-তে আমেদাবাদে থাকার সময়ে করা হয়েছিল। মালতীপুঁথি-তে এর পরের পৃষ্ঠায় [56/২৯খ] পাওয়া যায় 'হে কবিতা—হে কল্পনা' কবিতাটি—যেটি ২৩ আষাঢ় ১২৮৫-তে

লেখা। আবার 34/১৮খ পৃষ্ঠায় 'লীলা' [ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৫] গাথাটির শেষাংশ যেখানে রয়েছে, তার পাশে সাদা জায়গায় অনুবাদ-কবিতাটির কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ছত্র—'তুলিতে/সে আঁখি দেখে নি কেহ/উঁচু পানে', 'যেখানে যা উঁচু নিচু/প্রকৃতির বিধানে', 'রসিকা উজ্জ্বল অতি', 'কিন্তু কে বলিতে পারে শুধু সে কি ধাঁধিবারে/নহে কি তা বিঁধিতে?' প্রভৃতি—এলোমেলো ভাবে লেখা, যা থেকে মনে হয় এই পৃষ্ঠাটির পরেই 55/২৯ক পৃষ্ঠাটি ছিল, যেটি পরবর্তীকালে অসাবধানে নাড়াচাড়ার ফলে স্খলিত ও স্থানচ্যুত হয়েছে।

'তেলেনিপাড়ায় বাড়ুজ্যেদের বাগান' থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কবে মোরান সাহেবের বাগানে বাসস্থান পরিবর্তন করেছিলেন, তা নিশ্চিত করে বলা শক্ত। রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলা-য় লিখেছেন, 'কিছুদিন পরে বাসা বদল করা হল মোরান সাহেবের বাগানে।'[৩৯] অন্যত্রও এইরূপ অনির্দিষ্ট 'কিছুদিন পরে বাড়ী বদল করা হইল'[৪০] উক্তিই পাওয়া যায়। আমরা জানি, গুণেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়েছিল ২২ জ্যৈষ্ঠ [3 Jun] জামাইষষ্ঠীর দিনে। তার কয়েকদিন আগে তাঁর দেওয়া পার্টিতে রবীন্দ্রনাথ যোগ দিয়েছিলেন। জোড়াসাঁকোয় শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। সম্ভবত সেখান থেকে ফিরে আষাঢ়ের প্রথম দিকে বাসস্থান পরিবর্তন করা হয়েছিল। এখানে তাঁরা কতদিন বাস করেন, সে-সম্পর্কেও নির্দিষ্ট করে কিছু বলা কঠিন। চন্দননগরের বিশিষ্ট নাগরিক হরিহর শেঠের সঙ্গে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪ [1927]-এ শিলঙে এক সাক্ষাৎকারে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'তখন আমার বয়স ১৫।১৬ বৎসর হবে, চন্দননগরে পাঁচ-সাত মাস বোধ হয় ছিলাম।'[৪১] এই ধরনের তথ্যের উপর সর্বাংশে নির্ভর করা যায় না [যেমন, রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন কুড়ি বৎসর অতিক্রম করেছে], তবু অন্য উপাদানের অভাবে এই কথা গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। নতুবা রবীন্দ্রজীবনীকার-বর্ণিত 'বর্ষাকালটা চন্দননগরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহিত বাস করেন। বর্ষান্তেই তাঁহারা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন'[৪২] কিংবা জগদীশ ভট্টাচার্যের অনুমান, 'মনে হয় পুরো একটি বছর কবি চন্দননগরে কাটালেন'[৪৩]—দুটি কাল-নিরূপণই অযৌক্তিক লাগে। দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের বিবাহ হয় ১৬ অগ্রহায়ণ[*১], সম্ভবত এই সময়ে তাঁরা চন্দননগর ত্যাগ করেন। এই অনুমান মেনে নিলে রবীন্দ্রনাথ-বর্ণিত 'পাঁচ-সাত মাস' কালপরিমাণের সঙ্গে কিছুটা সংগতি স্থাপন করা যায়।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ একটানা এই দীর্ঘকাল চন্দননগরে বাস করেছেন, এমন ভাবা ঠিক হবে না। আষাঢ়ের শেষে বা শ্রাবণের গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ অন্তত কয়েক দিনের জন্য কলকাতায় এসেছিলেন, এ-কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। ১৫ শ্রাবণ [শুক্র 25 Jul] রাজনারায়ণ বসুর চতুর্থ কন্যা লীলাবতী দেবীর সঙ্গে কৃষ্ণকুমার মিত্রের বিবাহ হয়। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ দুটি গান রচনা করে রাজনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগীন্দ্রনাথ বসুকে পাঠিয়ে দেন এবং তাঁকে লেখেন, 'যোগেনবাবু,/দুটি বিবাহের গান রচনা করিয়া পাঠাই।/পছন্দ হইলে গ্রহণ করিবেন।/আপনার/শ্রী রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর'। পত্র মধ্যে এই দুটি গান প্রেরিত হয়:

> রাগিণী সাহানা, তাল ঝাঁপতাল/দুই হৃদয়ের নদী একত্রে মিলিল যদি
> জয় জয়ন্তি ঝাঁপতাল/মহা গুরু, দুটি ছাত্র এসেছে তোমার,

পত্রের শেষে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'আর একটা উৎসবের গান যদি পারি ত,/কাল পাঠাইতে চেষ্টা করিব/শ্রী—'; প্রতিশ্রুত গানটি তিনি পাঠিয়েছিলেন কি না তা অবশ্য জানা যায় নি। পত্রে কোনো তারিখ

নেই, সুতরাং পত্রটি ও গান দুটির রচনাকাল নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়; তবে অনুমান করা যায় পত্রটি আষাঢ়ের শেষে বা শ্রাবণের গোড়ায় [Jul 1881] প্রেরিত হয়েছিল, গান-দুটির রচনাকালও তাই।

১৫ শ্রাবণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে অনুষ্ঠিত প্রথম বিবাহোৎসবে অন্য চারটি গানের[*২] সঙ্গে এই দুটিও গীত হয়। দ্বিতীয় গানটির ক্ষেত্রে কিছু পাঠান্তর লক্ষিত হয়, প্রথম ছত্রটি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত : 'আজি এ সন্তান দুটি মিলিছে তোমার', চতুর্থ ছত্রে 'উজ্জ্বল আকার' হয় 'মঙ্গল আকার', অন্যান্য পরিবর্তন তুচ্ছ ধরনের। গানটির প্রথম ছত্র আরও পরিবর্তিত আকারে 'শুভদিনে এসেছে দোঁহে চরণে তোমার'-রূপে আরও কিছু পাঠান্তর সহ রবিচ্ছায়া-তে [পৃ ১৪২-৪৩, ব্রহ্ম ৫৪, বেহাগ] সংকলিত হয় ও এই আকারে গীতবিতান-এ [২। ৬১০] গৃহীত হয়েছে। স্বরবিতান ৮-এ ইন্দিরা দেবী-কৃত স্বরলিপিটি 'বেহাগ। ত্রিতাল'-এ নিবদ্ধ, পাদটীকায় উল্লিখিত হয়েছে : 'শেষ কলি দুইটি সাধারণত গাওয়া হয় না। তবে পূর্ব সঞ্চারী ও আভোগের সুরে গাওয়া যাইতে পারে।' লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথের পত্রে ও তত্ত্বকৌমুদী-তে গানটির সুর-তাল জয়জয়ন্তী-ঝাঁপতাল, কিন্তু রবিচ্ছায়া ও স্বরবিতান-এ সুরটি পরিবর্তিত হয়ে বেহাগে পরিণত হয়েছে। 'দুই হৃদয়ের নদী' গানটি উক্ত বিবাহের বিবরণ-সহ তত্ত্ববোধিনী-র ভাদ্র সংখ্যাতেও [পৃ ৯৮] মুদ্রিত হয়। রবিচ্ছায়া [পৃ ১৪৫-৪৬, ব্রহ্ম ৬০] ও গীতবিতান-এ [২।৬০৯] পাঠান্তর দেখা গেলেও সেগুলি তেমন গুরুতর নয়, সুর-তালও অপরিবর্তিত।

রবীন্দ্রজীবনী-কার জানিয়েছেন, উপরোক্ত গানগুলির সঙ্গে এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ আরও দুটি গান রচনা করেন : 'জগতের পুরোহিত তুমি' ও 'তুমি হে প্রেমের রবি।'[৪৪] তাঁর সংবাদের সূত্র ড কালিদাস নাগের একটি প্রবন্ধ 'ভানুসিংহের পদাবলী' [মাসিক বসুমতী, ভাদ্র ১৩৫৭। ৬৪৮], সেখানে কিন্তু তিনি শেষোক্ত গানটির কোনো উল্লেখ করেন নি। ড নাগ লিখেছেন : '১৮৮১ (১২৮৮, ১৫ই শ্রাবণ) রাজনারায়ণের চতুর্থ কন্যা লীলা দেবীর সঙ্গে ভবিষ্যৎ "সঞ্জীবনী" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্রের বিবাহ। তার নিখুঁৎ বিবরণ সৌভাগ্যক্রমে লীলা দেবী লিপিবদ্ধ করে গেছেন, এবং তাঁর পুত্র বন্ধুবর সুকুমার মিত্রের সৌজন্যে পড়বার সুযোগ পেয়েছি। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে সেই প্রথম জমকাল বিবাহ-সভা—আচার্য্য হয়েছিলেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী স্বয়ং; এবং "নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (রামমোহন জীবনচরিত রচয়িতা), সুন্দরীমোহন দাস, কেদারনাথ মিত্র, অন্ধ চুণীলাল ও নরেন্দ্র দত্ত (পরে স্বামী বিবেকানন্দ) মহাশয়গণ সঙ্গীত করিয়াছিলেন··· ·শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়—দুই হৃদয়ের নদী (সাহানা-ঝাপতাল); জগতের পুরোহিত তুমি (খাম্বাজ একতালা) শুভদিনে এসেছে দোঁহে (বেহাগ—তেতালা)[*]—প্রভৃতি সঙ্গীত রচনা করিয়া গায়কদিগকে শিখাইয়া দিয়াছিলেন।" লীলাবতী মিত্রের ডায়ারি থেকে ড নাগ এই অংশ অবিকল উদ্ধৃত করেছিলেন কিনা তাতে সন্দেহ আছে, কারণ মাঘ ১৩৬৮-সংখ্যা 'উদ্বোধন'-এ 'বিবেকানন্দ-জীবনীর উপাদান সংগ্রহ' প্রবন্ধে এই উক্তিটিই ঈষৎ পরিবর্তিত ভাষায় উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু তত্ত্বকৌমুদী-র বিবরণকে যদি প্রামাণ্য মনে করি, তাহলে বলতে হয় 'জগতের পুরোহিত তুমি' গানটি উক্ত অনুষ্ঠানে গীত হয় নি, প্রভাতকুমার-উল্লিখিত 'তুমি হে প্রেমের রবি' গানটি তো এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক।

যোগীন্দ্রনাথ বসুকে লেখা পত্র থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ [সম্ভবত চন্দননগর থেকে] দুটি গান সুর-তাল-নির্দেশ-সহ তাঁকে লিখে পাঠিয়েছিলেন; উপরে বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী তিনি নিজেই গানগুলি গায়কদের শিখিয়ে দিয়েছিলেন। এতে মনে হয় অন্তত এই প্রয়োজনেই শ্রাবণ মাসের প্রথম দিকে তিনি কয়েকদিনের জন্য

কলকাতায় এসেছিলেন। গায়কদের মধ্যে নরেন্দ্র দত্ত অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, এই তথ্যটিও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের পারস্পরিক সম্পর্ক অনেকেরই কাছে খুব কৌতূহলের বিষয় [এ-প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে], সুতরাং এই তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, অন্তত এই সংগীত-শিক্ষার আসরে উভয়ের সাক্ষাৎ ও যোগাযোগ ঘটেছিল। বিবেকানন্দ তাঁর সম্পাদিত সঙ্গীত কল্পতরু গ্রন্থে 'দুই হৃদয়ের নদী' গানটি অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, এই তথ্যটিও বর্তমান প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

মোরান সাহেবের বাগানে রবীন্দ্রনাথ যে কয়টি মাস জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে বাস করেছিলেন, তার সুখ-স্মৃতি তিনি সারা জীবনে ভোলেন নি, নানা ভাবে বিভিন্ন জায়গায় তার স্মৃতিচারণ করেছেন। চন্দননগরের গোন্দলপাড়ায় অবস্থিত সেই বাগান কিছুদিন পরেই 'লৌহদন্ত-দন্তুর কলের কবলে কবলিত' হয়ে তার সুন্দর রূপটি হারিয়ে ফেলে : 'আমাদের তরুচ্ছায়াপ্রচ্ছন্ন গঙ্গাতটের নিভৃত নীড়গুলির মধ্যে কলকারখানা ঊর্ধ্বফণা সাপের মতো প্রবেশ করিয়া সোঁ সোঁ শব্দে কালো নিশ্বাস ফুঁসিতেছে।'[৪৫] কিন্তু নীল-ব্যবসায়ী মোরান সাহেবের লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে নির্মিত সেই কুঠিবাড়ি তাঁদের বসবাসকালে অক্ষুণ্ণই ছিল : 'গঙ্গা হইতে উঠিয়া ঘাটের সোপানগুলি পাথরে বাঁধানো একটি প্রশস্ত সুদীর্ঘ বারান্দায় গিয়া পৌঁছিত।....ঘরগুলি সমতল নহে—কোনো ঘর উচ্চ তলে, কোনো ঘরে দুই-চারি ধাপ সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া যাইতে হয়। সবগুলি ঘর যে সমরেখায় তাহাও নহে। ঘাটের উপরেই বৈঠকখানাঘরের সাশিগুলিতে রঙিন ছবিওয়ালা কাচ বসানো ছিল। একটি ছবি ছিল, নিবিড় পল্লব-বেষ্টিত গাছের শাখায় একটি দোলা—সেই দোলায় রৌদ্রছায়াখচিত নিভৃত নিকুঞ্জে দুজনে দুলিতেছে; আর-একটি ছবি ছিল, কোনো দুর্গপ্রাসাদের সিঁড়ি বাহিয়া উৎসববেশে-সজ্জিত নরনারী কেহবা উঠিতেছে কেহবা নামিতেছে। সাশির উপরে আলো পড়িত এবং এই ছবিগুলো বড়ো উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিত। এই দুটি ছবি সেই গঙ্গাতীরের আকাশকে যেন ছুটির সুরে ভরিয়া তুলিত।....বাড়ির সর্বোচ্চতলে চারিদিক-খোলা একটি গোল ঘর ছিল। সেইখানে আমার কবিতা লিখিবার জায়গা করিয়া লইয়াছিলাম। সেখানে বসিলে ঘনগাছের মাথাগুলি ও খোলা আকাশ ছাড়া আর-কিছু চোখে পড়িত না। তখনো সন্ধ্যাসংগীতের পালা চলিতেছে—এই ঘরের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই লিখিয়াছিলাম।

> অনন্ত এ আকাশের কোলে
> টলমল মেঘের মাঝার
> এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর
> তোর তরে কবিতা আমার।'[৪৬]

অন্যত্র তিনি বলেছেন, 'সেই উপরের দোতলার ঘরে আমি থাকতুম, প্রভাতের সূর্য প্রথমেই আমার চোখে লাগত। সেই উপরের ঘরে বসেই কবিতা লিখতুম।'[৪৭] ছেলেবেলা-য় এই বাড়ির বর্ণনা : 'সেটা রাজবাড়ি বললেই হয়। রঙিন কাঁচের জানালা দেওয়া উঁচুনিচু ঘর, মার্বল পাথরে বাঁধা মেজে, ধাপে ধাপে গঙ্গার উপর থেকেই সিঁড়ি উঠেছে লম্বা বারান্দায়। ঐখানে রাত জাগবার ঘোর লাগত আমার মনে, সেই সাবরমতী নদীর ধারে পায়চারির সঙ্গে এখানকার পায়চারির তাল মেলানো চলত।'[৪৮]

দায়িত্বহীন কর্মহীন 'গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গ-করা পূর্ণ-বিকশিত পদ্মফুলের মতো' একটি একটি করে ভেসে চলছিল। 'এক-একদিন রান্নার আয়োজন বকুলগাছতলায়। সে রান্নায় মসলা বেশি ছিল না, ছিল হাতের গুণ।'[৪৯] 'কখনো-বা সূর্যাস্তের সময় আমরা নৌকা লইয়া বাহির হইয়া পড়িতাম

—জ্যোতিদাদা বেহালা বাজাইতেন, আমি গান গাহিতাম; পূরবী রাগিণী হইতে আরম্ভ করিয়া যখন বেহাগে গিয়া পৌঁছিতাম তখন পশ্চিমতটের আকাশে সোনার খেলনার কারখানা একেবারে নিঃশেষে দেউলে হইয়া গিয়া পূর্ববনান্ত হইতে চাঁদ উঠিয়া আসিত। আমরা যখন বাগানের ঘাটে ফিরিয়া আসিয়া নদীতীরের ছাদটার উপরে বিছানা করিয়া বসিতাম তখন জলে স্থলে শুভ্র শান্তি, নদীতে নৌকা প্রায় নাই, তীরের বনরেখা অন্ধকারে নিবিড়, নদীর তরঙ্গহীন প্রবাহের উপর আলো ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছে।'[৫০] এই প্রসঙ্গটিরই কিছু কম কবিত্বপূর্ণ ও অনেক বেশি তথ্যপূর্ণ বর্ণনা পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তিতে :'একটি ছোট ডিঙ্গি ছিল, জ্যোতিদাদার হাতে বেহালা থাকিত। অক্ষয়বাবুও আসিতেন। কি একটা সোনার অগ্নিময় সূর্যাস্ত! খুব গাহিতাম বড়দাদার গান 'গেল দিন আরে'। ফিরিয়া টেরাসে বসিতাম। সন্ধ্যা হইত। ধীরে ধীরে সব তারা ও চন্দ্র অস্ত যাইত। সব দেখিতাম। অথবা গভীর রাতে কৃষ্ণ পক্ষের চন্দ্রোদয়।'[৫০]

উপরে যে-কবিতাটির চারটি ছত্র রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত করেছেন, সেটি 'কবিতা সাধনা' নামে ভারতী-র পৌষ ১২৮৮-সংখ্যায় প্রকাশিত ও 'গান আরম্ভ' নামে সন্ধ্যাসঙ্গীত [১২৮৯] কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়। চন্দননগরে অবস্থান করার সময় সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, 'তখনো সন্ধ্যাসংগীতের পালা চলিতেছে।' কিন্তু ঠিক কোন্ কবিতাগুলি সেখানে লেখা, তা নিশ্চিত করে বলা শক্ত। সন্ধ্যাসংগীত কাব্যে কবিতাগুলি রচনার ক্রম অনুযায়ী সাজানো নয়, ভারতী-তে প্রকাশের ক্রমও রচনা-ক্রমকে অনুসরণ করেছে বলে মনে হয় না, তাছাড়া কতকগুলি কবিতা গ্রন্থাকারেই প্রথম প্রকাশিত হয়। ড সুকুমার সেন 'স্থান, কাল ও ভাব অনুসারে' সন্ধ্যাসংগীত-এর কবিতার মধ্যে চারটি স্তর লক্ষ্য করেছেন ও প্রধানত ভারতী-র প্রকাশসূচী অনুসরণ করে এই চার স্তরের কবিতার রচনার স্থান-কাল নির্দেশ করেছেন।[৫১] তাঁর মতে—'দুঃখ আবাহন', 'পরিত্যক্ত', 'তারকার আত্মহত্যা', 'সুখের বিলাপ', ও 'হৃদয়ের গীতিধ্বনি [গীতধ্বনি]' জোড়াসাঁকোয় লেখা; 'দেরাদুনের [মুসৌরী] পথে অথবা দেরাদুন হইতে ফিরিবার অব্যবহিত পরে'—'আশার নৈরাশ্য', 'শিশির', 'পরাজয় [সংগীত]' ও 'গান সমাপন'; 'অসহ্য ভালবাসা', 'হলাহল', 'পাষাণী', 'শান্তিগীত', 'আবার', 'গান আরম্ভ' ও 'অনুগ্রহ' মোরান সাহেবের কুঠিতে লেখা; এবং 'সংগ্রাম সঙ্গীত', 'আমি-হারা', 'সন্ধ্যা', 'কেন গান গাই', 'কেন গান শুনাই', 'উপহার' (প্রথম) ও 'উপহার' (দ্বিতীয়)-র রচনা-স্থান সদর স্ট্রীটের বাসা। মতভেদের আশঙ্কা মনে রেখেও সাধারণভাবে কবিতাগুলির এই ক্রম-বিন্যাস আমরা মেনে নিতে পারি।

এই সময়ে সম্ভবত কিছু গানও রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন। হরিহর শেঠের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি চন্দননগরের স্মৃতিচারণ করে বলেছিলেন, 'অনেক গান লিখেছি; সে গানগুলো মনে আছে।' কিন্তু উপযুক্ত তথ্যের অভাবে সেই গানগুলিকে শনাক্ত করার উপায় নেই।

চন্দননগরে থাকার সময়ে কেবল কবিতা বা গান নয়, অন্যান্য গদ্যরচনাও রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন। এদের রচনাকাল-নির্ণয়ের সমস্যা কম, কারণ প্রধানত ভারতী-র কলেবর পূর্ণ করার তাগিদেই এগুলি লিখিত—সুতরাং রচনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পত্রস্থ হয়েছে বলে অনুমান করা যায়। এই গদ্যরচনাগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল 'বিবিধ প্রসঙ্গ'। আমরা দেখেছি, বহু গদ্যপ্রবন্ধই রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থাকারে সংকলন করেন নি, কিন্তু 'বিবিধ প্রসঙ্গ'গুলি সম্বন্ধে সেকথা বলা যায় না। এর থেকেই রচনাগুলি সম্পর্কে তাঁর মমতার পরিচয় পাওয়া যায়, যদিও অচলিত সংগ্রহের [১৩৪৭] আগে এগুলি পুনর্মুদ্রিত হয় নি। এদের সম্পর্কে তিনি লিখেছেন : 'গঙ্গার ধারে বসিয়া সন্ধ্যাসংগীত ছাড়া কিছু-কিছু গদ্যও লিখিতাম। সেও কোনো বাঁধা লেখা নহে

—সেও একরকম যা-খুশি তাই লেখা।....মনের রাজ্যে যখন বসন্ত আসে তখন ছোটো ছোটো স্বল্পায়ু রঙিন ভাবনা উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে কেহ লক্ষ্যও করে না, অবকাশের দিনে সেইগুলাকে ধরিয়া রাখিবার খেয়াল আসিয়াছিল। আসল কথা, তখন সেই একটা ঝোঁকের মুখে চলিয়াছিলাম—মন বুক-ফুলাইয়া বলিতেছিল, আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিব—কী লিখিব সে খেয়াল ছিল না, কিন্তু আমিই লিখিব, এইমাত্র তাহার একটা উত্তেজনা।'[৫২]

একটু কৌতুকের সঙ্গে লক্ষণীয় যে, কেবলমাত্র যা-ইচ্ছা-তাই লেখার উত্তেজনাতে রচনাগুলি লিখে এবং ভারতী-তে প্রকাশ করেই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হন নি, তার সমর্থনে 'চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়' প্রবন্ধ রচনা করেছেন এবং সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতি কটাক্ষ-মিশ্রিত উপদেশও প্রদান করেছেন : 'মাসিক সংবাদ পত্রের ভাণ্ডারে....ভোজের সমস্ত উপকরণগুলিই থাকা আবশ্যক। সকল প্রকার ভোক্তার খোরাক যোগান' দরকার।....ভারতীর নিমন্ত্রণ সভায় সম্পাদক মহাশয়, স্বর-রহস্য, জ্যামিতি, ভৌতিক বিজ্ঞান, অধ্যাত্ম বিদ্যা প্রভৃতি যে সকল দাঁত ভাঙ্গা চর্ব্ব্যের পরিবেশন আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে উপস্থিত প্রস্তাব-লেখক বিশেষ ভীত ও ব্যাকুল হইয়া তাঁহার নিকট সবিনয় নিবেদন করিতেছে যে, যে সকল গুরুপাক খাদ্যের মাসিক বরাদ্দ হইয়াছে, তাহাদিগকে আর একটু লেহ্য আকারে পাতে দিলে মুখে তুলিতে ভরসা হয়, নচেৎ তাহাতে পাত পূরিবে বটে, কিন্তু পেট পূরিবে না।'[৫৩]

এই রচনাধারার গ্রন্থে বর্জিত আরম্ভাংশটুকুও যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক : 'স্মরণ হইতেছে, ফরাসীস্ পণ্ডিত প্যাস্কাল একজনকে একটি দীর্ঘ পত্র লিখিয়া অবশেষে উপসংহারে লিখিয়াছেন,—"মার্জ্জনা করিবেন, সময় অল্প থাকাতে বড় চিঠি লিখিতে হইল, ছোট চিঠি লিখিবার সময় নাই।" আমাদের হাতে যখন বিশেষ সময় থাকিবে তখন মাঝে মাঝে সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ পাঠকদের উপহার দিব।'[৫৪]

এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধগুলি শ্রাবণ ১২৮৮ থেকে শুরু করে কার্তিক ও অগ্রহায়ণ ছাড়া প্রতি মাসে কয়েকটি করে মুদ্রিত হয়ে বৈশাখ ১২৮৯-সংখ্যায় শেষ হয় অর্থাৎ মোরান সাহেবের বাগানে সূত্রপাত ও সদর স্ট্রীটের বাসায় অবস্থানের কিছুদিন পর্যন্ত এই রচনার ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। লক্ষণীয় যে, বিবিধ প্রসঙ্গ-গুলি রচনাকালের সমস্তটাই রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে একত্র কাটিয়েছেন—তথ্যটি এই প্রবন্ধাবলীর রচনার পটভূমিকা-নির্ণয়ে খুবই প্রয়োজনীয়। বস্তুত এগুলি একধরনের কথোপকথনেরই সমতুল, যার মধ্যে লেখকের কথাগুলিই আমরা জানতে পারি, কিন্তু অপরপক্ষের উপস্থিতিও অনুভবগম্য। এই অপরপক্ষ হচ্ছেন কাদম্বরী দেবী, গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় রবীন্দ্রনাথ সে-কথা গোপন করেন নি : 'আমার পাঠকদিগের মধ্যে একজন লোককে বিশেষ করিয়া আমার এই ভাবগুলি উৎসর্গ করিতেছি।—এ ভাবগুলির সহিত তোমাকে আরও কিছু দিলাম, সে তুমিই দেখিতে পাইবে! সেই গঙ্গার ধার মনে পড়ে? সেই নিস্তব্ধ নিশীথ? সেই জ্যোৎস্নালোক? সেই দুই জনে মিলিয়া কল্পনার রাজ্যে বিচরণ? সেই মৃদু গম্ভীর স্বরে গভীর আলোচনা? সেই দুই জনে স্তব্ধ হইয়া নীরবে বসিয়া থাকা? সেই প্রভাতের বাতাস, সেই সন্ধ্যার ছায়া! এক দিন সেই ঘনঘোর বর্ষার মেঘ, শ্রাবণের বর্ষণ, বিদ্যাপতির গান? তাহারা সব চলিয়া গিয়াছে! কিন্তু আমার এই ভাবগুলির মধ্যে তাহাদের ইতিহাস লেখা রহিল।...আমার এই লেখার মধ্যে লেখা রহিল—এক লেখা তুমি আমি পড়িব, আর এক লেখা আর সকলে পড়িবে।'[৫৫]

এ-থেকে বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথের জীবনের এই সময়টা ছিল বাস্তবিকই দায়িত্বহীন কর্মহীন নিরুদ্বেগ সুখে অভিষিক্ত। সে-পরিচয় এই গদ্যরচনাগুলির মধ্যেই ধরা পড়েছে, যার অনেকগুলি আজও সাময়িক পত্রিকার জীর্ণ বিবর্ণ পৃষ্ঠাতেই আবদ্ধ, আর যেগুলি গ্রন্থভুক্ত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছে 'প্রথম সংস্করণের শেষেই তাহাদিগকে সমাধি দেওয়া হইয়াছে, দ্বিতীয় সংস্করণে আর তাহাদিগকে নূতন জীবনের পাট্টা দেওয়া হয় নাই।' অথচ সে-তুলনায় আপেক্ষিক প্রাধান্য-প্রাপ্ত সমসাময়িক কবিতাগুলি অনেকাংশেই আমাদের প্রতারণা করে, বিশেষত যখন সেগুলিকে তাঁর ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয় কিংবা কবিতাগুলির মধ্যে কোনো আনুমানিক তথ্যের সমর্থন খোঁজা হয়, যেমনটি করা হয়েছে 'তারকার আত্মহত্যা' কবিতাটি অবলম্বনে। বস্তুত সন্ধ্যাসংগীত-এ যে সর্বগ্রাসী বেদনার প্রবাহ দেখা যায়, তা প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ-কথিত 'বিনা-কষ্টের কষ্ট—অনির্দিষ্ট বেদনা'—এর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিজীবনের সুখদুঃখের সম্পর্ক যেটুকু আছে, তা পরিমাণে খুবই সামান্য। এতাবৎ তাঁর জীবনে ব্যক্তিগত দুঃখের যে হিসেব পাওয়া যায়, তা হচ্ছে অন্তঃপুরের স্নেহমমতার শ্যামল জগৎ থেকে ভৃত্যরাজক তন্ত্রের নির্মম শাসনের মরুপ্রান্তরে নির্বাসন, হেমেন্দ্রনাথ-কর্তৃক 'নানা বিদ্যার আয়োজন'-এর জবরদস্তি, এবং বিদ্যালয়ের জীবনযাত্রার সঙ্গে অসামঞ্জস্য ও তজ্জনিত অসার্থকতা। কিন্তু এর অনেকগুলি শুধু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেই ঘটেছে তা নয়, তাঁর অন্য ভাইয়েরাও একই দুর্ভাগ্যের অংশীদার ছিলেন; আর লেখাপড়া ও ঐহিক সাফল্যের দিক দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারোরই কৃতিত্ব খুব উল্লেখযোগ্য নয় [অবশ্য পাট ও নীলের ব্যবসায়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সাময়িকভাবে কিছুটা লাভবান হয়েছিলেন]। এ-কথা ঠিক, শিশুকাল থেকে কবিতা রচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার যে স্ফুরণ ঘটেছিল, তারই ভিত্তিতে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁর সম্পর্ক আত্মীয়েরা একটু বেশিই আশান্বিত হয়েছিলেন, যা তাঁর নিজের মনেও কিছুটা সঞ্চারিত হয়ে থাকবে। সুতরাং ঘটনাচক্রে তাঁর সেক্ষেত্রে অসার্থকতার জন্য আত্মীয়দের সঙ্গে তিনি নিজেও কিছুটা আশাভঙ্গের বেদনা অনুভব করেছেন, এতে অস্বাভাবিকত্ব কিছু নেই। কিন্তু সেই বেদনা তাঁর পারিবারিক প্রতিবেশের পক্ষে এমন কিছু সীমাতিক্রমী নয় যে, তাঁর এই সময়কার সমস্ত কাব্যরচনাপ্রয়াস ভগ্নহৃদয়ের গানে পর্যবসিত হবে, বিশেষত বেশির ভাগ গদ্যরচনাই যেখানে বিপরীত সাক্ষ্য দেয়। তাই কবিতার মধ্যে যে দুঃখ প্রকাশ পেয়েছে, তাকে কবিজীবনের দুঃখ বলে মেনে নেওয়াই ভালো, ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে তাকে যুক্ত করতে গেলে অপব্যাখ্যার সম্ভাবনাই বেশি। এর মধ্যে যেটুকু তাৎপর্যপূর্ণ তা হল, এই ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে কবিজীবনের অসামঞ্জস্য-জনিত বেদনা ও অসংগতি যখন দূর হয়েছে তখন থেকে রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাবরূপটির পরিবর্তন ঘটেছে। তিনি সন্ধ্যাসংগীত-কে তাঁর 'কাব্যের প্রথম পরিচয়' বলে আখ্যাত করেছেন, কিন্তু তা শুধু নিজস্ব ছন্দ ও ভাষার আবিষ্কারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; অপরপক্ষে ভাবের দিক দিয়ে, আমাদের মনে হয়, হৃদয়-অরণ্যের জটিলতা থেকে যখন তাঁর মুক্তি ঘটেছে এবং বহির্জগতের সঙ্গে মানসিক আদান প্রদান শুরু হয়েছে—অর্থাৎ প্রভাতসংগীত-এ—তখন থেকেই তাঁর কবিজীবন ও ব্যক্তিজীবনের মধ্যেও সহজ সম্পর্কটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, রবীন্দ্র-জীবনবৃত্তান্তের পক্ষে আমরা সেটিকেই অধিক তাৎপর্যপূর্ণ মনে করি।

সম্ভবত মোরান সাহেবের বাগানে অবস্থানের শুরু থেকেই রবীন্দ্রনাথ বউঠাকুরানীর হাট উপন্যাস লেখা শুরু করেন। এই কুঠিবাড়ির বৈঠকখানাঘরের সার্শিগুলিতে যে দুটি রঙিন ছবিওয়ালা কাঁচ বসানো ছিল, সেগুলি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন : 'এই দুটি ছবি সেই গঙ্গাতীরের আকাশকে যেন ছুটির সুরে ভরিয়া তুলিত।

কোন্ দূরদেশের, কোন্ দূরকালের উৎসব আপনার শব্দহীন কথাকে আলোর মধ্যে ঝল্‌মল্ করিয়া মেলিয়া দিত—এবং কোথাকার কোন্ একটি চিরনিভৃত ছায়ায় যুগলদোলনের রসমাধুর্য নদীতীরের বনশ্রেণীর মধ্যে একটি অপরিস্ফুট গল্পের বেদনা সঞ্চার করিয়া দিত'।[৫৬] দূরকালের ইতিহাসকে অবলম্বন করে গল্প লেখার প্রেরণা হয়তো এই দুটি ছবি থেকেই তিনি লাভ করেছিলেন। কাব্যজগতে নিজের মনকেই মুখ্য করে যে বিষাদ ও বেদনার মধ্যে তিনি আবর্তিত হচ্ছিলেন, গল্পের পাত্রপাত্রীর মানসিক দ্বন্দ্ববিক্ষোভের মধ্যে সেই মনকে ছড়িয়ে দিয়ে একটা মুক্তির পথ খুঁজে বের করার প্রয়াস এই উপন্যাস-রচনার পিছনে কার্যকরী হয়ে থাকতে পারে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও প্রায় একই কথা লিখেছেন : 'অন্তর্বিষয়ী ভাবের কবিত্ব থেকে বহির্বিষয়ী কল্পনালোকে এক সময়ে মন যে প্রবেশ করলে, ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে লাগল, এ বোধ হয় কৌতূহল থেকে।/ প্রাচীর-ঘেরা মন বেরিয়ে পড়ল বাইরে, তখন সংসারের বিচিত্র পথে তার যাতায়াত আরম্ভ হয়েছে। এই সময়টাতে তার লেখনী গদ্যরাজ্যে নূতন ছবি নূতন নূতন অভিজ্ঞতা খুঁজতে চাইলে। তারই প্রথম প্রয়াস দেখা দিল বউ-ঠাকুরানীর হাট গল্পে—একটা রোমান্টিক ভূমিকায় মানবচরিত্র নিয়ে খেলার ব্যাপারে।'[৫৭]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম উপন্যাস করুণা-য় সমসাময়িক সমাজজীবনকে কাহিনীর পটভূমিকা রূপে গ্রহণ করেছিলেন, বউ-ঠাকুরানীর হাট-এর পটভূমিকা হল ঐতিহাসিক ঘটনা—যোড়শ শতাব্দীতে বাংলার বারো-ভূইঞার অন্যতম রাজা প্রতাপাদিত্যের কাহিনী। প্রতাপাদিত্যের জীবনবৃত্তান্তের সঙ্গে তিনি বাল্যাবধি পরিচিত ছিলেন; আমরা আগেই বলেছি, বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ-কর্তৃক প্রকাশিত 'গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তক সংগ্রহ'-এর অন্তর্ভুক্ত হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার-প্রণীত রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র [1853] গ্রন্থ তিনি বাল্যকালেই পাঠ করেছিলেন, আর-একটু বড়ো হবার পর প্রতাপচন্দ্র ঘোষ-বিরচিত বৃহদাকার বঙ্গাধিপ-পরাজয় প্রথম খণ্ড [1869] কাদম্বরী দেবীকে পড়ে শোনাবার কথা তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন ছেলেবেলা-য়। কিন্তু উপন্যাসটি রচনার মূল প্রেরণা ও সূত্র তিনি সম্ভবত লাভ করেছেন পৌষ ১২৮৭-সংখ্যা ভারতী-তে প্রকাশিত কৈলাসচন্দ্র সিংহের লেখা 'বাঙ্গালার দ্বাদশ ভৌমিকের ইতিহাস' [পৃ ৪৩৪-৪৮] নামক প্রবন্ধ থেকে।[*১] এই প্রবন্ধে প্রতাপাদিত্য ও রামচন্দ্র রায়ের সম্পর্ক এবং তার পরিণতি নিয়ে কিংবদন্তীমূলক একাধিক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ তার মধ্যে যেটি সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক সেটি বেছে নিয়ে তাঁর কল্পনার জাল বুনেছেন; উদয়াদিত্য, বসন্ত রায়, রামাই ভাঁড়, রামমোহন মাল প্রভৃতি ঔপন্যাসিক চরিত্রগুলির নাম ও তাদের প্রকৃতির পরিচয় সূত্রাকারে প্রবন্ধটিতেই আছে, 'বউ ঠাকুরানীর হাট' নামটিও উক্ত প্রবন্ধ থেকে নেওয়া। কৈলাসচন্দ্র সিংহ তাঁর প্রবন্ধে Dr. Wise লিখিত 'Bara Bhuia' প্রবন্ধ *[Journal of the Asiatic Society of Bengal,* Vol. XLIII, Part I, pp. 197-214] এবং ব্রজসুন্দর মিত্র লিখিত গ্রন্থের ['চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ', প্রকাশ : ১৭৯৬ শক] উল্লেখ করেছেন, রবীন্দ্রনাথও সম্ভবত এই রচনাগুলি পর্যালোচনা করে দেখেছিলেন। তিনি লিখেছেন : 'আমি সে সময়ে তাঁর [প্রতাপাদিত্য] সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে যা-কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলুম তার থেকে প্রমাণ পেয়েছি তিনি অন্যায়কারী অত্যাচারী নিষ্ঠুর লোক, দিল্লীশ্বরকে উপেক্ষা করবার মতো অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্য তাঁর ছিল কিন্তু ক্ষমতা ছিল না।'[৫৮] পরবর্তীকালে প্রতাপাদিত্যকে জাতীয় বীর আখ্যা দিয়ে প্রতাপাদিত্য-উৎসব প্রবর্তন করেছিলেন তাঁরই ভাগিনেয়ী সরলা দেবী, এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ক্ষোভ গোপন করেন নি। ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র মিত্র তাঁর যশোহর-খুলনার ইতিহাস প্রথম খণ্ডে [Sep 1914]

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ধারণার বিরোধিতা করেছেন ঐতিহাসিক তথ্যের নিরিখে, কিন্তু সে-প্রসঙ্গ বর্তমান ক্ষেত্রে অনাবশ্যক।

উপন্যাসটির প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হয় আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যা ভারতী-তে।[*২] আমাদের ধারণা, মোরান সাহেবের বাগানে অবস্থান-কালে শ্রাবণ ১২৮৮ থেকেই তিনি এটি রচনা করতে শুরু করেন। উক্ত মাসে প্রকাশিত 'চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়' প্রবন্ধে ভোজ্যতালিকায় 'ধূমায়ন' পরিচ্ছেদটি যুক্ত করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, 'বুদ্ধির ভোজে নবেলকে তামাক বলে। বুদ্ধিজীবীগণ ইহাকে বুদ্ধিগত শরীরের পক্ষে অপরিহার্য্য আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করেন না। তাঁহাদের অনেকে ইহাকে মৌতাতের স্বরূপে দেখেন।'[৫৯] তাঁর রচনাশক্তি তখন সাহিত্যের ভোজে চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় সবরকম পদই অকৃপণভাবে পরিবেশন করে চলেছিল, তারই সঙ্গে 'ধূমায়ন' পদটি যোগ করতে ব্যস্ত হয়েছিলেন বলেই সম্ভবত বিষয়টির অবতারণা। কার্তিক সংখ্যায় উপন্যাসটির পাঁচটি পরিচ্ছেদ একসঙ্গে প্রকাশিত হওয়া দেখে মনে হয় অনেকটা লেখার পরই তিনি এটি মুদ্রণের জন্য ভারতীর দপ্তরে প্রেরণ করেন। কিন্তু উপন্যাস-রচনায় তাঁর প্রথমাবধি অভ্যাসই ছিল মাসে মাসে খানিকটা লিখে পত্রিকায় প্রকাশ করা। তেমনই বউ ঠাকুরানীর হাট মোরান সাহেবের বাগানে লেখা শুরু হলেও সদর স্ট্রীটের বাসায় ['এখানেও একটু একটু করিয়া বউঠাকুরানীর হাট ও একটি একটি করিয়া সন্ধ্যাসংগীত লিখিতেছি'—জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৯৫] ও জোড়াসাঁকোর বাড়িতেও রচনাকার্য অব্যাহত ছিল। ভারতী-তে উপন্যাসটির প্রকাশ সমাপ্ত হয় ঠিক এক বৎসর পরে আশ্বিন ১২৮৯-সংখ্যায়। কয়েক মাস পরে পৌষ ১২৮৯-তে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

বর্তমান বৎসরে রবীন্দ্রনাথের আর-একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র', বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী প্রকাশের তারিখ 25 Jul 1881 [সোম ১১ শ্রাবণ ১২৮৮], মুদ্রণ-সংখ্যা ২০০০ ও মূল্য দেড় টাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২ [আখ্যাপত্র] + ৪ [উপহার] + ভূমিকা [০ — ল০] + ২৭৪।[*] গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি উদ্ধৃত করছি:

য়ুরোপ প্রবাসীর/পত্র।/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত/শ্রীসারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়/কর্ত্তৃক প্রকাশিত/কলিকাতা/বাল্মীকি যন্ত্রে/শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।/শকাব্দা ১৮০৩'

রুদ্রচণ্ড-এর মতো রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই ষষ্ঠ গ্রন্থটিও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করেন : 'উপহার।/ভাই জ্যোতিদাদা, ইংলণ্ডে যাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা/অধিক মনে পড়িত, তাঁহারই হস্তে এই/পুস্তকটি সমর্পণ করিলাম।/স্নেহভাজন/রবি।'

—অনেকে উপহার-পত্রের ভাষাটি লক্ষ্য করে মনে করেছেন, গ্রন্থটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বেনামীতে কাদম্বরী দেবীকেই উৎসর্গীকৃত। জগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছেন : 'বলাই বাহুল্য, জ্যোতিদাদার হাত দিয়ে কবির এই অঞ্জলি গিয়ে পৌঁছেছে নতুন বৌঠানেরই হাতে। তাঁকে প্রবাস-জীবনে শুধু যে সর্বাপেক্ষা অধিক মনে পড়ত তাই নয়, তাঁর প্রতি অনুরক্তির একাগ্র ঐকান্তিকতার ফলেই প্রবাসের অসংখ্য মোহবন্ধনের জাল থেকে কবি সহজেই মুক্ত হয়ে আসতে পেরেছেন।'[৬১] রবীন্দ্রজীবনী-কারও একই ইঙ্গিত করেছেন : 'কাহাকে অধিক মনে পড়িত এবং গ্রন্থখানি কাহার হস্তে সমর্পিত হইল, তাহা উৎসর্গপত্র হইতে স্পষ্ট না হইলেও অনুমান করা কঠিন নহে।'[৬১] এই ধরনের জল্পনার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের জীবন-গঠনে

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভূমিকাটি অসামান্য ছিল, তারই স্বীকৃতি উৎসর্গপত্রটিতে প্রকাশ পেয়েছে—এ কথা মেনে নিতে অসুবিধা হবার কথা নয়।

উপহার-পত্রটি সম্পর্কে আর-একটি কৌতূহলজনক তথ্য হল, এটি আখ্যাপত্র ভূমিকা ইত্যাদি ছাপা হয়ে যাওয়ার পর একটু মোটা ও আলাদা ধরনের কাগজে ঈষৎ বেগুনি রঙের কালিতে ছেপে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল।

'ভূমিকা'য় রবীন্দ্রনাথ লেখেন : 'বন্ধুদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া এই পত্রগুলি প্রকাশ করিলাম। প্রকাশ করিতে আপত্তি ছিল; কারণ কয়েকটি ছাড়া বাকি পত্রগুলি ভারতীর উদ্দেশে লিখিত হয় নাই, সুতরাং সে সমুদয়ে যথেষ্ট সাবধানের সহিত মত প্রকাশ করা যায় নাই, বিদেশীয় সমাজ প্রথম দেখিয়াই যাহা মনে হইয়াছে তাহাই ব্যক্ত করা গিয়াছে। কিন্তু ইহাতে, আর কোনো উপকার হউক বা না হউক একজন বাঙালি ইংলণ্ডে গেলে কিরূপে তাহার মত গঠিত ও পরিবর্ত্তিত হয় তাহার একটা ইতিহাস পাওয়া যায়।

'আমার মতে যে ভাষায় চিঠি লেখা উচিত সেই ভাষাতেই লেখা হইয়াছে। আত্মীয়-স্বজনদের সহিত মুখামুখি একপ্রকার ভাষায় কথা কহা ও তাঁহারা চোখের আড়াল হইবামাত্র আর-একপ্রকার ভাষায় কথা কহা কেমন অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

'পূজনীয় ভারতীর সম্পাদক মহাশয় আমার পত্রের উত্তরে তাঁহার যে-সকল অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাও পুস্তকে নিবিষ্ট হইল। সকল বিষয়েরই দুই পক্ষ আছে। উভয় পক্ষই পাঠকদের দেখা আবশ্যক।

'এই পুস্তক ছাপা হইবার সময় নানা কারণে আমি কোন মতেই নিজে তদারক করিতে পারি নাই, এই নিমিত্ত ইহাতে ভুল আছে বলিয়া সন্দেহ হইতেছে। এই অপরিহার্য্য ত্রুটি পাঠকেরা মার্জ্জনা করিবেন। গ্রন্থকার।'

রবীন্দ্রনাথ-যে গ্রন্থের মুদ্রণকার্য তদারক করতে পারেন নি, তার মূল কারণ তিনি সে-সময়ে চন্দননগরে বাস করছিলেন; তাই মুদ্রণের যাবতীয় দায়িত্ব পড়েছিল প্রকাশক বড়ো ভগ্নীপতি সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপর।

পত্রগুলি ভারতী-র বৈশাখ ১২৮৬ থেকে শ্রাবণ ১২৮৭ পর্যন্ত মোট ১৪টি সংখ্যায় মুদ্রিত হয়; কিন্তু গ্রন্থে তেরোটি পত্রের আকারে সংকলিত, যা স্পষ্টতই সম্পাদনার চিহ্ন বহন করে। সম্পাদনার আরও নিদর্শন পাওয়া যায় কিছু কিছু পত্রের পারম্পর্য পরিবর্তনে। কিন্তু এতে কোনো বিশেষ নীতি অনুসৃত হয়েছিল বলে মনে হয় না। মুদ্রিত গ্রন্থেও পত্রগুলি কালানুক্রমে সজ্জিত হয় নি, কিংবা বক্তব্যের ধারাবাহিকতাও অনুসরণ করা হয় নি—যা জীবনবৃত্তান্ত-লেখকদের পক্ষে সমস্যার সৃষ্টি করেছে। তবে সম্পাদনার পরিমাণ এইটুকুতেই সীমাবদ্ধ, মূল রচনায় কোথাও হস্তক্ষেপ করা হয় নি।

'হিতবাদীর উপহার' রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী-র অন্তর্ভুক্ত হয়ে গ্রন্থটি ১৩১১ বঙ্গাব্দে পুনর্মুদ্রিত হয়। এর বহুকাল পরে ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি-র দ্বিতীয় খণ্ডের সঙ্গে গ্রন্থটি বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত আকারে 'পাশ্চাত্য ভ্রমণ' নামে প্রকাশিত হয়। সেখানে দ্বিজেন্দ্রনাথ-রচিত পাদটীকাগুলি, ষষ্ঠ পত্রের অনেকখানি এবং সপ্তম নবম ও দশম পত্র সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়েছে; অন্যান্য পত্রেরও কয়েকটি অনুচ্ছেদ, বাক্য বা বাক্যাংশ বর্জিত হয়, অন্যবিধ সংস্কারের চিহ্নও দুর্লক্ষ্য নয়। এই পরিবর্তিত রূপটিই রবীন্দ্র-রচনাবলী-র প্রথম খণ্ডে

[১৩৪৬] সংকলিত। রবীন্দ্র-শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত ‘বিশ্বযাত্রী রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রথম সংস্করণটি পুনর্মুদ্রিত হয় [১৩৬৭], অবশ্য এটিতে পাদটীকাগুলি পত্রের শেষে সংখ্যাদিক্রমে সংকলিত ও স্পষ্ট মুদ্রণ-প্রমাদগুলি ভারতী-র পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে সংশোধিত হয়েছে।

১৪ ভাদ্র [29 Aug] তারিখের সোমপ্রকাশ-এ [২৪।৪২] গ্রন্থটির ‘বিজ্ঞাপন’ প্রকাশিত হয় : ‘ইউরোপ প্রবাসীর পত্র।/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।/(ভারতী হইতে পুস্তকাকারে পুনর্মুদ্রিত।) মূল্য—১॥০ টাকা। এই পুস্তক ক্যানিং লাইব্রেরী, সংস্কৃত প্রেস/ডিপজিটরি, ৩৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেনে প্রাপ্তব্য। শ্রীসারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।’ [ঠিকানার ভুলটি লক্ষণীয়; বিজ্ঞাপনটি ২১ ও ২৮ ভাদ্র এবং ৪ আশ্বিন-সংখ্যাতেও মুদ্রিত হয়, কিন্তু ভুলটি সংশোধিত হয় নি। সাধারণী-র ১৩, ২০ ও ২৭ ভাদ্র সংখ্যাতেও এটি মুদ্রিত হয়েছে, সেখানে অবশ্য ঠিকানায় কোনো ভুল নেই।] গ্রন্থটির কোনো সমালোচনা আমাদের চোখে পড়ে নি,* কিন্তু প্রসিদ্ধ পুস্তক-প্রকাশক ও বিক্রেতা গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় তাঁর বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরির পক্ষ থেকে ১২৯১ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথের সেই সময় পর্যন্ত প্রকাশিত পুস্তকের সমস্ত অবিক্রীত কপি কিনে নিয়ে একটি দীর্ঘ বিজ্ঞাপন দেন সোমপ্রকাশ-এর ১৪ শ্রাবণ ১২৯১ [২৮। ৩৭] সংখ্যায়—এর থেকে য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র সম্পর্কে লিখিত অংশটি আমরা উদ্ধৃত করছি, যেটি যুগপৎ বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা, যা পাঠকদেরও একই সঙ্গে সেই যুগের বিজ্ঞাপনের ভাষার নমুনা ও কৌতুকরস পরিবেশনে সক্ষম হবে:

‘ইউরোপ প্রবাসীর পত্র। যাঁহারা “ভারতী নাম্না” মাসিক পত্রিকা পড়িয়াছেন, তাঁহারাই জানেন এরূপ পত্র প্রকাশে দেশের উপকার আছে কিনা। পাঠক! যদি ঘরে বসিয়া সুসভ্য ইউরোপীয় সমাজের আচার ব্যবহার রীতি নীতি প্রভৃতি জানিতে চাহেন তবে একবার এই পুস্তকখানি পড়ুন;—ঘরে বসিয়া সাত সমুদ্র পারের ইউরোপীয় ধনী হইতে দরিদ্র বিদ্বান হইতে মূর্খ সকল সম্প্রদায়ের খবর জানিতে পারিবেন। বিলাতের প্রাকৃতিক দৃশ্য শোভার বিষয়ও খুব জানিতে পারিবেন। বিলাত বঙ্গবাসীর পক্ষে স্বর্গ—চক্ষে দেখা সকলের অদৃষ্টে ঘটিতে পারে না;—তাই বলি এই বইখানি পড়ুন। ঘরে বসিয়া সাহেব বিবির নাচ, তামাসা প্রভৃতি হইতে উচ্চ সামাজিকতার পরিচয় পর্য্যন্ত পাইবেন। যে যুবক বিলাত যাইতে ইচ্ছুক তাহারা পথের খবর প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সকল অবগত হইতে পারিবেন। কেমন করিয়া বিদেশে থাকিতে হইবে, কেমন করিয়া উষ্ণ প্রধান দেশ বাসী হিম প্রপাত সহ্য করিবেন, তাহারও উপদেশ পাইবেন। এ সম্বন্ধে বঙ্গভাষায় যতগুলি পুস্তক বাহির হইয়াছে সকলের চেয়ে এখানি ক্ষু[খু]ব ভাল হইয়াছে।’

ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৮ *[৫।৪]:*

১৪৯-৫৫ ‘কাব্যের অবস্থা পরিবর্ত্তন’ দ্র সমালোচনা অ-২।১০৫-১০

এক বৎসর আগে ‘বাঙ্গালি কবি নয়’ বা ‘বাঙ্গালি কবি নয় কেন?’ প্রবন্ধ দিয়ে—কিংবা বলা ভালো, কার্তিক ১২৮৩-তে ‘ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুখসঙ্গিনী’ প্রবন্ধ লিখে—রবীন্দ্রনাথ কাব্যের মূলতত্ত্ব নিয়ে যে আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন, বর্তমান প্রবন্ধটি সেই ধারারই অন্তর্গত। মহাকাব্যের যুগ শেষ হয়ে গিয়ে সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে খণ্ডকাব্য ও বিচিত্র রসের গীতিকাব্যের আবির্ভাব যে অবশ্যম্ভাবী, এ-প্রবন্ধেও সেই কথাই রবীন্দ্রনাথ জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন। এরই মধ্যে তাঁর নিজের

সমকালীন কবিতার বিষয়ের প্রতি প্রচ্ছন্ন সমর্থনও লক্ষিত হয় : 'এখনকার কবিতায় এমন-সকল ছায়াশরীরী মৃদুস্পর্শ কল্পনা খেলায় যাহা পুরাতন লোকদের মনেই আসিত না ও সাধারণ লোকেরা ধরিতে ছুঁইতে পারে না —এমন-সকল গূঢ়তম তত্ত্ব কবিতায় নিহিত থাকে যাহা সাধারণতঃ সকলে কবিতার অতীত বলিয়া মনে করে।'[৬২] গ্রন্থে সংকলন-কালে প্রবন্ধের কিছুটা, বিশেষ করে একটি দীর্ঘ পাদটীকা বর্জিত হয়, আমরা সেটি উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—নানাধরনের কাব্যচর্চা ও বিভিন্ন জনের সঙ্গে কাব্য নিয়ে আলোচনার ফলে রবীন্দ্রনাথের মনোজগতে কত বিচিত্র ভাবের উদয় হত উদ্ধৃতিটিতে তার খানিকটা পরিচয় আছে : 'অল্পদিন হইল একজন শ্রদ্ধাস্পদ কৃতবিদ্য ব্যক্তি [অক্ষয় চৌধুরী?] বলিতেছিলেন যে, Tennyson-এর De Profundis নামক কবিতাটি এক-তাল-আড়ম্বর-করা এক-তিল-বিষয়। অর্থাৎ যে বিষয়ের উপর অতখানি গম্ভীর কবিতাটি লিখিত হইয়াছে, সে বিষয়টি যথোপযুক্ত হয় নাই—এই বোধ করি, তাঁহার বলিবার তাৎপর্য্য। বিষয়টি আর কিছু নহে, কবি তাঁহার সন্তানের জন্মোপলক্ষে লিখিতেছেন। বোধ করি, শ্রদ্ধাস্পদ মহাশয় মনে করিয়াছেন যে একটি সন্তানের জন্মলাভ হইল, তাহা লইয়া অত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোলপাড় করিবার তাৎপর্য্য কি? কিন্তু একজন কবির চক্ষে ইহা বড় একটা সামান্য বিষয় নহে। যে মহা অতীতের মহাকারখানায় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ব্বকারণ সমূহ অযুত যুগ ধরিয়া সংঘৃষ্ট, একত্রিত, ঘূর্ণিত, বিচ্ছিন্ন হইয়া অবশেষে জগৎরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, সেই অনাদি অতীতের রাজ্যে যুগযুগান্তর ধরিয়া গঠিত, পরিবর্ত্তিত, সংস্কৃত হইয়া অবশেষে একটি শিশু আজ পৃথিবীতে আবির্ভূত হইল। কিছুকাল পূর্ব্বে সে কেহই ছিল না, আর আজ পৃথিবীর সহিত আমার সহিত তাহার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইল। বিষয়টি অতি গভীর অতি মহান্। এই কবিতাটির বিষয়ে আমাদের অনেক বক্তব্য আছে, স্বতন্ত্র প্রবন্ধে বলিবার বাসনা রহিল।'[৬৩] এই ইচ্ছা তিনি কিছুদিনের মধ্যেই কার্যে পরিণত করেন, 'ডি প্রোফণ্ডিস' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ আশ্বিন-সংখ্যা ভারতী-তে প্রকাশিত হয়। ১৭৩-৭৪ 'আশার নৈরাশ্য' ['ওরে আশা, কেন তোর হেন দীন বেশ'] দ্র সন্ধ্যাসংগীত ১।৮-৯

ভারতী ও প্রথম সংস্করণে কবিতাটিতে ৪৯টি ছত্র ছিল; তৎপরবর্তী বিভিন্নসংস্করণে বর্জন ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে রচনাবলী-তে ৩৪টি ছত্র রক্ষিত হয়। পাঠভেদ-সংবলিত সংস্করণে বর্জিত ছত্র ও পরিবর্তনগুলি সংকলিত হয়েছে।

১৭৪-৮৪ 'প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ /(বিদ্যাপতি)'

প্রবন্ধটি অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি সম্পাদিত. 'প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ' গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত 'বিদ্যাপতি' [অগ্র° ১২৮১] খণ্ডের একটি কঠোর সমালোচনা। এই গ্রন্থটির প্রকাশের সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথ এর প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করেছেন, সে-কথা আমরা যথাস্থানে উল্লেখ করেছি। কিছুদিন পূর্বেই তিনি বিদ্যাপতির 'ভরাবাদর মাহভাদর' পদটিতে মনের মতো সুর বসিয়েছিলেন। হয়তো সেই সূত্রেই 'প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ' গ্রন্থটি তিনি আর-একবার মনোযোগ দিয়ে পড়তে শুরু করেন ও সম্পাদনার বিভিন্ন ত্রুটি ও শৈথিল্য লক্ষ্য করে বর্তমান প্রবন্ধটি রচনা করেন। তিনি লেখেন : 'আমাদের আলোচ্য পুস্তকের সম্পাদক নিরলস হইয়া যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছেন কি না আমাদের সন্দেহ। রসেটি যেলীর কবিতা সমূহের যে সংস্করণ মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি প্রতি কমা ও সেমিকোলনের উপর মাথা ঘুরাইয়াছেন; ইহাতে কবির প্রতি তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ও সাধারণের সমীপে তাঁহার কর্ত্তব্য পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু এরূপ

তুলনা বৃথা। কোন বিষয়েই যাহাদের সহিত মিলে না, একটা বিশেষ বিষয়ে তাহাদের সহিত তুলনা দিতে যাওয়ার অর্থ নাই। বঙ্গদেশ ইংলণ্ড নহে, এবং সকল লোকেই রসেটি নহে।'[৬৪] এর পরে রবীন্দ্রনাথ সম্পাদকের শব্দার্থ-নির্ণয় ও ব্যাখ্যার বহু ত্রুটি প্রদর্শন করে লেখেন : 'সমস্ত পুস্তকের মধ্যে এত অসাবধানতা, এত ভ্রম লক্ষিত হয়, যে, কিয়দ্দূর পাঠ করিয়া সম্পাদকের প্রতি বিশ্বাস চলিয়া যায়। ইহার সমস্ত ভ্রম যে কেবল সম্পাদকের অক্ষমতা বশতঃ ঘটিয়াছে তাহা নহে, ইহার অনেকগুলি তাঁহার অসাবধানতা বশতঃ ঘটিয়াছে। এমন কি স্থানে স্থানে তিনি অভিধান খুলিয়া অর্থ দেখিবার পরিশ্রম টুকুও স্বীকার করেন নাই। এত অবহেলা, এত আলস্য যেখানে, সেখানে এ কাজের ভার গ্রহণ না করিলেই ভাল হইত।... আমাদের ইচ্ছা, কোন নিরলস, উৎসাহী ও কাব্যপ্রিয় সম্পাদক পুনশ্চ এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন।'[৬৫] শুধু ইচ্ছা প্রকাশ করা নয়, রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই ভার গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর সম্পাদিত 'যথাসম্ভব নির্দ্দোষ ও নির্ভুল' 'বিদ্যাপতির পদাবলী' ১৫ অগ্রহায়ণ ১২৯৩ তারিখে প্রকাশিত হবে বলে বিজ্ঞাপিতও হয়েছিল, কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে শেষ পর্য্যন্ত অপ্রকাশিত থেকে যায়। পরে তাঁর 'একখানি পুরাতন খাতা'র সাহায্যে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ১৩০১ বঙ্গাব্দে বিদ্যাপতির সটীক সংস্করণ প্রকাশ করেন।'[৬৬]

রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচনার উত্তর দেন যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়; তাঁর উত্তর ও রবীন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তর 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ/উত্তর-প্রত্যুত্তর' নামে ভাদ্র-সংখ্যা [পৃ ২২১-২৯] ভারতী-তে প্রকাশিত হয়। বিদ্যাপতির পদাবলীর অর্থ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যুক্তি খণ্ডন করার চেষ্টা করে যোগেন্দ্রনারায়ণ শেষে লেখেন : 'লেখার ভাব দেখিয়া আমাদের বোধ হইয়াছে, যে, লেখক যেন, দোষ দেখাইয়া আনন্দ লাভ করিবার জন্যই এক্ষণে সুযোগ পাইয়া এই প্রস্তাবে গাত্রের জ্বালা নিবারণ করিয়াছেন।'[৬৭] 'আমি সাহিত্যের সেবক। সাহিত্য লইয়াই অক্ষয় বাবুর সহিত বিবাদ করিয়াছি। তাহা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সাহিত্য-বহির্ভূত ব্যক্তি-গত কোন কথার উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করি নাই।'[৬৮] —এ-কথা লিখে রবীন্দ্রনাথ অভিযোগটি অস্বীকার করলেও যোগেন্দ্রনারায়ণের ইঙ্গিতটি সম্ভবত ভিত্তিহীন ছিল না। সাধারণী-সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার-লিখিত ভগ্নহৃদয়-এর পূর্বোদ্ধৃত সমালোচনা বর্তমান প্রবন্ধের পরে প্রকাশিত হলেও রুদ্রচণ্ড সম্বন্ধে অস্পষ্টতার অভিযোগ আগেই করেছিলেন। আমরা দেখি, রবীন্দ্রকাব্য সম্পর্কে অক্ষয়চন্দ্র অনুরূপ মনোভাব দীর্ঘকাল ধরে পোষণ করেছেন, কড়ি ও কোমল [১২৯৩] প্রকাশিত হলে তিনি নবজীবন পত্রিকায় উক্ত কাব্য সম্বন্ধে একই অভিযোগ করে 'কাব্যি' আখ্যা দেন। সমালোচনা-বিষয়ে কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণু রবীন্দ্রনাথ তার দীর্ঘ উত্তর দেন ভারতী ও বালক-এর চৈত্র ১২৯৩-সংখ্যায় 'কাব্য : স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট' প্রবন্ধ লিখে। সুতরাং বর্তমান ক্ষেত্রেও অনুরূপ কার্য-পরম্পরার অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব নয়।

১৮৪-৮৯ 'চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়।'

গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত এই প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ কোনো এক সময়ে গ্রন্থভুক্ত করার পরিকল্পনা করেছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত ভারতী-র পূর্বোল্লিখিত [Ms. 430 (i)] খণ্ডটিতে; সেখানে কিছু অংশ বর্জন-চিহ্নাঙ্কিত করে তিনি গ্রন্থে প্রকাশযোগ্য রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে সংগীত-বিষয়ক প্রবন্ধ দুটির মতো এটিও শেষ পর্যন্ত গ্রন্থভুক্ত হবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

এই প্রবন্ধে উদর-সেবার মতো বুদ্ধির খোরাককেও রবীন্দ্রনাথ চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করার পর 'ধূমায়ন অর্থাৎ ধোঁয়ান'-র পঞ্চম পরিচ্ছেদটি যুক্ত করতে চেয়েছেন। হাল্‌কা চালে লেখা প্রবন্ধটির কিছু কিছু অংশ আমরা এই অধ্যায়েই অন্যত্র ভিন্ন প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করেছি। 'পেয়' প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন : 'বুদ্ধিজীবী লোকদের খোরাকে কবিতাই পানীয়।...ইহা কখন মাদকের স্বরূপে তাঁহাদের মুহ্যমান দেহে চেতনার বল সঞ্চার করে, অলস শরীরে স্ফূর্ত্তি ও উদ্যমের উদ্রেক করে, সময় বিশেষে আবেশে গদগদ করিয়া দেয়। আবার কখন শীতল জল স্বরূপে সংসারের রৌদ্রদগ্ধ ব্যক্তির পিপাসা শান্তি করে, শরীর শীতল করে।...অতএব বয়স্ক বুদ্ধিজীবী লোকদের পক্ষে বুদ্ধির খাদ্য চর্ব্ব্য সকলও যেমন আবশ্যক, আবেগের পানীয় কবিতাও তেমনি উপযোগী।'[৬৯] কাব্যচর্চার সামাজিক উপযোগিতার স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন বর্ণনাটির লক্ষ্য বলে মনে হয়। আবার 'লেহ্য' প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন : 'প্রক্টর সাহেব কঠিন জ্যোতির্বিদ্যাকে পানীয় পদার্থে গলাইয়া জনসাধারণের জন্য মাঝে মাঝে প্রায় এক এক পাত্র লেহ্য প্রস্তুত করিয়া দেন। আজ কাল ইংলণ্ডে এই লেহ্য সেবনের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব পড়িয়াছে। ম্যাক্‌মিলান্‌, ব্ল্যাক্‌বুড প্রভৃতি দোকানদারেরা এইরূপ নানা প্রকার পদার্থের লেহ্য প্রস্তুত করিয়া ইংলণ্ডের ভোজন-পরায়ণদের দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছেন।'[৭০] রচনাকুশলতায় মুগ্ধ হওয়া ছাড়াও প্রক্টরের উল্লেখ আমাদের মনে একটু কৌতুকরসের সঞ্চার করে, যখন আমরা স্মরণ করি যে এই প্রক্টরের রচনার সাহায্যেই রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে পিতার সঙ্গে বোলপুর ও হিমালয় ভ্রমণকালে জ্যোতির্বিদ্যার প্রাথমিক পাঠের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন।

১৯০-৯৬ **'বিবিধ প্রসঙ্গ'** ১৯০ (১) দ্র **বিবিধ প্রসঙ্গ** অ-১।৩৯৪ [**'সংযোজনী'**]
১৯০-৯২ (২) দ্র ঐ অ-১।৩৪৩-৪৫ [**'মনের বাগান-বাড়ি'**]
১৯২-৯৩ (৩) দ্র ঐ অ-১।৩৪৫-৪৬ [**'গরীব হইবার সামর্থ্য'**]
১৯৩-৯৪ (৪) দ্র ঐ অ-১।৩৪৬-৪৮ [**'কিস্তু-ওয়ালা'**]
১৯৪-৯৫ (৫) দ্র ঐ অ-১।৩৪৮-৪৯ [**'দয়ালু মাংসাশী'**]

ভারতী-র মাঘ ১২৮৮-সংখ্যা পর্যন্ত 'বিবিধ প্রসঙ্গ'-এর অন্তর্গত রচনাগুলি কেবল সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত হয়েছিল, নামকরণ করা হয়েছে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হওয়ার সময়ে [ভাদ্র ১২৯০]। কোনো কোনো প্রসঙ্গের মধ্যে বক্তব্যের যোগ থাকলেও, বেশির ভাগই স্বতন্ত্র ভাবনা-মূলক—যেগুলি সম্পর্কে পরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'এ গ্রন্থ মনের ইতিহাসের এক অংশ। জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে মনের গঠনকার্য্য চলিতেছে।...এই গ্রন্থে এই অবিশ্রান্ত কার্য্যশীল পরিবর্ত্তমান মনের কতকটা ছায়া পড়িয়াছে। কাজেই ইহাতে বিস্তর অসম্পূর্ণ মত, বিরোধী কথা, ক্ষণস্থায়ী ভাবের নিবেশ থাকিতেও পারে।'[৭১] এইরূপ 'ক্ষণস্থায়ী ভাবের' ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায় উপরোক্ত পঞ্চম প্রসঙ্গে ['দয়ালু মাংসাশী'], যেখানে কিছুটা রাজনৈতিক চিন্তা তির্যক ভাবে অনুপ্রবেশ করেছে।

১৯৬ 'ভানুসিংহের কবিতা' ['মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান'] দ্র ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ২।২৪-২৬

অগ্র° ১২৮৭-সংখ্যা ভারতী-তে 'ভানুসিংহের কবিতা' ['সখিলো সখিলো নিকরুণ মাধব'] প্রকাশের আট মাস পরে এই কবিতাটি প্রকাশিত হতে দেখে মনে হয় এটি একটি সমসাময়িক রচনা, সম্ভবত বিদ্যাপতির পদাবলী নিয়ে নতুনভাবে চর্চা করতে গিয়ে তারই অভিঘাতে কবিতাটি লিখিত হয়। রবীন্দ্রসাহিত্যের বহু-আলোচিত কবিতাগুলির মধ্যে এটি অন্যতম।

ভারতী-র রবীন্দ্রনাথ-ব্যবহৃত খণ্ডটিতে তিনি শিরোনামটি কেটে দিয়ে কবিতার ১ম স্তম্ভের উপরে পেন্‌সিলে লিখেছেন, 'অভিসার/(ব্রজভাষা)'; এই শিরোনামে কবিতাটি ছবি ও গান [ফাল্গুন ১২৯০] কাব্যগ্রন্থে মুদ্রিত হয়। কাব্যগ্রন্থাবলী-তে [১৩০৩] কবিতাটির নূতন নামকরণ হয় 'মরণ'। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী-তে [১২৯১] কবিতাটির সুর-নির্দেশ 'পূরবী', কিন্তু রবিচ্ছায়া তে [১২৯২] 'ভৈরবী-একতালা'। গীতবিতান-এ [২।৩৪২] ৪১ ছত্রের কবিতাটি সংক্ষিপ্তাকারে গৃহীত ও স্বরবিতান ২১-এ ইন্দিরা দেবী-কৃত স্বরলিপিটি [৩০ ছত্র] সুর-নির্দেশ ছাড়া কাহার্‌বা তালে নিবদ্ধ হয়েছে।

ভারতী, ভাদ্র ১২৮৮ *[৫।৫]:*

২১৫-১৯ 'দরোয়ান'

প্রবন্ধটি স্বচ্ছন্দে 'বিবিধ প্রসঙ্গ'-এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারত।

২১৯-২০ 'শিশির' ['শিশির কাঁদিয়া শুধু বলে'] দ্র সন্ধ্যাসংগীত ১।৩৫-৩৬

মোট ৭৯ ছত্রের এই কবিতাটির মধ্যে বর্তমানে মাত্র ৩৪টি ছত্র রক্ষিত হয়েছে। পাঠভেদ-সংবলিত সংস্করণে বর্জিত ছত্রগুলি সংকলিত হয়েছে।

২২১-২৯ 'প্রাচীন 'কাব্যসংগ্রহ/উত্তর-প্রত্যুত্তর'

'প্রত্যুত্তর' অংশে 'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/প্রস্তাব লেখক' [পৃ ২২৩] পরিচিতিটি দেখতে পাওয়া যায়।

২৩৮-৪৪ **'বিবিধ প্রসঙ্গ'**	২৩৮-৩৯ (১)	দ্র	**বিবিধ প্রসঙ্গ**	অ-১।৩৬৬	['শূন্য']
	২৩৯ (২)	দ্র	ঐ	অ-১।৩৬৬-৬৭	['স্ত্রৈণ']
	২৩৯-৪০ (৩)	দ্র	ঐ	অ-১।৩৬৭-৬৮	['জমাখরচ']
	২৪০-৪১ (৪)	দ্র	ঐ	অ-১।৩৬৮-৬৯	['মনোগণিত']
	২৪১-৪২ (৫)	দ্র	ঐ	অ-১।৩৬৯-৭০	['নৌকা']
	২৪২-৪৪ (৬)	দ্র	ঐ	অ-১।৩৫৬-৫৮	['বসন্ত ও বর্ষা']

ষষ্ঠ প্রসঙ্গটি ['বসন্ত ও বর্ষা'] পরবর্তীকালে লেখা 'নববর্ষ' 'শরৎ' প্রভৃতি প্রবন্ধকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

এই মাসেই তত্ত্ববোধিনী-র [১০ম কল্প ৩য় ভাগ ৪৫৭ সংখ্যা] ৯৮ পৃষ্ঠায় 'দুই হৃদয়ের নদী একত্র মিলিল যদি' রাজনারায়ণ বসুর কন্যা লীলাবতীর বিবাহোপলক্ষে রচিত গানটি মুদ্রিত হয়।

ভারতী, আশ্বিন-কার্তিক ১২৮৮ *[৫।৬-৭]:*

২৫৪-৬২ 'ডি প্রোফণ্ডিস' দ্র সমালোচনা অ-২। ৯৭-১০৫

শ্রাবণ ১২৮৮-সংখ্যায় 'কাব্যের অবস্থা পরিবর্ত্তন' প্রবন্ধের পাদটীকায় রবীন্দ্রনাথ টেনিসনের 'De Profundis' কবিতাটির বিষয়ে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, এই প্রবন্ধটি তারই ফল। পরবর্তীকালে তিনি প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য অবলম্বনে যে অপূর্ব রসগ্রাহী আলোচনা করে বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে একটি নূতন রীতি প্রবর্তন করেছিলেন, বর্তমান প্রবন্ধটিতে তারই সূচনা বলা যায়। দুঃখের বিষয়, ইংরেজি সাহিত্য অবলম্বনে এই ধরনের প্রবন্ধ রচনা করতে তিনি পরে আর উদ্যোগী হননি। প্রবন্ধটি পরে তাঁর আধুনিক সাহিত্য [১৩১৪] গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়, কিন্তু রবীন্দ্র-রচনাবলী-তে এটি অচলিত

সংগ্রহ সমালোচনা গ্রন্থের অন্তর্গত হয়েই মুদ্রিত হয়েছে। সাহিত্যালোচনা আমাদের ক্ষেত্র-বহির্ভূত, সুতরাং প্রবন্ধটির মূল বক্তব্য নিয়ে আমরা আলোচনা করছি না—কেবল মধুসূদন বা হেমচন্দ্র-বিরচিত আধুনিক মহাকাব্যের প্রতি তাঁর বদ্ধমূল বিরূপতার দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রবন্ধের শেষাংশটি উদ্ধৃত করে দিচ্ছি : 'যাঁহারা একটা দৈত্যকে পর্ব্বত বলিলে, যষ্টিকে শালবৃক্ষ কহিলে মহান্-ভাবে হাঁ করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে, এত বড় কবিতার মহান্ ভাব উপলব্ধি করিতে পারেন না ইহাই আশ্চর্য। বস্তুগত মহান্ ভাব পর্য্যন্তই বোধ করি তাঁহাদের কল্পনার সীমা, বস্তুর অতীত মহান্ ভাব তাঁহারা আয়ত্ত করিতে পারেন না। তাহা যদি পারিতেন তবে তাঁহারা এই ক্ষুদ্র কবিতাটিকে সমস্ত 'Paradise Lost'-এর অপেক্ষা মহান্ বলিয়া বিবেচনা করিতেন।'[৭২] এর মধ্যে অক্ষয়চন্দ্র সরকার-প্রমুখ বস্তুবাদী সমালোচকদের প্রতি কটাক্ষটিও লক্ষণীয়। কটাক্ষটি যে লক্ষ্যভেদে সমর্থ হয়েছিল সাধারণী-র ১ কার্তিক [১৭।১] সংখ্যার আশ্বিন ও কার্ত্তিকের ভারতী-র 'সমালোচন' থেকেই তা বোঝা যায় : 'ইহাতে বিলাতী কবি টেনিসন বিরচিত ডি প্রোফণ্ডিস্ নামক কবিতার সুদীর্ঘ সমালোচনা আছে। বাঙ্গালা সাময়িক পত্রে ইংরাজি কবিতার ঐরূপ সমালোচন যেন অনধিকার চর্চ্চা বলিয়া বোধ হয়।'

২৮৪-৯২ 'বিবিধ প্রসঙ্গ'	২৮৪-৮৫ (১) দ্র	বিবিধ প্রসঙ্গ	অ-১।৩৯৫-৯৬	
	২৮৫-৮৬ (২) দ্র	ঐ	অ-১।৩৭১	['ফল ফুল']
	২৮৬ (৩) দ্র	ঐ	অ-১।৩৭২	['মাছ ধরা']
	২৮৬-৮৭ (৪) দ্র	ঐ	অ-১।৩৭২-৭৩	['ইচ্ছার দাম্ভিকতা']
	২৮৭-৮৮ (৫) দ্র	ঐ	অ-১।৩৭৪-৭৫	['অভিনয়']
	২৮৮-৯০ (৬) দ্র	ঐ	অ-১।৩৭৫-৭৬	['খাঁটি বিনয়']
	২৯০ (৭) দ্র	ঐ	অ-১।৩৭৭	['ধরা কথা']
	২৯১ (৮) দ্র	ঐ	অ-১।৩৭৮	['অন্ত্যোষ্টি সৎকার']
	২৯১-৯২ (৯) দ্র	ঐ	অ-১।৩৭৮-৭৯	['দ্রুত বুদ্ধি']

এই সংখ্যার প্রথম 'প্রসঙ্গটি' গ্রন্থভুক্ত হয় নি, রবীন্দ্র-রচনাবলী-তে 'সংযোজনী' অংশে মুদ্রিত হয়। ২৯৩-৩১৪ 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' প্রথম-পঞ্চম পরিচ্ছেদ দ্র বউ-ঠাকুরানীর হাট ১।৩৭৩-৯১ [প্রথম-চতুর্থ পরিচ্ছেদ]

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ শ্রাবণ ১৩৩৯-এ বউ-ঠাকুরানীর হাট-এর যে নূতন সংস্করণ প্রকাশ করেন, সেখানে ভারতী ও প্রথম সংস্করণের পাঠের পরিবর্তন সাধিত হয়। 'কোনো কোনো পরিচ্ছেদ বর্জিত হয়, কোনো পরিচ্ছেদ অংশত স্থানান্তরিত, অন্য পরিচ্ছেদের সহিত যুক্ত বা অংশত বর্জিত হয়, বিভিন্ন পরিচ্ছেদের অনেক অংশ বর্জিত বা পরিবর্ধিত হয়।'[৭৩] রবীন্দ্র-রচনাবলী-র প্রথম খণ্ডে এই সংস্করণের পাঠই সংকলিত হয়েছে। সেখানে 'গ্রন্থ পরিচয়'-প্রসঙ্গে লেখা হয় : 'প্রথম সংস্করণের প্রথম পরিচ্ছেদ বর্তমান সংস্করণে নাই; কাহিনীটির শেষ দৃশ্যের এক অংশ প্রথম পরিচ্ছেদেই নিবদ্ধ করা হইয়াছিল; তাহা চত্বারিংশ পরিচ্ছেদেও ভাষান্তরে লিপিবদ্ধ ছিল।' [১।৬৩৩] সুতরাং রচনাবলী-র প্রথম পরিচ্ছেদ বস্তুত ভারতী-তে প্রকাশিত দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের সমতুল; ফলে অন্যান্য পরিচ্ছেদের সংখ্যাতেও পরিবর্তন ঘটেছে। ভারতী-তে [যা প্রাথমিক সংস্করণগুলিতেও ছিল] তরুণ ঔপন্যাসিক যথেষ্ট নাটকীয়তার সঙ্গে কাহিনীটির সূত্রপাত করেছিলেন। 'চন্দ্রদ্বীপের (আধুনিক বাখরগঞ্জ) রাজধানী মাধবপাশা'তে রাজা রামচন্দ্রের বিবাহোৎসবের বর্ণনা দিয়ে

উপন্যাসটি সূচনা এবং ‘আলুথালু চুলে বদনে শীর্ণ ম্লান এক রমণী’ [প্রতাপাদিত্য-কন্যা ও রামচন্দ্রের প্রথমা পত্নী বিভা, নাট্যরস সৃষ্টির জন্য নামোল্লেখ করা হয় নি] ‘রাজার পা জড়াইয়া ভূতলে পড়িল...। রাজা শশব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে তুই? ভিখারিণী, ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছিস্!” রমণী নত মুখ তুলিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে রাজার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—“আজ্ঞা না মহারাজ! আমি আমার সর্ব্বস্ব দান করিতে আসিয়াছি।”[৭৪]—এই অংশটি ভাষান্তরে চত্বারিংশ পরিচ্ছেদে বর্ণনা করে কাহিনী-বৃত্ত পূর্ণ করা হয়েছিল। বর্তমানে পরিচ্ছেদটি সম্পূর্ণ বর্জিত হওয়ায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উদয়াদিত্য ও রমার কথোপকথনের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের সূচনা হয়েছে। এই পরিচ্ছেদগুলিতেও অনেক অংশ বর্জিত।

উপন্যাসটির পঞ্চম পরিচ্ছেদ [বর্তমান সংস্করণে চতুর্থ পরিচ্ছেদ] একাধিক কারণে উল্লেখযোগ্য। এখানেই বসন্ত রায় চরিত্রটির প্রধান সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যা আমাদের পূর্ব-পরিচিত শ্রীকণ্ঠ সিংহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথও জীবনস্মৃতি-র পাণ্ডুলিপিতে লিখেছিলেন, ‘আমার এই বাল্যকালের বৃদ্ধ বন্ধুটির আদর্শেই বসন্ত রায়কে আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম।’ শ্রীকণ্ঠ সিংহ ছিলেন ‘সেকালের ফারসি-পড়া রসিক মানুষ’—পাঠান হোসেন খাঁর মুখে বসন্ত রায়ের আনন্দপ্রকাশের মধ্যে সম্ভবত তাঁর স্মৃতিই প্রতিফলিত, বয়েৎগুলিও হয়তো তাঁর কাছ থেকেই সংগ্রহ করা। ‘পার্শ্বে শায়িত সহচরী সেতার’ এর উল্লেখও জীবনস্মৃতি-র বর্ণনার সঙ্গে মেলে। এইরূপ বহু সাদৃশ্য দেখে মনে হতে পারে, বসন্ত রায় চরিত্রটির মধ্যে শ্রীকণ্ঠ সিংহকে সম্পূর্ণ করে এঁকে পরে তারই আদলে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি-র ‘শ্রীকণ্ঠবাবু’ অধ্যায়টি রচনা করেছেন। জীবনস্মৃতি-র পাঠকদের কাছে পরিচিত একই ধরনের একটি বর্ণনা আমরা অন্য কারণে বউ-ঠাকুরানীর হাট থেকে উদ্ধৃত করছি : ‘ক্রমে উত্তেজনার প্রভাবে শিবিকার মধ্যে বসিয়া থাকা বসন্ত রায়ের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বাজাইতে লাগিলেন। মর্যাদা গাম্ভীর্য আত্মপর সমস্ত বিস্মৃত হইলেন ও বাজাইতে বাজাইতে অবশেষে গান ধরিলেন, “কেয়সে কাটোঙ্গী রয়ন, সো পিয়া বিনা।”[৭৫] বেহাগ-ত্রিতাল-এ নিবদ্ধ এই হিন্দী গানটি ভেঙে রবীন্দ্রনাথ বহুকাল পরে একটি ব্রহ্মসংগীত রচনা করেন—‘তিমির বিভাবরী কাটে কেমনে’ [১৩১৭ বঙ্গাব্দে মাঘোৎসবে গীত, দ্র গীতবিতান ১।১৭২]। শান্তিদেব ঘোষ গানটি সম্পর্কে লিখেছেন : “গুরুদেবকে প্রায়ই গাইতে শুনেছি বেহাগ রাগিণী হিন্দী গান—‘*ক্যায়সে* কাটোঙ্গি রয়না সো পিয়া বিনা/ একেলি জাগি সজনি আজু মোরা/নয়ন মে নিদ না আওয়ে ছোঁড়ি সৈয়াঁ॥’[*]

“এর উপরে নির্ভর ক’রে বহু বৎসর পূর্বে একটি ধর্মসংগীত লিখেছিলেন ‘তিমির বিভাবরী কাটে কেমনে জীর্ণ ভবনে, শূন্য জীবনে।’ পরে যখন ‘শাপমোচন’ লিখলেন, তখনো পেলাম ঐ গানটির অনুসরণে—‘হে বিরহী হায় চঞ্চল হিয়া তব...’।”[৭৬]

এই পরিচ্ছেদে বসন্ত রায়ের মুখে বৈষ্ণব পদাবলীর খণ্ডিতা ভাবের অনুকরণে লিখিত আট ছত্রের একটি গান দেওয়া হয়েছে—‘বঁধুয়া অসময়ে কেন হে প্রকাশ?’ গানটি রবীন্দ্রনাথের কোনো গীত-সংকলন গ্রন্থে গৃহীত হয় নি। কিন্তু প্রথম দুটি ছত্র রক্ষা ও নূতন তিনটি ছত্র যোগ করে ভিন্ন স্বাদের একটি গানের সাক্ষাৎ মেলে ১৩০০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত গানের বহি ও বাল্মীকি-প্রতিভা গ্রন্থে—এই রূপটিই প্রায়শ্চিত্ত [১৩১৬] নাটকে ও গীতবিতান-এ [৩।৭৯৮] গৃহীত হয়েছে। কিন্তু গানের বহি-তে এটির সুর-তাল ‘ইমন কল্যাণ-

ঝাঁপতাল', প্রায়শ্চিত্ত-তে 'ভূপালী-যৎ' এবং স্বরবিতান ৯-এ সংকলিত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত স্বরলিপিতে 'ইমন-ঝাঁপতাল'।

৩১৫-১৭ 'পরাজয় সঙ্গীত' ['ভাল করে যুঝিলি নে'] দ্র সন্ধ্যাসংগীত ১।৩৪-৩৫

১৩৩ ছত্রের কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্র-রচনাবলী-তে রক্ষিত ছত্র-সংখ্যা মাত্র ৪১। পাঠভেদ-সংবলিত সংস্করণে বর্জিত ছত্রগুলি ও অন্যান্য সংস্কারের ইতিহাস সংকলিত হয়েছে।

৩১৭-২১ 'জীবন ও বর্ণমালা'

অলস কল্পনা-রসে পরিপূর্ণ এই রচনাটিতে রবীন্দ্রনাথ জীবন ও বর্ণমালার সাদৃশ্য দেখিয়ে এক কৌতুকাবহ দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। এতাবৎ গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত প্রবন্ধটির সঙ্গে পাঠকদের একটি প্রাথমিক পরিচয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে আমরা এটি থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি:

'...লিখিত ভাষা-বিশেষ পড়িবার জন্যই যে বর্ণমালা বিশেষ উপযোগী তাহা নহে। তাহাতে জাতীয় জীবন প্রতিবিম্বিত থাকে।...ইংরাজদের ও আমাদের বিবাহ পদ্ধতির কি প্রভেদ, তাহা দেখিতে মনুও খুলিতে হইবে না, ইতিহাসও পড়িতে হইবে না; বর্ণমালা অনুসন্ধান করিয়া দেখ, বাহির হইয়া পড়িবে। ইংরাজী বর্ণমালায় 'L' অক্ষরের পর 'M' অর্থাৎ Love-এর পর Marriage। আমাদের বর্ণমালায় "ব"এর পর "ভ" অর্থাৎ বিবাহের পর ভালবাসা।... আসল কথা এই, সমাজ যে নিয়মে গঠিত হয়, বর্ণমালাও সেই নিয়মে গঠিত হয়।...

'আমাদের বর্ণমালায় পাঁচটি বর্গ আছে, আমাদের জীবনেও পাঁচ ভাগ আছে। কবর্গ, চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ, পবর্গ; শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্য। [৩১৮]...

'অ আ প্রভৃতি স্বর বর্ণগুলি আমাদের জীবনের অনুভাব সমূহ। এ গুলি ব্যতীত কোন ব্যঞ্জনবর্ণ দাঁড়াইতে পারে না।...মর্ত্ত্য-জীবনের বর্ণমালায় সমুদয় ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত অভাবসূচক "ক" লিপ্ত থাকে। তাহাই তাহার মূল সহচর। অদৃষ্ট আমাদের এই সকল অক্ষর সাজাইয়া এক একটা গ্রন্থ রচনা করিতেছে। কাহারো বা কাব্য হয়, কাহারো বা দর্শন হয়, কাহারো বা ছাড়া ছাড়া কতকগুলো অক্ষর-সমষ্টি হয় মাত্র, দেখিয়া মনে হয়, তাহার অদৃষ্ট হাত পাকাইবার জন্য চির জীবন কেবল মক্স করিয়াই আসিতেছে, পদ-রচনা করিতে আর শিখিল না!' [৩২০]

প্রবন্ধ শেষে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'অবশিষ্ট দুটি বর্গের কথা পরে বলিব'—হয়তো এই বিষয়ে আরও একটি প্রবন্ধ-রচনার পরিকল্পনা তাঁর মনে ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা কার্যে পরিণত হয় নি। রচনাটিকে গ্রন্থ-ভুক্ত করার কথাও তিনি এক সময়ে ভেবেছিলেন, Ms. 430 (i)-এ কিছু কিছু বর্জন-চিহ্ন তার স্বাক্ষর বহন করে।

৩২১-২৪ 'সম্পাদকের বৈঠক'

৩২১ 'রবির কিরণ হতে আড়াল করিয়া রেখে'—Swinburne

৩২১-২২ 'কেমনে কি হ'ল পারি নে বলিতে'—Christina Rossetti ['May' : 'I cannot tell you how it was']

৩২২ 'দেখিনু যে এক আশার স্বপন'—ঐ

৩২২ ‘অদৃষ্টের হাতে লেখা সূক্ষ্ম এক রেখা’—M. Arnold

৩২২-২৩ ‘ভুজ-পাশ-বদ্ধ অ্যান্টনি’ [‘এই ত আমরা দোঁহে ব’সে আছি কাছে কাছে]—

Robert Buchanan

৩২৩-২৪ ‘সেথায় কপোত-বধূ লতার আড়ালে’—Shelley

এই অনুবাদ-কবিতাগুলির মধ্যে প্রথম তিনটি কড়ি ও কোমল-এ [১২৯৩] ‘বিদেশী ফুলের গুচ্ছ’ বিভাগে এবং শেষটি প্রভাত সঙ্গীত-এ [১২৯০] ‘সম্মিলন’ (অনুবাদিত) শিরোনামে সংকলিত হয় [বিশ্বভারতী-সংস্করণ রবীন্দ্র-রচনাবলী-তে বর্জিত]; কিন্তু ম্যাথু আর্নল্ড ও রবার্ট ব্যুকাননের কবিতার অনুবাদ দুটি এ-পর্যন্ত ভারতী-র পৃষ্ঠাতেই আবদ্ধ, কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে নি।

৩৪০ ‘বিদ্যাপতির পরিশিষ্ট’

‘শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’-স্বাক্ষরিত এই রচনায় তিনি শ্রাবণ-সংখ্যায় প্রকাশিত ‘প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ/(বিদ্যাপতি)’ প্রবন্ধে ‘এ সখি, কি পেখনু এক অপরূপ’ পদটির যে অর্থ প্রকাশ করেছিলেন, সেটি সংশোধন করেছেন। তিনি এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন : ‘তাহার [উক্ত পদের] এক স্থানে অর্থ বুঝিতে গোলযোগ ঘটায় সন্দিগ্ধভাবে একটা অনুমান করিয়া-লওয়া ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। আর একবার মনোযোগ পূর্ব্বক ভাবিয়া ইহার যে অর্থ পাইয়াছি, তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কিছু নাই।’ এই সময়ে বিদ্যাপতির পদসমূহ কী গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি চর্চা করেছিলেন, রচনাটি তারই একটি নিদর্শন।

ভারতী, অগ্র° ১২৮৮ [৫।৮]:

৩৪১-৫৫ ‘বৌ-ঠাকুরাণীর হাট’, ষষ্ঠ-অষ্টম পরিচ্ছেদ দ্র বউ-ঠাকুরানীর হাট ১।৩৯২-৪০৮ [পঞ্চম-সপ্তম পরিচ্ছেদ] সপ্তম [বর্তমানে ষষ্ঠ] পরিচ্ছেদে বসন্ত রায়ের মুখে একটি সম্পূর্ণ গান ও একটি গানের কিয়দংশ ব্যবহার করা হয়েছে:

[১] ‘আজ তোমারে দেখতে এলেম’ দ্র রবিচ্ছায়া। ৪৩ [বিবিধ ৪৬, সুরনির্দেশ নেই]; গানের বহি-তে সুর-তাল ‘ভৈরবী ঝাঁপতাল’। বৌ-ঠাকুরাণীর হাট, রবিচ্ছায়া ও গানের বহি-তে একইপাঠ থাকলেও প্রায়শ্চিত্ত-তে ব্যাপক পাঠান্তর লক্ষিত হয়—নাটকের শেষে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত স্বরলিপিতেও [সুর-তাল : ভৈরবী-দাদরা] পরিবর্তিত পাঠই পাওয়া যায়; গীতবিতান-এও [২।৪১৪] এই পাঠই গৃহীত হয়েছে। কিন্তু স্বরবিতান ৯-এ উক্ত স্বরলিপিটির সঙ্গে ইন্দিরা দেবী-কৃত যে-স্বরলিপিটি মুদ্রিত হয়েছে, সেটি ভিন্ন সুরের—এখানে পূর্বতন পাঠই অনুসৃত।

[২] ‘মলিন মুখে ফুটুক্ হাসি জুড়াক্ দু নয়ন!’ উপন্যাসে গানটির মাত্র দুটি ছত্র আছে—পাঁচটি ছত্রের পূর্ণাঙ্গ গান হিসেবে এটির প্রথম আবির্ভাব প্রায়শ্চিত্ত [১৩১৬] নাটকে; এই গ্রন্থেরই শেষে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/কৃত স্বরলিপিতে সুর-তাল : ‘কাফি-কানাড়া। তেওরা’, স্বরবিতান ৯-এ এই সুরেই স্বরলিপিটি সংকলিত হয়েছে। দ্র গীতবিতান ৩।৭৯৮

৩৫৫-৬৪ ‘অদ্বৈতবাদ ও আধুনিক ইংরাজ কবি’ [?]

রবীন্দ্রজীবনী-কার প্রবন্ধটিকে রবীন্দ্রনাথের লেখা বলে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন [দ্র রবীন্দ্রজীবনী ১। ১৩৬-৩৭], কিন্তু এ-সম্পর্কে আমরা এতটা নিশ্চিত নই। কারণ লেখাটি তাঁর হলে বিষয়ের

গুরুত্ব অনুযায়ী সমালোচনা গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হওয়া অপরিহার্য ছিল, যেখানে অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ রচনাও উক্ত গ্রন্থভুক্ত হতে দেখা যায়। যদিও প্রবন্ধটির এক স্থানে পাদটীকায় 'গত সংখ্যক ভারতীতে ডি প্রোফণ্ডিস নামক প্রবন্ধ দেখ' উল্লেখ এবং 'সেলী' [এই বানানই আছে], টেনিসন, ম্যাথিউ আর্নল্ড ও ব্যুকানন [শেষোক্ত দুজনের একটি করে কবিতার অনুবাদ কার্তিক-সংখ্যা ভারতী-তে মুদ্রিত হয়েছে, কিন্তু কোনো গ্রন্থভুক্ত হয় নি] —এই চারজন প্রিয় কবির কবিতায় আলোচনা করা হয়েছে, তবু এ-ধরনের দার্শনিক আলোচনা একবিংশ বর্ষীয় রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার মানসিকতার পক্ষে ঠিক স্বাভাবিক বলে মনে হয় না। ৩৬৫-৬৬ 'গান সমাপন' ['জনমিয়া এ সংসারে কিছুই শিখি নি আর'] দ্র সন্ধ্যাসংগীত ১। ৪৩-৪৪

মূল কবিতাটির ৮৩টি ছত্রের স্থানে বর্তমানে মাত্র ৪৪টি ছত্র রক্ষিত হয়েছে। বর্জিত ছত্রগুলি পাঠভেদ-সংবলিত সংস্করণে সংকলিত।

৩৬৬-৭০ 'রেল গাড়ি'

'দরোয়ান' প্রবন্ধটির মতো এটিও একটি লঘু রসের রচনা। রেলগাড়ির রূপকটি ব্যবহার করে সরস ভঙ্গিতে সাহিত্যিকদের শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কিত ভাবনা প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু।

আমরা আগেই বলেছি, ১৬ অগ্র° [বুধ 30 Nov] দ্বিপেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতিরা ঠিক কবে চন্দননগর ত্যাগ করেছিলেন তা জানা না গেলেও, অনুমান করা যায় যে, এই বিবাহের পূর্বেই তাঁরা কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। আষাঢ় ১২৮৫-তে সর্বসুন্দরী দেবীর মৃত্যুর পর থেকেই দ্বিজেন্দ্রনাথের পরিবার গৃহিণীশূন্য, এর পূর্বেই তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা সরোজার বিবাহ হয়েছিল বৈশাখ ১২৮৩-তে। দ্বিপেন্দ্রনাথের বিবাহ দিয়ে গৃহে একটি বধূ আনার প্রয়োজন ছিল। দ্বিপেন্দ্রনাথের বয়স এই সময়ে প্রায় সাড়ে উনিশ বৎসর, ঠাকুরপরিবারে ছেলেদের বিবাহের স্বাভাবিক বয়স। কিন্তু যেটি অস্বাভাবিক লাগে সেটি হল, তাঁর চেয়ে এক বৎসর দু-মাস বড়ো পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথ অবিবাহিত থাকা সত্ত্বেও দ্বিপেন্দ্রনাথের বিবাহের অয়োজন করা। বিবাহের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের কোনো বিরূপতা ছিল বলে মনে হয় না, আর উপার্জনশীলতা অন্তত ঠাকুরপরিবারে বিবাহযোগ্যতার মাপকাঠি ছিল না দ্বিপেন্দ্রনাথ স্বয়ং তার উদাহরণ। উপযুক্ত তথ্যের অভাবে এ-রহস্যের সমাধান করা কঠিন।

ভারতী, পৌষ ১২৮৮ *[৫।৯]:*

৪০১-০৭ 'এক চোখো-সংস্কার' দ্র সমালোচনা অ-২। ১৪৫-৪৯

প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক সামাজিক ভাবনার দিক্-নির্দেশক। পারিবারিক দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, সমাজ-সংস্কার বিষয়ে সেই সমাজ ছিল মধ্যপন্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী। বর্তমান প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের মনোভাবকেই 'এক-চোখো-সংস্কার' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি লিখেছেন: 'এক দল লোক আছেন, তাঁহারা পরিবর্ত্তন মাত্রেরই বিরোধী নহেন। তাঁহারা আংশিক পরিবর্ত্তন করিতে চাহেন।...তাঁহারা বলেন, বিধবাবিবাহে আমাদের মত নাই; তবে সংস্কার করিতে হয় ত বিধবাদের অবস্থা-সংস্কার কর— ...তাঁহারা বলিবেন, —"...অনুরাগমূলক বিবাহে আমাদের আপত্তি নাই। পিতামাতাদের দ্বারা বধূ নির্ব্বাচিত না হইয়া প্রণয়াকৃষ্ট বিবাহেচ্ছুক যদি স্বয়ং আপনার উপযোগী পাত্রী স্থির করে ত ভাল হয়। কিন্তু অসবর্ণ বিবাহ নৈব নৈবচ।" তাঁহারা পুত্রের বয়স অধিক না হইলে বিবাহ দিতে

অনুমতি করেন না, কিন্তু কন্যাকে অল্প বয়সে বিবাহ দেন। তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা বুঝিয়াছেন, কিন্তু স্ত্রী-স্বাধীনতাকে ডরান। লোকাচারবিশেষের উপর তাঁহাদের বিরাগ নাই, তাহার আনুষঙ্গিক দুই একটা অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁহাদের আক্রোশ।...তাঁহারা যাহা বলেন তাহার মর্ম্ম এই—"সমস্ত বৃক্ষটির উপর আমাদের বিদ্বেষ নাই; কিন্তু উহার কতকগুলা জটিল শিকড় যত অনর্থের মূল। আমরা শুদ্ধ কেবল ঐ শিকড়গুলা ছেদন করিব। আহা গাছটি বাঁচিয়া থাক্!"[৭৭]

এই মত আদি ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত লোকেদের। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ধারণা, এ-ভাবে সমাজ-সংস্কার করা যায় না। অসবর্ণ বিবাহে আপত্তি থাকলে অনুরাগমূলক-বিবাহকে প্রশ্রয় না দেওয়াই উচিত, কারণ অনুরাগ বর্ণভেদ মানে না; সেক্ষেত্রে পিতামাতা-নির্বাচিত 'পরাধীন বিবাহপ্রথা'ই ভালো, কিন্তু তার জন্যও বাল্যবিবাহ ও অবরোধপ্রথা রক্ষা করা দরকার। নতুবা সুবিধামতো সমাজ থেকে লোকাচারের একটি ইঁট খসাতে চাইলে তার সঙ্গে আরও অনেক ইঁট খসে সমাজ-প্রাচীরে বৃহৎ ছিদ্র দেখা দেবে।

আবার আমূল-সংস্কারবাদীদের চেষ্টার বিরুদ্ধে সমাজ রুখে দাঁড়ালেও তাঁদের প্রয়াস ধীরে ধীরে ঈপ্সিত ফল প্রদান করতে থাকে। তাঁরা যখন কামান দেগে লোকাচারের প্রাচীর ধ্বংস করতে উদ্যত, তখন অন্যেরা সেখানে 'খিড়কির দরজা' বসান। এইভাবে অসংখ্য খিড়কির দরজা বসে লোকাচারের প্রাচীর যখন তার প্রাচীরত্ব হারাবে, তখন সমস্তটা ভেঙে ফেলতে কারোর আপত্তি হবে না। এইরূপ সংস্কারের দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের পরিবারেই লক্ষ্য করেছেন। তাই তিনি লিখলেন 'এইরূপ এক-চোখো সংস্কারকগণ নিজের উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে যতটা সমাজ সংস্কার করেন, এমন অল্প সংস্কারকই করিয়া থাকেন। ইঁহারা রক্ষণশীলদলভুক্ত হইয়াও উৎপাটনশীলদিগকে সাহায্য করেন।'[৭৮]

প্রবন্ধটি সাধারণভাবে পড়লে মনে হবে, রবীন্দ্রনাথ এখানে আদিব্রাহ্মসমাজীদের মধ্যপন্থাকেই সমর্থন করেছেন, রবীন্দ্রজীবনী-কারও তাই মনে করেন। [দ্র রবীন্দ্রজীবনী ১।১২১]। কিন্তু 'এক-চোখো' এই নিন্দাব্যঞ্জক বিশেষণটি বা 'নিজের উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে' 'রক্ষণশীলদলভুক্ত' ইত্যাদি শব্দপ্রয়োগ দেখে অন্যরূপ ধারণাই জন্মায়। বস্তুত প্রবন্ধটিকে তাঁর নিজের পরিবার ও সমাজের কার্যধারার বিরুদ্ধে একটি প্রচ্ছন্ন সমালোচনা বলেই মনে হয়। [দ্বিপেন্দ্রনাথের বিবাহকে কেন্দ্র করে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যে অপ্রীতিকর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছিল প্রবন্ধটি কি তারই পটভূমিকায় রচিত? দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য : ২] 'পারিবারিক দাসত্ব' প্রবন্ধে সেই সমালোচনা যতটা উগ্ররূপে প্রকাশ পেয়েছিল, এখানে তার প্রকাশ অপেক্ষাকৃত সংযত এবং আলোচনার ক্ষেত্রটিও ব্যাপকতর—এইটুকুই পার্থক্য। অবশ্য কেবল সমালোচনা-প্রবণতার জন্যই তিনি প্রবন্ধটি লিখেছিলেন তা নয়, সামাজিক সংস্কারের বিভিন্নমুখী সমস্যা নিয়ে তিনি যে চিন্তা করেছিলেন তার দৃষ্টান্ত আছে ফাল্গুন ১২৯১-সংখ্যায় প্রকাশিত 'সমস্যা' [পৃ ৪৯৩-৫০০; সমালোচনা অ-২। ১৩৭-৪৪] প্রবন্ধে, যেখানে তিনি বর্তমান প্রবন্ধটিরও উল্লেখ করেছেন। ৪০৭-০৯ 'কবিতা সাধনা' দ্র সন্ধ্যাসংগীত ১।৩-৫ ['গান আরম্ভ']

কবিতাটি সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। মূল কবিতাটি ১৩৮ ছত্রের, যার মধ্যে মাত্র ৬৩ ছত্র বর্তমানে রক্ষিত হয়েছে। বর্জিত ছত্র ও অন্যান্য পরিবর্তনের ইতিহাসের জন্য দ্র পাঠভেদ-সংবলিত সংস্করণ। ২১-২৬

৪১৪-১৮ ‘বিবিধ প্রসঙ্গ’ ৪১৪-১৬ (১) দ্র **বিবিধ প্রসঙ্গ** অ-১।৩৮২-৮৪ [‘ছোট ভাব’]
৪১৬ (২) দ্র ঐ। ৩৮৪ [‘জগতের জন্মমৃত্যু’]
৪১৭ (৩) দ্র ঐ। ৩৮৫ [‘অসংখ্য জগৎ’]
৪১৭-১৮ (৪) দ্র ঐ। ৩৮৬ [‘জগতের জমিদারী’]

৪২৯-৩৬ ‘বৌ-ঠাকুরাণীর হাট’, নবম-দশম পরিচ্ছেদ দ্র বউ-ঠাকুরানীর হাট ১।৪০৮-১৬ [অষ্টম-নবম পরিচ্ছেদ]

নবম [বর্তমানে অষ্টম] পরিচ্ছেদে বসন্ত রায়ের মুখে একটি দ্বিপদী কবিতা আছে:

‘হাসিরে পায়ে ধরে রাখিবি কেমন করে,
হাসিরে সে প্রাণের সাধ ঐ অধরে খেলা করে।’

—কবিতাটি গীতিরূপ লাভ করেছে প্রায়শ্চিত্ত নাটকে : ‘ভৈরবী-একতালা’ সুর-তালে নিবদ্ধ ‘হাসিরে কি লুকাবি লাজে’ [দ্র গীতিবিতান ২।৪২০] গানটিতে।

দশম [বর্তমানে নবম] রামমোহন মালের কণ্ঠে একটি ‘আগমনী গান’ ব্যবহার করা হয়েছে : ‘সারা বরষ দেখি নে মা, মা তুই আমার কেমন ধারা।’ দ্র কাব্যগ্রন্থাবলী। ৪৩৭, বিভাস-একতালা; প্রায়শ্চিত্ত নাটকের শেষে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত স্বরলিপিতে সুর-তাল ‘মিশ্র-একতাল’—এই স্বরলিপিটিই স্বরবিতান ৯-এ মুদ্রিত হয়েছে, তার সঙ্গে ইন্দিরা দেবীকৃত সুরভেদও সংকলিত।

ভারতী, মাঘ ১২৮৮ [৫।১০]:

৪৪০-৪৩ ‘অনুগ্রহ’ [‘এই যে জগতে হেরি আমি’] দ্র সন্ধ্যাসংগীত ১।২২-২৬

বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ১৪১ ছত্রের কবিতাটি রচনাবলী-তে ১১৪ ছত্রে পরিণত; বর্জিত ছত্রসমূহ ও পাঠান্তরের জন্য দ্র পাঠভেদ-সংবলিত সংস্করণ। ৬৫-৬৭। কবিতাটি সম্ভবত মোরান সাহেবের বাগান থেকে কলকাতায় ফিরে এসে লেখা। অনির্দিষ্ট বেদনা ও নৈরাশ্যের যে ছায়া সন্ধ্যাসংগীতের পূর্ববর্তী কবিতাগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য, এটি তার থেকে অনেকটা মুক্ত। আত্মবিশ্বাসের যে সুর কবিতাটিতে ধ্বনিত হয়েছে, তাতে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ যেন প্রভাতসংগীতের মানসিক জগতে পৌঁছে গেছেন। লক্ষণীয় যে, এই সংখ্যাতে মুদ্রিত ‘মহাস্বপ্ন’ কবিতাটি প্রভাতসংগীত-এ সংকলিত হয়েছে।

৪৪৮-৫৭ ‘বৌ-ঠাকুরাণীর হাট’ একাদশ-দ্বাদশ পরিচ্ছেদ দ্র বউ-ঠাকুরানীর হাট ১।৪১৬-২৬ [দশম-একাদশ পরিচ্ছেদ]

একাদশ [বর্তমানে দশম] পরিচ্ছেদে বসন্ত রায়ের কণ্ঠে একটি গানের দুইটি কলি ব্যবহার করা হয়েছে : ‘কবরীতে ফুল শুকাল, কাননের ফুল ফুটল বনে...’। গানটি অসম্পূর্ণ, রবিচ্ছায়া বা অন্য কোনো গীতগ্রন্থে সংকলিত হয় নি; স্বরলিপিও নেই। বর্তমানে গীতবিতান ৩য় খণ্ডের ৭৯৮ পৃষ্ঠায় ‘নাট্যগীতি’ বিভাগে গৃহীত হয়েছে।

৪৫৮-৬৪ ‘সঙ্গীত ও কবিতা’ দ্র সমালোচনা অ-২।৮৬-৯২

জ্যৈষ্ঠের ভারতী-তে মুদ্রিত বেথুন সোসাইটিতে প্রদত্ত বক্তৃতা 'সঙ্গীত ও ভাব' এবং আষাঢ়-সংখ্যায় মুদ্রিত 'সঙ্গীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা' প্রবন্ধ দুটিতে রবীন্দ্রনাথ যে আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন, বর্তমান প্রবন্ধে তারই অনুসৃতি লক্ষ্য করা যায়। প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি তা উল্লেখ করেছেন : 'আমরা ইতিপূর্ব্বে ভারতীতে সঙ্গীতকে ভাব প্রকাশের উপায় স্বরূপে উল্লেখ করিয়াছিলাম। এবারেও আমরা আর এক দিক দিয়া তাহাই করিব। আমরা কবিতাকে যে চক্ষে দেখি, সঙ্গীতকেও ঠিক সেই চক্ষে দেখিব।' কবিতা সম্পর্কে তাঁর যে মনোভাব 'কাব্যের অবস্থা পরিবর্ত্তন', 'ডি প্রোফণ্ডিস্' প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছিলেন, সেই ভাবনা এখানে সংগীতের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছে—কাব্যের মতো সংগীতেরও 'অবস্থা পরিবর্তন' তাঁর আকাঙ্ক্ষিত, এই মতই জোরের সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন। চন্দননগর থেকে কলকাতায় ফিরে বিভিন্ন আলোচনার অভিঘাতে প্রবন্ধটি রচিত হয়েছিল বলে মনে হয়।

৪৭৩-৭৭ 'বিবিধ প্রসঙ্গ' ৪৭৩-৭৪ (১) দ্র বিবিধ প্রসঙ্গ অ-১।৩৭৯-৮০ ['লজ্জাভূষণ']
৪৭৪-৭৫ (২) দ্র ঐ অ-১।৩৮০-৮১ ['ঘর ও বাসাবাড়ি']
৪৭৫ (৩) দ্র ঐ অ-১।৩৮১ ['নিরহঙ্কার আত্মম্ভরিতা']
৪৭৫ (৪) দ্র ঐ অ-১।৩৮২ ['আত্মময় আত্মবিস্মৃতি']
৪৭৫-৭৬ (৫) দ্র ঐ অ-১।৩৫৪-৫৫ [আত্মীয়ের বেড়া']
৪৭৬-৭৭ (৬) দ্র ঐ অ-১।৩৫৫-৫৬ ['বেশী দেখা ও কম দেখা']

[৪৭৮-৭৯ 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়'। এই 'ক্রমশঃ'-চিহ্নিত প্রবন্ধটিকে রবীন্দ্রজীবনী-কার রবীন্দ্রনাথের লেখা ধরে নিয়ে আলোচনা করেছেন, দ্র রবীন্দ্রজীবনী ১।১১৬; কিন্তু আমরা এ-সম্পর্কে অন্য মত পোষণ করি। প্রবন্ধটির বিষয়, বিন্যাস-পদ্ধতি, ভাষা এবং বিশেষত যে-তিনটি কাব্যাংশ রচনাটির মধ্যে রয়েছে, সেগুলি বিচার করলে এটিকে কিছুতেই রবীন্দ্রনাথের লেখা বলে ভাবা যায় না, বরং মনে হয় এটি তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনা। উদাহরণ-স্বরূপ আমরা দুটি কাব্যাংশ উদ্ধৃত করছি:

[১] ...ভূত কালে কে আর ঘুরায় মাথা
যা আছে, সকলই আছে বর্ত্তমানে,
প্রাণে প্রাণে গাঁথা।
বর্ত্তমান-জ্ঞান
ঘুরণা-সমান
তিন কালে আনে কোলে ফিরাইয়া যাঁতা॥

[২] ভূত বল কাহারে? কোথা সে? কই?
কোথাও নাহিক যদি,
কেন সে ভূতের বোঝা বই?
যা ছিল, যা' হ'বে,
না আছে তা কবে?

সবই আছে বর্ত্তমান—কি আছে তা' বই?

—অবশ্য প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল, চৈত্র ১২৮৮-সংখ্যায় তাঁর একই নামের একটি দীর্ঘ কবিতা মুদ্রিত হয়।]

৪৮০-৮৩ সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

এই বিভাগের অন্তর্গত সবক'টি গ্রন্থের সমালোচনাই রবীন্দ্রনাথ-কৃত কি না সে-বিষয়ে সংশয় থাকলেও প্রথম দুটি গ্রন্থের ['শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত' 'রাবণ-বধ দৃশ্য কাব্য' ও 'অভিমন্যু-বধ দৃশ্য কাব্য'] আলোচনা তিনিই করেছিলেন, সে-সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত। রবীন্দ্রজীবনী-কার এদের উল্লেখ না করলেও প্রবোধচন্দ্র সেন ও ড সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় সমালোচনাটিকে রবীন্দ্রনাথের লেখা ধরে নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।[৭৯] আমরাও তাঁদের সিদ্ধান্তের সমর্থক। মেঘনাদবধ কাব্য-সম্বন্ধে তাঁর বদ্ধমূল বিরূপতা রবীন্দ্রনাথ এখানেও প্রকাশ করেছেন: '...এমন কি, মাইকেলও তাঁহার মেঘনাদ বধ কাব্যে শূর-শ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ দেবকে কি বেরঙ্গে আঁকিয়াছেন!—ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয় যে, যে লক্ষ্মণকে আমরা রামায়ণে শৌর্য্যের আদর্শ স্বরূপ মনে করিয়াছিলাম,—যে লক্ষ্মণকে আমরা কেবল মাত্র মূর্ত্তিমান ভ্রাতৃ-স্নেহ ও নিঃস্বার্থ উদারতা ও বিক্রম বলিয়া ভাবিয়া আসিতেছি, সেই লক্ষ্মণকে মেঘনাদ বধ কাব্যে একজন ভীরু স্বার্থপূর্ণ—"গোঁয়ার" মাত্র দেখিলে আমাদের বুকে কি আঘাতই লাগে! কেনই বা তা হইবে না? কল্পনার আদর্শভূত একটি পশুপক্ষীরও একগাছি লোমের হানি করিলেও আমাদের সহ্য হয় না। সুখের বিষয় এই যে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র আমাদের প্রাণে সে আঘাত দেন নাই।....মাইকেল মহাশয় যেমন অকারণে লক্ষ্মণকে অসময়ে মেঘনাদের সঙ্গে যুদ্ধে মারিয়াছেন, অর্থাৎ প্রকৃত প্রস্তাবে লক্ষ্মণের ধ্বংশ[স] সাধন করিয়াছেন গিরিশবাবু অভিমন্যুকে, কি অর্জ্জুনকে, কি কৃষ্ণকে কোথাও সেরূপ হত্যা করেন নাই—ইহা তাঁহার বিশেষ গৌরব।'[৮০] গিরিশচন্দ্রের নাট্য-সংলাপের ছন্দ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন : 'আমরা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রের নূতন ধরণের অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিশেষ পক্ষপাতী। ইহাই যথার্থ অমিত্রাক্ষর ছন্দ। ইহাতে ছন্দের পূর্ণ স্বাধীনতা ও ছন্দের মিষ্টতা উভয়ই রক্ষিত হইয়াছে। কি মিত্রাক্ষরে কি অমিত্রাক্ষরে অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত ছন্দ না থাকিয়া হৃদয়ের ছন্দ প্রচলিত হয়, ইহাই আমাদের একান্ত বাসনা ও ইহাই আমরা করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। গিরিশবাবু এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করাতে আমরা অতিশয় সুখী হইলাম।'[৮১] এই অংশটুকু রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ করে চিনিয়ে দেয়। সন্ধ্যাসংগীত-এর সূচনা থেকেই তিনি প্রচলিত ছন্দোবন্ধকে 'খাতির করা' ছেড়ে দিয়েছিলেন—বর্তমান সময় থেকে, অমিত্রাক্ষরে না হোক, মিত্রাক্ষরে 'সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়', 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' প্রভৃতি কবিতায় 'হৃদয়ের ছন্দ' প্রবর্তনের প্রয়াস করেছেন। সংগীতে তিনি হৃদয়ের রাগিণী রচনার মত সমর্থন ও প্রচার করছিলেন, কবিতাতে তাই হৃদয়ের ছন্দ প্রচলনের বাসনা ও চেষ্টা তাঁর তৎকালীন মনোভাবের সঙ্গে যথেষ্ট সংগতিপূর্ণ।

১৬ শ্রাবণ [শনি 30 Jul] 'রাবণ বধ' এবং ১২ অগ্র° [শনি 26 Nov]'অভিমন্যু বধ' ন্যাশানাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়; রবীন্দ্রনাথ এই অভিনয় দেখেছিলেন কি না বলা সম্ভব নয়।

৪৮৩-৮৪ 'মহাস্বপ্ন' ['পূর্ণ করি মহাকাল পূর্ণ করি অনন্ত গগন'] দ্র প্রভাতসংগীত ১।৮০-৮২

কবিতাটি বিভিন্ন দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। অনূদিত কবিতাগুচ্ছ ছাড়া প্রভাতসংগীত-এ [১২৯০] সংকলিত কবিতাগুলির মধ্যে এইটিই প্রথম ভারতী-তে মুদ্রিত হয়েছিল। সন্ধ্যাসংগীত-এর অন্তর্গত 'সংগ্রাম-সঙ্গীত' ও

'আমি-হারা' কবিতা দুটি যদিও এর পরে ভারতী-তে মুদ্রিত হয় [যথাক্রমে ফাল্গুন ১২৮৮ ও বৈশাখ ১২৮৯-সংখ্যায়]—সম্ভবত এ-দুটি পূর্ববর্তী রচনা—তবু মনের দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে সন্ধ্যাসংগীত-এর পর্যায় পেরিয়ে এসেছেন, এই কবিতাটি তার প্রমাণ। পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'সন্ধ্যাসংগীতের পর্বে আমার মনে কেবলমাত্র হৃদয়াবেগের গদ্‌গদভাষী আন্দোলন চলছিল। প্রভাতসংগীতের ঋতুতে আপনা-আপনি দেখা দিতে আরম্ভ করেছে একটা-আধটা মননের রূপ, অর্থাৎ ফুল নয় সে, ফসলের পালা, সেও অশিক্ষিত বিনা চাষের জমিতে।'[৮২] এক ধরনের চাষ যে মনের জমিতে পড়ছিল পৌষ-সংখ্যার 'বিবিধ প্রসঙ্গ' থেকেই তার আভাস পাওয়া যায়—'জগতের জন্ম-মৃত্যু', 'অসংখ্য জগৎ', 'জগতের জমিদারী', প্রসঙ্গগুলি তার উদাহরণ। তাঁর কবিজীবনে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতা ও তার পশ্চাদ্‌বর্তী অভিজ্ঞতার গুরুত্বের কথা রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন স্থানে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন—সে গুরুত্ব তাদের আছেই—কিন্তু তারও পূর্ববর্তী একটি উপলব্ধির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন জীবনস্মৃতি-তে, তাঁর মানসিক ঋতু-পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সেটি আমাদের যথেষ্ট মূল্যবান বলে মনে হয় : 'একদিন জোড়াসাঁকোর বাড়ির ছাদের উপর অপরাহ্নের শেষে বেড়াইতেছিলাম। দিবাবসানের ম্লানিমার উপরে সূর্যাস্তের আভাটি জড়িত হইয়া সেদিনকার আসন্ন সন্ধ্যা আমার কাছে বিশেষভাবে মনোহর হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। পাশের বাড়ির দেয়ালগুলা পর্যন্ত আমার কাছে সুন্দর হইয়া উঠিল। আমি মনে-মনে ভাবিতে লাগিলাম, পরিচিত জগতের উপর হইতে এই-যে তুচ্ছতার আবরণ একেবারে উঠিয়া গেল একি কেবলমাত্র। সায়াহ্নের আলোকসম্পাতের একটি জাদুমাত্র। কখনোই তাহা নয়। আমি বেশ দেখিতে পাইলাম, ইহার আসল কারণটি এই যে, সন্ধ্যা আমারই মধ্যে আসিয়াছে—আমিই ঢাকা পড়িয়াছি। দিনের আলোতে আমিই যখন অত্যন্ত উগ্র হইয়া ছিলাম তখন যাহা কিছুকেই দেখিতে-শুনিতেছিলাম সমস্তকে আমিই জড়িত করিয়া আবৃত করিয়াছি। এখন সেই আমি সরিয়া আসিয়াছে বলিয়াই জগতকে তাহার নিজের স্বরূপে দেখিতেছি। সে-স্বরূপ কখনোই তুচ্ছ নহে—তাহা আনন্দময় সুন্দর। তাহার পর আমি মাঝে মাঝে ইচ্ছাপূর্বক নিজেকে যেন সরাইয়া ফেলিয়া জগতকে দর্শকের মতো দেখিতে চেষ্টা করিতাম, তখন মনটা খুশি হইয়া উঠিত।'[৮৩] এই ব্যাখ্যা যে নিছক পরবর্তীকালের চিন্তাপ্রসূত নয়, মাঘ-সংখ্যায় প্রকাশিত 'নিরহঙ্কার আত্মম্ভরিতা', 'আত্মময় আত্মবিস্মৃতি' বা ফাল্গুন-সংখ্যার 'প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল' প্রসঙ্গগুলি উপরের উদ্ধৃতিটির সঙ্গে মিলিয়ে পড়লেই বোঝা যায়। 'মহাস্বপ্ন' কবিতাটিকে এই উপলব্ধির পটভূমিকায় দেখলে তার যথার্থ তাৎপর্যটি অনুধাবন করা সহজ হবে বলে মনে করি।

১১ মাঘ [সোম 23 Jan 1882] আদি ব্রাহ্মসমাজের দ্বিপঞ্চাশ সাংবৎসরিক অনুষ্ঠিত হয়। গত বৎসর এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ সাতটি ব্রহ্মসংগীত রচনা করেছিলেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় বর্তমান বৎসরে তিনি এইরূপ একটি গানও লেখেননি। তত্ত্ববোধিনী-র ফাল্গুন-সংখ্যায় এই উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণগুলি শুধু মুদ্রিত হয়, কিন্তু কোনো গানের উল্লেখ দেখা যায় না। সম্ভবত পুরোনো গান দিয়েই অনুষ্ঠানসূচী রচনা করা হয়েছিল।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস লিখেছেন, 'সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ আসিয়া তাঁহাদের জোড়াসাঁকোর বাটীতে বঙ্কিমকে লইয়া যান। সেই দিন ১১ই মাঘ ছিল।'[৮৪] এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতায় ৯২ নং বউবাজার স্ট্রীটের বাড়িতে বাস করিতেন। তাঁর গৃহ তখনকার বিখ্যাত সাহিত্যিকদের সম্মিলন-ক্ষেত্র ছিল। উপরোক্ত গবেষকদ্বয় লিখেছেন, 'সেখানে প্রায় প্রত্যহই সাহিত্যিক বৈঠক বসিত; 'আনন্দমঠে'র পাণ্ডুলিপি পড়া হইত। চন্দ্রনাথ বসু, হেমচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, তারাকুমার কবিরত্ন,

বলাইচাঁদ দত্ত, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ও সঞ্জীবচন্দ্র নিয়মিত সেই আড্ডায় জুটিতেন।...'বান্ধব'-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মধ্যে মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে বঙ্কিমের নিকট যাতায়াত করিতেন।' আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথ প্রথম বঙ্কিমকে দেখেন কলেজ রি-ইউনিয়ন সভায় ১৮ মাঘ ১২৮২ [31 Jan 1876] তারিখে। তার পূর্বেই বঙ্গদর্শন-এর মাধ্যমে তিনি রবীন্দ্রনাথের মন জয় করে নিয়েছিলেন। এরপর ১৬ ফাল্গুন ১২৮৭ [12 Feb 1881] তিনি বিদ্বজ্জন-সমাগমে বাল্মীকি প্রতিভার অভিনয় দেখেন। সম্ভবত এর পরই রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয়ের জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তিনি লিখেছেন : 'একবার, যখন হাওড়ায় তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তখন সেখানে তাঁহার বাসায় সাহস করিয়া দেখা করিতে গিয়াছিলাম। দেখা হইল, যথাসাধ্য আলাপ করিবারও চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ফিরিয়া আসিবার সময় মনের মধ্যে যেন একটা লজ্জা লইয়া ফিরিলাম। অর্থাৎ, আমি যে নিতান্তই অর্বাচীন, সেইটে অনুভব করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এমন করিয়া বিনা পরিচয়ে বিনা আহ্বানে তাঁহার কাছে আসিয়া ভালো করি নাই।'[৮৫] বঙ্কিমচন্দ্র বর্ধমান ডিভিসনের কমিশনারের পার্সন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদেই হুগলী থেকে হাওড়ায় বদলি হন 14 Feb 1881 [১৮ ফাল্গুন ১২৮৭][৮৬] তারিখে অর্থাৎ বাল্মীকি প্রতিভা অভিনয়ের দুদিন পরে; সম্ভবত এর পরেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে যান এবং তাঁর গাম্ভীর্যে প্রতিহত হয়ে সংকুচিত মনে ফিরে আসেন।

চন্দননগর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর হয়তো আর-একবার রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা যে ঘটে নি তা রবীন্দ্রনাথ নিজেই ব্যক্ত করেছেন : 'বঙ্কিমবাবুর কাছে যাইতাম বটে কিন্তু বেশিকিছু কথাবার্তা হইত না। আমার তখন শুনিবার বয়স, কথা বলিবার বয়স নহে। ইচ্ছা করিত আলাপ জমিয়া উঠুক, কিন্তু সংকোচে কথা সরিত না। এক-একদিন দেখিতাম সঞ্জীববাবু [সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 1834-89] তাকিয়া অধিকার করিয়া গড়াইতেছে। তাঁহাকে দেখিলে বড়ো খুশি হইতাম। তিনি আলাপী লোক ছিলেন। গল্প করায় তাঁহার আনন্দ ছিল এবং তাঁহার মুখে গল্প শুনিতেও আনন্দ হইত।'[৮৭] বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে আকাঙ্ক্ষিত ঘনিষ্ঠতা না ঘটলেও সঞ্জীবচন্দ্র ও তখনকার অন্যান্য সাহিত্যরথীদের সঙ্গে এখানে আলাপ-পরিচয় হয়েছিল, একথা অনুমান করা যেতে পারে। সম্ভবত এই যোগাযোগই পরের বৎসর 'সারস্বত সমাজ' প্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরণা দান করেছিল। উল্লেখ্য যে, বঙ্কিমচন্দ্র উক্ত সমাজের অন্যতম সহযোগী সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

এগারোই মাঘের উৎসবে বঙ্কিমচন্দ্রের আগমনের ফলে উদ্ভূত চাঞ্চল্যের কথা বর্ণনা করেছেন সরলা দেবী : 'একবার একটা ১১ই মাঘের উৎসবে বাড়ির ছেলে-মেয়ে-গায়নমণ্ডলী আমরা গান গাইতে গাইতে, হঠাৎ অনুভব করলুম আমাদের পিছনে একটা নাড়াচাড়া সাড়াশব্দ পড়ে গেছে। কে এসেছেন? পিছন ফিরে ভিড়ের ভিতর হঠাৎ একটি চেহারা চোখে পড়ল—দীর্ঘনাসা তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল দৃষ্টি, মুখময় একটা সহাস্য জ্যোতির্ময়তা। জানলুম তিনি বঙ্কিম। যে বঙ্কিম এতদিন তাঁর বইয়ে রচনামূর্তিতে আমাকে পেয়ে বসেছিলেন আজ পেলুম তাঁকে প্রকৃতির তুলিতে হাড়েমাসে রঞ্জনা মূর্তিতে।'[৮৮] এই বর্ণনা আমাদের রবীন্দ্রনাথের প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখার কথা মনে করিয়ে দেয়। ইন্দিরা দেবীও এই আবির্ভাবের প্রসঙ্গ তাঁর অপ্রকাশিত স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন : 'ছোট বেলায় আমি রবিকার সঙ্গে ২ তাঁর সভায় এবং অন্যান্য জায়গায় চলে যেতুম। মনে আছে বঙ্কিম বাবুর বাড়ীতেও গিয়েছিলাম। তাঁর তীক্ষ্ণ নাক ও চাপা ঠোঁটের চেহারা এখনো একটু ২ মনে আনতে

পারি। তাঁর উপন্যাস তখন টাট্‌কা ২ খোলা থেকে সবে নাব্‌ছে, আর মেয়েরা নতুন ২ বই পড়বার জন্য আঁকুবাঁকু করছে। তিনি যোড়াসাঁকোর বাড়ী আসবেন শুনে বর্ণপিসিমা ওঁদের সে কি আগ্রহ। আর খড়খড়ে তুলে উঁকিঝুঁকি মেরে তাঁকে দেখবার সে কি উৎসাহ।'

চন্দননগর থেকে ফিরে এসেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্ভবত 'স্বপ্নময়ী নাটক' রচনায় হাত দেন। কৈলাসচন্দ্র সিংহের লেখা একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ থেকে রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর বউঠাকুরানীর হাট উপন্যাস রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন, আমাদের ধারণা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উক্ত নাটকটির সূত্রও তেমনি তাঁর অপর একটি প্রবন্ধ 'ক্ষিতীশ বংশাবলী-চরিত' [ভারতী, ভাদ্র ১২৮৮।১৯৭-২০৬] থেকে লাভ করেছিলেন। অবশ্য নাটকটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব খুবই সামান্য, ইতিহাসের একটি ক্ষীণ সূত্র অবলম্বন করে রোমাণ্টিক গীতিমুখর নাট্যরচনার প্রয়াসই এখানে সমধিক পরিলক্ষিত হয়। আর এই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ এই নাটক রচনায় একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। নাটকে ব্যবহৃত মোট উনিশটি গানের মধ্যে রবীন্দ্রসংগীতের সংখ্যাই পনেরোটি। তাছাড়া হিন্দুমেলার একাদশ অধিবেশন [১২৮৩] উপলক্ষে রচিত তাঁর 'দিল্লী দরবার' কবিতাটি কিছু পরিবর্তিত আকারে শুভসিংহের স্বগতোক্তি রূপে চতুর্থ অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'পূর্বদিকের চিলেকোঠার ছায়ায় জ্যোতিদাদার কফি খাওয়ার সরঞ্জাম হত সকালে। সেই সময়ে পড়ে শোনাতেন তাঁর কোনো-একটা নতুন নাটকের প্রথম খসড়া। তার মধ্যে কখনো কখনো কিছু জুড়ে দেবার জন্য আমাকেও ডাক পড়ত আমার অত্যন্ত কাঁচা হাতের লাইনের জন্যে।'[৮৯] দ্বিতীয় সংস্করণ-পুরুবিক্রম, সরোজিনী, অশ্রুমতী ও মানময়ী-তে রবীন্দ্র-রচনা ব্যবহৃত হলেও, আমাদের ধারণা, এখানে রবীন্দ্রনাথ স্বপ্নময়ী-র কথাই উল্লেখ করেছেন—এইটিতেই তাঁর হস্ত-চিহ্ন স্পষ্টতর ভাবে লক্ষিত হয়।

বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুসারে নাটকটির প্রকাশের তারিখ 24 Mar 1882 [১২ চৈত্র ১২৮৮]; 'উৎসর্গ-পত্র' : 'কবি-কুল-রত্ন শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চক্রবর্তী/সুহৃদ্বরের হস্তে আমার স্বপ্নময়ীকে/সমর্পণ করিলাম।' রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই কাব্যগুরুর উদ্দেশ্যে কোনো গ্রন্থ উৎসর্গ করেন নি, কিন্তু বর্তমান গ্রন্থে রচনাধিক্য-বশত এইটিকেই তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি ভাবতে ভালো লাগে!

স্বপ্নময়ী নাটক-এ রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত গানগুলি ব্যবহৃত হয়েছে :

[১] 'বল্ গোলাপ মোরে বল্', ২য় অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্ক, পিলু-খেম্‌টা; বালক, বৈশাখ ১২৯২-সংখ্যায় [পৃ ২০-২২] প্রতিভাসুন্দরী দেবী-কৃত গানটির স্বরলিপি প্রকাশিত হয়, তার সঙ্গে গানটির সচিত্র প্রতিলিপি লিথোগ্রাফ পদ্ধতিতে মুদ্রিত হয়, এটির প্রস্তুতকর্তা রবীন্দ্রনাথের বেঙ্গল, অ্যাকাডেমির সহপাঠী হরিশ্চন্দ্র হালদার; দ্র গীতবিতান ২।৪২২-২৩; স্বর ২০।

[২] 'আমি স্বপনে রয়েছি ভোর', ২য় অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্ক, গৌরী; দ্র গীতবিতান ৩।৮৭৭-৭৮; স্বর ৩৫।

[৩] 'আঁধার শাখা উজল করি', ২য় অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্ক, গৌড়সারং-কাওয়ালি; দ্র গীতবিতান ৩।৭৭১; স্বর ২০।

[৪] 'হৃদয় মোর কোমল অতি', ২য় অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্ক, গৌড়সারং-কাওয়ালি; দ্র গীতবিতান ৩।৮৭৬; স্বর ৩৫, ইন্দিরা দেবী-কৃত স্বরলিপিতে সুর-তাল 'মিশ্র গৌড়সারং-ঝাঁপতাল'। গানটির আদি রূপ ভগ্নহৃদয়-এর পঞ্চম সর্গে [দ্র অ-১।১৬৫-৬৬] দেখা যায়।

[৫] ‘হাসি কেন নাই ও নয়নে’, ৩য় অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্ক, সিন্ধু ঝিঁঝিট; দ্র গীতবিতান ৩।৮৭৮; স্বর ৩৫, ইন্দিরা দেবী-কৃত স্বরলিপিতে সুর-তাল ‘মিশ্র-সিন্ধু-কাহার্‌বা’।

[৬] ‘ক্ষমা কর মোরে সখি সুধায়ো না আর’, ৩য় অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্ক, ঝিঁঝিট; গানটি পূর্বেই আলোচিত।

[৭] ‘এস গো এস বনদেবতা’, ৩য় অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্ক, প্রভাতী; দ্র গীতবিতান ৩।৯৫৩, ‘গ্রন্থপরিচয়’-এর ১০১৬ পৃষ্ঠায় গানটি সম্পর্কে লিখিত হয়েছে :‘ভাব ভাষা ছন্দের বৈশিষ্ট্য এবং রবীন্দ্রজীবনের বিশেষ অনুষঙ্গ বা স্মৃতি ছাড়া ইহা যে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা সে সম্পর্কে অন্য প্রমাণ দুর্লভ।’ স্বরলিপি নেই।

[৮] ‘দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখ-গান গাহিয়ে’, ৩য় অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্ক, বাহার; দ্র গীতবিতান ৩।৮১৮; স্বর ৪৭।

[৯] ‘দে লো সখি দে পরাইয়ে চুলে’, ৩য় অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্ক, দেশ; গানটি রবিচ্ছায়া-তে নেই, বহুল পরিবর্তিত আকারে মায়ার খেলা [১২৯৫] গীতিনাট্যে ব্যবহৃত হয়েছে। গীতবিতান-এর ‘গ্রন্থপরিচয়’-এ [পৃ ১০১৭] বলা হয়েছে : ‘ইন্দিরাদেবীর অভিমত এই যে, ‘স্বপ্নময়ী’র গানটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা, অথবা অক্ষয়চন্দ্র হইলেও হইতে পারে।’ কিন্তু মায়ার খেলা-র পরিবর্তিত পাঠটি সম্বন্ধে উক্ত পাদটীকায় উল্লিখিত : ‘‘সম্পূর্ণ গানটির সম্পর্কে ‘স্বরলিপি-গীতিমালা’র সংকেতে জানি রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ, আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতের লেখায় স্পষ্টই পাই—‘‘শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’।’’ তাছাড়া ভগ্নহৃদয়-এর দ্বিতীয় সর্গের শুরুতেই নলিনীর মুখে ‘সখি! অলকচিকুরে কিশলয়-সাথে/একটি গোলাপ পরায়ে দে’ কাব্য-সংলাপটিকে আমরা এই গানের প্রাথমিক রূপ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। সুতরাং আমাদের মনে হয়, স্বপ্নময়ী ও মায়ার খেলা-র গান দুটিকে রবীন্দ্র-রচনা রূপে গ্রহণ করাই সংগত।

[১০] ‘বুঝেছি বুঝেছি সখা ভেঙেছে প্রণয়’, ৩য় অঙ্ক ৬ষ্ঠ গর্ভাঙ্ক, ভৈরবী; গানটি পূর্বেই আলোচিত।

[১১] ‘বলি গো সজনি, যেও না যেও না, ৪র্থ অঙ্ক ৩য় গর্ভাঙ্ক, খট; দ্র গীতবিতান ৩।৮৮৭; স্বর ৩২, যোগিয়া-একতাল।

[১২] ‘দেখে যা, দেখে যা, দেখে যা লো তোরা’, ৫ম অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্ক, কালাংড়া-আড়খেমটা; গানটি পূর্বেই আলোচিত।

[১৩] ‘আয় তবে সহচরি’, ৫ম অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্ক, ছায়ানট; গানটি সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

[১৪] ‘কে যেতেছিস, আয় রে হেথা’, ৫ম অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্ক, বাগেশ্রী-খেমটা; দ্র গীতবিতান ৩।৮৯০; ইন্দিরা দেবী-কৃত স্বরলিপি স্বরবিতান ৩৫-এ সংকলিত, মিশ্র বাগেশ্রী-দাদরা; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গানটির সুরকার, খেমটা তালে গ্রথিত তাঁর স্বরলিপি ‘কথা:—শ্রীর—সুর:—গ্র—’ উল্লেখ-সহ স্বরলিপি-গীতি-মালা [১৩০৪] গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল, স্বরবিতান-এর ‘সুরভেদ/ছন্দোভেদ’ বিভাগে এই স্বরলিপিটিও মুদ্রিত হয়েছে।

[১৫] ‘অনন্ত সাগর মাঝে দাও তরী ভাসাইয়া’, ৫ম অঙ্ক শেষ দৃশ্য, বাগেশ্রী; গানটি পূর্বেই আলোচিত।

এছাড়াও ৫ম অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্কে সুমতির গান ‘নিতান্ত না রইতে পেরে দেখিতে এলেম আপনি’ [রাগিণী। সর্ফদা]-র সঙ্গে বউ-ঠাকুরানীর হাট-এর ‘আজ তোমারে দেখতে এলেম’ গানটির ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য লক্ষণীয়। ৪র্থ অঙ্ক ৪র্থ গর্ভাঙ্কে শুভসিংহের উক্তি ‘দূর আকাশের তলে, ওই যে রতন জ্বলে’ কবিতাটিও রবীন্দ্ররচনা বলে মনে হয়। ২য় অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্ক, ৩য় অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্ক প্রভৃতি কয়েকটি দৃশ্য প্রায় সম্পূর্ণ কবিতা ও গানে লিখিত। এইজন্যই ড সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন : ‘নাট্যঘটনার পরিকল্পনায় ও নাটকের রচনায় কিশোর

রবীন্দ্রনাথের হাতের ও মনের ছাপ বেশ আছে।...নাটকের পদ্যাংশ প্রায় সম্পূর্ণভাবে রবীন্দ্রনাথের লেখা বলিয়া অনুমান করি।'[৯০]

ভারতী, ফাল্গুন ১২৮৮ *[৫।১১]:*

'বিবিধ প্রসঙ্গ' এই সংখ্যার আগে পর্যন্ত কেবল সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত হয়ে গুচ্ছাকারে মুদ্রিত হয়েছে, নামকরণ করা হয় গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময়ে; কিন্তু বর্তমান সংখ্যায় এগুলি শিরোনামাঙ্কিত হয়ে বিচ্ছিন্ন ভাবে মুদ্রিত হয়। আমরা এগুলিকে একত্রে সূচী-বদ্ধ করছি:

৪৯৮-৯৯	'আত্ম-সংসর্গ'	দ্র	বিবিধ প্রসঙ্গ	অ-১।৩৬২-৬৩
৫১১-১৩	'বধিরতার সুখ'	দ্র	ঐ	অ-১।৩৬৪-৬৫
৫১৫	'প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল'	দ্র	ঐ	অ-১।৩৫৮-৫৯
৫২৬-২৭	'বন্ধুত্ব ও ভালবাসা'	দ্র	ঐ	অ-১।৩৬১-৬২
৫২৮-২৯	'আদর্শ প্রেম'	দ্র	ঐ	অ-১।৩৫৯-৬০

৫০০-১১ 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট', ত্রয়োদশ-পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ দ্র বউ-ঠাকুরানীর হাট ১।৪২৭-৩৮ [দ্বাদশ-চতুর্দশ পরিচ্ছেদ]

চতুর্দশ [বর্তমানে ত্রয়োদশ] পরিচ্ছেদে বসন্তরায়ের কণ্ঠে দুটি গান শোনা যায়:

[১] 'ওরে যেতে হবে, আর দেরি নাই' দ্র গীতবিতান ২।৬০৩; স্বর ২০, ইন্দিরা দেবী-কৃত স্বরলিপির সুর-নির্দেশ 'মিশ্রললিত। আড়াঠেকা'।

[২] 'আমার যাবার সময় হল' দ্র গীতবিতান ২।৬০২; স্বর ২০, খট্-একতাল।

৫১৩-১৪ 'সংগ্রাম-সঙ্গীত' ['হৃদয়ের সাথে আজি'] দ্র সন্ধ্যাসংগীত ১।৩৭-৩৯

ভারতী ও প্রথম সংস্করণের ৯০ ছত্রের কবিতাটির বর্তমান ছত্রসংখ্যা মাত্র ৬০। ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হলেও কার্তিক সংখ্যার 'পরাজয় সঙ্গীত'-এর সঙ্গে কবিতাটি একই ভাবনাসূত্রে গ্রথিত, সেইজন্য এদের সমসাময়িক রচনা বলে মনে হয়। সম্ভবত চন্দননগর-বাসের শেষ পর্বে কবিতা দুটি রচিত হয়, বৈশাখ ১২৮৯-সংখ্যায় প্রকাশিত 'আমি-হারা'ও একই সময়ের রচনা বলে ভাবা যেতে পারে। পরবর্তীকালে কবিতাগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'ইনডেফিনিটনেসের ব্যথা—তাহাকে সন্ধ্যা বা কবিতা যাহাই বলো, ইহা লক্ষ্যহীন হৃদয়ের আবেগ। যে আবেগ ভিতরে—সে অন্তরে বিকাশ চায়। এই বিফলতার গান পরাজয়সংগীতে আছে। সেখানে জীবন যে মৃত্যুর মধ্যে বিলীন সেই নিদারুণ শূন্যতার ছায়া হইতে জাগিতে হইবে—সেই সংগ্রাম হৃদয় জগৎকে গ্রাসিতে চায়—মিলিতে চাহে না। তাহাই সংগ্রাম সঙ্গীত। সে জানিয়াছে জগৎকে—পাইতেছে না।...আমার কাব্য ও জীবনে একটা সত্য বরাবর আছে একদিকে একটা বেদনার ধারা! তাহা নিয়তই আছে। আর একদিকে এক পুরুষ এই হৃদয়াবেগকে ক্রমাগত দোষ দিতেছে। যেন একটা আকর্ষণ করে অন্যটা ধরে। মনে হয় এই যুগ্মধারা আমার মধ্যে বরাবর চলিয়াছে। যেমন বেদনা আছে, তেমনি আছে তাহাকে স্বীকার করিবার অনিচ্ছা। এই ধারা পরিস্ফুট পরাজয় সঙ্গীতে সংগ্রাম সঙ্গীতে এবং আমি-হারাতে।'[৯১]

৫১৬-২৬ 'চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি' দ্র সমালোচনা অ-২।১১০-২১

প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ-এর অন্তর্ভুক্ত বিদ্যাপতি পদাবলী দিয়ে বৈষ্ণব কাব্যের জগতে রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ করেছিলেন। এই সংগ্রহের দ্বিতীয় ভাগ চণ্ডীদাসের পদাবলী, রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত এই গ্রন্থের একটি খণ্ড শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে আছে।* এই গ্রন্থটি অবলম্বনে চণ্ডীদাসের কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে। যদিও প্রবন্ধটির শিরোনাম 'চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি', কিন্তু বিদ্যাপতির প্রসঙ্গ গৌণ, তুলনার মাধ্যমে চণ্ডীদাসের প্রেমভাবনার বিশিষ্টতাটি স্পষ্ট করার সূত্রেই বিদ্যাপতির কথা এসেছে। প্রবন্ধটির প্রকৃত মূল্য এইখানে যে, আজ পর্যন্ত চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কাব্যবিচার প্রধানত এই তরুণ সমালোচকের নির্দেশিত পথেই অগ্রসর হয়েছে। এ-বিষয়ে একটি কৌতূহলোদ্দীপক এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উল্লেখ করেছেন ড অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় রবীন্দ্র-প্রভাব' প্রবন্ধে।[৯২] দীনেশচরণ বসুর লেখা 'মানসবিকাশ' কাব্যের আলোচনা করতে গিয়ে বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮০-সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গত জয়দেব ও বিদ্যাপতির কবিপ্রকৃতির লক্ষণ বিচার করে জয়দেবকে ভোগের ও সুখের কবি এবং বিদ্যাপতিকে দুঃখের কবি হিসেবে দুই ভিন্নশ্রেণীর গীতিকবির আদর্শস্বরূপ বিবেচনা করে লেখেন : 'যাহা জয়দেব সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহা ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বর্ত্তে, যাহা বিদ্যাপতি সম্বন্ধে বলিয়াছি তাহা গোবিন্দ দাস চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের সম্বন্ধে তদ্রূপই বর্ত্তে।' এই প্রবন্ধটিরই অংশবিশেষ 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' শিরোনামে তাঁর বিবিধ সমালোচনা [1876: ১২৮৩] গ্রন্থে সংকলিত হয়। কিন্তু এই প্রবন্ধটিই যখন বিবিধ প্রবন্ধ প্রথম ভাগ-এ [1887 : ১২৯৪] মুদ্রিত হয়, তখন দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পূর্বসিদ্ধান্তের অনেকটাই পরিবর্তন করেছেন। ড ভট্টাচার্যের অনুমান যথার্থ বলেই মনে হয় যে, তরুণ রবীন্দ্রনাথের বর্তমান প্রবন্ধটিই প্রবীণ বঙ্কিমচন্দ্রের মত পরিবর্তনের অন্যতম কারণ।

৫২৭ 'গান।/ রাগিণী ইমন কল্যাণ।/কেন গো সে যেন মোরে করে না বিশ্বাস?'

দ্র রবিচ্ছায়া। ৫৩-৫৪ [বিবিধ ৫৭], মিশ্র ছায়ানট-কাওয়ালি; গীতবিতান ৩। ৮৭২ [গানের বহি-র সংক্ষিপ্ত পাঠ গৃহীত—গ্রন্থপরিচয়। ১০০৫]; স্বরবিতান ৩৫-এ ইন্দিরা দেবী-কৃত স্বরলিপিতে সুর-তাল 'মিশ্র ছায়ানট। একতাল'।

মূল গানটি ২০ ছত্রের। বিচ্ছিন্নভাবে গানটির প্রকাশ আমাদের একটু বিস্ময়াপন্ন করে। সম্ভবত স্বপ্নময়ী নাটক-এর জন্য গানটি রচিত হয়েছিল, নাটকে ব্যবহৃত না হওয়াতেই ভারতী-তে প্রকাশ করা হয়। সুরের পরিবর্তনটিও লক্ষণীয়।

৫২৯-৩২ 'সংক্ষিপ্ত সমালোচনা'

এই সংখ্যায় সমালোচিত পুস্তকগুলির মধ্যে অন্যতম গিরিশচন্দ্রের তিনটি নাটক 'আনন্দ রহো', 'সীতার বনবাস' ও 'লক্ষ্মণ বর্জন' এবং দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'ঊর্মিলা-কাব্য' ও 'নির্ঝরিণী' গীতিকাব্যের প্রথম খণ্ড। সমালোচনাগুলি রবীন্দ্রনাথের লেখা বলে মনে হয়। 'ঊর্ম্মিলা-কাব্য'-এর বিষয়বস্তু বর্ণনা করে কাব্যটির প্রশংসা করা হয় এবং নির্ঝরিণী সম্বন্ধে লিখিত হয় : 'এই কাব্য গ্রন্থ খানিতে "আঁখির মিলন" প্রভৃতি দুই একটি সুন্দর কবিতা আছে, কিন্তু সাধারণতঃ সমস্ত কবিতাগুলি তেমন ভাল নহে।' সম্ভবত এই সমালোচনা-সূত্রেই দেবেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পত্রালাপ শুরু হয়। দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'রবিবাবু আমার ফুলবালা

কাব্য ও ঊর্ম্মিলা কাব্যের পক্ষপাতী ছিলেন ও আমার নির্ঝরিণী কাব্যের "আঁখির মিলন" কবিতা তাঁহার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে আলাপ না থাকিলেও, পত্রের দ্বারায় পরিচয় ছিল। তিনি আমার ঊর্ম্মিলা কাব্যের সম্বন্ধে আমাকে লিখিয়াছিলেন, "ইহাতে স্থানে স্থানে কল্পনার খাঁটি রত্ন বসান হইয়াছে। আমি মুক্ত কণ্ঠে এ কাব্যখানির সুখ্যাতি করিতে পারি" ইত্যাদি।'[৯৩]

আমরা আগেই বলেছি যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্ভবত অগ্রহায়ণের গোড়ার দিকে চন্দননগর থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন। এরপর তিনি চৌরঙ্গির ১০নং সদর স্ট্রীটে একটি বাড়ি ভাড়া করে সেখানে সস্ত্রীক কয়েক মাস বাস করেন। ৭ বৈশাখ ১২৮৯ [বুধ 19 Apr 1882] তারিখে ক্যাশবহির একটি হিসাবে দেখা যায় : 'ব° যদুনন্দন লাল দ° চৌরঙ্গির সদর স্ট্রীটে ১০ নং বাটীতে শ্রীযুত ছোটবাবু মহাশয় থাকায় ঐ বাটীর ১২৮৮ সালের চৈত্র মাসের ভাড়া শোধ... ১৯০'—এই হিসাব থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কোন্ মাসে বাড়িটি ভাড়া করেছিলেন তা জানা না গেলেও চৈত্র ১২৮৮-তে তিনি সেখানে ছিলেন এই তথ্যটি আমরা জানতে পারি। রবীন্দ্রনাথ এখানেও তাঁদের সঙ্গী হন। তখন আট বছরের বালিকা ইন্দিরা দেবীও কিছুদিন তাঁদের সঙ্গে বাস করেছিলেন, সে-কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর অপ্রকাশিত আত্মকথা শ্রুতি ও স্মৃতিতে :'হঠাৎ মনে পড়ল যে তারও আগে জ্যোতিকামশায়ের সঙ্গে দিনকতক ১৪ (?) নং সদর স্ট্রীটের বাড়ীতে থাকার কথা ভুলে গেলে চলবে না। সেই বাড়ীর অবশিষ্ট সাদা মাটির বিলাতী পুতুল, চীনে মাটির ষ্ট্যাণ্ড্ ও বড় ২ আয়না বহুদিন পরেও আমাদের অন্যান্য বাড়ীতে ভাঙাচোরা অবস্থায় পূর্ব্ব গৌরবের মূক সাক্ষী স্বরূপ ছিল।'

বিলাত-প্রবাসের সময়ে শিশু ইন্দিরার সঙ্গে তরুণ পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথের স্নেহ-সম্পর্কের সূত্রপাত, সদর স্ট্রীটের বাড়িতে কিছুদিন একত্রবাস সেই সম্পর্ককে আরও ঘনিষ্ঠ করেছে। তখন রবীন্দ্রকাব্যে সন্ধ্যাসংগীতের পালা শেষ হয়ে প্রভাতসংগীত-এর সুর শোনা যাচ্ছে। ঠিক এই সময়টিতে ইন্দিরা দেবীর সাহচর্য তাঁর পক্ষে অত্যন্ত উপকারী হয়েছিল। সন্ধ্যাসংগীত-এ রবীন্দ্রনাথের যে প্রেম-কল্পনা হৃদয়ারণ্যের অন্ধকারে পথহারা হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে, বালিকা ইন্দিরার প্রতি স্বতোৎসারিত বাৎসল্য-প্রেম তার থেকে মুক্তির একটি পথ দেখিয়েছে মনে করলে খুব ভুল হবে না। এ-প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, প্রভাত সংগীত কাব্যগ্রন্থটি ইন্দিরা দেবীকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। 'স্নেহ-উপহার' কবিতায় 'শ্রীমতী ইন্দিরা—প্রাণাধিকাসু' সম্বোধন করে লিখেছেন:

> 'আয়রে বাছা কোলে বসে চা' মোর মুখ পানে,
> হাসি-খুসী প্রাণ খানি তোর প্রভাত ডেকে আনে।
> আমায় দেখে আসিস্ ছুটে, আমায় বাসিস্ ভালো,
> কোথা হ'তে পড়লি প্রাণে তুইরে উষার আলো!'

—দশ বছরেরও কম বয়সের [বৈশাখ ১২৯০-তে প্রভাত সঙ্গীত-এর প্রকাশ-কালে] একটি বালিকাকে এই গ্রন্থোৎসর্গ বিশেষ তাৎপর্য বহন করে বলে মনে হয়।

ভারতী, চৈত্র ১২৮৮ [৫।১২]:

৫৪০-৪৪ 'সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়' [দেশশূন্য কালশূন্য জ্যোতিঃশূন্য, মহাশূন্য 'পরি'] দ্র প্রভাত সংগীত ১।৮২-৯১

মাঘ ১২৮৮-সংখ্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথের 'সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়' নামে যে অসম্পূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, কবিতাটি তার দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবিত। কবিতাটির ছন্দও বিশিষ্টতা-পূর্ণ, মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষরের সংমিশ্রণ, নানা মাপের ছত্র-ব্যবহার, কিছুটা গিরিশচন্দ্রের নাট্যসংলাপের আদর্শ—রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'হৃদয়ের ছন্দ'—অনুসরণ করেছে। এছাড়াও লক্ষণীয় যে, ভারতী-তে মুদ্রিত কবিতাটিতে যেখানে ২৫৮টি ছত্র ছিল, গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় সেখানে ছত্র-সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৭৪—কিছু বর্জন ও অনেকটা সংযোজনে এর বর্তমান রূপটি গঠিত। এই পরিবর্তনের ইতিবৃত্তটি যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক—আশা করি সন্ধ্যাসংগীত-এর পাঠভেদ-সংবলিত সংস্করণের মতো প্রভাত সংগীত-এরও অনুরূপ একটি সংস্করণে ইতিহাসটি পাঠকের কাছে একদিন উদঘাটিত হবে।

৫৫৯-৭৩ 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' ষোড়শ-ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ দ্র বউ-ঠাকুরানীর হাট ১।৪৩৮-৪৮ [পঞ্চদশ-সপ্তদশ পরিচ্ছেদ]

বর্তমানে প্রচলিত সংস্করণে ভারতী [ও প্রথম দুটি সংস্করণের] সপ্তদশ পরিচ্ছেদ [পৃ ৫৬৩-৬৬]-টি বর্জিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের দ্বারা সংশোধিত ভারতী-তে [Ms. 430 (i)] ঊনবিংশ [বর্তমান সপ্তদশ] পরিচ্ছেদে ৫৭২ পৃষ্ঠায় [দ্র ১।৪৪৭] তাঁর স্বহস্ত-কৃত একটি সংযোজন দেখা যায় : "বিভা, বিভা, [আমার কি হইল বল্ দেখি!] শীঘ্র একবার তাঁহাকে ডাক্, আর বিলম্ব নাই"—কিন্তু তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যবর্তী এই সংযোজনটি কোনো সংস্করণে গৃহীত হয় নি।

৫৭৮-৮০ 'বিবিধ প্রসঙ্গ'

৫৭৮-৭৯ 'প্রকৃতি পুরুষ' দ্র বিবিধ প্রসঙ্গ অ-১।৩৮৬-৮৮

৫৭৯-৮০ 'জগৎ পীড়া' দ্র ঐ অ-১।৩৮৮-৯০

বিবিধ প্রসঙ্গ-এর অন্তর্ভুক্ত বর্তমান দুটি প্রসঙ্গ [এবং ফাল্গুন-সংখ্যায় মুদ্রিত প্রসঙ্গগুলিও] পূর্ববর্তীদের তুলনায় কিছুটা আলাদা। প্রথম দিকের প্রসঙ্গগুলিতে [চন্দননগরে লেখা] সন্ধ্যাসংগীত-এর কবিতার মতোই 'হৃদয়াবেগের গদ্‌গদভাষী আন্দোলন' অনুভব করা যায়, কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গগুলিতে 'মননের রূপ' প্রত্যক্ষ; 'প্রকৃতি পুরুষ' প্রসঙ্গে ঋগ্‌বেদের ১০ম মণ্ডলের ১২৯ সূক্তের ৬ষ্ঠ ঋকের শেষাংশ ও সপ্তম ঋক্‌টির পূর্ণ উদ্ধৃতি—'অথ কো বেদ যত আবভূব। ইয়ং বিসৃষ্টির্‌যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন। যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ স অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ'—এবং তার অনুবাদ মনের প্রকৃতিটিকেও স্পষ্ট করে তোলে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 'সামুদ্রিক জীব' প্রবন্ধে 'আত্মবৈ জায়তে পুত্রঃ'-এর পরে বৈদিক সাহিত্য থেকে এইটিই দ্বিতীয় উদ্ধৃতি—দীর্ঘতর ও অনুবাদ-সংবলিত।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ১

১২৮৮ বঙ্গাব্দে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা ২২ জ্যৈষ্ঠ [শুক্র 3 Jun 1881] জামাইষষ্ঠীর দিনে গিরীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র গুণেন্দ্রনাথের মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে মৃত্যু—পুত্র অবনীন্দ্রনাথ ও দৌহিত্রী প্রতিমা দেবীর স্মৃতিকথা থেকে অনুমান হয়, অতিরিক্ত মদ্যপান-জনিত অসুস্থতাই তাঁর মৃত্যুর

কারণ। জ্যেষ্ঠা কন্যা বিনয়িনী দেবীর বিবাহ স্থির করা উপলক্ষে বিরাট পার্টি দেবার পরেই তাঁর অকালমৃত্যু ঘটে [দ্র জোড়াসাঁকোর ধারে। ৬৩-৬৫] *Hindoo Patriot* [Vol. XXVIII, No. 43, 6 Jun]-এ লিখিত হয় : 'Another promising scion of an illustrious family has passed away! We are exceedingly sorry to learn that Babu Gunendranath Tagore, a grandson of the late Babu Dwarakanath Tagore, breathed his last at his villa at Champdani near Serampore, on Friday last, the 3rd instant. He was in the full bloom of life—only thirty-two years of age.' এই বিবরণের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের বর্ণনার কিছু পার্থক্য দেখা যায়। শ্রীরামপুরের নিকটে চাঁপদানির বাগান ঠাকুরপরিবারের অনেক দিনের পুরোনো সম্পত্তি, হিন্দু পেট্রিয়ট-এর সংবাদ অনুসারে এই বাগানেই গুণেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়; কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন, এই দুর্ঘটনা ঘটে নতুন-কেনা পলতার বাগানে। সঠিক তথ্যটি নির্ণয় করা দুরূহ।

মহর্ষি এই সময়ে মুসৌরী পাহাড়ে বাস করছিলেন। তিনি ১২৮৭-র অগ্রহায়ণ মাসে দার্জিলিং থেকে নেমে নৌকায় দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ফাল্গুনের কোনো সময়ে প্রথমে দেরাদুনে ও পরে মুসৌরীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখান থেকে ৭ বৈশাখ জামাতা সারদা প্রসাদকে একটি পত্রে লেখেন : 'ইন্দুকে [ইন্দুমতী] বাড়ীতে আনিয়াছ, ইহাতে আহ্লাদিত হইলাম। তাহার ছেলের অন্নপ্রাশন এখানে দিবে। তাহার নাম নিশীথনাথ রাখিলে হয়।' ৭ জ্যৈষ্ঠ যদুনাথ মুখোপাধ্যায় একটি পত্রে মহর্ষিকে জানান, 'ইন্দু ও নিত্যানন্দ [চট্টোপাধ্যায়] কটক জাত্রা করিয়াছে।' সুতরাং বৈশাখে বা জ্যৈষ্ঠের শুরুতে অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু চিত্রা দেব-সংকলিত বিস্তৃত বংশতালিকায় [দ্র ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল] ইন্দুমতী দেবীর নিশীথনাথ নামক কোনো পুত্রের উল্লেখ নেই। সম্ভবত পুত্রটি দীর্ঘজীবী হয় নি।

১৬ অগ্র° [বুধ 30 Nov 1881] তারিখে বরিশালের অন্তর্গত লাখুটিয়ার জমিদার রাখালচন্দ্র রায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুশীলার সঙ্গে দ্বিপেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। তত্ত্ব-কৌমুদী [৪।১২, ১৬ অগ্র°, পৃ ১৪৩-৪৪] লেখে : 'বিগত ৩০শে নভেম্বর কলিকাতায় বরিশালের শ্রীযুক্ত রাখাল চন্দ্র রায়ের কন্যা শ্রীমতী সুশীলার সহিত শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র শ্রীমান দ্বীপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবাহ আদি সমাজের পদ্ধতি অনুসারে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এই বিবাহে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেকে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।' উক্ত পত্রিকার ১৬ পৌষ সংখ্যা থেকে জানা যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ পুত্রের বিবাহোপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ৫০ টাকা দান করেন।

৫ মাঘ [মঙ্গল 17 Jan 1882] শরৎকুমারী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা সুশীলার বিবাহ হয়। তত্ত্ব-কৌমুদী [৪।১৫, ১ মাঘ] সংবাদটি দিয়ে লেখে : '৫ই মাঘ আদি সমাজের পদ্ধতি অনুসারে আর একটি বিবাহ হইয়াছে। পাত্রের নাম বাবু শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, নিবাস বিক্রমপুর। ইনি লাহোরের ট্রাইবিউন্ নামক সুবিখ্যাত পত্রের সম্পাদক। পাত্রীর নাম কুমারী সুশীলা। ইনি বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্রী এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্রী।...বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর আচার্য্যের কার্য্য করেন।'

এই বৎসর স্বর্ণকুমারী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরণ্ময়ী বেথুন স্কুল থেকে মধ্য ইংরেজি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ২

বৎসরের শুরুতেই আদি ব্রাহ্মসমাজের কয়েকটি সাংগঠনিক পরিবর্তন হয়। ট্রাস্টী হিসেবে এতদিন দেবেন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রনাথ কাজ করছিলেন, '১ বৈশাখ ব্রাহ্ম সংবৎ ৫২' তারিখে জানকীনাথ ঘোষালকে আর একজন ট্রাস্টী নিয়োগ করা হয়। পৌষ ১২৮৬-তে যে-কর্মচারীদের নিয়োগ করা হয়েছিল, এই তারিখে তাঁদের সঙ্গে অধ্যক্ষ হিসেবে দ্বিজেন্দ্রনাথের জামাতা মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ও গৃহীত হন [দ্র তত্ত্ব°, জ্যৈষ্ঠ। ৪০]

১১ মাঘ [সোম 23 Jan 1882] দ্বিপঞ্চাশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ অনুষ্ঠিত হয়। প্রাতে ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে শম্ভুনাথ গড়গড়ি ও বেচারাম চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন ও সায়ংকালে মহর্ষিভবনে শুধু বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ই ভাষণ দেন। এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে এ-বৎসর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ঔদাসীন্য বিস্ময়কর। সংগীতাংশ সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ না থাকাতে মনে হয় পুরোনো গানই গাওয়া হয়েছিল। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ এদিন সন্ধ্যায় নিজে এসে বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁদের বাড়িতে নিয়ে যান। *Hindoo Patriot*-এর এই দিনের সংখ্যায় [Vol. XXIX, No. 4] যথারীতি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বাক্ষরে সন্ধ্যা ৭টার পূর্বে আসন পূর্ণ হয়ে গেলেই মহর্ষিভবনে প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রিত করা হবে এই মর্মে বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশিত হয়। সুতরাং আয়োজনের কোনো ত্রুটি ছিল একথা বলা যাবে না। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ততার অভাব ছিল এটা অনুমান করা যায়। এর পশ্চাৎপটটি সম্ভবত উদঘাটিত হয়েছে সৌদামিনী দেবীকে লেখা মহর্ষির ৪ মাঘের চিঠিতে : 'তোমার আত্মাতে দেবভাবের স্ফূর্ত্তি দেখিয়াই আমাদের গৃহদেবতা পরম দেবতার নিকটে প্রতিদিন বাড়ীর সকলকে উপস্থিত করিবার ভার তোমাকে দিয়াছি। ইহা অতি গুরুতর ভার তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের বাড়ীতে এখন যে আসুরিক ভাবের প্রবলতা, ইহাতে তুমি সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও যে কৃতকার্য্য হইবে তাহাতে আমার বড় আশা নাই। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির অনুরোধে ঈশ্বরের উপাসনায় লোককে প্রবৃত্ত করা অসাধ্য ব্যাপার —...তুমি বলিয়াছ যে, "বাড়ীর প্রাত্যহিক উপাসনা এ পদ্ধতিতে ঠিক চলিতেছে না—আজ কাল ইহা অনেকটা ওষ্ঠ-গত হইয়া দাঁড়াইয়াছে—হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে না।"[৯৪] কী কারণে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির আধ্যাত্মিক আবহাওয়াটি মলিন হয়ে উঠেছিল, উপযুক্ত তথ্যের অভাবে তা অবশ্য বলা শক্ত।

মন্দির প্রতিষ্ঠার পর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তাঁদের কর্মক্ষেত্র ও প্রভাববৃদ্ধির দিকে সচেষ্ট হন। এঁদের কার্যপদ্ধতির একটি বিশেষত্ব হল আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে নানাভাবে সংযোগ রক্ষা করা। আদি সমাজও এই যোগাযোগকে স্বাগত জানায়। দ্বিপেন্দ্রনাথ ও সুশীলা দেবীর বিয়েতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেকেই নিমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করেন; কৃষ্ণকুমার মিত্রের বিবাহ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেন ও সংগীতশিক্ষা দেন। কিন্তু এক অদ্ভুত ধরনের গোঁড়ামি দুটি সম্প্রদায়ের সম্পর্ককে স্বাভাবিক হতে দেয় নি, বরং ধীরে ধীরে উভয়ের মধ্যে দূরত্বকে বাড়িয়ে তুলতে থাকে, যা পরে অনেক জটিলতার কারণ হয়। এই গোঁড়ামির সূচনা প্রধানত উভয় সম্প্রদায়ের বিবাহ পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে। আদি সমাজ অপর দুই সমাজের রেজেস্ট্রি বিবাহকে 'নিরীশ্বর বিবাহ' আখ্যা দিয়ে সমালোচনা করেছিল। ফলে আদি সমাজের সভাপতি রাজনারায়ণ বসুর কন্যা লীলাবতীর সঙ্গে যখন সাধারণ সমাজের কৃষ্ণকুমার মিত্রের উক্ত পদ্ধতিতে বিবাহ হয়, তখন পিতা রাজনারায়ণ-সহ আদি সমাজের কোনো সদস্যই এই বিবাহে যোগ দেন নি। ঘটনাটি সম্বন্ধে তত্ত্ববোধিনী-তে [ভাদ্র। ৯৮] লিখিত হয় : 'পাত্রীর বয়স সতর, পাত্রের বয়স আটাইস বৎসর।...এই বিবাহে কন্যার ইচ্ছাই বলবতী ছিল। শ্রীমান্ কৃষ্ণকুমার সুপাত্র হওয়া প্রযুক্ত শ্রদ্ধাস্পদ রাজনারায়ণ বাবু তাঁহার সহিত নিজ কন্যার বিবাহে প্রথাবধি সম্মত ছিলেন [মহর্ষি এই বিবাহের জন্য ১৮ জ্যৈষ্ঠ রাজনারায়ণ বসুকে ৪০০ টাকা সাহায্য

করেন[৯৫]]। কিন্তু যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে শ্রীমান্ কৃষ্ণকুমার আদি সমাজ-অবলম্বিত বিবাহ-পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করিতে প্রস্তুত নহেন তখন তিনি বিবাহে অসম্মতি দেন। কিন্তু কন্যা বয়স্কা এবং তজ্জন্য ভাল-মন্দ বিচারে সক্ষমা বিবেচনা করিয়া তিনি এই বিবাহে কন্যার মত জিজ্ঞাসা করেন। কন্যা এই বিবাহে সম্পূর্ণ অভিমত প্রকাশ করেন। রাজনারায়ণ বাবু নিজ কন্যার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ পূর্ব্বক তাঁহার সুখসৌভাগ্যের অন্তরায়স্বরূপ হওয়া অনুচিত বিবেচনা করিয়া কন্যারই ইচ্ছানুসারে কার্য্য হওয়া শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করেন। বিবাহ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনুমোদিত পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হওয়াতে রাজনারায়ণ বাবু ও আদি ব্রাহ্মসমাজের কোনো ব্রাহ্মই উহাতে যোগ দিতে সক্ষম হন নাই।' তত্ত্ব-কৌমুদী [৪।৪, ১৬ শ্রাবণ। ৪৫] থেকে জানা যায়, রাজনারায়ণ কন্যাকে তাঁর কুটুম্ব ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্তের কাছে প্রেরণ করেন ও তিনিই এই বিবাহে অভিভাবকের ভূমিকা গ্রহণ করেন।

একই রকম মনোভাব দেখা যায় দ্বিপেন্দ্রনাথের বিবাহের সময়; এ-বিষয়ে তত্ত্ব-কৌমুদী [৪।১২, ১৬ অগ্র°। ১৪৪] লেখে; 'এই বিবাহে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেকে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। উপবীতধারী আচার্য্য বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করাতে তাঁহারা কেহই বিচার [? বিবাহ] ক্রিয়ায় যোগ দিতে পারেন নাই। নিমন্ত্রিতদিগের মধ্যে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা বিবাহান্তে আহার প্রভৃতিতে যোগদান করিয়াছিলেন। যেখানে মতভেদ আছে সেখানে সকলে স্বাধীনভাবে কার্য্য করুন কিন্তু যে বিষয়ে মতভেদ নাই সেখানে একতা থাকাই প্রার্থনীয়।' তৎকালীন পরিবেশ অনুযায়ী শেষোক্ত মন্তব্য যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত; কিন্তু কিছুদিন পরেই সুশীলা দেবীর বিবাহ-প্রসঙ্গে তত্ত্ব-কৌমুদী-র [৪।১৫, ১ মাঘ। ১৭৮] বক্তব্যে বেশ তিক্ততা প্রকাশ পায় : 'আদিসমাজের উপবীতধারী আচার্য্যগণ বা অনানুষ্ঠানিক অপর কেহ আচার্য্যের কার্য্য করিবেন না, এই বিষয় বিবাহের পূর্ব্বে স্থির হওয়াতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ অনেক সভ্য বিবাহে যোগ দেন। বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর আচার্য্যের কার্য্য করেন। দ্বিজেন্দ্র বাবু উপবীতত্যাগী আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ইহা সকলেই জানিতেন কিন্তু বিবাহের সময় দেখা গেল তিনি উপবীত ধারণ করিয়াছেন। আমরা ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি, পূর্ব্বে একরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া কার্য্যের সময় অন্যথা করা ভাল হয় নাই। আমরা অবগত হইলাম বর ও বরপক্ষীয় সকলেই এই ব্যাপারে অত্যন্ত মনোক্লেশ পাইয়াছেন।' এই বিবৃতি থেকে বোঝা যায়, ধর্মমতের দিক দিয়ে বিশেষ কোনো পার্থক্য না থাকলেও দুই ব্রাহ্মসমাজ আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে সাম্প্রদায়িক মনোভাবকেই প্রাধান্য দিচ্ছেন এবং বিশেষ করে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বিবাহের ক্ষেত্রে জাতিভেদ প্রথাকে অস্বীকার করলেও একটি নূতন ধরনের জাতিভেদ গড়ে তুলেছেন। এই আশ্চর্যজনক স্ব-বিরোধিতা পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের জীবনেও নানাপ্রকার সংকট সৃষ্টি করেছিল।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩

রুদ্রচণ্ড নাটিকা ও ভগ্নহৃদয় কাব্যের কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য সমালোচনা আমরা এখানে উদ্ধৃত করছি।

সোমপ্রকাশ-এর সমালোচক ১৮ জ্যৈষ্ঠ [২৪।২৯।৪৫৭-৫৮] সংখ্যায় রুদ্রচণ্ড সম্পর্কে লেখেন:

'পুস্তক সমালোচনা।/রুদ্রচণ্ড। নাটিকা। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। বাল্মীকি যন্ত্রে মুদ্রিত। রবীন্দ্র বাবু একজন সুলেখক, তাঁহার কবিতা ও নাটক লিখিবার বিশেষ ক্ষমতা আছে। বাস্তবিক তিনি সমাজ ও প্রকৃতির একজন সুন্দর চিত্রকর। তাঁহার রচিত অন্যান্য গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমাদিগের হৃদয়তন্ত্র যেমন আনন্দে নৃত্য করিয়াছে রুদ্রচণ্ড পাঠে সেরূপ হয় নাই। ইহার অধিকাংশ কবিতাই অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত। ঘটনাগুলি বর্ণনা প্রসঙ্গ সঙ্গতিক্রমেই হইয়াছে, কিন্তু কবিতাগুলির স্থানে স্থানে কিছু কিছু নীরস হইয়াছে। আমরা পাঠকদের দর্শনার্থ দুই স্থান হইতে দুইটী কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

এই গ্রন্থের নায়িকা অমিয়ার সহিত চাঁদ কবির প্রণয় সঞ্চার হয়। কিন্তু অমিয়ার পিতা রুদ্রচণ্ড তাহার প্রতিবাদী হইয়া অমিয়াকে যে কথা বলিয়াছিলেন এবং অমিয়া তাহার যেরূপ উত্তর দান করেন তাহা এই—

রুদ্রচণ্ড।—/মাতৃস্তন্য কেন তোর হয় নাই বিষ।...তাহার উত্তপ্ত রক্তে করিব ক্ষালন। [দ্র অ-১।২৮২, ২য় দৃশ্য]

দৃশ্য [।] পথ। নেপথ্যে গমন [গান]।/তরু তলে ছিন্ন বৃন্ত মালতীর ফুল...ধীরে ধীরে শুকাইয়া যায়।' [দ্র অ-১।৩০২, ৮ম দৃশ্য]

১০ আশ্বিন-সংখ্যায় সাধারণী-তে প্রকাশিত ভগ্নহৃদয়-এর সমালোচনা থেকে জানা যায়, উক্ত পত্রিকায় ইতিপূর্বেই রুদ্রচণ্ড নাটিকাটি সমালোচিত হয়েছিল। জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত সাধারণী-র ফাইল ৩ জ্যৈষ্ঠ [১৬।৫] সংখ্যাটি নেই; সম্ভবত এই সংখ্যাতেই উক্ত সমালোচনাটি মুদ্রিত হয়।

সাধারণী [১৩, ২০, ২৭ ভাদ্র] এবং সোমপ্রকাশ [১৪, ২১, ২৮ ভাদ্র ও ৪ আশ্বিন] পত্রিকায় য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র-এর সঙ্গে একত্রে রুদ্রচণ্ড নাটিকা-র বিজ্ঞাপনও প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপনে বান্ধব পত্রিকা থেকে [কবিতাগুলি বাদ দিয়ে] সম্পূর্ণ সমালোচনাটি উদ্ধৃত করা হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ভগ্নহৃদয়-এর জন্য এই সময়ে কোনো বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় নি।

সোমপ্রকাশ-এর সাহিত্য-সমালোচক রুদ্রচণ্ড-এর প্রশংসা করতে না পারলেও ভগ্নহৃদয়-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন ১১ শ্রাবণ [২৪।৩৭, পৃ ৫৮৪-৮৫] সংখ্যায় :

'ভগ্নহৃদয় (গীতিকাব্য)...আমরা ইহার আদ্যন্ত পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। গ্রন্থকার নাটকের ন্যায় ইহাতে নায়ক নায়িকার নাম দিয়া এই কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকার ইহাতে প্রণয় প্রভৃতি কয়েকটি রসের চূড়ান্ত দেখাইয়াছেন। তিনি ইহার এক একটী নিপুণতার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন তদ্দর্শনে আমরা প্রীত হইয়াছি, কবিতাগুলি সরল, হৃদয়গ্রাহী ও ভাবপূর্ণ হইয়াছে। অধিকন্তু ইহার মধ্যে যে গানগুলি সংযোজিত হইয়াছে, তাহা পাঠকালে হৃদয় আরও মুগ্ধ হয়। গ্রন্থকার যে আর কিছুদিন পরে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি হইবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সাধারণের পাঠের নিমিত্ত আমরা এক স্থান হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।' ['নাচ শ্যামা, তালে তালে।...এমন সুখের কারা!'—এই দীর্ঘ অংশটি উদ্ধৃত হয়েছে।]

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৪

রাজনারায়ণ বসুর চতুর্থ কন্যা লীলা দেবীর সঙ্গে কৃষ্ণকুমার মিত্রের বিবাহোপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের গান রচনা প্রসঙ্গটি অনর্থক জটিল করে তোলা হয়েছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ড কালিদাস নাগ বা অন্যান্য গবেষকগণ যদি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র তত্ত্ব-কৌমুদী-র ১৬ শ্রাবণ [৪।৪] সংখ্যাটি দেখতেন, তাহলে এই জটিলতা অনেকটাই এড়ানো যেত। যোগীন্দ্রনাথ বসুকে লিখিত পত্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'দুই হৃদয়ের নদী' ও 'মহা গুরু, দুটি ছাত্র এসেছে তোমার' গান দুটি পাঠিয়ে আর-একটি গান পাঠানোর সম্ভাবনার কথা লিখেছিলেন। তত্ত্ববোধিনী-র ভাদ্র সংখ্যায় 'এই বিবাহ প্রসঙ্গে কোন ব্রাহ্ম সুকবি কয়েকটী সঙ্গীত রচনা করেন, তন্মধ্যে একটি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম' লিখে 'কয়েকটী সঙ্গীত'-এর মধ্যে একটি 'দুই হৃদয়ের নদী' মুদ্রিত হয়েছে, সুতরাং এই দুটি সূত্র থেকে বোঝা সম্ভব নয় রবীন্দ্রনাথ মোট ক'টি গান রচনা করেছিলেন। কিন্তু তত্ত্ব-কৌমুদী-র উক্ত সংখ্যায় বিবাহানুষ্ঠানটির চার পৃষ্ঠা [৪৪-৪৭]-ব্যাপী একটি দীর্ঘ প্রতিবেদনে পরিণয় উপলক্ষে গীত সব ক'টি গানই সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয়েছে:

[১] ঝিঁঝিট—ঠুংরি। আজি এ শুভদিনে সব বান্ধবে

[২] বারোঁয়া—ঠুংরি। আজি মনে আনন্দ অপার!

[৩] খাম্বাজ—ঠুংরি। প্রভু মঙ্গল শান্তি সুধাময় হে [শিবনাথ শাস্ত্রী]

[৪] জয় জয়ন্তি—ঝাঁপতাল। আজি এ সন্তান দুটি মিলিছে তোমার [রবীন্দ্রনাথ]

[৫] সাহানা—ঝাঁপতাল। দুই হৃদয়ের নদী [,,]

[৬] ঝিঁঝিট—একতালা। মঙ্গল আনন্দধ্বনি করলো পুরনারী।

—সমসাময়িক বিবরণ বলে এই তথ্যই গ্রহণযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে, 'জগতের পুরোহিত তুমি', 'তুমি হে প্রেমের রবি' প্রভৃতি গানগুলিও এইরূপ বিবাহানুষ্ঠানের জন্যই রচিত ও গীত হয়েছিল—কিন্তু সে-ঘটনা আরও পরবর্তীকালের, যথাস্থানে আমরা সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করব।

বর্তমান প্রসঙ্গে আরও একটি জটিল বিষয়, গায়কদলে নরেন্দ্রনাথ দত্ত বা বিবেকানন্দের অন্তর্ভুক্তি। এ-ব্যাপারে ড কালিদাস নাগ কর্তৃক উদ্ধৃত লীলাবতী দেবীর ডায়েরির অংশ ছাড়া আর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি। সংগীতবিদ্যায় নরেন্দ্রনাথের পারদর্শিতা ও সুকণ্ঠের জন্য তাঁর খ্যাতির ফলে এইরূপ অন্তর্ভুক্তি অসম্ভব নয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে তাঁকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের 'উৎসাহী সভ্য' ইত্যাদি রূপে আখ্যাত করা কতখানি সংগত এ প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। শঙ্করীপ্রসাদ বসু কেশবচন্দ্র-প্রযোজিত নববৃন্দাবন নাটকে নরেন্দ্রনাথের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ের বর্ণনার পর লিখেছেন : 'নরেন্দ্রনাথ অবশ্য শেষ পর্যন্ত কেশবের দলে থাকেন নি। কুচবিহার বিবাহকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মসমাজ বিভক্ত হয়ে গেলে তিনি সাধারণ সমাজে যোগ দেন, যার আদি সদস্যদের তিনি অন্যতম এবং কখনো সেখান থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেননি।'[৯৬] এই উক্তিকে যদি আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করি, তাহলে বলতে হয় নরেন্দ্রনাথ প্রথমে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং 15 May 1878 [২ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫] তারিখে যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় তিনি তখন ঐ সমাজের সদস্যপদ গ্রহণ করেন, যা তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে কখনোই ত্যাগ করেন নি। কিন্তু নববৃন্দাবন প্রথম অভিনীত হয়েছিল 16 Sep 1882 [১ আশ্বিন ১২৮৯][*] তারিখে, শেষ অভিনয়ের বিবরণ পাওয়া যায় 18 Jan 1883 [বৃহ ৬ মাঘ ১২৮৯] ত্রিপঞ্চাশত্তম সাংবৎসরিক উৎসবের অঙ্গ রূপে। সুতরাং এই সব অভিনয়ে

যোগদানের পর নরেন্দ্রনাথের পক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের 'আদি সদস্য'-ভুক্ত হওয়া কালগত কারণেই অসম্ভব। তাছাড়া 1878-এ সাধারণ সমাজ প্রতিষ্ঠার সময়ে নরেন্দ্রনাথ ছিলেন রায়পুরে, তাঁর বয়স তখন কিঞ্চিদধিক পনেরো বছর। অথচ উক্ত সমাজ সদস্যভুক্তির জন্য যে নিয়মাবলী প্রণয়ন করে, তাতে সদস্যপদপ্রার্থীর নিম্নতম বয়ঃসীমা ছিল আঠারো বৎসর। নূতন সদস্যকে ন্যূনপক্ষে বাৎসরিক তিন টাকা চাঁদা দিতে হত এবং কার্যনির্বাহক সমিতির দু-জন সদস্য প্রস্তাবক ও সমর্থক রূপে তাঁর আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করতেন।* এই আবেদন কার্যনির্বাহক সভায় গৃহীত হলে তবেই একজন সদস্যপদভুক্ত হতেন। এই সব বিবরণ সমাজের মুখপত্রসমূহে বিস্তারিত ভাবে প্রকাশিত হত। কিন্তু *The Brahmo Public Opinion* বা তত্ত্ব-কৌমুদী-তে মুদ্রিত কোনো বিবরণে আমরা নরেন্দ্রনাথ দত্তের নাম খুঁজে পাই নি। এমন-কি উক্ত দুটি পত্রিকার ও পরবর্তীকালে *Indian Messenger*-এর গ্রাহকমূল্য-প্রাপ্তির তালিকাতেও তাঁর নাম দেখা যায় না। এই কারণেই আমাদের মনে হয়, নরেন্দ্রনাথ কোনো দিনই আনুষ্ঠানিক ভাবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সদস্য হন নি; কিন্তু প্রবল ধর্মপিপাসা ও ঈশ্বরতত্ত্ব-জিজ্ঞাসার তাগিদে তিনি যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ছুটে গিয়েছিলেন, সেই একই তাড়নায় [ও কিছুটা সংগীতানুরাগের জন্যও] তিনি আদি ও নববিধান সমাজের উপাসনা ও অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাদিতেও উপস্থিত থাকতেন। একথা ঠিকই যে, তিনি শেষোক্ত সমাজের সঙ্গে অধিকতর ঘনিষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু তার অন্যতম কারণ ছিল উক্ত সমাজের ছাত্রশাখাগুলির ক্রমপ্রসারিত কার্যকলাপ, যার কেন্দ্রে ছিলেন আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ছাত্রদরদী নেতারা। আমাদের ধারণা, নরেন্দ্রনাথ এই সংগঠনগুলির সঙ্গেই প্রধানত জড়িত ছিলেন এবং সেই সূত্রেই শিবনাথ শাস্ত্রী কখনও কখনও তাঁর খোঁজে গৌরমোহন মুখার্জি লেনের বাড়িতে যেতেন। আর সুকণ্ঠ গায়ক হিসেবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় তাঁর উপস্থিতি যে আদরণীয় ছিল, কৃষ্ণকুমার মিত্রের বিবাহানুষ্ঠানে গায়কদলে অন্তর্ভুক্তি তার অন্যতম প্রমাণ। এই প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর প্রথম যোগাযোগ ঘটে সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমেই।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৫

পৌষ ১২৮৭-সংখ্যা ভারতী-তে কৈলাসচন্দ্র সিংহ 'বাঙ্গালার দ্বাদশ ভৌমিকের ইতিহাস' প্রবন্ধে লিখেছেন : 'কন্দর্পনারায়ণের মৃত্যুর পর, শিশু রামচন্দ্র পৈতৃক আসনে আরোহণ করেন। তিনি সুবিখ্যাত রাজা প্রতাপাদিত্যের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। বোধ হয় এই উদ্বাহ-কার্য্য কন্দর্পনারায়ণের জীবিতাবস্থায় সম্পন্ন হইয়াছিল। কিন্তু বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র ও ডাক্তার ওয়াইজ সাহেবের লিখা দ্বারা এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে না। ব্রজসুন্দর বাবু বলেন—"বিবাহার্থী রাজা বহু সমৃদ্ধি সহকারে সমারোহ পূর্ব্বক প্রতাপাদিত্যের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। রাত্রিতে বিবাহ-কার্য্য সমাপনান্তর বর কন্যা গৃহপ্রবিষ্ট হইলে, বর (রামচন্দ্র) শুনিতে পাইলেন যে, রাত্রিতে তাঁহাকে হত্যা করিয়া রাজা প্রতাপাদিত্য চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য ও বঙ্গজ কায়স্থসমাজপতিত্ব অধিকার করিবেন, তাহার সমুদয় মন্ত্রণা স্থির হইয়াছে। (কেহ বলেন, রামচন্দ্র তাঁহার নববিবাহিত পত্নীর নিকট এই কথা শুনিতে পান; কেহ বলেন, প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য বসন্তরায় তাঁহাকে এই সম্বাদ জ্ঞাপন করেন।)

রামচন্দ্র ইহাও অবগত হইলেন যে, যে খাল দিয়া গমন করিতে হয়, তাহা বৃহৎ কাষ্ঠ সকল দ্বারা রুদ্ধ করা হইয়াছে। অন্তঃপুরে রামচন্দ্র এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ভয়ে মৃতকল্প হইলেন। কিন্তু সে সময়, তাঁহার আত্মীয় ভৃত্য ও রক্ষিবর্গ বহির্ব্বাটিতে আনন্দে কালক্ষেপ করিতেছিল। তাহারা ইহার বিন্দুবিসর্গও জ্ঞাত ছিল না। পরিশেষে রাজা রামচন্দ্র তাঁহার নবোঢ়া মহিষীর (কেহ বলেন বসন্ত রায়ের) সাহায্যে অবরুদ্ধ রাজপুরী হইতে বহির্গত হইলেন। রাজা রামচন্দ্রের শরীররক্ষকদিগের নায়ক ভীমপরাক্রম রামমোহন মাল স্বীয় প্রভুর মুখে সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অনুচরবর্গের সাহায্যে তৎক্ষণাৎ রাজা রামচন্দ্রকে ৬৪ ক্ষেপণী-যুক্ত এক কোষ নৌকায় আরোপণ পূর্ব্বক কাষ্ঠ ও বৃক্ষাদি পূর্ণ খালে নৌকা টানিয়া লইয়া চলিল। বিঘ্নসঙ্কুল খাল অতিক্রম করিয়া তোপধ্বনিতে রাজা রামচন্দ্র স্বীয় শ্বশুরকে তাঁহার গমন-সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।"

'ডাক্তার ওয়াইজ সাহেবের লিখিত বিবরণ ইহার সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য নহে। তিনি বলেন, "বিবাহ-রজনীতে রাজা রামচন্দ্রের অনুচর রামাই ভাঁড় স্ত্রীবেশে প্রতাপাদিত্যের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া প্রতাপ-মহিষীর সহিত হাস্য পরিহাস করিয়াছিল। রাজা প্রতাপাদিত্য এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র ক্রোধে অধীর হইয়া নূতন জামাতার প্রাণবধে স্থিরসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু প্রতাপদুহিতা পিতৃপ্রতিজ্ঞা অবগত হইয়া রাজা রামচন্দ্রকে নির্ব্বিঘ্নে অন্তঃপুর হইতে বাহির করিয়া দিলেন। চন্দ্রদ্বীপপতি রামমোহনের বাহুবলে নির্ব্বিঘ্নে স্বীয় রাজধানীতে পহুঁছিয়াছিলেন।"

'"প্রতাপাদিত্য চরিত্র" নামক ক্ষুদ্র পুস্তকে লিখিত আছে, রাজা প্রতাপাদিত্য (বিবাহের বহুকাল পরে) লোভাক্রান্ত হইয়া জামাতৃ-রাজ্য করতলস্থ করিতে মনস্থ করেন। তিনি নিমন্ত্রণ করিয়া রাজা রামচন্দ্রকে নিজ ভবনে আনাইলেন। রামচন্দ্র শ্বশুরের কৌশলজালে রুদ্ধ হইয়া কিছুকাল যশোহরে বাস করিয়াছিলেন। অবশেষে একদা প্রতাপাদিত্য জনৈক দৌবারিককে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "কল্য প্রাতে রামচন্দ্র যখন অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইবেন, তখন তোমরা একজন যে কেউ হউক তাঁহাকে সংহার করিবে।" প্রতাপাদিত্যের এই অনুজ্ঞা তাঁহার কন্যার কর্ণগত হইলে তিনি দুঃখে মৃতকল্প হইলেন। পরে নিশাযোগে সঙ্গোপনে স্বীয় স্বামীকে সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। রাজা রামচন্দ্র পত্নীবাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীয় শ্যালক যুবরাজ উদয়াদিত্যকে আহ্বান করিলেন এবং তিনি তথায় উপনীত হইলে সবিনয়ে সমস্ত বিবরণ বিবৃত করিলেন। অনুজার রোদন ও ভগিনীপতির বিনয় বাক্যে যুবরাজের অন্তঃকর দয়ার্দ্র হইল। তিনি কৌশলে রাজা রামচন্দ্রকে তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুর হইতে নির্ব্বিঘ্নে বাহির করিয়া দিলেন। চন্দ্রদ্বীপপতি শ্যালকের কৃপায় প্রাণ রক্ষা করিলেন। বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র, ও ওয়াইজ সাহেবের লিখা হইতে মহাত্মা রামরাম বসুর লিখার অধিকাংশ সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে।...

'বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র বলেন,"রাজা রামচন্দ্র যশোহরের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া স্বীয় জীবনরক্ষিত্রী পত্নীকে হৃদয় হইতে বিসর্জ্জন করিলেন। কিন্তু কয়েক বৎসর অন্তে প্রতাপ-দুহিতা কাশী-যাত্রাচ্ছলে চন্দ্রদ্বীপে গমন করেন। তিনি মাধবপাসার নিকটবর্তী স্থানে পহুঁছিয়া নৌকাতেই রহিলেন, কেহ তাঁহাকে সমাদর পূর্ব্বক নিতে আসিল না। তাঁহার নৌকার নিকট সপ্তাহে দুইবার হাট বসিত, অদ্যাপি সেই স্থানটী "বউ ঠাকুরাণীর হাট" নামে পরিচিত রহিয়াছে। পরে তিনি সারসী গ্রামে একটি দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। এই সংবাদ রাজমাতার কর্ণগোচর হইলে তিনি স্বয়ং আসিয়া বধূকে লইয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইল না, রাজা পত্নী সন্দর্শন করিবেন [না] বলিয়া তিন দিবস দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিলেন। হতভাগিনী প্রতাপ-দুহিতা অবশেষে কাশী-

যাত্রা করিলেন।" আমাদের বিবেচনায় ব্রজসুন্দর বাবুর লিখিত বিবরণ সম্পূর্ণ সত্য নহে। রাজা রামচন্দ্রের ন্যায় একজন সুবোধ নৃপতি তাঁহার জীবনরক্ষিত্রী পত্নীর প্রতি এরূপ অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না।'

ঐতিহাসিক তাঁর বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে তথ্যপ্রমাণ-সহযোগে শেষ বিবরণটি অগ্রাহ্য করলেও রবীন্দ্রনাথ কাহিনীর বিয়োগান্ত পরিণতি ঘটাবার জন্য এটিকেই গ্রহণ করেছেন—একথা তাঁর উপন্যাস-পাঠকের অজানা নেই। তিনি ড ওয়াইজ, ব্রজসুন্দর মিত্র বা রামরাম বসুর [কিংবা তাঁর গ্রন্থটি অবলম্বনে হরিশচন্দ্র তর্কালঙ্কার কর্তৃক অপেক্ষাকৃত মার্জিত ভাষায় লিখিত গ্রন্থ] বর্ণিত ঘটনাগুলির মধ্য থেকে প্রয়োজনমতো গ্রহণ ও বর্জন করেছেন, ঐতিহাসিক তথ্যের যাথাযথ্য নিয়ে তিনি খুব বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন বলে মনে হয় না। 'বঙ্গাধিপ পরাজয়'-এর প্রথম খণ্ডটি তাঁর পড়া থাকলেও [দ্বিতীয় খণ্ড তখনো প্রকাশিত হয় নি] উপন্যাসের কাহিনী-নির্মাণে উক্ত গ্রন্থের কোনো প্রভাব দেখা যায় না।

উল্লেখপঞ্জী

১ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৮৮

২ ঐ ১৭। ৩৮১

৩ ভারতী, জ্যৈষ্ঠ। ৬৮; র° র° ১৪ [শতবার্ষিক সং]। ৮৭৯-৮০

৪ জীবনস্মৃতি [১৩৬৮]। ২৫১, 'তথ্যপঞ্জী', টীকা ১১৩॥৪

৫ জীবনস্মৃতি ১৭। ৪২৯

৬ ঐ ১৭। ৩৮৮

৭ রবীন্দ্রজীবনী ১ [১৩৯২]। ১০৭

৮ ক্ষিতিমোহন সেন-অনুলিখিত 'জীবনস্মৃতির জন্মকথা' [১৪ বৈশাখ ১৩১৮ তারিখে কথিত] : শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৮৩। ১৩

৯ 'রবীন্দ্রপরিচয়' : প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩২৯। ৫০৭

১০ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ৩। ৪১

১১ রবীন্দ্রজীবনী ১। ১০৭-০৮

১২ রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য। ২৩৩

১৩ রবীন্দ্রজীবনী ১। ১১৫

১৪ রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী। ৩৪

১৫ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৭২

১৬ রবীন্দ্রকথা [১৩৪৯]। ১৯৫

১৭ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৭২

১৮ ‘ত্রিপুর দরবারে রবীন্দ্রনাথ’, দেশীয় রাজ্য [১৩৩৫]। ২০৮-০৯

১৯ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৯৪

২০ চিঠিপত্র ৮ [১৩৭০]। ২৮৭

২১ ঐ ৮। ২৮৩

২২ ‘বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা’, সমালোচনা অ-২।৯৪

২৩ ঐ। ৯৬

২৪ ‘বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা’ : ভারতী, বৈশাখ ১২৮৮। ২৪

২৫ ‘জীবনস্মৃতির জন্মকথা’ : শারদীয়া আনন্দবাজার ১৩৮৩। ১৩

২৬ হরিহর শেঠ-সংকলিত ‘রবীন্দ্রনাথ ও চন্দননগর’ [১৩৬৮]। ১২৮

২৭ চিঠিপত্র ৩ [১৩৪৯]। ১১৫, পত্র ৪৭

২৮ রানী চন্দ, ‘গুরুদেব’ [১৩৮৭]। ৩৭

২৯ ছেলেবেলা ২৬। ৬২৩-২৪

৩০ রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা ১। ২৫৮

৩১ রবীন্দ্রসাহিত্যের আদিপর্ব। ৩৬৬-৬৮

৩২ রবীন্দ্রজীবনী ১।১১৮-১৯

৩৩ ‘জীবনস্মৃতির জন্মকথা’, শারদীয়া আনন্দবাজার ১৩৮৩।১৩

৩৪ ‘পুষ্পাঞ্জলি’, গ্রন্থপরিচয় ১৭। ৪৮৭

৩৫ রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা ১। ২৫৯

৩৬ ভারতী, জ্যৈষ্ঠ। ৮১

৩৭ *Essays Scientific, Political and Speculative*, Vol. I [1868], pp. 210-38.

৩৮ প্রিয় পুষ্পাঞ্জলি [১৩৪০]। ২১৩

৩৯ ছেলেবেলা ২৬। ৬২৪

৪০ ‘জীবনস্মৃতির জন্মকথা’, শারদীয়া আনন্দবাজার ১৩৮৩। ১৩

৪১ রবীন্দ্রনাথ ও চন্দননগর। ১৮৮

৪২ রবীন্দ্রজীবনী ১ [১৩৬৭]। ১২২

৪৩ কবিমানসী ১ [১৩৭৭]। ১৭৮

৪৪ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ১ [১৩৯২]। ১৫১; গীতবিতান : কালানুক্রমিক সূচী ১। ১৬

৪৫ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৯১

৪৬ ঐ ১৭। ৩৯১-৯২

৪৭ রবীন্দ্রনাথ ও চন্দননগর। ১৮৯

৪৮ ছেলেবেলা ২৬। ৬২৪

৪৯ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৯১

৫০ ‘জীবনস্মৃতির জন্মকথা’ শারদীয়া আনন্দবাজার ১৩৮৩। ১৩

৫১ দ্র বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ৩। ৪৮-৫০

৫২ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৯৫

৫৩ ভারতী, শ্রাবণ। ১৮৯

৫৪ ঐ। ১৯০; ‘সংযোজনী’ বিবিধ প্রসঙ্গ অ-১। ৩৯৪

৫৫ ‘সমাপন’, বিবিধ প্রসঙ্গ অ-১। ৩৯২-৯৩

৫৬ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৯২

৫৭ ‘সূচনা’, বউ-ঠাকুরানীর হাট ১। ৩৬৯

৫৮ ঐ ১। ৩৭০

৫৯ ভারতী, শ্রাবণ। ১৮৮

৬০ কবিমানসী ১। ১৫৫

৬৯ রবীন্দ্রজীবনী ১। ১৫৫

৬১ রবীন্দ্রজীবনী ১। ৯৫

৬২ সমালোচনা অ-২। ১০৭

৬৩ ভারতী, শ্রাবণ। ১৫১

৬৪ ঐ। ১৭৫

৬৫ ঐ। ১৮৪

৬৬ দ্র রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী। ১৮৪-৮৫

৬৭ ভারতী, ভাদ্র। ২২৮-২৯

৬৮ ঐ। ২২৯

৬৯ ঐ। শ্রাবণ। ১৮৬-৮৭

৭০ ঐ। ১৮৭

৭১ ‘সমাপন’, বিবিধ প্রসঙ্গ অ-১। ৩৯১

৭২ সমালোচনা অ-২। ১০৪-০৫

৭৩ রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী। ৬৭

৭৪ দ্র ‘বৌ-ঠাকুরাণীর হাট’, প্রথম পরিচ্ছেদ : ভারতী কার্তিক। ২৯৩-৯৫

৭৫ বউ-ঠাকুরানীর হাট ১। ৩৮৮

৭৬ রবীন্দ্রসংগীত [১৩৭৬]। ১২৩-২৪

৭৭ সমালোচনা অ-২। ১৪৭

৭৮ ঐ। ১৪৯

৭৯ দ্র ছন্দ [১৩৮২]। ২৯৫-৩০১; রবীন্দ্রসাহিত্যের আদিপর্ব। ৩২৯-৩২

৮০ ভারতী, মাঘ। ৪৮০-৮১

৮১ ঐ। ৪৮২

৮২ ‘সূচনা’, প্রভাত সংগীত ১। ৪৯

৮৩ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৯৬

৮৪ সা-সা-চ ২। ২২ [১৩৬৯]। ৯৭

৮৫ জীবনস্মৃতি ১৭। ৪১৬-১৭

৮৬ ক্যালকাটা গেজেট-এ তারিখটি 6 Jan 1881

৮৭ জীবনস্মৃতি ১৭। ৪১৮

৮৮ জীবনের ঝরাপাতা। ৪৪

৮৯ ছেলেবেলা ২৬। ৬২৩

৯০ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ২ [১৩৮৬]। ৩০৫

৯১ ‘জীবনস্মৃতির জন্মকথা’, শারদীয়া আনন্দবাজার ১৩৮৩। ১১-১৩

৯২ দেশ, ১৪ বৈশাখ ১৩৮৬। ১১-১৩

৯৩ ‘স্মৃতি’ : ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩। ১৬২

৯৪ পত্রাবলী। ২০৩-০৪, পত্র ১৩৩

৯৫ দ্র অজিতকুমার চক্রবর্তী, ‘মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর’ [১৩৭৭]। ৩৬৩

৯৬ শঙ্করীপ্রসাদ বসু, বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ ২ [১৩৮৬]। ১৬৩

---

* পূর্ববর্তী সংস্করণে রবীন্দ্রনাথের প্রথম ‘পাবলিক’ ভাষণের তারিখটি সম্পর্কে আমরা উল্লেখ করেছিলাম যে, ৮ই বৈশাখ [মঙ্গল 19 Apr 1881] বেথুন সোসাইটির উদ্যোগে মেডিকেল কলেজ হলে তিনি এই বক্তৃতাটি দেন। এ সম্পর্কে আমাদের প্রধান তথ্য-সূত্র ছিল জীবনস্মৃতি-র [১৩৬৮] তথ্যপঞ্জী-তে উল্লিখিত ও উদ্ধৃত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের একটি অপ্রকাশিত পত্রের তারিখ : ‘১২৮৮, বৈশাখ ৯ (19 April, 1881)’ [পৃ ২৫১, টীকা ১১৩॥4]। কিন্তু এই বছরে ৯ বৈশাখ ছিল 20 Apr, 19 Apr নয়। সেইজন্য রবীন্দ্র-জীবনী ১ [পৃ ১০০] ও যোগেশচন্দ্র বাগলের বেথুন সোসাইটি [পৃ ১২০] গ্রন্থ অবসান ৮ বৈশাখ [19 Apr] তারিখটিই আমরা গ্রহণযোগ্য মনে করেছিলাম। কিন্তু সম্প্রতি অনাথনাথ দাসের সৌজন্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মূল পত্রটি দেখার সৌভাগ্য হয়েছে, তাতে পত্রের তারিখটি স্পষ্টভাবে ‘৯ বৈশাখ’ লেখা আছে। সুতরাং বক্তৃতার তারিখটি ৯ বৈশাখ বুধ 20 Apr বলেই গ্রহণ করা সংগত। এতে ‘দ্বিতীয়বার বিলাতে যাইবার পূর্বদিন...প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম’—রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিরও সামঞ্জস্য করা সম্ভব। জাপান-যাত্রী গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : ‘বোম্বাই থেকে যতবার যাত্রা করেছি জাহাজ চলতে দেরি করে নি। কলকাতার জাহাজে যাত্রার আগের রাত্রে গিয়ে বসে থাকতে হয়’ [১৯।২৯৫] —উক্তিটি সম্ভবত বর্তমান যাত্রার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য; ১১ বৈশাখ [22 Apr] ভোরে Kaisar-i-Hind জাহাজটি যাত্রা শুরু করেছিল, ফলে রবীন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদ আগের দিন রাত্রে [১০ বৈশাখ বৃহ 21 Apr] জাহাজে আরোহণ করতে হয়—হয়তো এই স্মৃতি থেকেই রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ উক্তি করেছিলেন।

* ‘রবীন্দ্রপরিচয়’ : প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩২৯। ৫০৭। বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান চন্দ্রনাথ বসু 1881-এ প্রকাশিত বইগুলি সম্পর্কে রিপোর্ট দিতে গিয়ে রুদ্রচণ্ড সম্বন্ধে লেখেন : ‘The best work coming under this head [drama] was a small tragedy by Baboo Rabindra Nath

Tagore, entitled 'Rudrachandra'. ...But the work under notice is not written in a spirit of sentimental patriotism. One of its principal objects is to describe the workings of a mind completely possessed by feelings of hatred and vindictiveness on account of personal wrongs; and this object has been accomplished with remarkable success.' দ্র চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সরকারী দলিলে রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনা' : বি. ভা। প., মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯। ২৮৪

* দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩

* 'মহারাণী ভানুমতী স্বর্গারোহণ করেন ১২৮৯ সালে।' —সত্যরঞ্জন বসু, 'ত্রিপুরায় রবীন্দ্র-স্মৃতি' : রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা [১৩৯৩]।৭

* 'Some Celebrities', The Modern Review, May 1927, p. 544; গ্রন্থটি বাজার থেকে তুলে নেওয়ার কথা অবশ্য ঠিক নয়, পরবর্তীকালে বহুদিন পর্যন্ত এটিকে সাময়িকপত্রে বিজ্ঞাপিত হতে দেখা যায়।

* রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী [পৃ ৩১-৩২] থেকে উদ্ধৃত। চন্দ্রনাথ বসু তাঁর রিপোর্টে ভগ্নহৃদয় সম্বন্ধে এই অভিযোগ স্বীকার করেন নি : 'Vagueness is one of the principal characteristics of modern Bengali poetry. The Bengali poet's pictures of men and things are hazy and inaccurate. His men and women do not seem to be made of flesh and blood and bone; they have no clear outline or definite movement; they move as a mist in which it is hard to discern a true or living form. To certain poems which appeared last year this criticism, however, does not apply; the chief among them being 'Bhagnahridaya' by Baboo Rabindra Nath Tagore. It is a love poem, like all those belonging to the school of Bengali poetry, of which Baboo Rabindra Nath is a leading representative. But the characters introduced in it look like real living beings, with mental and bodily features that may be clearly distinguished. The poetry of this school deals with realities, though of sentimental kind; and treats them in a fitting spirit and style.' দ্র চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ ২৮৪-৮৫

* "ইতিপূর্বে ইহার সরলা দেবী-কৃত স্বরলিপি 'ভারতী ও বালক' পত্রে (১২৯৯ শ্রাবণ) ও 'শতগান' গ্রন্থে (১৩০৭ বৈশাখ) মুদ্রিত হইয়াছিল; উল্লিখিত স্বরলিপির প্রথমটিতে গানের সপ্তম-অষ্টম ছত্র রূপক তালে আর অবশিষ্ট অংশ কাওয়ালি তালে বিন্যস্ত, দ্বিতীয় স্বরলিপিতে ৭ মাত্রার তাল আদ্যন্ত (৪+৩) মাত্রায় ভাগ করা হয়।" —টীকা, 'কেতকী'

*১ জোড়াসাঁকোর ধারে। ৬৪; গুণেন্দ্রনাথ একটি তারিখহীন অসমাপ্ত পত্রে রবীন্দ্রনাথকে এই অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন : 'ভাই রবি/এই শনিবার [১৬ জ্যৈষ্ঠ 28 May] দিন আমি একটা party আমার বাগানে দিব। তোমাকে গাইতে হবে প্রস্তুত থাকিবে।'

*২ দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য : ১

* 'LES/CONTEMPLATIONS/PAR/VICTOR HUGO/VIGNETTES/PAR J.—A. BEAUCE/I/AUTREFOIS—1830-1843 / TROISIÈME ÉDITION / MICHEL LÉVY FRÈRES—HETZEL-PAGNERRE /ÉDITEURS/LIBRAIRIE DE GUSTAVE HAVARD/15 RUE GUÉNÉGAUD/1857/*Tous droits réservés*.'

'LES/CONTEMPLATIONS/.../II/AUJOURDHUL— 1843-1856/.../1857/...'

* উল্লেখ্য যে, সমালোচনী পত্রিকার প্রথম বর্ষ তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যার [ফাল্গুন-চৈত্র ১৩০৮], ১৬৯-৭০ পৃষ্ঠায় এই কবিতাটির জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কৃত একটি অনুবাদ 'আসলে জীবিত' শিরোনামে প্রকাশিত হয়; প্রথম ছত্র : 'এই এরা রহে হেথা—ওরা চলি যায়'।

*১ দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য : ১

*২ দ্র তত্ত্ব-কৌমুদী, ১৬ শ্রাবণ ১৮০৩ শক। ৪৪-৪৭; অপিচ প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৪

* এই পাঠ ও সুর-তাল প্রথম দেখা গেছে রবিচ্ছায়া-তে [1886-এ প্রকাশিত ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী-র ২য় সংস্করণে তত্ত্বকৌমুদী-র পাঠ ও সুর-তাল গৃহীত হয়েছে—এখানে সুরের উল্লেখ আছে 'আহা আর কোথা যাব']—সুতরাং লীলা দেবীর ডায়ারিটি যদি ঘটনার অব্যবহিত পরেই লেখা হয়ে থাকে, তবে প্রশ্ন জাগতে পারে এই পাঠ ও সুর-তালের উল্লেখ তিনি কোথায় পেলেন?

*১ দ্র প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৫

*২ এই যুগ্ম-সংখ্যাটি সম্ভবত ১৫ আশ্বিনের পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল, কারণ ওই দিনই মহাসপ্তমী ছিল।

* মূলগ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা সর্বত্র ২৫৬ বলে উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু প্রকৃত পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৭৪; ২৬৪ পৃষ্ঠার পর শেষ ফর্মায় [২৩শ], ভ্রমক্রমে ২৪৬ থেকে ২৫৬ পৃষ্ঠাঙ্ক বসানো হয়েছে।

* চন্দ্রনাথ বসু তাঁর রিপোর্টে য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র-কে বৎসরের শ্রেষ্ঠ ভ্রমণ কাহিনী বলেন নি, তাঁর মতে রামকুমার ভট্টাচার্যের 'আসাম-ভ্রমণ' এই মর্যাদার অধিকারী, ভ্রমণকাহিনীতে যে-সব তথ্য পাঠকের প্রত্যাশিত, য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র-তে তা নেই, 'But, although very far from

possessing the best features of a book of travels, Baboo Rabindra Nath's work gives ample evidence of descriptive power and capacity for observation, combined with a talent for humourous and caustic writing which is rare among Bengali authors.' দ্র চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ ২৮৫

* তু° 'তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী/অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।/ বিদ্যাপতি কহে কৈসে গোঙায়বি/হরি বিনে দিন রাতিয়া॥'

* 'চণ্ডীদাস/ কৃত পদাবলি।/ শ্রীঅক্ষয় চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক/সম্পাদিত।/ চুঁচুড়া।/সাধারণী যন্ত্রে শ্রীনন্দলাল বসু কর্ত্তৃক/মুদ্রিত ও প্রকাশিত।/ ১২৮৫।/ মূল্য ১ এক টাকা মাত্র।' ১৫৯ পৃষ্ঠার গ্রন্থটিতে ১২৯ থেকে ১৩৬ পৃষ্ঠাসংবলিত ফর্মাটি নেই; দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ পেনসিলে এই তথ্যটি লিপিবদ্ধ করেছেন : 'এখানে গোটা আষ্টেক/পাতা দেখিতেছি না।'

* 'অর্দ্ধপ্রকাশ্য অভিনয়' বা স্টেজ রিহার্সাল হয় 1 Sep 1882 [১৭ ভাদ্র] তারিখে।

* 'উপাসকমণ্ডলীর সভ্য হইবার যোগ্যতা।...যাঁহারা উপাসকমণ্ডলীর হিতার্থে মাসিক অন্যূন ।০ চাঁদা প্রদান করিতে স্বীকার করেন; এরূপ ব্যক্তি অন্যূন ১৮ বৎসর বয়স্ক হইলে এবং অসচ্চরিত্র না হইলে উপাসকমণ্ডলীর সভা হইতে পারিবেন।'—তত্ত্ব-কৌমুদী, ১ মাঘ ১৮০৩ শক [৪। ১৫]। ১৭৪; অপিচ দ্র Sivanath Sastri, *History of the Brahmo Samaj,* pp. 624-25

দ্বাবিংশ অধ্যায়

১২৮৯ [1882-83] ১৮০৪ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের দ্বাবিংশ বৎসর

চৌরঙ্গির ভারতীয় যাদুঘরের পাশে ১০ নং সদর স্ট্রীটের ভাড়া বাড়িতে সস্ত্রীক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কবে থেকে বাস করতে শুরু করেছিলেন তা নিশ্চিত করে বলা না গেলেও, চৈত্র ১২৮৮ পুরো মাসটিই যে তাঁরা সেখানে ছিলেন, ক্যাশবহি থেকে সে-সংবাদ আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করেছি। বর্তমান বৎসরেও বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস তাঁরা এই বাড়িতে অবস্থান করেন, ক্যাশবহি-তে এই দুমাসের জন্য ১৯০ টাকা করে ভাড়া দেওয়ার বিবরণ লিখিত হয়েছে। বাড়িটি ১০ আষাঢ় [শুক্র 23 Jun 1882] পর্যন্ত তাঁর অধিকারে ছিল, এই তথ্যটি আছে ২২ অগ্রহায়ণের হিসাবে : 'ব° যদুনন্দন লাল দ° চৌরঙ্গীর সদর স্ট্রীটে ১০ ন° বাটীতে শ্রীযুক্ত ছোটবাবু মহাশয় থাকায় ১২৮৯ সালের গত আষাঢ় মাসের ১০ দশ রোজের ঐ বাটীর ভাড়া শোধ ৬৩।৫'। সুতরাং মোটামুটি নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চৈত্র ১২৮৮ থেকে জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯ পর্যন্ত তিন মাস এবং আষাঢ় মাসের অন্তত প্রথম সপ্তাহটি সদর স্ট্রীটের ভাড়া বাড়িতে কাটিয়েছিলেন। সাহেব-পাড়াতে অবস্থিত বাড়িটি সুসজ্জিত করার জন্য 'সাদা মাটির বিলাতী পুতুল, চীনে মাটির ষ্ট্যাণ্ড ও বড় ২ আয়না' ইত্যাদি কেনা হয়েছিল, সে-কথা ইন্দিরা দেবী তাঁর স্মৃতিকথায় আমাদের জানিয়েছেন। তিনিও কিছুদিন ওই বাড়িতে অবস্থান করেছিলেন। জোড়াসাঁকোর অন্যান্য আত্মীয়দের মধ্যে কেউ কেউ সেখানে গিয়ে থাকতেন, এমন সম্ভাবনাও প্রবল; অক্ষয় চৌধুরী-প্রমুখ বন্ধুবান্ধবের গতায়াত তো ছিলই। ভাড়ার অঙ্ক থেকেই বোঝা যায়, বাড়িটি নিতান্ত ছোটো ছিল না।

মোরান সাহেবের বাগানের মতো রবীন্দ্রনাথ এখানেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবীর সঙ্গী হন। এখন তিনি সাবালক, সুতরাং অন্যান্য ভ্রাতাদের মতো তাঁর জন্যও মাসোহারার বন্দোবস্ত হয়েছে মাসিক ১০০ টাকা [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পেতেন ৩০০ টাকা, কাদম্বরী দেবী ১০ টাকা, সোমেন্দ্রনাথ বিকৃত-মস্তিক বলেই সম্ভবত তাঁর জন্য বরাদ্দ ২০ টাকা]। ১২৮৭ ও ১২৮৮ বঙ্গাব্দের ক্যাশবহি না পাওয়াতে রবীন্দ্রনাথকে কবে থেকে মাসোহারা দেওয়া আরম্ভ হয়েছিল, তা জানা যায় না। কিন্তু বিলাত-প্রত্যাবর্তনের পর থেকেই সম্ভবত তিনি এই টাকা পেতে থাকেন, এ-প্রসঙ্গে ৮ আষাঢ় ১২৮৭ তারিখে 'রবীন্দ্রের বয়ঃপ্রাপ্তির জন্য' প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সারদাপ্রসাদকে লিখিত মহর্ষির নির্দেশেব কথা আমরা স্মরণ করতে পারি। ১২৯২-এর শুরু থেকে মাসোহারার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৫০ টাকায় পরিণত হয়।

সদর স্ট্রীটের বাড়িতে অবস্থান-কালে রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনে একটি বিরাট পরিবর্তন ঘটে। এর কথা তিনি জীবনস্মৃতি ও অন্যত্র বহুবার বিস্তৃত আকারে বর্ণনা করেছেন। আমরা এখানে জীবনস্মৃতি-র বর্ণনাটিই উদ্ধৃত করছি : 'সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধকরি ফ্রী-ইস্কুলের বাগানের

গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেইদিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলি পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে-একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল।'[১] অন্যত্র এই অনুভূতিকে তিনি 'আমার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা যাকে আধ্যাত্মিক নাম দেওয়া যেতে পারে' বলে অভিহিত করেছেন।[২] এই ধরনের অভিজ্ঞতার সূচনা অবশ্য আগেই হয়েছিল, যখন একদিন জোড়াসাঁকোর বাড়ির ছাদের উপর অপরাহ্নের শেষে বেড়াতে বেড়াতে সন্ধ্যার একটি মনোহর রূপ দেখে তাঁর মনে হয়েছিল যে পরিচিত জগতের উপর থেকে তুচ্ছতার আবরণ একেবারে উঠে গেল—মনে হয়েছিল 'সন্ধ্যা আমারই মধ্যে আসিয়াছে—আমিই ঢাকা পড়িয়াছি। দিনের আলোতে আমিই যখন অত্যন্ত উগ্র হইয়া ছিলাম তখন যাহা কিছুকেই দেখিতে শুনিতেছিলাম সমস্তকে আমিই জড়িত করিয়া আবৃত করিয়াছি। এখন সেই আমি সরিয়া আসিয়াছি বলিয়াই জগতকে তাহার নিজের স্বরূপে দেখিতেছি।'[৩] [অংশটি আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে একবার আরও বিস্তৃত আকারে উদ্ধৃত করেছি।] সন্ধ্যাসংগীত-পর্বে হৃদয়াবেগের গদ্‌গদভাষী আন্দোলনের পর প্রভাতসংগীত-পর্বে যে মননের রূপ ফুটে উঠতে আরম্ভ করেছিল, এই সময়েই তার সূচনা। এর পর থেকেই রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে জগৎকে দর্শকের মতো দেখতে চেষ্টা করতেন। তাই সদর স্ট্রীটের বাড়ির অভিজ্ঞতাকে আকস্মিক মনে না করে পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার পরিণতি হিসেবে দেখাই সংগত। আমাদের ধারণা, জোড়াসাঁকোর অভিজ্ঞতার পরই সন্ধ্যাসংগীত কাব্যের প্রথম 'উপহার' কবিতাটি ['সন্ধ্যা'—'অয়ি সন্ধ্যে,/অনন্ত আকাশতলে বসি একাকিনী'] ও 'আমি-হারা' কবিতা-দুটি লেখা দুটির মধ্যেই কিছুটা আত্মসমীক্ষার সুর শুনতে পাওয়া যায়। এর পর সদর স্ট্রীটের বাড়ির অভিজ্ঞতা কাব্যরূপ লাভ করে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতার মধ্যে—যাকে তিনি পরবর্তীকালে তাঁর সমস্ত কাব্যের ভূমিকা[*] বলে উল্লেখ করেছেন।

রবীন্দ্রজীবনী-কার কবিতাটি আশ্বিন ১২৮৯ মাসে লেখা বলে আভাস দিয়েছেন[৪]; কিন্তু সদর স্ট্রীটের বাড়িতে অবস্থান-কাল বিবেচনা করে এটি বৎসরের প্রথম দিকে লেখা হয়েছিল এরূপ সিদ্ধান্ত করাই সংগত। অবশ্য কবিতাটি প্রকাশিত হয় অনেক পরে ভারতী-র অগ্রহায়ণ সংখ্যায় [পৃ ৩৬১-৬৪]। এই কবিতারই প্রসঙ্গক্রমে লিখিত অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর 'অভিমানিনী নির্ঝরিণী' উক্ত সংখ্যাতেই [পৃ ৪০৭-০৮] প্রকাশিত হয়, প্রভাতসংগীত-এর প্রথম সংস্করণে [বৈশাখ ১২৯০] দুটি কবিতাই একত্রে মুদ্রিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ লেখা হয়ে যাবার পরেও 'জগতের সেই আনন্দরূপের উপর তখনো যবনিকা পড়িয়া গেল না।' তখন তাঁর কাছে কেউ বা কিছুই অপ্রিয় রইল না। এমন-কি একটি 'নির্বোধ এবং অদ্ভুতরকমের ব্যক্তি' নানাবিধ অলীক তত্ত্বালোচনায় তাঁকে বিব্রত করত, পরদিন মধ্যাহ্নকালে সেই লোকটিকে সাগ্রহ অভ্যর্থনা জানাতে তিনি কুণ্ঠিত হলেন না, কারণ 'আমি যাহাকে দেখিয়া খুশি হইলাম এবং অভ্যর্থনা করিয়া লইলাম সে তাহার ভিতরকার লোক—আমার সঙ্গে তাহার অনৈক্য নাই, আত্মীয়তা আছে।'[৫] বাড়ির সামনে বাঁধা একটি গাধার বাচ্ছার ঘাড় হঠাৎ একটি বাছুর এসে যখন চেটে দিতে লাগল,

তখন সেই ‘মূঢ় পশুশাবকটির ভাষাহীন স্নেহসম্ভাষণদৃশ্য’ তাঁর কাছে ‘একটা বিশ্বব্যাপী রহস্যবার্তা’ ধ্বনিত করে তুলল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে যখন দেখতেন রাস্তা দিয়ে মুটে-মজুর বা যে-কোনো লোক চলে যাচ্ছে তখন তাদের গতিভঙ্গি, শরীরের গঠন, মুখশ্রী সবই ভারি আশ্চর্য বলে বোধ হত, একটি যুবক যখন আর-এক যুবকের কাঁধে হাত দিয়ে হাসতে হাসতে চলে যেত সেই তুচ্ছ ঘটনাটিও একটি অসামান্য তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠত। তাঁর সেই মনোভাবটিকে তিনি পরবর্তীকালে এইভাবে বর্ণনা করেছেন : ‘এই মুহূর্তেই পৃথিবীর সর্বত্রই নানা লোকালয়ে, নানা কাজে, নানা আবশ্যকে কোটি কোটি মানব চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে—সেই ধরণীব্যাপী সমগ্র মানবের দেহচাঞ্চল্যকে সুবৃহৎভাবে এক করিয়া দেখিয়া আমি একটি মহাসৌন্দর্যনৃত্যের আভাস পাইতাম। বন্ধুকে লইয়া বন্ধু হাসিতেছে, শিশুকে লইয়া মাতা লালন করিতেছে, একটা গোরু আর একটা গোরুর পাশে দাঁড়াইয়া তাহার গা চাটিতেছে, ইহাদের মধ্যে যে-একটি অন্তহীন অপরিমেয়তা আছে তাহাই আমার মনকে বিস্ময়ের আঘাতে যেন বেদনা দিতে লাগিল।’[৬] এরই অভিঘাতে রবীন্দ্রনাথ ‘প্রভাত উৎসব’ কবিতাটি এই সময়েই লেখেন, যদিও সেটি প্রকাশিত হয় অনেক পরে ভারতী-র পৌষ সংখ্যায় [পৃ ৪২১-২৩]। ‘অনন্ত মরণ’ [ভারতী, আশ্বিন। ২৭২-৭৫] ও ‘অনন্ত জীবন’ [তত্ত্ববোধিনী, পৌষ। ১৬৬-৬৮] কবিতা দুটি সম্ভবত এই সময়ে কিংবা কিছু পূর্ববর্তীকালে লেখা, ‘মহাস্বপ্ন’ বা ‘সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়’ কবিতার মধ্যে দার্শনিক মননের যে রূপ দেখা গিয়েছিল এরা তারই সমগোত্রীয়। জীবন ও মৃত্যুর পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে ভাবনার সূত্রপাত এখানেই, যা পরবর্তীকালে রবীন্দ্র-রচনায় প্রায়ই দেখা দিয়েছে। লক্ষণীয়, ‘অনন্ত জীবন’ কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল তত্ত্বচিন্তার বাহক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়। পরে ‘স্রোত’ কবিতাটিও এই পত্রিকাটিতে [বৈশাখ ১২৯০] মুদ্রিত হয়েছিল, ‘অনন্ত মরণ’ও অনুরূপভাবে মুদ্রিত হলে অস্বাভাবিক হত না।

ভারতী-র বৈশাখ ১২৮৯ [৬।১] সংখ্যায় রবীন্দ্র-রচনার প্রকাশ-সূচী:

১০-১৬ ‘বৌ-ঠাকুরাণীর হাট’, বিংশ-একবিংশ পরিচ্ছেদ দ্র বউঠাকুরানীর হাট ১। ৪৪৮-৫৫ [অষ্টাদশ-ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ]

২১-২৩ ‘আমি হারা’ [‘পরাণের অন্ধকার অরণ্য মাঝারে’] দ্র সন্ধ্যাসংগীত ১। ৩৯-৪২

ভারতী-র পাঠে কবিতাটিতে ১২৮টি ছত্র ছিল, বর্তমান সংস্করণে আছে ৯৮টি; বর্জিত ছত্রগুলি সন্ধ্যাসংগীত-এর পাঠভেদ-সংবলিত সংস্করণে [পৃ ১০৪-০৫] সংকলিত হয়েছে। মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ-তে কবিতাটির নাম ‘পথভ্রষ্ট’।

২৪-২৮ ‘বিবিধ প্রসঙ্গ’	**২৪-২৫**	**‘অনধিকার’**	**দ্র**	**বিবিধ প্রসঙ্গ**	**অ-১। ৩৫০-৫১**
	২৫-২৭	**‘অধিকার’**	**দ্র**	**ঐ**	**অ-১। ৩৫১-৫৪**
	২৭-২৮	**‘উপভোগ’**	**দ্র**	**ঐ**	**অ-১। ৩৯৪-৯৫**

গ্রন্থে সংকলনের সময়ে ‘উপভোগ’ প্রবন্ধটি পরিত্যক্ত হয়েছিল।

বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত উপরোক্ত রচনাগুলি ছাড়া ‘দেবতায় মনুষ্যত্ব আরোপ’ [পৃ ২৯-৩৭] প্রবন্ধটি ও ‘সংক্ষিপ্ত সমালোচনা’ [পৃ ৪৫-৪৮]-র অন্তর্ভুক্ত সব-ক’টি না হলেও অন্তত কয়েকটি সমালোচনা রবীন্দ্রনাথের লেখা বলে মনে হয়। জীবনস্মৃতি-র পাণ্ডুলিপিতে তিনি লিখেছিলেন, ‘সদর স্ট্রীটে বাসের সঙ্গে আমার আর-একটা কথা মনে আসে। এই সময়ে বিজ্ঞান পড়িবার জন্য আমার অত্যন্ত একটা আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল।

তখন হক্স্লির রচনা হইতে জীবতত্ত্ব ও লক্ইয়ার, নিউকোম্ব প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে জ্যোতির্বিদ্যা নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিতাম। জীবতত্ত্ব ও জ্যোতিষ্কতত্ত্ব আমার কাছে অত্যন্ত উপাদেয় বোধ হইত।'[৭] 'দেবতায় মনুষ্যত্ব আরোপ' প্রবন্ধটি সম্ভবত এই পাঠ-চর্চার ফল। রবীন্দ্রনাথ হাবার্ট স্পেনসরের রচনাবলীর অনুরাগী পাঠক ছিলেন, তা আমরা আগেই দেখেছি। বর্তমান রচনাটি তাঁর 'The use of Anthropomorphism' প্রবন্ধ অবলম্বনে লেখা—শতপথ ব্রাহ্মণ, ভাগবত, পুরাণ, গ্রীক পুরাণ, টমাস হেনরি হাক্সলি [1825-95]-র The Genealogy of Animals' প্রবন্ধ প্রভৃতি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে স্পেনসরের বক্তব্যের বিরোধিতা করা হয়েছে। প্রবন্ধের শেষে স্পেনসরের *Data of Ethics* গ্রন্থের উল্লেখ করা হয়েছে; আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথ বইটি পড়েছিলেন, জীবনস্মৃতি [১৭। ৩৬৭-৬৮]-তে সদ্য-প্রকাশিত [Jun 1879] গ্রন্থটির প্রসঙ্গ আছে।

'সংক্ষিপ্ত সমালোচনা'-য় যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের 'জন স্টুয়ার্ট মিলের জীবন বৃত্ত', 'ইতালীর ইতিবৃত্ত সম্বলিত ম্যাট্‌সিনির জীবন বৃত্ত' এবং 'হৃদয়োচ্ছ্বাস, বা ভারত বিষয়ক প্রবন্ধাবলি' গ্রন্থ তিনটি সমালোচনা করতে গিয়ে লেখক শেষোক্তটি সম্পর্কে লিখেছেন, '...প্রাচীন ভারতের উন্নতি লইয়া গর্ব্ব, আধুনিক ভারতের অবনতি লইয়া দুঃখ, ঐক্যের অভাব লইয়া বিলাপ, বদ্ধপরিকর হইবার জন্য উত্তেজনা এত শুনা গিয়াছে যে, ও বিষয়ে শুনিবার আর বাসনা নাই।... এখন "ঐক্য" "উন্নতি" "বন্ধন" প্রভৃতি কতকগুলা সাধারণ কথা পরিত্যাগ করিয়া, ঐক্য ও উন্নতি সাধনের যে শত সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাধা আমাদের সহিত এক পরিবারভুক্ত হইয়া বাস করিতেছে সেই সকল বিশেষ বিশেষ বিষয়ের আলোচনা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। বড় বড় কথা শুনিয়া আমাদের যুবকদিগের একটা বিষম রোগ উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা তাঁহাদের দুই দুর্ব্বল হস্তে দুই গুরুভার তলবারী লইয়া অধীনতা ছেদন করিবার জন্য দিগ্বিদিক হাতড়াইয়া দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহাদের যদি বলা যায়, অত হাঙ্গাম করিবার আবশ্যক কি? অধীনতার অন্বেষণে ছুঁচাবাজির মত চারিদিকে ধড়্ফড়্ করিয়া বেড়াইতেছ কেন? অধীনতা যে তোমাদের দুয়ারের কাছে। এমন কি, তোমাদের গৃহের কোণ হইতে শত শত অধীনতার পাশ অতি সূক্ষ্ম মাকড়সার জালের মত তোমাদের হাত পা বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে। তলোয়ার দুটা রাখ। একে একে ধীরে ধীরে সেই সূক্ষ্ম গ্রন্থিগুলা মোচন কর। এ কথা শুনিলে তাঁহারা নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন [পৃ ৪৬]।' বক্তব্য ও ভাষার দিক দিয়ে পূর্বে উল্লিখিত 'পারিবারিক দাসত্ব' প্রবন্ধের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যের জন্য সমালোচনাটি রবীন্দ্র-রচনা বলে মনে করেছি। এই বক্তব্যের সূত্র ধরেই পরবর্তী গ্রন্থ মহেন্দ্রনাথ রায়-রচিত 'স্যামুয়েল হানিমানের জীবনবৃত্ত' সমালোচিত হয়েছে, সেইজন্য সেটিও রবীন্দ্রনাথ-কৃত বলে অনুমান করা যায়। এই প্রসঙ্গে হ্যানিমান [1755-1843]-প্রবর্তিত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রতি রবীন্দ্রনাথের আমরণ অনুরক্তির কথা আমরা স্মরণ করতে পারি।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত রচিত 'স্বপন-সঙ্গীত' 'গীতিকাব্য'টির সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিত হয়েছে : 'এখানি একটি ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ। লেখকের এখনো হাত পাকে নাই। কিন্তু ইহার অনেক স্থানে যথার্থ কবিতা আছে, অনেক স্থানে লেখকের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় [পৃ ৪৮]' নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত [? 1861-1940] রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের অন্যতম। আমাদের ধারণা, উপরোক্ত সমালোচনার সূত্রেই তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা দেখা দেয়। এর কয়েক মাস পরেই ভারতী-র কার্তিক সংখ্যায় [পৃ ৩৫৮-৬০] নগেন্দ্রনাথের 'উপহার' কবিতাটি প্রকাশিত হয় এবং পরে মাঝে মাঝেই প্রকাশিত হতে থাকে [ফাল্গুন। ৫৪৭-৪৮ 'ঘুমের ঘোর', বৈশাখ ১২৯০। ৪১-৪২ 'স্বপ্ন', আষাঢ়। ১৩৮-৩৯ 'সাঁজের তারা' ইত্যাদি]। ভারতী-তে প্রকাশিত প্রিয়নাথ সেনের প্রথম

কবিতা 'নীহারিকা' [পৃ ৩৪৯-৫০]-ও উক্ত সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। বিহারীলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রিয়নাথের প্রতিবেশী ও বন্ধু ছিলেন [আষাঢ় ১২৮৮ থেকে তিনি ভারতী-র নিয়মিত লেখক-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হন], সম্ভবত তাঁর মাধ্যমেই এঁদের মধ্যে যোগাযোগ গড়ে ওঠে। নগেন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'Rabindranath Tagore was just twenty years old when I first met him and we have been friends ever since....At that time he was a tall, slender young man with finely chiselled features. He wore his hair long, curled down his back and had a short beard....Two of his early lyrical works, *Sandhya Sangit* and *Prabhat Sangit*, had just been published.'[৮] এই বর্ণনায় সম্ভবত কিছু ত্রুটি আছে; তাঁদের আলাপের সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স কুড়ির বেশি এবং প্রভাতসংগীত তখনো প্রকাশিত হয় নি।

ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯ [৬/২]:

৬৯-৭৮ 'বৌঠাকুরাণী হাট', দ্বাবিংশ-চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ দ্র বউঠাকুরানীর হাট ১। ৪৫৫-৬৫ [বিংশ-দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ]

৮৪-৮৯ 'বিজ্ঞতা' দ্র সমালোচনা অ-২। ৭০-৭৪

এই প্রবন্ধটি রচনার পিছনে একটি বিস্তৃত পটভূমিকা আছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'এই সময়ে, বাংলার সাহিত্যিকগণকে একত্র করিয়া একটি পরিষৎ স্থাপন করিবার কল্পনা জ্যোতিদাদার মনে উদিত হইয়াছিল। বাংলার পরিভাষা বাঁধিয়া দেওয়া ও সাধারণত সর্বপ্রকার উপায়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধন এই সভার উদ্দেশ্য ছিল।'[৯] কয়েক বৎসর পূর্বে 1872 [১২৭৯]-তে সিভিলিয়ান জন বীমস্ প্রায় একই ধরনের প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু তা কোনো কার্যকরী রূপ পরিগ্রহ করে নি। ঠাকুর-পরিবার ব্যক্তিগত উদ্যোগে 'বিদ্বজ্জন সমাগম' অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করে প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের সম্মিলনের আয়োজন করেছিল, কিন্তু সেই অনুষ্ঠান সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখী কোনো সংগঠন গড়ে তুলতে পারে নি, উদ্যোক্তাদের সেই রকম কোনো উদ্দেশ্য ছিল বলেও মনে হয় না। কিন্তু বর্তমানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'কলিকাতা সারস্বত সম্মিলন' নামে 'বঙ্গসাহিত্যবিজ্ঞানদর্শনসঙ্গীত প্রভৃতিবিষয়িণী একটি সমালোচনী সভা' স্থাপনের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। নানা ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করে একটি অনুষ্ঠানপত্র ও নিয়মাবলীও প্রস্তুত হয়। এরই কিয়দংশ উদ্ধৃত করে ভারতী-র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় [পৃ ৯০-৯৭] তিনি 'কলিকাতা সারস্বত সম্মিলন' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। উদ্ধৃত অংশটি দেখলে মনে হয়, অনুষ্ঠানপত্রটি ইতিমধ্যে রচিত ও বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে প্রচারিত হয়েছিল। সেক্ষেত্রে অনুমান করা যায়, চন্দননগর থেকে প্রত্যাবর্তনের কিছুদিন পর থেকেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে রবীন্দ্রনাথ সারস্বত সম্মিলনের প্রস্তাব নিয়ে যথেষ্ট ব্যস্ত হয়ে পড়েন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র [1822-91] উৎসাহের সঙ্গে প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন ও সভাপতি হতে রাজি হন। কিন্তু অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সকলের কাছ থেকে যথোপযুক্ত সাড়া পাওয়া যায় নি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই সভায় আহ্বান করিবার জন্য গেলাম, তখন সভার উদ্দেশ্য ও সভ্যদের নাম শুনিয়া তিনি বলিলেন, "আমি পরামর্শ দিতেছি, আমাদের মতো লোককে পরিত্যাগ করো—'হোমরাচোমরা' দের লইয়া কোনো কাজ হইবে না, কাহারও সঙ্গে কাহারও মত মিলিবে না।" এই বলিয়া তিনি এ-সভায় যোগ দিতে রাজি হইলেন না।'[১০] জ্যোতিরিন্দ্রনাথও তাঁর জীবনস্মৃতি-তে প্রায় অনুরূপ উক্তিই

করেছেন।[১১] সেইজন্যই উপরোক্ত প্রবন্ধের শেষে তিনি এই আশঙ্কা ব্যক্ত করে লেখেন, 'সভার স্থায়িত্বের প্রতি এখন কেবল একটি মাত্র সংশয় আছে। আমাদের সাহিত্য-সংসারে অনেকগুলি দলপতি। প্রায় সকল দলপতিই এক স্থানে সমবেত হইয়াছেন—এক্ষণে যদি তাঁহারা ক্ষুদ্র দলাদলীর ভাব ত্যাগ করিয়া, নিজের ক্ষুদ্র অভিমান বিসর্জ্জন করিয়া, উৎসাহের সহিত এক হৃদয়ে সরস্বতীর সেবায় নিযুক্ত হন তবেই সারস্বত সম্মিলনের পক্ষে মঙ্গল, নচেৎ যে আয়োজন করা হইতেছে, সে কেবল বাঙ্গালীর আর একটি কলঙ্ক ধ্বজা স্থাপনের নিমিত্ত।'[১২]

এই আশঙ্কার যে বাস্তব ভিত্তিও ছিল, 'বিজ্ঞতা' প্রবন্ধটি তার প্রমাণ। প্রাথমিক আয়োজনের সূত্রে রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে-সমস্ত পণ্ডিত ও সাহিত্যিক ব্যক্তির কাছে গিয়েছিলেন, সম্ভবত তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এই উদ্যোগকে খুব সহজ মনে গ্রহণ করতে পারেন নি; বিশেষ করে ঠাকুরবাড়ির কোনো নূতন প্রচেষ্টাকে সন্দেহের চোখে দেখা তখন অনেকের পক্ষেই খুব স্বাভাবিক ছিল। সেই কারণেই হয়তো মৌখিক আলোচনায় কিংবা সংবাদপত্রে সারস্বত সম্মিলন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবও অন্যায়ভাবে সমালোচিত হয়েছিল। 'বিজ্ঞতা' প্রবন্ধে এরই বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভ ও বিরক্তি তীব্র ব্যঙ্গের আকারে প্রকাশ পেয়েছে : 'তোমরা সিংহাসনস্থ বড় বড় রাজা মহারাজার চেয়ে নিজেকে উঁচু মনে করিতেছ—তাহার কারণ, তোমাদের আত্মম্ভরিতা-নামক লাঙ্গুলের প্রসরটা অত্যন্ত অধিক—নিজ-রচিত কুণ্ডলিত লাঙ্গুল-সিংহাসনের উপর বসিয়া দূরবীক্ষণের উল্টা দিক দিয়া জগৎসংসারকে দেখিতেছ। তোমাদের শরীরের আয়তন অধিক নহে, কিন্তু লেজ হইতে মাপিলে অনেকটা হয়।'[১৩] উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথ অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে সংকলন না করলেও এই সাময়িক উত্তেজনা প্রসূত রচনাটি গ্রন্থভুক্ত করেছেন; এর থেকে বোঝা যায় যে পাঁচ বছর পরে 'সমালোচনা' গ্রন্থ প্রকাশের সময়েও [১২৯৪] প্রবন্ধটির বক্তব্য তাঁর কাছে তাৎপর্য-হীন হয়ে যায় নি।

সারস্বত সম্মিলন প্রতিষ্ঠার এই প্রয়াস সম্ভবত চৈত্র ১২৮৮ থেকেই শুরু হয়েছিল। কারণ এই উপলক্ষেই রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং সেই সূত্রেই তাঁর 'যমের কুকুর' প্রবন্ধটি ভারতী-র বৈশাখ ১২৮৯ [পৃ ১৭-২১]-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "আমি তাঁহার কাছ হইতে 'যমের কুকুর' নামে একটি প্রবন্ধ আদায় করিয়া ভারতী-তে ছাপাইতে পারিয়াছিলাম; তখনকার কালের আর-কোনো যশস্বী লেখকের প্রতি এমন করিয়া উৎপাত করিতে সাহসও করি নাই এবং এতটা প্রশ্রয় পাইবার আশাও করিতে পারিতাম না।"[১৪] নাবালক জমিদার-সন্তানদের উপযুক্ত শিক্ষার জন্য সরকার থেকে Court of wards-এর অধীনে Wards' Institution স্থাপিত হয় [Mar 1856], রাজেন্দ্রলাল ছিলেন তার অধ্যক্ষ। মানিকতলা আপার সারকুলার রোডে শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানে অবস্থিত এই প্রতিষ্ঠান 1880-তে বন্ধ হয়ে গেলেও রাজেন্দ্রলাল তার পরেও সেখানেই বাস করতেন। রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। তিনি লিখেছেন : 'আমি সকালে [এই বর্ণনা সম্ভবত সদর স্ট্রীটের বাড়ি থেকে জোড়াসাঁকোতে ফিরে আসার পরবর্তী কালের, কারণ সদর স্ট্রীট থেকে নিয়মিত সকালে মানিকতলায় আসা একটু অসুবিধাজনক ছিল] যাইতাম—দেখিতাম তিনি লেখাপড়ার কাজে নিযুক্ত আছেন। অল্পবয়সের অবিবেচনাবশতই অসংকোচে আমি তাঁহার কাজের ব্যাঘাত করিতাম। কিন্তু সেজন্য তাঁহাকে মুহূর্তকালও অপ্রসন্ন দেখি নাই। আমাকে দেখিবামাত্র তিনি কাজ রাখিয়া দিয়া কথা আরম্ভ করিয়া দিতেন। সকলেই জানেন, তিনি কানে কম শুনিতেন। এইজন্য পারতপক্ষে তিনি আমাকে প্রশ্ন করিবার অবকাশ দিতেন না। কোনো একটা বড়ো প্রসঙ্গ তুলিয়া তিনি

নিজেই কথা কহিয়া যাইতেন। তাঁহার মুখে সেই কথা শুনিবার জন্যই আমি তাঁহার কাছে যাইতাম। আর কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপে এত নূতন নূতন বিষয়ে এত বেশি করিয়া ভাবিবার জিনিস পাই নাই। আমি মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আলাপ শুনিতাম।...তিনি বাংলা ভাষারীতি ও ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে কথা কহিতেন, তাহাতে আমি বিস্তর উপকার পাইতাম।...আমার মতো অর্বাচীনকেও তিনি কিছুমাত্র অবজ্ঞা না করিয়া, ভারি একটি দাক্ষিণ্যের সহিত আমার সঙ্গে বড়ো বড়ো বিষয়ে আলাপ করিতেন।'[১৫] রাজেন্দ্রলালের *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* গ্রন্থ এই বৎসরই প্রকাশিত হয়। বইটি দীর্ঘকাল রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ছিল, তাঁর বহু কাব্য ও নাটকের কাহিনী তিনি এই গ্রন্থ থেকেই আহরণ করেছিলেন—বর্তমান প্রসঙ্গে এই তথ্যটি আমরা স্মরণ করতে পারি।

ভারতী, আষাঢ় ১২৮৯ [৬।৩]:

১১৭-২৯ 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' পঞ্চবিংশ-অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ দ্র বউঠাকুরানীর হাট ১। ৪৬৫-৭৬ [ত্রয়োবিংশ-পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ]

ভারতী-তে মুদ্রিত ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদের প্রথম দুটি অনুচ্ছেদ বর্তমান ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদের শেষে যুক্ত হয়েছে এবং অবশিষ্ট অংশ বর্জিত। এই পরিচ্ছেদেই উদয়াদিত্যের মুখে একটি গান ছিল—'মা আমি তোর কি করেছি?' প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণেও গানটি ছিল, পরে বর্জিত হয়; দ্র রবিচ্ছায়া। ১২৯ [ব্রহ্ম ৩৬], মিশ্র বাঁরোয়া-আড়াঠেকা; গীতবিতান ৩। ৯৪৮; স্বরবিতান ২০-তে সংকলিত ইন্দিরা দেবী-কৃত স্বরলিপিতে সুর-তাল 'মিশ্র বাঁরোয়া। আড়াঠেকা'।

সম্ভবত আষাঢ় মাসেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্য-সংকলন 'সন্ধ্যা সঙ্গীত' প্রকাশিত হয়। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী গ্রন্থটির প্রকাশের তারিখ 5 Jul 1882 [বুধ ২২ আষাঢ়], মুদ্রণসংখ্যা ১০০০ ও মূল্য আট আনা। গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি এইরূপ:

সন্ধ্যাসঙ্গীত।/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/প্রণীত।/কলিকাতা/আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে/শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী কর্ত্তৃক/মুদ্রিত ও প্রকাশিত।/সন ১২৮৮।/মূল্য ।।০ আনা'।

লক্ষণীয়, আখ্যাপত্রে প্রকাশকাল 'সন ১২৮৮' মুদ্রিত হলেও, গ্রন্থভুক্ত একটি কবিতা 'আমি-হারা' ভারতী-র বৈশাখ ১২৮৯-সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস 'রবীন্দ্র রচনাপঞ্জী' সংকলন করতে গিয়ে বিষয়টি লক্ষ্য করেন।[১৬] বইটির মুদ্রণেও কিছু বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। প্রথম 'উপহার' ['অয়ি সন্ধ্যে', ৫টি পৃষ্ঠায় মুদ্রিত] ও শেষ 'উপহার' ['ভুলে গেছি, কবে তুমি', গ্রন্থ 'সমাপ্ত' হবার পর ৩টি পৃষ্ঠায় মুদ্রিত] কবিতায় কোনো পৃষ্ঠা-সংখ্যা দেওয়া নেই, 'কেন গান গাই' ও 'কেন গান শুনাই' কবিতা দুটি ৯৬ ও ১০০ পৃষ্ঠায় আরম্ভ হলেও সূচীপত্রে ১০০ ও ১০১ পৃষ্ঠা নির্দেশ করা হয়েছে। এবং 'গান সমাপন' ১০৭ পৃষ্ঠায় শেষ হলেও ১০৮ পৃষ্ঠাটি সাদা রেখে একটি flyleaf-এ 'বিষ ও সুধা' মুদ্রিত করে ১১১ পৃষ্ঠা থেকে কবিতাটি ছাপা হয়েছে। এর থেকে মনে হয়, বইটি হয়তো আরও সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশের পরিকল্পনা ছিল, সেই হিসেবে মুদ্রণের পর আখ্যাপত্রে 'সন ১২৮৮ ছাপা হয়; কিন্তু পরে আরও কয়েকটি সদ্য-লিখিত ও পুরোনো কবিতা সংযোজিত এবং 'বিজ্ঞাপন' ও 'উপহার' যুক্ত হয়ে গ্রন্থটি বর্ধিত আকারে পরে প্রকাশিত

হয়েছে। কিন্তু এই যুক্তিও পৃষ্ঠাসংখ্যা-হীন দুটি 'উপহার' যোগ করা এবং সূচীপত্রের ভুলগুলি [মুদ্রণপ্রমাদ?] ব্যাখ্যা করার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

বইটির মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা : আখ্যাপত্র [২]+'বিজ্ঞাপন' [২]+'উপহার' [৬]+১৩২+'উপহার' [৪]=১৪৬। 'বিজ্ঞাপন'-এ লিখিত হয়েছে : 'আমার রচিত কবিতার মধ্যে যেগুলি সন্ধ্যা সঙ্গীত নামে উক্ত হইতে পারে, সেইগুলিই এই পুস্তকে প্রকাশিত হইল। ইহার অধিকাংশ কবিতাই গত দুই বৎসরের মধ্যে রচিত হইয়াছে, কেবল "বিষ ও সুধা" নামক দীর্ঘ কবিতাটি বাল্যকালের রচনা।/গ্রন্থকার।'

সন্ধ্যা সঙ্গীত-এর প্রথম সংস্করণে মোট ২৫টি কবিতা ছিল, এর মধ্যে ১২টি কবিতা গ্রন্থ-প্রকাশের পূর্বেই ভারতী-তে মুদ্রিত হয়েছে, বাকি ১৩টি গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। 'বিষ ও সুধা'র প্রাথমিক রূপটি পাওয়া যায় মালতীপুঁথি-র ৪/৪খ ও 7/৪ক পৃষ্ঠায় [পাণ্ডুলিপিতে পাতাটি উলটো করে সেলাই করা]। অবশ্য মুদ্রিত কবিতায় ছত্র-সংখ্যা যেখানে ৪২৩, পাণ্ডুলিপিতে সেখানে মাত্র ১৮৮টি ছত্র পাওয়া যায়, যার অনেকগুলিই মুদ্রিত পাঠে গৃহীত হয় নি। কবিতাটি কোন্ সময়ে লেখা নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই, মালতীপুঁথি-রই কোনো হারানো পৃষ্ঠায় এটিকে সম্পূর্ণ রূপ দেওয়া হয়েছিল কিনা তাও বলা সম্ভব নয়। তবে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের গাথা-কবিতা রচনার পর্বেই—অর্থাৎ ১২৮৪-৮৫ বঙ্গাব্দে—এটি লিখিত হয়েছিল। সন্ধ্যাসঙ্গীত-এর দ্বিতীয় সংস্করণে [১২৯৯] কবিতাটি বর্জিত হয়, পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণের [১৩৭৬] আগে আর পুনর্মুদ্রিত হয় নি। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত অন্য কবিতাগুলিরও পরবর্তী সংস্করণসমূহে যথেষ্ট পরিবর্তন করা হয়েছে, এইগুলির আনুপূর্বিক বিবরণ পুলিনবিহারী সেন ও শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়-কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত উক্ত পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

সোমপ্রকাশ-এর ২ শ্রাবণ [২৬। ৩৫। ৫৪৫] সংখ্যায় সন্ধ্যাসঙ্গীত-এর বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় : 'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি সংস্কৃত ডিপজিটরী, ক্যানিং লাইব্রেরী প্রভৃতি পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।/ভগ্ন-হৃদয়... ... ... ১/সন্ধ্যা সঙ্গীত (নব প্রকাশিত)...॥০'; বিজ্ঞাপনটি পরবর্তী ৯, ১৬, ২৩ শ্রাবণের সংখ্যাতেও মুদ্রিত হয়। তত্ত্ববোধিনী-র ভাদ্র সংখ্যায় [পৃ ১০০] গ্রন্থটির 'প্রাপ্তি স্বীকার' করা হয়েছে, কিন্তু সমসাময়িক পত্রিকায় কাব্যটির কোনো সমালোচনা আমাদের চোখে পড়ে নি।

পরোক্ষ সমালোচনার দুটি বিবরণ অবশ্য আমরা রবীন্দ্রনাথের জবানীতেই পেয়েছি—একটি বঙ্কিমচন্দ্রের ও অপরটি প্রিয়নাথ সেনের। প্রিয়নাথ সেনের সমাদর সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'এই সন্ধ্যাসংগীত রচনার দ্বারাই আমি এমন একজন বন্ধু পাইয়াছিলাম যাঁহার উৎসাহ অনুকূল আলোকের মতো আমার কাব্যরচনার বিকাশচেষ্টায় প্রাণসঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। তিনি শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন। তৎপূর্বে ভগ্নহৃদয় পড়িয়া তিনি আমার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন, সন্ধ্যাসংগীতে তাঁহার মন জিতিয়া লইলাম।'[১৭] বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসা-সম্পর্কে তাঁর উক্তি : 'রমেশ দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহসভার দ্বারের কাছে বঙ্কিমবাবু দাঁড়াইয়া ছিলেন; রমেশবাবু বঙ্কিমবাবুর গলায় মালা পরাইতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম। বঙ্কিমবাবু তাড়াতাড়ি সে-মালা আমার গলায় দিয়া বলিলেন, "এ-মালা ইঁহারই প্রাপ্য—রমেশ, তুমি সন্ধ্যাসংগীত পড়িয়াছ?" তিনি বলিলেন "না"। তখন বঙ্কিমবাবু সন্ধ্যাসংগীতের কোনো কবিতা সম্বন্ধে যে-মত ব্যক্ত করিলেন তাহাতে আমি পুরস্কৃত হইয়াছিলাম।' অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ একই ঘটনা সম্পর্কে লিখেছেন, 'একদিন আমার প্রথম বয়সে কোনো নিমন্ত্রণসভায় তিনি নিজকণ্ঠ হইতে আমাকে পুষ্পমাল্য পরাইয়াছিলেন,

সেই আমার জীবনের সাহিত্যচর্চার প্রথম গৌরবের দিন।'[১৮] ৯ শ্রাবণ [সোম 24 Jul][*১] তারিখে রমেশচন্দ্রের ২০নং বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা কমলা দেবীর[*২] সঙ্গে ভূতত্ত্ববিদ্ প্রমথনাথ বসুর হিন্দুমতে বিবাহ হয়। বিবাহটি যথেষ্ট সামাজিক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, কারণ বিলাত-ফেরত শ্বশুর ও জামাতা কেউই প্রায়শ্চিত্ত করতে রাজি হন নি।

কলিকাতা সারস্বত সম্মিলন স্থাপনের জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। ১ শ্রাবণ [রবি 16 Jul] জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সভাপতিত্বে এই সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশন হয় এবং 'তিন চারিটি নামের মধ্য হইতে অধিকাংশ উপস্থিত সভ্যের সম্মতিক্রমে সভার নাম স্থির হইল সারস্বত সমাজ।' রবীন্দ্রনাথের হস্তলিখিত এই অধিবেশনের একটি কার্যবিবরণী মালতীপুঁথি-র 28/১৫খ ও 29/১৬ক পৃষ্ঠায় পাওয়া গেছে এবং রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা প্রথম খণ্ডের ৪৬-৪৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছে।

বিবরণের প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, '১২৮৯ সালে শ্রাবণ মাসের প্রথম রবিবারে ২রা তারিখে দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি ৬ নম্বর ভবনে সারস্বত সমাজের প্রথম অধিবেশন হয়।' প্রবোধচন্দ্র সেন লক্ষ্য করেছেন শ্রাবণ ১২৮৯-র প্রথম রবিবার ১লা ছিল, '২রা নয়; এ-বিষয়ে তিনি লিখেছেন, 'মনে হয় রবীন্দ্রনাথ এই প্রতিবেদনটি প্রথম অধিবেশনের পরেই লিখে রাখেন নি, লিখেছিলেন বেশ কিছুদিন পরে হয়তো দ্বিতীয় অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্বে। সম্ভবতঃ এটাই এই তারিখভ্রান্তির হেতু।... উক্ত খসড়া প্রতিবেদনে মাসের তারিখের চেয়ে 'প্রথম রবিবারে' কথাটার উপরেই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে, ১২৮৯ সালে ১লা শ্রাবণ... রবিবারেই সারস্বত সমাজের প্রথম অধিবেশন হয়েছিল, দ্বিতীয় অধিবেশন হয়েছিল পরের মাসের প্রথম রবিবারে অর্থাৎ ১২৮৯ ভাদ্র ৫ (ইং ১৮৮২ অগস্ট ২০) তারিখে, আর এই তারিখের (দ্বিতীয়) অধিবেশনেই উক্ত প্রতিবেদনটি পড়া হয়েছিল।'[১৯] শ্রীসেনের অনুমানের শেষাংশ নিশ্ছিদ্র নয়; কারণ তিনি ধরে নিয়েছেন যে, প্রতি বাংলা মাসের প্রথম রবিবারেই সারস্বত সমাজের মাসিক অধিবেশন বসত, অথচ আমরা সমাজের আর একটি অধিবেশনের কথা জানি যেটি বসেছিল ১৭ অগ্রহায়ণ [2 Dec] শনিবারে। কিন্তু সে যাই হোক, বর্তমান ক্ষেত্রে তারিখের ভ্রান্তি মেনে নিতে কোন দ্বিধা নেই।

প্রতিবেদনের শেষাংশ থেকে জানা যায় 'অধিকাংশ উপস্থিত সভ্যের সম্মতিক্রমে বর্তমান বর্ষের জন্য ড রাজেন্দ্রলাল মিত্র সভাপতি, বঙ্কিমচন্দ্র, ড শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও দ্বিজেন্দ্রনাথ সহযোগী সভাপতি এবং কৃষ্ণবিহারী সেন ও রবীন্দ্রনাথ সম্পাদক নির্বাচিত হন। বঙ্কিমচন্দ্র সহ-সভাপতি পদে নির্বাচিত হলেও রবীন্দ্রনাথের ভাষায় : 'বঙ্কিমবাবু সভ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে সভার কাজে যে পাওয়া গিয়াছিল তাহা বলিতে পারি না।'[২০] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধ-মঞ্জরী [১৩১২] গ্রন্থের ভূমিকায় কিছু অতিরিক্ত সংবাদ দিয়েছেন : 'বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি তখনকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রায় সমস্ত সাহিত্যসেবীই এই সভায় উৎসাহ-সহকারে যোগ দিয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবু ইহার নাম "অ্যাকাডেমি অফ বেঙ্গলি লিটারেচার" রাখিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা গৃহীত হয় নাই।'

সারস্বত সমাজের কার্যধারা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'ভৌগোলিক পরিভাষানির্ণয়েই আমরা প্রথম হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম। পরিভাষার প্রথম খসড়া সমস্তটা রাজেন্দ্রলালই ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন।...পৃথিবীর সমস্ত দেশের নামগুলি সেই সেই দেশে প্রচলিত উচ্চারণ অনুসারে লিপিবদ্ধ করিবার সংকল্পও আমাদের

ছিল।’ প্রথম অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে রাজেন্দ্রলাল পরিভাষার সমস্যা সম্পর্কে সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ‘১৭ই অগ্রহায়ণ শনিবার [2 Dec] অপরাহ্ন চার ঘটিকার সময় আলবার্ট হলে’ সারস্বত সভার যে অধিবেশন হয়,* তাতেও ‘সভ্যসাধারণের দ্বারা আহূত হইয়া’ রাজেন্দ্রলাল ভৌগোলিক পরিভাষা সম্বন্ধে তাঁর দীর্ঘ বক্তব্য প্রকাশ করেন। এর পরে ভূগোলের পরিভাষা স্থির করার জন্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীবর বেদান্তবাগীশ, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে নিয়ে একটি সমিতি গঠিত হয় এবং স্থির হয় ‘যে সকল ভৌগোলিক শব্দ আলোচনা করিতে হইবে, শ্রীযুক্তবাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাহার তালিকা প্রস্তুত করিয়া সমিতিতে সমর্পণ করিবেন’ ও ‘তিনমাস পরে উক্ত সমিতির কার্য্য সাধারণ সভায় বিজ্ঞাপিত হইবে।’ এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিছু কাজ হয়েছিল; রাজেন্দ্রলাল মিত্র পরিভাষা-সমিতির সদস্য না হলেও রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যানুসারে পরিভাষার প্রথম খসড়া তিনিই করে দিয়েছিলেন এবং সেটি ছাপিয়ে অন্যান্য সভ্যদের আলোচনার জন্য সকলের হাতে বিতরণ করা হয়েছিল। ‘ভৌগোলিক পরিভাষা’ বিষয়ক মুদ্রিত প্রস্তাব পেয়ে দেওঘর থেকে ৪ আষাঢ় [১২৯০] রাজনারায়ণ বসু ও খিদিরপুর থেকে 6 Jul [1883, ২৩ আষাঢ়] যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ সারস্বত সমাজের সম্পাদকের কাছে যে পত্র লেখেন, মন্মথনাথ ঘোষ তাঁর গ্রন্থে সেগুলি উদ্ধৃত করেছেন [পৃ ১১৭-২০]। সুতরাং এই সমাজ অন্তত এক বৎসরের পরমায়ু লাভ করেছিল, এ কথা মনে করা যেতে পারে, কিন্তু আর কোনো অধিবেশন ইত্যাদির খবর পাওয়া যায় না। অবশ্য ক্যাশবহি-র কয়েকটি হিসাবে আমরা সারস্বত সমাজের উল্লেখ দেখতে পাই। ১ পৌষ [শুক্র 15 Dec 1882] তারিখের হিসাবে আছে : দ° সারস্বত সভা বাটীতে হইবায় উপস্থিত সভ্যদিগের পান তামাক বরফ সোড়াওয়াটর ইত্যাদি ব্যয় ৮৷৷০’ —জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এই সভা কবে হয়েছিল বলা শক্ত, কারণ পূর্ববর্তী ১৭ অগ্রহায়ণের সভা হয়েছিল অ্যালবার্ট হলে। সারস্বত সমাজের সভ্যদের মধ্যে কেউ কেউ চাঁদাও দিয়েছিলেন [১ শ্রাবণের প্রথম অধিবেশনে সভ্যদের জন্য বার্ষিক চাঁদা ৬ টাকা ও আজীবন সদস্যদের জন্য এককালীন ১০০ টাকা নির্ধারিত হয়েছিল], সেই চাঁদা ঠাকুর-পরিবারের সরকারী তহবিলের সঙ্গে রক্ষিত হত এই তথ্যটি জানা যায় ২৫ মাঘের ‘২২ মাঘের জমা মা° সারস্বত সভার ক্যাস দং আমানত রাখা যায়...রোক ১২’ এবং ১১ ফাল্গুনের ‘সারস্বত সভার তহবিল ২৪’— এই দুটি হিসাব থেকে। বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে লেখা তারিখ-হীন একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ সারস্বত সমাজ প্রসঙ্গে লিখেছেন, ‘আমি কিছুদিন থেকে সারস্বত সমাজের হ্যাঙ্গামা নিয়ে ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলুম—এখনো অল্প অল্প চল্‌চে—তাই আর আপনাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ প্রভৃতি হয়ে ওঠেনি।’[২১] [পত্রটি নিয়ে পরে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করব।] রবীন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসুকে একটি তারিখহীন পত্রে লেখেন : ‘সারস্বত সমাজে গোল যথেষ্ট হইতেছে, কিন্তু ভূগোল কিছুই হইতেছে না, এই সংক্ষেপে বলিলাম।’ সারস্বত সমাজ সম্পর্কে পত্রটিতে এইটুকুই উল্লেখ আছে, কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-সংগ্রহশালায় রক্ষিত এই অত্যন্ত জীর্ণ পত্রটি অন্যান্য কারণেও মূল্যবান বলে আমরা এর থেকে আরও কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। পোকায় নষ্ট করায় কিছু শব্দ বা বাক্যাংশ বিলুপ্ত, সহজবোধ্য অনুমানযোগ্য শব্দগুলি আমরা তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে দিয়েছি, অন্য লুপ্ত অংশগুলি...চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়েছে :

ভক্তি ভাজনেষু,

আপনার পত্র পাইয়া অতিশয় প্রীত হইলাম। বৌঠাকুরাণীর হাট আপনার যে ভাল লাগিয়াছে ইহা শুনিয়া আমি ...ের অনুভব করিতেছি।

যোগীন বাবু আমাকে সুরভির জন্য কতকগুলি ইংরাজি কবিতা [র] অনুবাদ পাঠাইতে অনুরো[ধ করিয়া] ছিলেন। আমি তাঁহাকে [লিখিয়াছি] ভাল কবিতা অনুবাদ ক...হইয়া যায় অতএব অনু [বাদ]...করিলেই তাহাদের প্রতি [? অবিচার] করা হয়। অনুবাদ করিলে...কৃতয়ের মত কাজ করা হয়। অ... ...সম্প্রতি তাঁহার অনুরোধ মতে এক[টি ইংরাজি কবিতা] অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু দুই চারি ছত্র লিখিয়াই এমনি মন [? বিকল] হইয়া গেল যে, সে কাজ [? পরিত্যাগ] করিতে হইল। সুরভিতে আপ[নার] রচিত গ্রাম্য উপাখ্যান পাঠ করিয়াছি—উক্ত প্রবন্ধের...সরল অকৃত্রিম ছাঁচের লেখা...আপনার লেখা বলিয়া...ছিলাম।

[কিছুদিন] হইতে আপনি ভারতীর...একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন...ভারতী আপনার নিকট হইতে... তো উৎসাহজনক সমালোচনা আশা করে, ইহাতে আপনার কৃপণতা[করা] উচিত হয় না।

[এখানে সারস্বত-সংক্রান্ত বাক্যটি আছে।]

মেজদাদারা এখনো [? কলিকাতায়] আছেন—আরো ৫। ৬ [দিন থাকিবেন।] আপনি আমার প্রণাম জানিবেন ও [যোগীন] বাবুকে আমার প্রীতি সম্ভাষণ...

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাজনারায়ণের তত্ত্বাবধানে ও তাঁর পুত্র যোগীন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদনায় সাপ্তাহিক পত্রিকা সুরভি ১ আশ্বিন ১২৮৯ [শনি 16 Sep 1882] থেকে প্রকাশিত হতে থাকে, বছর-চারেক পরে 'পতাকা'র সঙ্গে মিলিত হয়ে 'সুরভি ও পতাকা' নাম ধারণ করে [দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাময়িক-পত্র ২। ৩৬-৩৭]। পত্রিকাটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিল এবং তাঁর কিছু অনুবাদ-কবিতা পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়ে থাকতে পারে, পত্রটি থেকে এই তথ্যটি পাওয়া যায়। কিন্তু সুরভি-র ফাইল সম্ভবত বিলুপ্ত, সুতরাং রচনাগুলি উদ্ধার করা হয়তো সম্ভব নয়। সত্যেন্দ্রনাথ 4 Mar [রবি ২১ ফাল্গুন] পর্যন্ত ছুটি নিয়ে পৌষ মাসের শেষে কলকাতায় এসেছিলেন। সুতরাং অনুমান করা চলে, পত্রটি ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে লেখা হয়েছিল। সারস্বত সমাজ সম্পর্কে আর কোনো তথ্য পাওয়া যায় নি।

পরবর্তী প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে ভারতী-তে রবীন্দ্র-রচনার প্রকাশ-সূচীটি একবার পর্যালোচনা করে নেওয়া যাক।

ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৯ [৬।৪]:

১৭০-৭৮ 'বসন্ত রায়' দ্র সমালোচনা অ-২।১২১-৩০

অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ'-এর অন্তর্গত 'বিদ্যাপতির পদাবলী' গ্রন্থে বসন্ত রায়ের ভনিতাযুক্ত ৫৮টি পদ সংকলিত হয়েছিল। এক সময়ে অনেকেরই ধারণা ছিল, বিদ্যাপতি ও বসন্তরায় একই ব্যক্তি। বর্তমান প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ, ঐতিহাসিক প্রমাণের দিক দিয়ে নয়, রসবিচারের ভিত্তিতে উভয়কে স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলে সিদ্ধান্ত করেছেন এবং বিদ্যাপতির সঙ্গে তুলনা করে বসন্তরায়ের সরল অথচ মর্মস্পর্শী পদাবলীর কাব্যসৌন্দর্য বিশ্লেষণ করেছেন। এ-সম্পর্কে কৈলাসচন্দ্র সিংহ লেখেন, 'বসন্তরায় দীর্ঘকাল বিদ্যাপতি বসনাভ্যন্তরে লুক্কায়িত ছিলেন। সম্প্রতি জনৈক সুলেখক বিশেষ দক্ষতা সহকারে বসন্তরায়কে স্বাধীন ভাবে পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন।...যে মহাত্মা বসন্তরায়কে স্বতন্ত্রভাবে সাহিত্য-জগতে দাঁড় করাইতে পারিয়াছেন আমরা তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ না দিয়া বিরত হইতে পারিলাম না।'[২২] সতীশচন্দ্র রায়ও লিখেছেন, 'আমাদের যতদূর জানা আছে, তাহাতে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ই...প্রথমে বসন্ত রায়ের সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহার রচনার অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনা নির্দ্দেশ করেন।'[২৩] রবীন্দ্রনাথ বৌ-ঠাকুরাণীর হাট-এ প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য বসন্ত রায়কে বৈষ্ণব করে এঁকেছেন, তাঁর কণ্ঠের কয়েকটি গানে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব আমরা পূর্বেই নির্দেশ করেছি। কৈলাসচন্দ্র সিংহ তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে লিখেছেন, 'কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একদা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে মহারাজা প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য রাজা বসন্তরায়ই কবি বসন্তরায় বলিয়া তিনি কোনও কোনও ব্যক্তির নিকট শ্রবণ করিয়াছেন। এই উক্তির পোষণোপযোগী কোনও প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হই নাই।'[২৪]

১৭৮-৯৩ 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট', ঊনত্রিংশ-ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ দ্র বৌঠাকুরাণীর হাট ১।৪৭৬-৯৩ [ষড়্‌বিংশ-ত্রিংশ পরিচ্ছেদ]

ভারতী-র ত্রিংশ [বর্তমান সপ্তবিংশ] পরিচ্ছেদে বসন্ত রায়ের মুখে একটি গান ব্যবহার করা হয়েছে—'আমিই শুধু রইনু বাকী!' [পৃ ১৮১] দ্র রবিচ্ছায়া। ১৩০ [ব্রহ্মসঙ্গীত ৩৭], রামপ্রসাদি সুর; গীতবিতান ২। ৬০৩; স্বরবিতান ৮-এ ইন্দিরাদেবী-কৃত স্বরলিপি 'রামপ্রসাদী সুর। একতালা' নির্দেশ-সহ মুদ্রিত হয়েছে।

ভারতী, ভাদ্র ১২৮৯ [৬।৫]:

২৩৪-৪০ 'মেঘনাদবধ কাব্য' দ্র সমালোচনা অ-২।৭৫-৭৯

শ্রাবণ ১২৮৪-সংখ্যা ভারতী-তে কিশোর রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধ কাব্যের ধারাবাহিক বিরুদ্ধ সমালোচনার সূত্রপাত করেছিলেন, পরেও অন্তত দুটি ক্ষেত্রে ['বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা'—বৈশাখ ১২৮৮ ও 'রাবণ বধ দৃশ্যকাব্য'—মাঘ ১২৮৮] কাব্যটির প্রতি তাঁর বিরূপতা গোপন করেন নি। কিন্তু সেই রচনাগুলি ছিল স্বাক্ষর-বিহীন, ফলে বিশেষ করে প্রথম সমালোচনাটির বিরোধিতা করতে গিয়ে যোগীন্দ্রনাথ তর্কচূড়ামণি তাঁর 'মেঘনাদবধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে কিভাবে ভ্রমক্রমে দ্বিজেন্দ্রনাথকে উক্ত প্রবন্ধের লেখক ধরে নিয়ে কটূক্তি করেছিলেন, আমরা তা পূর্বেই আলোচনা করেছি। সেইজন্যই হয়তো বর্তমান প্রবন্ধটি 'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' স্বাক্ষরে ও আশ্বিন-সংখ্যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা একই নামের প্রবন্ধটি [পৃ ২৬৫-৭২] তাঁর স্বনামে মুদ্রিত হয়। দুটি প্রবন্ধ পড়লেই বোঝা যায়, মেঘনাদবধের কাব্যগুণ সম্বন্ধে দুই ভ্রাতার মতের বিশেষ পার্থক্য নেই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেখানে রসবিচারের দিক দিয়ে কাব্যটির সমালোচনা করেছেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেক্ষেত্রে বিচার করেছেন মহাকাব্যের আলংকারিক আদর্শের মানদণ্ডে।

২৪৯-৫৭ 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট', চতুস্ত্রিংশ-পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ দ্র বউঠাকুরাণীর হাট ১।৪৯৩-৫০২ [একত্রিংশ-দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ]

২৫৭-৬২ 'প্রত্যুত্তর/দেশজ প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি' দ্র সমালোচনা অ-২।৬৭-৬৮ ['সত্যের অংশ]

ভারতী-র আষাঢ় [পৃ ১৫২-৫৭] ও শ্রাবণ [পৃ ২০১-০৮]-সংখ্যায় 'শ্রীঅঃ—' [অক্ষয় চন্দ্র চৌধুরী]-লিখিত 'দেশজ প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি'-শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধটির প্রত্যুত্তরে 'শ্রীরঃ' স্বাক্ষরে রবীন্দ্রনাথের বর্তমান রচনাটি লিখিত হয়। সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি তাঁর কোনো গ্রন্থে সংকলিত না হলেও প্রারম্ভিক বাক্যটির কিয়দংশ বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ প্রথম অনুচ্ছেদটি [পৃ ২৫৭-৫৮] 'সত্যের অংশ' নামে 'সমালোচনা' [১২৯৪] গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তথ্যটি জানা না থাকায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস তাঁদের 'রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী'-তে এবং পুলিনবিহারী সেন রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জীতে প্রবন্ধটির উৎস নির্দেশ করতে পারেন নি। এর ফলে রবীন্দ্র-রচনার কালানুক্রমিক তালিকা তৈরি করতে গিয়েও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে; ড সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "সত্যের অংশ" প্রবন্ধটি গ্রন্থেই প্রথম প্রকাশ'।[২৫]

অক্ষয় চৌধুরী তাঁর প্রথম প্রস্তাব-এ লেখেন, 'আমাদের মস্তিষ্কে, আমাদের হৃদয়ে পর্য্যন্ত বিলাতের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। সে ছায়ার আওতায় আমাদের মনের বা হৃদয়ের সহজ স্ফূর্তি বুঝি আর সম্ভবপর নহে।...এ সকল দেশ-কাল-পাত্রভ্রষ্ট অসঙ্গত কল্পনা দৃশ্যে যাঁহারা প্রমোদিত হইতে চাহেন, সচ্ছন্দে তাঁহারা প্রাণ ভরিয়া প্রমোদিত হউন, কিন্তু আমরা তাঁহাদের সহিত যোগ দিতে পারি না।'[২৬] রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'প্রত্যুত্তর'-এ লিখলেন, 'কবিতায় কৃত্রিমতা দোষার্হ, এ বিষয়ে কাহারো দ্বিমত থাকিতে পারে না।...[কিন্তু] যখন তিনি বলেন, দেশকাল পাত্র-বহির্ভূত হইলে কবিতা কৃত্রিম হয় ও আধুনিক বঙ্গীয় কবিতা দেশকালপাত্র-বহির্ভূত হইতেছে, তখনই তাঁহার সহিত আমরা সায় দিতে পারি না।'[২৭] নিজ মতের সমর্থনে তিনি লিখলেন, 'বাস্তবিকই যখন ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে বাঙ্গলা দেশের বদ্ধ, স্থির, নিস্তরঙ্গ সমাজের মধ্যে সহসা এক তুমুল পরিবর্ত্তনের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, সমাজের কোন পাড় ভাঙ্গিতেছে, কোন পাড় গড়িতেছে, সমাজের কত শত বদ্ধমূল বিশ্বাসের গোড়া হইতে মাটি খসিয়া যাইতেছে, কত শত নূতন বিশ্বাস চারিদিকে মূল প্রসারিত করিতেছে, যখন আমাদের বাহিরে ওলট্‌পালট্, যখন আমাদের অন্তরে ওলট্‌পালট্, তখন যে আমরা দেশকালপাত্র অতিক্রম করিয়া প্রাচীন কবিদের কবিতার আঁচল ধরিয়া থাকিব, আমাদের কবিতার মধ্যে এই দুর্দ্দান্ত পরিবর্ত্তনের কোন প্রভাব লক্ষিত হইবে না—ইহা যে নিতান্তই অস্বাভাবিক। লেখক যে একটি কল্পনার জেলখানা নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব করিতে চাহেন, দিশি ইঁট দিয়া তাহার প্রাচীর নির্ম্মিত হইবে বলিয়াই যে কবিরা তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে রাজি হইবেন, এমন ত বোধ হয় না।'[২৮]

আধুনিক কবিরা তাঁদের কবিতায় সমাজ-বিরুদ্ধ ভাবের অবতারণা করেন বলে অক্ষয়চন্দ্র দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তার উত্তরে লেখেন, 'আমি ত বলি, বঙ্গীয়-রমণী-হৃদয়-চিত্রের কলঙ্ক আধুনিক কবিদের দ্বারা অপসৃত হইয়াছে।...লেখক কি বলিবেন যে, প্রেমের সেই কানাকানি, ঢাকাঢাকি, লুকাচুরী, সেই শাশুড়ি-ননদী-ভীতিময় পীরিতি, সেই মলয়, কোকিল, ভ্রমরের বিভীষিকা পূর্ণ বিরহ, সেই সুমেরু-মেদিনী সঙ্কুল ভৌগোলিক শরীর বর্ণনা, তাহাই আমাদের দেশজ সহজ হৃদয়ের ভাব, অতএব তাহাই কবিতায় প্রবর্ত্তিত হউক্—আর আজকালকার এই প্রকাশ্য, মুক্ত, নির্ভীক, অলঙ্কার-বাহুল্য বিরহিত কালাপাহাড়ী ভাব, ইহা বিদেশীয় ইহা আমাদের কবিতা হইতে দূর হউক! সমাজের যথার্থ হানি কিসে হয়; গোপনে গোপনে সমাজের শিরায় শিরায় বিষ সঞ্চারিত করিয়া দিয়া, না প্রকাশ্য ভাবে সমাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া?'[২৯] এর পরে আধুনিক কবিদের মুখপাত্র হিসেবে লিখলেন, 'প্রকৃত কথা এই যে, সমাজকে সমাজ বলিয়াই খাতির করা, এবং দেশকালপাত্রের অন্ধ অসুসরণ করিয়া চলা কবিরা পারিয়া উঠেন না। প্রবহমান সমাজের উপর যে সকল ফেনা, যে সকল তৃণ খণ্ড ভাসে তাহা ত আজ আছে কাল নাই, কবিরা সেই ভাসমান খড় কুটায় বাঁধিয়া তাঁহাদের কবিতাকে সমাজের স্রোতে ভাসান্ দিতে চান না। সেই স্রোতের বাহিরেই তাঁহারা ধ্রুব আশ্রয়ভূমি দেখিতে পান।...নতুবা সমাজের প্রত্যেক তরঙ্গের সহিত উঠিয়া পড়িয়া তাহারা কোথায় মিলাইয়া যায়।'[৩০] প্রবন্ধটি সহজলভ্য নয় বলেই আমরা এর থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিলাম; লক্ষণীয় রবীন্দ্রনাথ নিজের মতকে কতখানি জোরের সঙ্গে সমর্থন করতে সক্ষম হয়ে উঠেছেন।

ভারতী, আশ্বিন ১২৮৯ [৬।৬]:

২৭২-৭৫ 'অনন্ত মরণ' দ্র প্রভাতসংগীত ১।৬৮-৭০

১৫২টি ছত্রের মধ্যে রচনাবলী-সংস্করণে মাত্র ৫৪টি ছত্র রক্ষিত হয়েছে। আমাদের ধারণা, কবিতাটি অনেক পূর্বে 'মহাস্বপ্ন' বা 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়' প্রভৃতি কবিতার সমকালে বা কিছু পরে লেখা—এ-সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

২৭৫-৯১ 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট', ষট্‌ত্রিংশ-চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ ও উপসংহার দ্র বউঠাকুরানীর হাট ১।৫০২-২০ [ত্রয়স্ত্রিংশ-সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ]

'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' কার্তিক ১২৮৮-সংখ্যা ভারতী-তে আরম্ভ হয়ে মোট বারোটি সংখ্যায় ধারাবাহিক-রূপে প্রকাশিত হবার পর বর্তমান সংখ্যায় সমাপ্ত হয়। 'উপসংহার' অংশটি বর্তমানে শেষ পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, চত্বারিংশ [বর্তমান সপ্তত্রিংশ] পরিচ্ছেদের একাংশ প্রথমে ভাষান্তরে প্রথম পরিচ্ছেদে লিপিবদ্ধ ছিল, পরে এই পরিচ্ছেদটি বর্জিত হয়। ষট্‌ত্রিংশ [বর্তমান ত্রয়স্ত্রিংশ] পরিচ্ছেদের অন্তর্গত বসন্ত রায়ের কণ্ঠে দুটি গান ছিল, শেষেরটি দ্বিতীয় সংস্করণের পরই বর্জিত হয়েছে : [১] 'আর কি আমি ছাড়্‌ব তোরে' দ্র ভারতী, আশ্বিন ১২৮৯।২৭৫; রবিচ্ছায়া। ৯৫ [বিবিধ ১১১]; গানের বহি। ১২৮ [বিবিধ], টোড়ি-ঝাঁপতাল; গীতবিতান ৩।৭৯৯; সুরটি সংরক্ষিত হয় নি।

[2] 'আজ আমার আনন্দ দেখে কে' দ্র ভারতী, আশ্বিন। ২৭৬; গীতবিতান। ৩।৭৯৯; সুরের কোনো উল্লেখ দেখা যায় না।

ভারতী-র আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যা যুগ্মভাবে প্রকাশিত হয়েছিল কিনা বলা শক্ত, কিন্তু কার্তিক ১২৮৯ [৬।৭]-সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের কোনো রচনা মুদ্রিত হয় নি।

সম্ভবত কার্তিক মাসের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে দার্জিলিং বেড়াতে যান। শ্রাবণ মাসে কাদম্বরী দেবী কিছু অসুস্থ হয়ে পড়েন, ক্যাশবহি-র হিসাবে দেখা যায় :'শ্রীমতী নূতন বধূ ঠাকুরাণীর পীড়ার জন্য নীলমাধব [হালদার] ডাক্তারকে আনিতে... ১১ শ্রাবণের এক বৌচর ২্'। হয়তো এই অসুস্থতার পর বায়ু-পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে দার্জিলিং যাত্রা করা হয়। তাছাড়া দেবেন্দ্রনাথের মতোই শারদীয়া পূজার সময়ে দেশভ্রমণে বহির্গত হওয়ার অভ্যাস জ্যোতিরিন্দ্রনাথও আয়ত্ত করেছিলেন। এই ভ্রমণ সেই অভ্যাশ-বশতও হয়ে থাকতে পারে।

ভাদ্র মাসে রবীন্দ্রনাথের অসুস্থতার কথাও জানা যায় ক্যাশবহি-র ১৮ ভাদ্র [2 Sep] তারিখের হিসাবে : 'ব° ভগবান চন্দ্র রূদ্র ডাক্তার/দ° সোমবাবু ও রবীবাবু মহাশয়দিগের পীড়ার জন্য উক্ত ডাক্তারের ফি ৪্'। ২৯ ভাদ্র [বুধ 13 Sep] তারিখের একটি হিসাব : 'কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের নিকট রবীবাবুর এক পত্র/পাঠাইবার টিকিট- ৶৬', মহর্ষির নিকট প্রেরিত রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিটি রক্ষিত হয় নি, বস্তুত পিতাকে লেখা তাঁর কোনো চিঠিই পাওয়া যায় না।

আমরা আগেই বলেছি, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্ভবত কার্তিক মাসের শুরুতেই সস্ত্রীক দার্জিলিং বেড়াতে যান। (এই বছর ৩ কার্তিক [বৃহ 19 Oct] সপ্তমী পূজার দিন ছিল।) হয়তো পুরো মাসটিই তাঁরা সেখানে কাটান, অন্তত ১৯ কার্তিক [শনি 4 Nov]-এর পর কিছুদিন সেখানে ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় ওই দিন কলকাতা থেকে দার্জিলিঙে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে একটি চিঠি পাঠানোর হিসাব থেকে।

রবীন্দ্রনাথও তাঁদের সঙ্গী হন। এইটিই তাঁর প্রথম দার্জিলিং যাত্রা।* রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি-র পাণ্ডুলিপিতে লিখেছেন, "দার্জিলিঙে গিয়া শহর হইতে দূরে 'রোজভিলা' নামক একটি নিভৃত বাসায় আশ্রয় লইলাম।"[৩১] 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-এর সেই অপূর্ব অভিজ্ঞতার পর রবীন্দ্রনাথ কিছু কাল 'আত্মহারা আনন্দের অবস্থা'য় ছিলেন। সুতরাং তিনি ভেবেছিলেন, সদর স্ট্রীটের শহরের ভিড়ের মধ্যে যা দেখেছিলেন হিমালয়ের উদার শৈলশিখরে তা-ই আরও ভালো করে, গভীর করে দেখতে পাবেন। অন্তত এই দৃষ্টিতে হিমালয় নিজেকে কিভাবে প্রকাশ করে তা জানা যাবে। কিন্তু হিমালয়ে গিয়ে দেখা গেল সেই দৃষ্টিই হারিয়ে গেছে। 'বাহির হইতে আসল জিনিস কিছু পাইব এইটে মনে করাই বোধ করি আমার অপরাধ হইয়াছিল। নগাধিরাজ যত বড়োই অভ্রভেদী হোন না, তিনি কিছুই হাতে তুলিয়া দিতে পারেন না, অথচ যিনি দেনেওয়ালা তিনি গলির মধ্যেই এক মুহূর্তে বিশ্বসংসারকে দেখাইয়া দিতে পারেন।'[৩২]

দার্জিলিঙে অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথ 'প্রতিধ্বনি'[৩৩] নামে একটি কবিতা লেখেন। এটি কোনো পত্রিকাতে মুদ্রিত না হয়ে সরাসরি গ্রন্থভুক্ত হয়। কবিতাটি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'সেটা এমনি একটা অবোধ্য ব্যাপার হইয়াছিল যে, একদা দুই বন্ধু বাজি রাখিয়া তাহার অর্থ নির্ণয় করিবার ভার লইয়াছিল। হতাশ হইয়া তাহাদের মধ্যে একজন আমার কাছ হইতে গোপনে অর্থ বুঝিয়া লইবার জন্য আসিয়াছিল। আমার সহায়তায় সে বেচারা যে বাজি জিতিতে পারিয়াছিল এমন বোধ হয় না।'[৩৪] কবিতাটি কারোর চোখে পড়ে না বা এর জন্য তাঁকে কারোর কাছে জবাবদিহি করতে হয় না একথা বলেও জীবনস্মৃতি বা অন্যত্র এটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, এ থেকেই বোঝা যায় কবিতার অন্তর্নিহিত ভাবটি তাঁর কাছে কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

দার্জিলিং থেকে ফিরে রবীন্দ্রনাথ নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ভারতী-র অগ্রহায়ণ সংখ্যা [৬।৮]-য় তাঁর 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' ও অক্ষয় চৌধুরীর 'অভিমানিনী নির্ঝরিণী' মুদ্রিত হয় এবং ১৭ অগ্রহায়ণ [শনি 2 Dec] অ্যালবার্ট হলে সারস্বত সমাজের একটি বিশেষ অধিবেশন হয়, এসব প্রসঙ্গ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এর কয়েকদিন পরে তাঁর দ্বিতীয় গীতিনাট্য কালমৃগয়া প্রকাশিত হয় 5 Dec 1882 [মঙ্গল ২০ অগ্র°] তারিখে [বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা অনুযায়ী]। এরপর তিনি এটি অভিনয়ের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

এখন প্রশ্ন, কাল-মৃগয়া কোন্ সময়ে লিখিত হয়েছিল। সাধারণভাবে মনে করা যেতে পারে যে, দার্জিলিং থেকে ফিরেই রবীন্দ্রনাথ এটির রচনা-কার্যে হাত দেন। কিন্তু এ-বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হয় প্রিয়নাথ সেনকে লেখা একটি পত্র পড়ে। এটিতে তিনি লিখছেন, 'ভারতী বেরিয়েছে। এবারকার কবিতাটি তেমন ভাল লাগবে না।...কালমৃগয়া এখনো ছাপা হয় নি। প্রেসে দেওয়া হয়েছে বটে।'[৩৫] এখানে ভারতী-র যে সংখ্যাটির কথা বলা হয়েছে, সেটি নিশ্চয়ই অগ্রহায়ণ সংখ্যা নয়—কারণ এই সংখ্যায় মুদ্রিত 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' সম্বন্ধে 'এবারকার কবিতাটি তেমন ভাল লাগ্‌বে না' মন্তব্য করা সহজবোধ্য কারণেই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কার্তিক সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের কোনো কবিতা প্রকাশিত হয় নি, তাছাড়া তিনি তখন দার্জিলিঙে, এই কারণেই আমাদের মনে হয়, তিনি এখানে আশ্বিন-সংখ্যায় মুদ্রিত 'অনন্ত মরণ' কবিতাটির কথা উল্লেখ করেছেন—যেটি সম্পর্কে উপরোক্ত মন্তব্য করা সম্ভব। এই হিসেবে কাল-মৃগয়া-র রচনাকাল দাঁড়ায় ১৫ আশ্বিনের পূর্ববর্তী কোনো সময়—সেক্ষেত্রে বন্ধু-মহলে পাঠ করে শোনানো, সুরারোপ প্রভৃতির জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়।

বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা অনুযায়ী গ্রন্থটির মুদ্রণসংখ্যা ২৫০ মাত্র অর্থাৎ কেবল অভিনয়পত্রী হিসেবেই ৩৮ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়েছিল। বইটির আকারও বড়ো বিচিত্র—মোটামুটি মাপ ১২.৫ সে.মি. . ৮.৫ সে.মি. মাত্র। বইটিতে কোনো আখ্যাপত্র নেই, মলাটের উপরে লেখা আছে:

'কাল-মৃগয়া।/ (গীতিনাট্য।)/বিদ্বজ্জন সমাগম উপলক্ষে/অভিনয়ার্থ/রচিত।/কলিকাতা/আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে/শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও/প্রকাশিত।/অগ্রহায়ণ ১২৮৯।/মূল্য চারি আনা।'

গীতিনাট্যটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'বাল্মীকিপ্রতিভার গান সম্বন্ধে এই নূতন পন্থায় উৎসাহ বোধ করিয়া এই শ্রেণীর আরও একটা গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম। তাহার নাম কালমৃগয়া, দশরথকর্তৃক অন্ধমুনির পুত্রবধূ তাহার নাট্যবিষয়। তেতালার ছাদে স্টেজ খাটাইয়া ইহার অভিনয় হইয়াছিল—ইহার করুণরসে শ্রোতারা অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন।'[৩৬]

গ্রন্থ-প্রকাশের কয়েকদিনের মধ্যেই নাটিকাটির অভিনয়ের জন্য ব্যস্ততার নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রিয়নাথ সেনকে একটি তারিখ-হীন পত্রে লেখেন, 'এখন আমি আমাদের অপেরার রিহর্সলে নিতান্ত ব্যস্ত আছি।'[৩৭]—পত্রটি অগ্রহায়ণের শেষ সপ্তাহে [Dec 1882] লেখা বলে অনুমান করা যায়। ক্যাশবহি-তে ২৭ অগ্র° [12 Dec]-র হিসাবে দেখা যায় : 'জায়/বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কালমৃগয়া গীতনাট্য অভিনয় খরচ জন্য হা° ২৩ অগ্রহাণ...এক বৌচর গুঃ রবীবাবু রোক ২০্ ও নিজ রোজ ঐ খরচ জন্য গুঃ যদুনাথ চট্টো° রোক এক বৌচর ২৫্, দফে গুঃ ঐ চট্টো° কুক কেনডির দোকানের সোনার লেফলেট [?] ক্রয়ে এক বিল শোধ...৪০্ সর্ব্ব একুনে—৮৫্; ৮ ফাল্গুনের হিসাবে দেখি : 'জায়/...বিদ্বজ্জন সমাগমে কার্ড ও প্রগ্রাম বই ছাপান ব্যয় ব° আদিব্রাহ্ম সমাজ গুঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এক বিল ৩৩্' [কালমৃগয়া প্রোগ্রাম বই হিসেবেই ছাপা হয়েছিল, সুতরাং এই খরচের মধ্যে গ্রন্থ মুদ্রণের ব্যয়টিও ধরা হয়েছে]; ১৯ বৈশাখ ১২৯০ [1 May 1883] তারিখে এই অভিনয় বাবদ মোট খরচের হিসাবটি পাওয়া যায় : 'বিদ্বজ্জন সমাগম উপলক্ষে বাটীতে কালমৃগয়া গিতনাট্য অভিনয় হয় তাহার ব্যয় শোধ...৩৬৭।৩'।

কাল-মৃগয়া-র অভিনয় হয় ৯ পৌষ শনি 23 Dec তারিখে। এই প্রসঙ্গে মন্মথনাথ ঘোষ লিখেছেন, '১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ২৩শে ডিসেম্বর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভবনে 'কালমৃগয়া'র অভিনয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দশরথের, রবীন্দ্রনাথ অন্ধমুনির, হেমেন্দ্রনাথের পুত্র ঋতেন্দ্রনাথ [১২] ও কন্যা অভিজ্ঞা দেবী [৯] যথাক্রমে অন্ধমুনির পুত্রকন্যার এবং পরিবারস্থ বালিকাগণ বনদেবীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।'[৩৮] ইন্দিরা দেবী তাঁর 'ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা' হিসেবে লিখেছেন, "আমি [৯] ও উষাদিদি [১১; দ্বিজেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা] কালমৃগয়া-য় বনদেবী সেজে 'সমুখেতে বহিছে তটিনী' গানটিতে এক জায়গায় বসে ডান হাতের ভঙ্গিতে সামনের দিকে কেমন তটিনী বয়ে যাচ্ছে আর দু-আঙুল উপরে তুলে 'দুটি তারা আকাশে ফুটিয়া' দেখাতাম, সে গল্প করে সেদিন পর্যন্ত কত মেয়েদের হাসিয়েছি।"[৩৯] গানের সঙ্গে নাচের ভঙ্গির ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, "বনদেবীদের 'রিমঝিম' প্রভৃতি গানের সঙ্গে নৃত্যে অতি প্রাথমিক ড্রিল-এর মতো একপ্রকার নাচ শেখানো হত, যা দেখে এখনকার নৃত্যপটীয়সীরা বোধ হয় তাচ্ছিল্যের হাসি হাসবেন।'[৪০] এই অভিনয় সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, "তারপর বাল্মীকিপ্রতিভার গান একটু ভেঙেটেঙে 'কালমৃগয়া' হল। জ্যোতিকাকা সাজলেন রাজা দশরথ, রবিকাকা অন্ধমুনি, ঋতু অন্ধমুনির ছেলে। এই কালমৃগয়াতে প্রথম বনদেবীর পার্ট শুরু

হয়। ছোটো ছোটো মেয়ে যারা গাইতে পারে তারা বনদেবী সেজে স্টেজে নামত, ঘুরে ঘুরে গান করত। তখন নাচ-টাচ ছিল না তোমাদের মতো দুম্‌দাম্ করে। ওই হাতমুখ নেড়ে গান পর্যন্তই। সেবারে জ্যোতিকাকামহাশয়ের সত্যিকারের একটা পোষা হরিণ বের করে দেওয়া হল স্টেজে।'[৪১]

মন্মথনাথ ঘোষ সাপ্তাহিক 'ভারতবন্ধু' পত্রিকা থেকে অভিনয়ের একটি বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন : 'বিদ্বজ্জন সমাগম। গত শনিবার রাত্রে ঁদ্বারকানাথ ঠাকুরের বাড়ীতে বিদ্বজ্জন সমাগম হইয়াছিল। এই সমাগম উপলক্ষে "কালমৃগয়া" নামক একখানি ক্ষুদ্র নাট্য গীতি রচিত হইয়া ঐ রাত্রে অভিনীত হয়। অভিনয় অনেকাংশে সুন্দর হইয়াছিল। গৃহদেবীরা বনদেবী সাজিয়া অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। বিদূষকের অভিনয়ের শেষাংশ ভাল হয় নাই। মুনিকুমার পিতার নিকট জল আনিতে গেলে লীলা তাহার অন্বেষণ করিতে করিতে অন্ধমুনির নিকটে যেরূপে গান গাহিয়াছিল, তাহা শুনিলে পাষাণহৃদয়ও বিগলিত হয়।'[৪২]

হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা এই অভিনয় সম্বন্ধে লেখে : '...The actors and actresses were for the most part the children of the family, and the performance was simply exquisite. It would be invidious to single out any particular character, when all acquitted themselves so well....'[৪৩]

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'পরে, এই গীতিনাট্যের অনেকটা অংশ বাল্মীকিপ্রতিভার সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছিলাম বলিয়া ইহা গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই।'[৪৪] দীর্ঘকাল পরে রবীন্দ্র-রচনাবলী-র অচলিত সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে [আশ্বিন ১৩৪৭] নাটিকাটি পুনর্মুদ্রিত হয় [দ্র অ-১।৩১৭-৩৮]। গীতবিতান ৩য় খণ্ড সংকলন কালে [আশ্বিন ১৩৫৭] নাটিকাটি 'গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য' পর্যায়ে মুদ্রিত হয় [দ্র ৩।৬১৭-৩৪]। প্রতিভা দেবী বালক পত্রিকার [১২৯২] ভাদ্র, আশ্বিন, পৌষ ও মাঘ সংখ্যায় কালমৃগয়া-র প্রথম দৃশ্য থেকে চতুর্থ দৃশ্যের কিয়দংশ ['আয় লো সজনি, সবে মিলে'] পর্যন্ত স্বরলিপি প্রকাশ করেন। পরে ইন্দিরা দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথ কোনো-কোনো গানের স্বরলিপি করেন। ইন্দিরা দেবী-কৃত সমগ্র গীতনাট্যটির স্বরলিপি স্বরবিতান ২৯ [আষাঢ় ১৩৬০]-এ মুদ্রিত হয়েছে।

প্রয়োজনবোধে মন্তব্য-সহ গীতনাট্যের গানগুলির একটি তালিকা দেওয়া হল:

প্রথম দৃশ্য/তপোবন

১ মিশ্র ভূপালী—যৎ [ঝাঁপতাল*]/বেলা যে চলে যায়, ডুবিল রবি

২ মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালি [ত্রিতাল]/ও ভাই, দেখে যা; ইন্দিরা দেবীর মতে, এটি ইংরেজি 'The British Grenadiers' গানের সুর অবলম্বনে রচিত, দ্র রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম।১১

৩ মিশ্র খাম্বাজ—আড়খেম্‌টা [খেমটা]/ও, দেখবি রে ভাই, আয় রে ছুটে; মূল গান : "The Vicar of Bray'

৪ মিশ্র বিভাস–আড়খেম্‌টা [খেমটা]/কাল সকালে উঠব মোরা; মূল গান : 'Auld Lang Syne'; এই সুরেই রবীন্দ্রনাথ 'পুরানো সেই দিনের কথা' [দ্র গীতবিতান ৩।৮৮৫] গানটি রচনা করেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য/বন

৫ মিশ্র সিন্ধু—ঢিমে তেতালা [ত্রিতাল]/সমুখেতে বহিছে তটিনী; দ্র রবিচ্ছায়া ৪ [বিবিধ ৪], ঝিঁঝিট সিন্ধু —কাওয়ালি; পূর্বরচিত 'হাসি কেন নাই ও নয়নে' [স্বপ্নময়, সিন্ধু-ঝিঁঝিট] গানটির সুর ব্যবহৃত হয়েছে।

৬ মিশ্র কেদারা—একতালা [খেম্‌টা]/ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে; মূল গান : ‘Ye banks and braes’

৭ ছায়ানট—আধ্বা [ত্রিতাল]/নেহার’ লো সহচরি; পূর্বলিখিত ‘আয় তবে সহচরী, হাতে হাতে ধরি ধরি’ গানটির সুর এখানে প্রায় অপরিবর্তিত রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

তৃতীয় দৃশ্য/কুটীর

[দৃশ্যের শুরুতেই অন্ধ ঋষি ‘অন্তরিক্ষোদরঃ কোশো’ ইত্যাদি, ছান্দোগ্যোপনিষদের তৃতীয় অধ্যায় পঞ্চদশ খণ্ডের প্রথম দুটি মন্ত্র (৩।১৫।১-২) পাঠ করে পুত্রের মঙ্গলকামনার সূত্রপাত করেন। দ্বিতীয় মন্ত্রটির শেষাংশ নাটিকাটির ভাববস্তুর পক্ষে তাৎপর্যময় বলে এর একটি অনুবাদ উদ্ধৃত করছি : ‘যিনি বায়ুকে দিক্‌সমূহের বৎস বলিয়া জানেন, তাঁহাকে পুত্রবিয়োগ নিবন্ধন রোদন করিতে হয় না। আমিও সেই প্রকার বায়ুকে দিক্‌সমূহের বৎস বলিয়া জানি, আমাকেও যেন পুত্রবিয়োগে রোদন করিতে না হয়।’ তৃষ্ণায় কাতর হয়ে সব-ক’টি মন্ত্র পাঠ না করতে পারাও লক্ষণীয়।]

৮ জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল/জল এনে দে রে বাছা তৃষিত কাতরে

৯ দেশ—ঢিমে তেতালা [ত্রিতাল]/না না কাজ নাই, যেও না বাছা

চতুর্থ দৃশ্য/বন

১০ গৌড়মল্লার—কাওয়ালি [মিশ্র মল্লার। ত্রিতাল]/সঘন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া

১১ মল্লার—কাওয়ালি [ত্রিতাল]/ঝম্‌ ঝম ঘন ঘন রে বরষে; ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে বাল্মীকিপ্রতিভা-র দ্বিতীয় সংস্করণে ব্যবহৃত।

১২ মল্লার—কাওয়ালি [ত্রিতাল]/আয় লো সজনি, সবে মিলে

১৩ গারা—কাওয়ালি [ত্রিতাল]/কি ঘোর নিশীথ, নীরব ধরা

১৪ মিশ্র বেলাওল—একতালা [ত্রিতাল]/মানা না মানিলি, তবুও চলিলি; মূল গান : ‘Go where glory waits thee’—*Irish Melodies*; বাল্মীকিপ্রতিভা দ্বিতীয় সংস্করণে এই সুরেই ‘মরি ও কাহার বাছা’ ও ব্রহ্মসংগীত ‘ওহে দয়াময়, নিখিলআশ্রয়’ [১২৯১ বঙ্গাব্দে মাঘোৎসবে গীত] এবং মায়ার খেলা-র ‘আহা আজি এ বসন্তে’ গানগুলি রচিত হয়।

পঞ্চম দৃশ্য/[শিকারীগণের প্রবেশ]

১৫ ইমন কল্যাণ—কাওয়ালি [কাহারবা]/বনে বনে সবে মিলে চল হো; সামান্য পরিবর্তিত আকারে বাল্মীকিপ্রতিভা-য় গৃহীত।

১৬ সিন্দুড়া—[কাহারবা]/জয়তি জয় জয় রাজন্‌ বন্দি তোমারে

১৭ বাহার—[দাদরা]/গহনে গহনে যা রে তোরা; অপরিবর্তিত আকারে বাল্মীকিপ্রতিভা-য় গৃহীত।

১৮ অহং—কাওয়ালি [কাহারবা]/চল চল্‌ ভাই; অপরিবর্তিত আকারে বাল্মীকিপ্রতিভা-য় গৃহীত।

১৯ দেশ—খেমটা/প্রাণ নিয়ে ত সটকেছি রে; সংক্ষেপিত ও পরিবর্তিত আকারে বাল্মীকিপ্রতিভা-য় গৃহীত।

২০ শঙ্করা [মিশ্র শঙ্করা। একতালা]/ঠাকুরমশয়, দেরি না সয়; ‘ঠাকুরমশয়’ শব্দটির বদলে ‘সর্দারমশায়’ ব্যবহার করে বাল্মীকিপ্রতিভা-য় গৃহীত।

২১ মিশ্র সিন্ধু—[তালফেরতা]/আঃ, বেঁচেছি এখন; সংক্ষেপিত ও পরিবর্তিত আকারে বাল্মীকিপ্রতিভা-য় গৃহীত।

২২ এনেছি মোরা এনেছি মোরা; পরিবর্তিত আকারে বাল্মীকিপ্রতিভা-য় গৃহীত, সুর : মিশ্র ঝিঁঝিট।

২৩ মিশ্র মল্লার—পোস্ত [তেওরা]/কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে; বাল্মীকিপ্রতিভা-য় অপরিবর্তিত আকারে গৃহীত। মোরান সাহেবের বাগানে থাকার সময়ে বিদ্যাপতির 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর' গানটিতে যে-সুর দিয়েছিলেন, সেই সুরে কথা বসিয়েই গানটি রচিত; এমনকি 'তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী' শব্দগুচ্ছটি বিদ্যাপতির উক্ত পদ থেকেই সংগৃহীত হয়েছে।

২৪ খাম্বাজ—কাওয়ালি [লুম খাম্বাজ। ত্রিতাল]/না জানি কোথা এলুম

ভৈরবী—[ত্রিতাল]/হায় কি হ'ল! হায় কি হ'ল*

২৫ বেহাগ—আড়াঠেকা/কি করিনু হায়!

২৬ খট—ঝাঁপতাল [মিশ্রখট্]/কি দোষ করেছি তোমার

ষষ্ঠ দৃশ্য/কুটীর

২৭ মিশ্র ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান/আমার প্রাণ যে ব্যাকুল হয়েছে

২৮ রামকেলী—কাওয়ালি [ত্রিতাল/বল বল পিতা, কোথা সে গিয়েছে

২৯ বেহাগ—কাওয়ালি/কে জানে কোথা সে; লক্ষণীয়, এই সুরটিই 'সহে না যাতনা' [দ্র গীতবিতান ৩। ৮৮৭] গানটিতে ব্যবহার করা হয়েছে—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, গানটির 'রচনাকাল নির্দ্দেশ করা সম্ভব হয় নাই'।[৪৫]

৩০ সিন্ধু—চৌতাল [কাফি-কানাড়া। চৌতাল]/এতক্ষণে বুঝি এলি রে

৩১ রাজবিজয়ী [মিশ্র রাজবিজয়। ত্রিতাল]/অজ্ঞানে কর হে ক্ষমা

৩২ বাহার—টিমে তেতালা [মিশ্র বাহার। ত্রিতাল]/কি বলিলে, কি শুনিলাম

'পুত্রব্যসনজং দুঃখং...' ইত্যাদি শ্লোকটি বাল্মীকি রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড [৬৪।৫৪] থেকে গৃহীত। হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন-কৃত অনুবাদ : 'সম্প্রতি আমার যেমন পুত্রশোক হইয়াছে, এইরূপ পুত্রশোকে তোমাকে দেহপাত করিতে হইবে।'[৪৬]

৩৩ মিশ্র ভূপালি—কাওয়ালি/ক্ষমা কর মোরে তাত

৩৪ কাফি—আড়াঠেকা/আহা, কেমনে বধিল তোরে

৩৫ নটনারায়ণ—[ঝাঁপতাল]/শোক তাপ গেল দূরে

৩৬ প্রভাতী—[ঝাঁপতাল]/যাও রে অনন্তধামে মোহ মায়া পাশরি

৩৭ ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতাল/সকলি ফুরাল স্বপন প্রায়; মূল গান : 'Robin Adair.'

কাল-মৃগয়া ঠাকুরবাড়িতে পরেও কয়েকবার অভিনীত হয়, কিন্তু সেগুলির কোনো বিবরণ রক্ষিত হয় নি। ফাল্গুন ১২৯২ [Mar 1886]-তে প্রকাশিত বাল্মীকিপ্রতিভা-র দ্বিতীয় সংস্করণে কাল-মৃগয়া-র ৯টি গান অপরিবর্তিত বা সামান্য পরিবর্তন-সহ গৃহীত হয়; অনেকগুলি গানের সুর অন্য এক বা একাধিক গানে বসানো হয়। এই সব কারণেই রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে নাটিকাটির পুনঃপ্রচারে আগ্রহী হন নি।

এর অল্প কিছুকাল পরেই ভারতী-তে ধারাবাহিক ভাবে মুদ্রিত উপন্যাস ‘বৌ-ঠাকুরাণীর হাট’ গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়। বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা অনুযায়ী গ্রন্থটি প্রকাশের তারিখ 11 Jan 1883 [বৃহ ২৮ পৌষ], মুদ্রণ সংখ্যা ১০০০ ও মূল্য ১।০ গ্রন্থটির আখ্যাপত্র এইরূপ:

বৌ-ঠাকুরাণীর হাট।/উপন্যাস।/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।/প্রণীত।/কলিকাতা/ আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে/শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।/পৌষ ১৮০৪ শক।

পৃষ্ঠাসংখ্যা : আখ্যাপত্র [২]+উপহার [০-ল০]+৩০৪+উপসংহার [১]

গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের বড়দিদি ‘শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী শ্রীচরণেষু’ উৎসর্গীকৃত। ২৪টি ছত্রের একটি ‘উপহার’ কবিতাও আছে, যার শেষ ১৬টি ছত্রের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় মালতীপুঁথি-র 19/১০খ পৃষ্ঠায় [দ্র রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা ১।৩২-৩৩; পাণ্ডুলিপি-চিত্র : ঐ ২।১৯৬]। পাণ্ডুলিপিতেই কিছু সংস্কারের চিহ্ন আছে, গ্রন্থে আরও কিছু পাঠান্তর দেখা যায়। কবিতাটির রচনা-কাল সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কিছু বলা শক্ত। তবে হস্তাক্ষর দেখে এটিকে সমসাময়িক রচনা বলে অনুমান করা যায়—‘সারস্বত সমাজ’-এর পূর্বোল্লেখিত প্রতিবেদন ও ‘কি করিলি আশার ছলনে’ [‘কি করিলি মোহের ছলনে’—এই বৎসরের মাঘোৎসবে গীত] গানটির পাণ্ডুলিপিতেও একই ধরনের হস্তাক্ষর দেখা যায়, যা স্পষ্টতই পূর্ববর্তী রচনার হস্তাক্ষরের অনেক পরিণত রূপ। যাই হোক, কবিতাটির ৫ম-৮ম ছত্রগুলি—

সুদূর প্রবাস হতে আজি বহুদিন পরে
আসিতেছ ঘরে,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে আছি উপহার লয়ে করে
সমর্পণ তরে।

—একটি বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। সৌদামিনী দেবী ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভাকে সঙ্গে নিয়ে ১২৮৮ বঙ্গাব্দের শেষদিকে [Feb 1882] কানারায় সত্যেন্দ্রনাথের কর্ম্মস্থলে গিয়ে প্রায় এক বছর সেখানে থেকে ১ মাঘ [শনি 13 Jan 1883] কলকাতায় ফিরে আসেন [দ্র ক্যাশবহি-র ১০ চৈত্রের হিসাব : ‘মেজবাবু মহাশয়েরা সকলে বম্বে হইতে বাটীতে আগমন করায় আহারাদি ব্যয় ১ মাঘের...’]। সৌদামিনী দেবীর এই দীর্ঘ প্রবাসের অন্তরালে সম্ভবত কিছু পারিবারিক অশান্তি* নিহিত ছিল। সুতরাং যখন তাঁর বাড়ি ফিরে আসার খবর পাওয়া গেল, তখন সেই আনন্দ-মুহূর্তকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যই রবীন্দ্রনাথ এই ‘উপহার’-কবিতাটি লিখে উপন্যাসটি স্নেহময়ী বড়দিদিকে উৎসর্গ করেন।

বইটির মুদ্রণ-ব্যয়ের দায়িত্ব প্রধানত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন। ক্যাশবহি-তে ৮ মাঘের হিসাবে দেখা যায় : ‘জায়/দফে উক্ত বাবু [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ]—দং বউঠাকুরাণীর হাট পুস্তকের কাগজের মূল্য চন্দ্র মোহন সূরকে দেওয়া যায় বিঃ এক বিল ১৭০।০’ ও ‘বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দং বই তৈয়ার কাগজের মূল্য চন্দ্রমোহন সূর ১ বৌচর ৩২ল৯’; ১৬ ফাল্গুনের একটি হিসাব : ‘বউঠাকুরাণীর হাট নামক পুস্তক ছাপায় আদি ব্রাহ্মসমাজের এক বিলের ১৫৯ মধ্যে ইনপাট...১০০’। প্রাথমিক ব্যয় সরকারী তহবিল থেকে মেটানো হলেও শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পুস্তকের আয়ব্যয়ের হিসাব-সংবলিত একটি খাতায় এই উপন্যাস-বাবদ ব্যয় ও আয়ের অনুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যায়। এই খাতায় দেখি, বই বাঁধাইয়ের জন্য নেহাজদ্দি

দপ্তরিকে ২৩৲ দেওয়া হয়েছে, নববিভাকর চারু বার্তা ঢাকা প্রকাশ প্রভৃতি, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ ১১৷লি৬; ২৬ মাঘ ১২৮৯ তারিখে ৪ খানা বই 'নগদ বিক্রি' থেকে আরম্ভ করে ২৪ আষাঢ় পর্যন্ত প্রায় ১৬৪টি বই বিক্রয়ের হিসাব পাওয়া যায়, উপহার দেওয়া হয় ৬৭টি পুস্তক। এর পর ২৮ আষাঢ় ১২৯১ [11 Jul 1884] গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়কে এক-চতুর্থাংশ মূল্যে ৫৬০ খানি বই দেওয়া হয়; পরেও প্রতিটি পাঁচ আনা মূল্যে ৭৮টি বই বিক্রয়ের হিসাব পাওয়া যায়। এই হিসাব থেকে বুঝতে পারি যে, কেবল কবিকাহী-র প্রকাশক প্রবোধচন্দ্র ঘোষের ক্ষেত্রেই 'বইয়ের বোঝা সুদীর্ঘকাল দোকানের শেল্‌ফ এবং তাঁহার চিত্তকে ভারাতুর করিয়া অক্ষয় হইয়া বিরাজ' করে নি, রবীন্দ্রনাথও এই আনুষঙ্গিক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত ছিলেন না। জনসমাজে সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর পরিচিতি যতই ব্যাপক হোক-না কেন, গ্রন্থ-বিক্রয়ের হিসাবে তার যথোপযুক্ত প্রতিফলন ঘটে নি। সেদিক থেকে তাঁর ন-দিদি স্বর্ণকুমারী দেবী বা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অনেক বেশি সৌভাগ্যের অধিকারী ছিলেন।

উপরে উল্লিখিত পত্রিকাগুলি ছাড়াও সোমপ্রকাশ ও সাধারণী-তে বৌঠাকুরানীর হাট-এর বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতে দেখা যায় : 'শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত নিম্ন লিখিত নবপ্রকাশিত পুস্তকগুলি ক্যানিং লাইব্রেরী সংস্কৃত ডিপজিটরি প্রভৃতি প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। বৌঠাকুরাণীর হাট (উপন্যাস) ১।o/ সন্ধ্যা-সংগীত... ॥o/শ্রীপ্রিয়নাথ সেনগুপ্ত। ৬ নং দ্বারিকানাথ ঠাকুরের লেন যোড়াসাঁকো-কলিকাতা।' বিজ্ঞাপনটি সোমপ্রকাশ-এর ১, ১৫ ও ২২ ফাল্গুন সংখ্যায় এবং সাধারণী-র ৩০ মাঘ, ১৪ ও ২১ ফাল্গুন সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। অন্য পত্রিকার বিজ্ঞাপনগুলি আমরা না দেখলেও, অনুমান করা যায় তাদের ভাষাও একই রকম ছিল। এছাড়া সোমপ্রকাশ-এর ৬ চৈত্র [২৭।১৮] সংখ্যায় শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় 'বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি/৯৭ নং কলেজ স্ট্রীট কলিকাতা' ঠিকানায় বিজ্ঞাপন দেন—'এতদ্ভিন্ন বঙ্কিম বাবুর, সঞ্জিব বাবুর, মাইকেল, দীনবন্ধু, রমেশবাবু, রবীন্দ্র, জিতেন্দ্র [? জ্যোতিরিন্দ্র], বাবুর ইত্যাদি সকল রকমের ভাল পুস্তক পাওয়া যায়।' লক্ষণীয় যে, এই বয়সে—অন্তত বিজ্ঞাপনেও রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল ইত্যাদির সঙ্গে একত্রে স্থান পেয়েছেন!

সমসাময়িক পত্রিকার যে ফাইলগুলি আমরা দেখেছি, তাতে উপন্যাসটির সম্বন্ধে কোনো আলোচনা চোখে পড়ে নি। কেবল সাধারণী-র-১০ বৈশাখ ১২৯০ [২০।২]-সংখ্যায় [পৃ ১৭] একটি অত্যন্ত বিরূপ সমালোচনা মুদ্রিত হয়। 'সাহিত্য সমালোচনা।/১২৮৯ সাল।'/শিরোনামায় 'গদ্যকাব্য' পর্যায়ে 'বিগত বৎসরের প্রধান কাব্য —আনন্দমঠ' সম্বন্ধে আলোচনা করে সমালোচক [? অক্ষয়চন্দ্র সরকার], লিখেছেন:

'দ্বিতীয় উপন্যাস গ্রন্থ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, বৌঠাকুরাণীর হাট। যুরোপ যাত্রীর পত্রগুলি, কেবল চিঠি লেখা বলিয়া ধরিলে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই খানি প্রথম গদ্যগ্রন্থ বলিয়াই বোধ হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পদ্যে যে ছায়াময় আবেশের ভাবটি আছে, তাঁহার গীতিতে যে ভাঙ্গাভাঙ্গা স্বরটি আছে, তাঁহার গদ্যে তাহার কিছুই নাই। এই গ্রন্থের বিবরণ ভাগ, ইংরাজি দৈনিক পত্রের সংবাদ লেখার মত লেখা। বর্ণন ভাগও প্রায় সেইরূপ। যেন বিজ্ঞানের চক্ষে প্রকৃতির ভাব গ্রহণ করিয়া, চা খড়ি দিয়া কেবল অস্থি পঞ্জর লেখা হইয়াছে। রঙ্গ ফলাইতে, ছায়াতপ প্রদর্শন করিতে, ক্ষমতা থাকিলেও ইচ্ছা নাই। যদি এইরূপ কঠিনী পাত্রে তুর্লিকা [?] চিত্রণের ফল হইত, তাহা হইলে গ্রন্থকার জয়লাভ করিতেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা হয় নাই। অর্দ্ধাঙ্কিত চিত্রে অনেক স্থলে হৃদয় স্পর্শ হয় না।

'এই গ্রন্থের মর্ম্ম গ্রন্থি আমরা খুঁজিয়া পাই নাই। বসন্ত রায় রাজ্য গিয়াছে বলিয়া প্রফুল্ল,; উদয়াদিত্য রাজ্যভার বহন করিতে হইবে বলিয়া আশঙ্কায় অসন্তুষ্ট। দুইটি একত্র করিলে বোধ হয়, গ্রন্থকার ঐহিক সুখ সম্পত্তির অনিত্যতা প্রদর্শন করিতে চাহেন; কিন্তু তাই যদি হয়, তবে ভুক্তভোগী প্রতাপাদিত্য স্বীয় বিস্ময় জনক দৃঢ়তা রক্ষা করিতেছেন কি রূপে? পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমরা গ্রন্থের মূল গ্রন্থি বুঝিতে পারি নাই; সুতরাং সমস্ত গ্রন্থের সৌন্দর্য্য সমালোচনা করিতে আমরা পারিলাম না।

'পুরুষের মধ্যে মোহনলাল [? রামমোহন] ও স্ত্রীলোকের মধ্যে মঙ্গলা—এই দুটি চিত্র বেশ পরিষ্কার রূপে আমরা বুঝিতে পারিয়াছি। দুটিতেই গ্রন্থকারের গুণপনা আছে। রামচন্দ্র রায় এবং রসাই [? রমাই] কিছুই হয় নাই। বসন্ত রায় মন্দ নয়। সুরমা বিভা প্রভৃতি ছায়াবাজীর পুতুল, গ্রন্থকার রজ্জু ধরিয়া যখন যে দিকে লইয়া গেছেন, তখন সেই দিকেই গিয়াছেন; তাঁহাদের অবয়ব আছে, প্রাণ নাই। উদয়াদিত্যের জন্য ধর্ম্মত দুঃখ করা উচিত, কিন্তু কার্য্যত এক বিন্দু অশ্রু চক্ষে আসে নাই। আর প্রতাপাদিত্য যে,

নাহি মানে পাতশায়, কেহ নাহি আঁটে তায়,
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ—

কৈ সেরূপ প্রতাপ দেখিলাম কৈ! সেই পাষাণের কঠোরতা আছে—কিন্তু সে রাবণের প্রতাপ কৈ?

'অতএব বৌ ঠাকুরাণীর হাটে ঠাকুর কবি নূতন যশঃ ক্রয় করিতে পারেন নাই, তবে আমাদিগকে একখানি সুরুচি সম্পন্ন সরল ভাষায় লিখিত সুখ পাঠ্য উপন্যাস উপহার দিয়াছেন বটে।'*

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'এই গল্প বেরোবার পর বঙ্কিমের কাছ থেকে একটি অযাচিত প্রশংসাপত্র পেয়েছিলুম, সেটি ইংরেজি ভাষায় লেখা। সে পত্রটি হারিয়েছে কোনো বন্ধুর অযত্ন-করক্ষেপে। বঙ্কিম এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে, বইটি যদিও কাঁচাবয়সের প্রথম লেখা তবু এর মধ্যে ক্ষমতার প্রভাব দেখা দিয়েছে—এই বইকে তিনি নিন্দা করেন নি। ছেলেমানুষির ভিতর থেকে আনন্দ পাবার এমন কিছু দেখেছিলেন, যাতে অপরিচিত বালককে [এসময় অবশ্য 'বালক' নন, এবং বঙ্কিমের 'অপরিচিত'ও নন] হঠাৎ একটা চিঠি লিখতে তাঁকে প্রবৃত্ত করলে। দূরের যে পরিণতি অজানা ছিল সেইটি তাঁর কাছে কিছু আশার আশ্বাস এনেছিল। তাঁর কাছ থেকে এই উৎসাহবাণী আমার পক্ষে ছিল বহুমূল্য।'[৪৭] শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'রবীন্দ্র বাবুর কথা উঠিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁর উপন্যাস কি আপনি পড়িয়াছেন? উত্তর—পড়েছি। স্থানে স্থানে অতি সুন্দর সুন্দর উচ্চদরের লেখা আছে, কিন্তু উপন্যাসের হিসাবে সেটা নিষ্ফল হয়েচে। রবিকে সে কথা আমি বলেছি। উদীয়মান, লেখকদের মধ্যে হরপ্রসাদ, তুমি ও রবির মধ্যে আমার বোধ হয় রবি বেশী "গিফ্‌টেড্" কিন্তু "পৃকোসাছ্", এখনি তার বয়স ২২।২৩, সে কথা সে দিন রবিকে বলেছি। রবি বলেন, আপনিও অল্প বয়সে "দুর্গেশনন্দিনী" লেখেন। আমি যখন "দুর্গেশনন্দিনী" লিখি, তখন আমার বয়স ২৪ বৎসর।'[৪৮] হয়তো বঙ্কিমের সঙ্গে এই আলোচনার অভিঘাতেই রবীন্দ্রনাথ কিছুদিনের মধ্যে একটি প্রবন্ধে লেখেন, 'বঙ্কিমবাবু যখন দুর্গেশনন্দিনী লেখেন তখন তিনি যথার্থ নিজেকে আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। লেখা ভাল হইয়াছে, কিন্তু উক্ত গ্রন্থে সর্ব্বত্র তিনি তাঁহার নিজের সুর ভাল করিয়া লাগাইতে পারেন নাই। কেহ যদি প্রমাণ করে, যে, কোন একটি ক্ষমতাশালী লেখক অন্য একটি উপন্যাস অনুবাদ বা রূপান্তরিত করিয়া দুর্গেশনন্দিনী রচনা করিয়াছেন, তবে তাহা শুনিয়া নিতান্ত আশ্চর্য্য হই না।'[৪৯]

১১ মাঘ [মঙ্গল 23 Jan 1883] ব্রাহ্মসমাজের ত্রিপঞ্চাশ সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ চারটি ব্রহ্মসংগীত রচনা করেন, এদের মধ্যে দুটি প্রাতঃকালীন উপাসনায় আদি ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে ও দুটি মহর্ষি-ভবনে সায়ংকালে গীত হয়:

[১] 'দেখ্ চেয়ে দেখ্ তোরা জগতের উৎসব' দ্র গীতবিতান ৩।৮৩০

তত্ত্ববোধিনী, ফাল্গুন। ২০৫, রাগ ভয়রোঁ—তাল ঝাঁপতাল; রবিচ্ছায়া। ১৩৬ [ব্রহ্ম ৪৫]; স্বরবিতান ৪৫-এ ইন্দিরা দেবী-কৃত স্বরলিপিতে রাগ 'মিশ্র ভৈরোঁ'।

[২] 'কী করিলি মোহের ছলনে' দ্র গীতবিতান ৩।৮২৯-৩০

তত্ত্ববোধিনী, ফাল্গুন। ২০৫-০৬, ভজন—তাল ঠুংরি; মালতীপুঁথি-র 73/৩৮ক পৃষ্ঠায় গানটির পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে, সেখানে প্রথম ছত্রটি—'কি করিলি আশার ছলনে' দ্র রবীন্দ্র জিজ্ঞাসা ১।১২৩; রবিচ্ছায়া। ১৩৭-৩৮ [ব্রহ্ম ৪৬]; স্বরবিতান ৮; 'অবদিন থোড়ি রহি' এই হিন্দি ভজনের সুরটি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে।[৫০]

[৩] 'বড়ো আশা করে এসেছি গো' দ্র গীতবিতান ৩।৮৩১

তত্ত্ববোধিনী, ফাল্গুন। ২০৬, কর্ণাটী ঝিঁঝিট্-তাল কাওয়ালি; রবিচ্ছায়া। ১৪১-৪২ [ব্রহ্ম ৫৩]; স্বরবিতান ৮। মূল গান : 'সখি বা বা'—ইন্দিরা দেবী এ-সম্পর্কে লিখেছেন, "বিবাহের অনতিপূর্বে কবি [রবীন্দ্রনাথ] কারোয়ার-নামক বোম্বাইয়ের যে সুন্দর বন্দরে আমাদের সঙ্গে ছিলেন, সেখানে এক সময়ে একদল নর্তকী গান শোনাতে আসে, মনে পড়ে। তাদের কাছে কয়েকটি কানাড়ী ভাষার গান শুনি ও শিখি, যা পরে তিনি 'ভাঙেন'।"[৫১] এই তথ্য ঠিক বলে মনে হয় না, কারণ রবীন্দ্রনাথ কারোয়ার গিয়েছিলেন ১২৯০ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে। সেইজন্য আমাদের ধারণা, প্রতিভা দেবী যখন সেখানে সত্যেন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে কয়েক মাস ছিলেন, তখন তিনিই সম্ভবত এই গানটি এবং আরও কয়েকটি গান শিখে আসেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে সেগুলি শুনে সেই সুরে কয়েকটি গান রচনা করেন, বর্তমান গানটি তার অন্যতম।

[৪] 'আজি শুভদিনে পিতার সদনে' দ্র গীতবিতান ৩।৮৩০-৩১,

তত্ত্ববোধিনী, ফাল্গুন। ২০৬, কর্ণাটী খাম্বাজ—তাল ফের্‌তা; রবিচ্ছায়া। ১৪৭-৪৮ [ব্রহ্ম ৬৩]; স্বরবিতান ৪৫-এ প্রতিভা দেবী-কৃত স্বরলিপি মুদ্রিত হয়েছে, বালক পত্রিকার আষাঢ় ১২৯২ [পৃ ১৪৬-৪৮] সংখ্যায় তিনি গানটির প্রথম স্বরলিপি প্রকাশ করেন। মূল গান : 'পূর্ণ চন্দ্রাননে' [কানাড়ী]। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে কানাড়ী গান ভাঙা সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই গানটি সম্পর্কেও প্রযোজ্য।*

পাঠকের স্মরণ আছে, ১৫ শ্রাবণ ১২৮৮ তারিখে কৃষ্ণকুমার মিত্র ও লীলাবতী দেবীর বিবাহ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ দুটি গান রচনা করেছিলেন। এই বৎসরও অনুরূপ অনুষ্ঠানের জন্য তাঁকে বিবাহ-গীতি রচনা করতে দেখা যায়। তত্ত্বকৌমুদী-তে [৫।২০-২১, ১৬ মাঘ-১ ফাল্গুন সংখ্যা, পৃ ২৫০-৫১] লিখিত হয় : 'বিগত ২৯এ মাঘ শনিবার [10 Feb 1883] রাত্রিতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উপাসনালয়ে শ্রীযুক্তবাবু কালীশঙ্কর সুকুলের সহিত বরিশাল জেলাবাসী ও দেরাধুন নগর প্রবাসী শ্রীযুক্তবাবু কালীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা কুমারী হেমন্তকুমারীর পরিণয় হইয়া গিয়াছে।... ইঁহার বয়ক্রম ২৬ বৎসর। শ্রীমতী হেমন্তকুমারী পঞ্চদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছেন।... ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে বিবাহ রেজেষ্টরী করা হইয়াছে। বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন।... বিবাহ উপলক্ষে নিম্নলিখিত নূতন সঙ্গীতগুলি হইয়াছিল।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা। জগতের পুরোহিত তুমি, তোমার এ জগত মাঝারে।

রাগিণী সাহানা—তাল যৎ। শুভদিনে শুভক্ষণে, পৃথিবী আনন্দমনে,

রাগিণী জয়জয়ন্তি—তাল ঝাঁপতাল। তুমি হে প্রেমের রবি আলো করি চরাচর।'

লক্ষণীয় যে, এর মধ্যে দুটি গান—'জগতের পুরোহিত তুমি' ও 'তুমি হে প্রেমের রবি'—প্রভাতকুমার মুখখাপাধ্যায় কৃষ্ণকুমার মিত্রের বিবাহ উপলক্ষে রচিত বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ের আলোচনায় দেখেছি যে, এই বক্তব্য তথ্য-ভিত্তিক নয়। উপরের উদ্ধৃতি থেকে আমরা উক্ত গান দুটির ও অন্য একটি গানের রচনার পটভূমিটি জানতে পারছি। অনুমান করা যায়, গানগুলি কিছুদিন পূর্বেই রচিত হয়েছিল। বিবাহটি আদিসমাজের পদ্ধতি অনুসারে অনুষ্ঠিত হয় নি, সুতরাং বিবাহনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি সম্ভব ছিল না।

গানগুলির সম্পর্কে অন্যান্য তথ্য এখানে সংকলিত হল:

[১] জগতের পুরোহিত তুমি দ্র রবিচ্ছায়া। ১৫৫-৫৭ [ব্রহ্ম ৭৩]; গীতবিতান ৩।৮৬২; রবিচ্ছায়া-র পাঠই গীতবিতান-এ সংকলিত হয়েছে, কিন্তু তত্ত্বকৌমুদী-র পাঠে কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয়; স্বরলিপি নেই।

[২] শুভদিনে শুভক্ষণে দ্র রবিচ্ছায়া। ১৪৬ [ব্রহ্ম ৬১]; গীতবিতান ৩।৮৬৩; তত্ত্বকৌমুদী-র পাঠে ৭ম ছত্রে 'রাখো তারে' স্থলে 'রাখো তাকে'; স্বরলিপি নেই।

[৩] তুমি হে প্রেমের রবি দ্র রবিচ্ছায়া। ১৫৭ [ব্রহ্ম ৭৪]; গীতবিতান ৩।৮৬২-৬৩; তত্ত্বকৌমুদী-তে শেষ ছত্রে 'উভয়ে উভয়ে হেরে' স্থলে 'উভয়ে উভেরে-হেরে'—এই পাঠই সংগত বলে মনে হয়; স্বরলিপি নেই।

তিনটি গানের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল, কোনোটির সুরই সংরক্ষিত হয় নি।

সত্যেন্দ্রনাথ 8 Jan [সোম ২৫ পৌষ] থেকে 4 Mar [রবি ২১ ফাল্গুন] পর্যন্ত ছুটি নিয়ে কারোয়ার থেকে কলকাতায় আসেন। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী পূর্ব থেকেই পুত্র-কন্যা নিয়ে ১৪ নং লোয়ার সার্কুলার রোডের ভাড়া বাড়িতে বাস করছিলেন। তাঁর আত্মীয়-বৎসলতা, আমুদে ও মিশুক প্রকৃতির জন্য জোড়াসাঁকোর অনেকেই তাঁর কাছে যাতায়াত করতেন। রবীন্দ্রনাথ তো মাঝে মাঝেই সেখানে গিয়ে কয়েক দিন কাটিয়ে আসতেন, প্রিয়নাথ সেনকে লেখা তাঁর পত্রে এইরূপ অবস্থানের সংবাদ পাওয়া যায়; যেমন একটি পত্রে লিখেছেন, 'আমি এখন ১৪নং South Circular Road মেজদাদাদের বাড়িতে আছি—এ জায়গাটা যোড়াসাঁকোর দিক থেকে এত দূরে যে মনে হয় যেন নির্ব্বাসনে আছি—তাই জন্যে আপনাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ প্রভৃতি আর হয়ে ওঠে না।'[৫২] সত্যেন্দ্রনাথ আসার পর সেই বাড়িতে নিত্য উৎসবের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। কোনো এক 'বৃহস্পতিবার'-এ রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'কাল আমাদের এখানে অর্থাৎ (১৪ নং সর্কুলর রোডে) একটা ছোট পার্টি আছে, তাতে ঋষি ও হালদার আস্‌বেন, আপনি এলে বড়ই খুসি হই। মেজদাদার সেই অবসরে আপনার সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছে আছে।... এবার ভারতীতে যে কবিতা ['কবিতা-সাধনা'—ভারতী ফাল্গুন। ৫৩২-৩৭] যাবে সেইটে সঙ্গে আন্‌বেন। মেজদাদার *Mademoiselle De Maupin*[*১] খুবই ভাল লাগ্‌চে।'[৫৩] এই বিষয়ে তাঁর লিখিত 'পুনশ্চঃ' : '*Mademoiselle De Maupin* মেজদাদার পড়া হয়ে গেছে। তাঁর খুব ভাল লেগেছে। আমার ওপরে, তিনি আপনাকে সহস্র thanks দেবার বরাত দিয়েছেন গ্রহণ করবেন।'[*২] এইরূপ কয়েকটি চিঠির মধ্যেই সার্কুলার রোডের বাড়িতে তাঁর অবস্থানের সংবাদ পাওয়া যায়।

এই সময়েই হয়তো রবীন্দ্রনাথ ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা মিলে সাহিত্যচর্চার জন্য একটি 'সমালোচনী সভা' স্থাপন করেন। সারস্বত সমাজের বৃহত্তর পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার জন্যই সম্ভবত এই ক্ষুদ্র গোষ্ঠী গড়ে তোলার প্রয়াস করা হয়েছিল। প্রিয়নাথ সেনকে একটি তারিখ-হীন পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'আপনি বোধ করি—বিহারীবাবুর কাছে, আমাদের সমালোচনী সভার বিশেষ বিবরণ শুনিয়া থাকিবেন। আপনাকে সেই সভায় যোগ দিতেই হইবে।... আজ আমাদের প্রথম দিন। ২টার সময় আরম্ভ হইবে।'[৫৪] পত্রটিতে তারিখ না থাকাতে ইতিহাসের দিক থেকে ক্ষতিকর হয়েছে। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এই সভা সম্পর্কে লিখেছেন, 'we had a sort of a friendly Literary Society which met occasionally at the house of friends. We met once at Akrur Dutt Street [Lane] in the house in which the Savitri Library was located and there was another meeting st Rabindranath's house. We used to have animated discussions on literary subjects, but the inner man was not neglected and ample refreshments were always provided.'[৫৫] এই উদ্ধৃতি থেকে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত করেছেন, 'প্রথম সভা বসে অক্রুর দত্তের গলিতে সাবিত্রী লাইব্রেরীর আহ্বানে'[৫৬]—কিন্তু এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য বলে মনে হয় না।

অবশ্য ১৮ অক্রুর দত্ত লেনে প্রতিষ্ঠিত সাবিত্রী লাইব্রেরির সঙ্গে এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ১২৮৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে প্রতিষ্ঠিত এই লাইব্রেরির বার্ষিক অধিবেশনগুলি বিদ্বজ্জন সমাগমের একটি বিশেষ উপলক্ষ ছিল। বর্তমান বৎসরের বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে 'স্ত্রী-শিক্ষার উৎসাহ দিবার জন্য এবং তাঁহাদের চিন্তাশক্তি কতদূর জন্মিয়াছে জানিবার জন্য' মহিলাদের মধ্যে একটি প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই বৎসরের প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল : 'বাল্যবিবাহ ও অবরোধ প্রথা'। 'সাবিত্রী' [আশ্বিন ১২৯৩] নামক প্রবন্ধ-সংকলন গ্রন্থে সম্পাদক গোবিন্দলাল দত্ত 'ভূমিকা'-য় লেখেন : 'শ্রীযুক্ত সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়গণ প্রবন্ধগুলির পরীক্ষা-ভার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে যথেষ্ট অনুগৃহীত করিয়াছিলেন।' বর্তমান বৎসরে ঢাকা নিবাসিনী শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবীর রচনা শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়ায় তিনি প্রতিশ্রুত ২৫ টাকা পুরস্কার লাভ করেন। উল্লেখযোগ্য যে, পরবর্তী দুটি বৎসরের প্রতিযোগিতায় তিনিই পুরস্কৃত হন।

সাবিত্রী লাইব্রেরির চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন হয় ৫ চৈত্র [রবি 18 Mar] তারিখে। চন্দ্রনাথ বসু এই অনুষ্ঠানে 'হিন্দু-পত্নী'-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। 'বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের অনুবাদক বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বেঙ্গল অফিসের লাইব্রেরিয়ান বাবু চন্দ্রনাথ বসু হিন্দুদিগের বিবাহ প্রণালী বিষয়ে রচনা পাঠ করিয়াছিলেন। কয়েকটি যুবক বাহ্য সুন্দর ইউরোপীয় বিবাহ প্রণালীর উৎকৃষ্টতা প্রতিপাদনের নিমিত্ত বৃথা চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজকৃষ্ণবাবু যুক্তিগর্ভ কথায় হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও হিন্দু বিবাহ প্রণালীর পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। দুইটি বালক কবিতা আবৃত্তি করিয়া সমবেত লোকদিগের চিত্তরঞ্জন করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত রামতারণ সান্যাল জাতীয় সঙ্গীত গান করিয়াছিলেন। জগদ্বিখ্যাত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, লোকহিতৈষী ভারতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রবর্ত্তক বাবু রাজেন্দ্রনাথ দত্ত, রইস ও রাইয়তের সম্পাদক বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রাণনাথ পণ্ডিত সরস্বতী, হিন্দুস্কুলের হেড মাষ্টার চণ্ডিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়গণ সভার

শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।'[৫৭] এই বিবরণে রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লিখিত না হলেও সম্ভবত তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

এই অধিবেশনের দুদিন পরেই ৭ চৈত্র [মঙ্গল 20 Mar] তারিখে তিনি আর একটি অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। সাধারণী লেখে : 'বঙ্গের কতিপয় বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত মহোদয় ইণ্ডিয়া ক্লব নামে একটি সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে ইংরাজ বাঙ্গালি মুসলমান প্রভৃতি নানা বর্ণের সভ্য আছেন, ইহার উদ্দেশ্য বিদ্যালাচনা, নির্দ্দোষ খেলা, সংবাদপত্র পাঠ ও পরস্পর আলাপ ও বাদানুবাদ। গত মঙ্গলবার রাত্রে তথায় একটি 'Evening party' হইয়া গিয়াছে। নির্দ্ধারিত সভ্য ভিন্ন অপরাপর লোকের নিমন্ত্রণ ছিল। প্রায় দুই শত লোকের শুভাগমন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর বাঙ্গালা গান করিয়া শ্রোতাদিগের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। জজ রমেশচন্দ্র মিত্র, বাবু কেশবচন্দ্র সেন, বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ, বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন, ঠাকুর গোষ্ঠির অনেকগুলি, নবাব আবদুল লতিফ, মহীসুর পরিবারের একজন ও নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়, বিয়াক সাহেব (ষ্টেটম্যানের সম্পাদক), বাবু প্রিয়নাথ ঘোষ, যোগেশচন্দ্র দত্ত, কতকগুলি বাঙ্গালি বারিষ্টার, ফাদার লাফোঁ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।'[৫৮] অভিজাত সমাজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ কিভাবে গড়ে উঠেছিল, তার দৃষ্টান্ত হিসেবে ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য।

৩০ চৈত্র [বৃহ 12 Apr] সন্ধ্যায় আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে বর্ষশেষের উপাসনা হয়। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ একটি গান রচনা করেন—'বর্ষ ওই গেল চলে'—এইরূপ অনুষ্ঠানের জন্য তিনি এই প্রথম গান লিখলেন। পরের দিন ১ বৈশাখ ১২৯০ [শুক্র 13 Apr] তারিখে প্রাতে মহর্ষিভবনে নববর্ষের উপাসনাতেও তাঁর রচিত দুটি গান গীত হয় : 'সখা, তুমি আছ কোথা' ও 'প্রভু, এলেম কোথায়'। গান দুটি বর্তমান বৎসরে রচিত বলে আমরা এই অধ্যায়েই তাদের সম্পর্কে আলোচনা করছি:

[১] 'বর্ষ ওই গেল চলে' দ্র গীতবিতান ৩।৮৩১

তত্ত্ববোধিনী, জ্যৈষ্ঠ ১৮০৫ শক [১২৯০]। ২৫, রাগিণী পূরবী—তাল আড়াঠেকা; রবিচ্ছায়া। ১২৪ [ব্রহ্ম ২৯]; কাঙালীচরণ সেন ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ৬ [জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮]-এ গানটির স্বরলিপি প্রকাশ করেন, দ্র স্বরবিতান ২৭।

[2] 'সখা, তুমি আছ কোথা' দ্র গীতবিতান ৩।৯৪৯-৫০

তত্ত্ববোধিনী, জ্যৈষ্ঠ ১৮০৫ শক। ২৮-২৯, রাগিণী টোড়ী—তাল একতালা; রবিচ্ছায়া। ১২৫ [ব্রহ্ম ৩০]; স্বরবিতান ৪৫-এ সংকলিত ইন্দিরা দেবী-কৃত স্বরলিপিতে সুর-তাল : 'ভৈরবী। একতাল'। গানটির সম্বন্ধে গীতবিতান-এর পরিশিষ্ট ৩-এ লেখা হয়েছে : 'প্রথম সংস্করণ গীতবিতান (পরিশিষ্ট খ) যে গানগুলি রবীন্দ্রনাথের নয় বলিয়া নির্দিষ্ট তাহারই একাংশ। রবীন্দ্রনাথের রচনা নয় যে, এ সম্পর্কে অন্য নির্ভরযোগ্য মুদ্রিত প্রমাণ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।' [পৃ ৯৪৭]

[৩] 'প্রভু এলেম কোথায়' দ্র গীতবিতান ৩।৮৩২

তত্ত্ববোধিনী, জ্যৈষ্ঠ ১৮০৫ শক। ২৯, রাগিণী আলাইয়া—তাল আড়াঠেকা; রবিচ্ছায়া। ১২৫-২৬ [ব্রহ্ম ৩১]; গানটির সুর রক্ষিত হয় নি।

সাময়িকপত্রে রবীন্দ্র-রচনার প্রকাশ-সূচী আমরা কার্তিক ১২৮৯ পর্যন্ত সংকলন করেছি; পরবর্তী মাসগুলির সূচী এখানে সংকলিত হল:

ভারতী, অগ্রহায়ণ ১২৮৯ [৬।৮]:

৩৬১-৬৪ ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’ দ্র প্রভাতসংগীত ১।৫৬-৬১

২০১ ছত্রের এই কবিতাটি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রথম প্রকাশিত হওয়ার সময়ে [বৈশাখ ১২৯০] নতুন আরও ৬৭টি ছত্র যুক্ত হয়; তারপরে বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমানে রবীন্দ্র-রচনাবলী-তে ১৫৪টি ছত্র রক্ষিত হয়েছে; সঞ্চয়িতা-র পাঠ আরও সংক্ষিপ্ত—সেখানে ছত্রসংখ্যা মাত্র ৪৩ [ছত্রসংখ্যার এই হিসাব অবশ্য প্রকৃত চিত্রটি উদঘাটিত করে না, কারণ অনেকস্থানেই দুটি ছত্র বিন্যাসের পার্থক্যে একটি ছত্রে পরিণত হয়েছে]। বিভিন্ন সংস্করণে কবিতাটির পাঠভেদের আনুপূর্বিক বিবরণ পুলিনবিহারী সেন ও শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়-কৃত ‘রবীন্দ্র-কাব্যে পাঠভেদ : ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’ প্রবন্ধে [দেশ, রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংখ্যা ১৩৬৯। ৩৩-৪২] সংকলিত হয়েছে।

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী এই কবিতাটির ‘প্রসঙ্গ ক্রমে’ ‘অভিমানিনী নির্ঝরিণী’ রচনা করেন, সেটিও ভারতী-র বর্তমান সংখ্যায় [পৃ ৪০৭-০৮] মুদ্রিত হয়। প্রভাতসংগীত-এর প্রথম সংস্করণেও কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত হয়, দ্বিতীয় সংস্করণ [১২৯৮] ও তদবধি বর্জিত হয়েছে, দ্র জগদীশ ভট্টাচার্য, কবিমানসী ১।২১১-১৩।

তত্ত্ববোধিনী, পৌষ ১৮০৪ শক [১০ম কল্প ৪র্থ ভাগ ৪৭৩ সংখ্যা]:

১৬৬-৬৮ ‘অনন্ত জীবন’ দ্র প্রভাতসংগীত ১।৬৫-৬৮

ভারতী, পৌষ ১২৮৯ [৬।৯]:

৪২১-২৩ ‘প্রভাত উৎসব’ দ্র প্রভাতসংগীত ১।৬২-৬৪

তত্ত্ববোধিনী, ফাল্গুন ১৮০৪ শক [১০।৪।৪৭৫]:

২০৫	‘দেখ্ চেয়ে দেখ্ তোরা জগতের উৎসব’	দ্র	গীতবিতান	৩।৮৩০
২০৫-০৬	‘কি করিলি মোহের ছলনে’	দ্র	ঐ	৩।৮২৯-৩০
২০৬	‘বড় আশা করে এসেছি গো’	দ্র	ঐ	৩।৮৩১
২০৬	‘আজি শুভদিনে পিতার সদনে’	দ্র	ঐ	৩।৮৩০-৪১

তত্ত্বকৌমুদী, ১৬ মাঘ ও ১ ফাল্গুন ১৮০৪ শক [৫ম ভাগ, ২০-২১ সংখ্যা]:

২৫১	‘জগতের পুরোহিত তুমি’	দ্র	গীতবিতান	৩।৮৬২
২৫১	‘শুভদিনে শুভক্ষণে’	দ্র	ঐ	৩।৮৬৩
২৫১	‘তুমি হে প্রেমের রবি’	দ্র	ঐ	৩।৮৬২-৬৩

ভারতী, ফাল্গুন ১২৮৯ [৬।১১]

৫১০-১৬ ‘চেঁচিয়ে বলা’

তরুণ রবীন্দ্রনাথের এই উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক প্রবন্ধটি এখনও পর্যন্ত কোনো গ্রন্থে সংকলিত বা পুনর্মুদ্রিত হয় নি, অথচ তাঁর রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ পর্যালোচনায় এই সময়ে লিখিত অনুরূপ আরও কয়েকটি প্রবন্ধের ['জিহ্বা-আস্ফালন', 'ন্যাশনল ফণ্ড', 'টৌনহলের তামাশা' প্রভৃতি] মতো এটিরও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। লক্ষণীয়, উক্ত প্রবন্ধগুলির কোনোটিকেই রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থভুক্ত করেন নি, সম্ভবত সাময়িক উত্তেজনাপ্রসূত এই রচনাগুলির তীব্র ব্যঙ্গাত্মক প্রকাশভঙ্গিই এর অন্যতম কারণ। হিন্দুমেলার গঠনাত্মক আত্মনির্ভর-প্রয়াসী স্বদেশচেতনার আবহাওয়ায় পরিবর্ধিত রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সমসাময়িক বাক্যবাগীশ দেশহিতৈষিতাকে মেনে নেওয়া কঠিন ছিল। এইজন্যই তিনি বর্তমান প্রবন্ধে লিখেছেন : 'দেশ-হিতৈষিতা, আলো জ্বালিবার গ্যাসের মত যতক্ষণ গুপ্তভাবে চোঙ্গের মধ্য দিয়া সঞ্চারিত হইতে থাকে, ততক্ষণ তাহা বিস্তর কাজে লাগে—কিন্তু যখন চোঙ্ ফুটা হইয়া ছাড়া পায় ও বাহির হইতে থাকে, তখন দেশ-ছাড়া হইতে হয়।... এখন "ভ্রাতাগণ" "ভগ্নিগণ", "ভারতমাতা" নামক কতকগুলা শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহারা অনবরত হাওয়া খাইয়া খাইয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, অনেক দূর আকাশে উঠিয়া হঠাৎ আলো নিবিয়া যায় ও ধপ্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া যায়।'[৫৯] প্রসঙ্গক্রমে তিনি বাংলা সংবাদপত্রের দায়িত্বহীন সমালোচনার পদ্ধতি ['অনবরত আত্ম-প্রশংসা করিয়া নিজের দোষের জন্য পরকে তিরস্কার করিয়া নিজের দোষের জন্য পরকে তিরস্কার করিয়া নিজের কর্ত্তব্যভার পরের স্কন্ধে চাপাইয়া, কেবল গলার আওয়াজেরই উন্নতি করিতেছি, ও চক্ষু বুজিয়া মনে করিতেছি যে, আমাদের দুর্ভাগ্যের নিমিত্ত আমরা ব্যতীত বিশ্বশুদ্ধ সকলেই দায়ী'—পৃ ৫১৩], Independent spirit-এর চর্চায় ব্যস্ত বাঙালি যুবকদের অভদ্র পরুষ ব্যবহার ['শুয়াপোকার ন্যায় দিনরাত্রি কণ্টকিত হইয়া থাকাকেই ইহারা Independent spirit কহে।... যাহার যথার্থ বল আছে সে সর্ব্বদাই ভদ্র—সে তাহার বলটাকে গণ্ডারের শিঙ্গের মত অহোরাত্র নাকের উপর খাড়া করিয়া রাখে না। আর যে দুর্ব্বল, হয় সে লাঙ্গুল গুটাইয়া কুঁক্ড়ি মারিয়া থাকে, নয় সে খেঁকি কুকুরের মত ভদ্রলোক দেখিলেই দূর হইতে অবিরত ঘেউ ঘেউ করিতে থাকে।'—পৃ ৫১৪-১৫] এবং বাংলা সাহিত্যের বেআব্রু ও বিকৃত উচ্ছ্বাসপ্রবণতার নিন্দা করেছেন।*

ভারতী, চৈত্র ১২৮৯ [৬।১২]:

৫৭৫-৭৮ 'পুনর্ম্মিলন' দ্র প্রভাতসংগীত ১।৭০-৭৫

কবিতাটি যদিও চৈত্র-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে, তবু আমাদের ধারণা, এটির রচনাকাল বহু পূর্ববর্তী—সম্ভবত সদর স্ট্রীটের বাড়ির সেই অভিজ্ঞতার পরে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', 'প্রভাত উৎসব' ইত্যাদি কবিতার সমকালে লেখা। কবিতাটির একটি তথ্যগত মূল্য এই যে, এখানে বাল্যস্মৃতির যে বর্ণনা আছে, পরবর্তী কালে জীবনস্মৃতি-তে 'ঘর ও বাহির' 'বাহিরে যাত্রা' প্রভৃতি অধ্যায়ে প্রায় সেই বর্ণনাই গদ্যভাষায় বিবৃত হয়েছে। তাছাড়া 'প্রভাতসংগীত' অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন, 'আমার শিশুকালেই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমার খুব একটি সহজ এবং নিবিড় যোগ ছিল।... তাহার পর একদিন যখন যৌবনের প্রথম উন্মেষে হৃদয় আপনার খোরাক দাবি করিতে লাগিল, তখন বাহিরের সঙ্গে জীবনের সহজ যোগটি বাধাগ্রস্ত হইয়া গেল। তখন ব্যথিত হৃদয়টাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নিজের মধ্যেই আবর্তন শুরু হইল; চেতনা তখন আপনার ভিতরের দিকেই আবদ্ধ রহিল।... অবশেষে একদিন সেই রুদ্ধ দ্বার জানি না কোন্ ধাক্কায় হঠাৎ ভাঙিয়া গেল, তখন যাহাকে

হারাইয়াছিলাম তাহাকে পাইলাম। শুধু পাইলাম তাহা নহে, বিচ্ছেদের ব্যবধানের ভিতর দিয়া তাহার পূর্ণতর পরিচয় পাইলাম।'[৬০] 'পুনর্মিলন' কবিতায় এই বিবর্তনের একটি ইতিহাস কবিতার ভাষায় অভিব্যক্ত হয়েছে।
৫৯৯-৬০০ 'সংক্ষিপ্ত সমালোচনা'

আমাদের ধারণা, ভারতী-র সম্পাদক হিসেবে ১২৯০ পর্যন্ত দ্বিজেন্দ্রনাথের নাম থাকলেও, অন্তত ১২৮৮ বঙ্গাব্দের শেষভাগ থেকে রবীন্দ্রনাথই সম্পাদনার দায়িত্ব বহন করে এসেছেন। প্রিয়নাথ সেনকে লেখা অনেকগুলি চিঠি থেকে এই ধারণাই সমর্থিত হয় : 'আগামী ভারতীতে আপনার "পাতার কুটীরে" পাঠাইলেই হইবে' (চিঠিপত্র ৮।১), 'নগেন বাবুর কবিতা পেলুম, খুব ভাল হয়েছে, দেখা হলে এ বিষয়ে কথা কওয়া যাবে। ভারতী বেরিয়েছে।... একখানা ভারতী আপনাকে পাঠাই' (ঐ ৮।২), 'ভারতী এখান থেকে পাঠাচ্ছি' (ঐ ৮।৫), 'এবার ভারতীতে যে কবিতা যাবে সেইটে সঙ্গে আনবেন' (ঐ ৮।৬), 'আজ ১৫ই—এই জন্য ভারতীর কাজে বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি' (ঐ ৮।৭), 'এবার বাইরে থেকে বিস্তর ভাল ভাল কবিতা পাওয়া গেছে। একে একে দেব' (ঐ ৮।৮)—এর থেকে মনে হয় রচনা-সংগ্রহ ও নির্বাচন থেকে শুরু করে প্রকাশনা পর্যন্ত সমস্ত দায়িত্ব তিনিই বহন করতেন।* এই সূত্রে সমালোচনার জন্য ভারতী-র দপ্তরে প্রেরিত গ্রন্থগুলির অধিকাংশ তাঁর দ্বারাই সমালোচিত হয়েছে—এমন কিছু-কিছু সমালোচনার উল্লেখ আমরা পূর্বেই করেছি। আমরা মনে করি, এইভাবেই রবীন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথ সেন, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি কবিদের বন্ধু হিসেবে লাভ করেছিলেন। অনুরূপ ভাবে শত্রুবৃদ্ধিও যে ঘটেছে, তার একটি নিদর্শন পাওয়া যায় বর্তমান সংখ্যার একটি গ্রন্থ-সমালোচনায়:

'সমালোচক কাব্য। মূল্য এক আনা। সমালোচনা স্থানে ভারতী বর্ত্তমান গ্রন্থকারের কোনো একটি কাব্যকে ভাল বলেন নাই, এই অপরাধে ভারতীকে আক্রমণ করিয়া এই গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই কাব্যখানি পড়িয়া তাঁহার পূর্ব্বতন গ্রন্থ সম্বন্ধে আমাদের মতের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হইল না। এই লেখার দরুণ পাঠকদিগের নিকটেও যে তাঁহার পূর্ব্বগ্রন্থের বিশেষ আদর বাড়িবে, তাহাও নহে। তবে লিখিয়া ফল কি হইল? লেখক কি মনে মনে বড় আনন্দ উপভোগ করিতেছেন? তবে তাহাই করুন, তাহাতে আমরা ব্যাঘাত দিব না।

'কথাটা এই যে, নিজের লেখা ভাল বলিয়া লেখকের দৃঢ় বিশ্বাস থাকিতে পারে, তাহা লইয়া কেহ তাঁহার সহিত বিবাদ করিবে না, কিন্তু সমালোচকেরও যে সে বিষয়ে তাঁহার সহিত মতের সম্পূর্ণ ঐক্য হইয়া যাইবে এরূপ আশা করাটা কিছু অতিরিক্ত হয়। আমাদের মতে, গালিমন্দ দেওয়া বা ঠাট্টা বিদ্রূপ করা সমালোচকের কর্ত্তব্য কাজ নহে, কিন্তু যে সমালোচক কোন প্রকার অভদ্রতাচরণ না করিয়া শুদ্ধ মাত্র নিজের মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাঁহার সহিত লেখকের ঝগড়া করা ভাল দেখায় না। সমালোচকের কাজটা দেখিতেছি, 'ঘরের কড়ি খরচ করিয়া বনের মহিষ তাড়ান', মাঝে মাঝে গুঁতাটাও খাইতে হয়।'*

এর পরে নগেন্দ্রনাথ ঘোষের 'সুর সভা' 'কৈলাস কুসুম' ও 'মণি মন্দির' গীতিনাট্যের সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিত হয়েছে : 'গীতিনাট্যের যথার্থ সমালোচনা সম্ভবে না, কারণ গীতগুলি কেবলমাত্র পড়িয়া সমালোচনা করা যায় না। গান লিখিবার সময় কবিত্ব কিছু না কিছু হাতে রাখিয়া চলিতে হয়, সমস্তটা প্রকাশ করা যায় না, কারণ তাহা হইলে সুরের জন্য আর কিছুই স্থান থাকে না। গানের লেখাতে কবিত্বের যে কোরকটুকুমাত্র দেখা যায় সুরেতে তাহাকেই বিকশিত করিয়া তোলে। এই নিমিত্ত সকল সময় গান পাঠ করা বিড়ম্বনা। তথাপি

বলিতে পারি, এই গীতিনাট্যগুলির স্থানে স্থানে ভাল ভাল গান আছে। মণি মন্দিরের গানগুলিই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে।’[৬১]—এই বক্তব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিজের রচিত গীতিনাট্য ও গীত-সংকলন গ্রন্থের ভূমিকার বক্তব্যের সুস্পষ্ট সাদৃশ্যের জন্য আমরা সমালোচনাটিকে রবীন্দ্র-রচিত বলে মনে করছি।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ১

পাঠকের স্মরণ আছে, মহর্ষি অগ্রহায়ণ ১২৮৭ [Nov 1880]-তে দার্জিলিং ত্যাগ করে নৌকাযোগে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল অভিমুখে গমন করেন ও চৈত্র মাসের প্রথমে [Mar 1881] মুসৌরী-তে পৌঁছন। সেখানে দীর্ঘ কয়েকমাস অবস্থান করে ডান পায়ের একটি ক্ষত চিকিৎসার জন্য সম্ভবত শীতের প্রারম্ভে [Noa 1881] দেরাদুনে নেমে আসেন। সিভিল সার্জেন মেক্‌লারেন সাহেবের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করলেও অর্শ, ক্ষুধাহীনতা ইত্যাদি ব্যাধিতে তিনি পূর্ব স্বাস্থ্য কখনই ফিরে পান নি। বর্তমান বৎসরে দেখা যায়, সারা বছরটি তিনি কখনও দেরাদুনে বা কখনও মুসৌরীতে কাটিয়েছেন। দার্জিলিং বাসের সময় থেকেই প্রিয়নাথ শাস্ত্রী তাঁর অন্তরঙ্গ সহচর ছিলেন। মুসৌরী ও দেরাদুনে থাকার সময়েও তিনি মহর্ষির দেখাশোনা করতেন। জামাতা বা পুত্রদের মধ্যে কেউ কেউ মাঝে মাঝে তাঁর কাছে যেতেন। মেক্‌লারেন সাহেবের চিকিৎসার সময়ে জামাতা জানকীনাথ তাঁর কাছে ছিলেন।[৬২] বর্তমান বৎসরে পৌষ মাসের শেষ দিকে [Jan 1883] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর কাছে যান ও মাঘ মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত সেখানে থাকেন। এই সময়েই কনিষ্ঠ জামাতা বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। চিকিৎসা-বিদ্যায় উচ্চতর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে তিনি 1878-এ স্কটল্যান্ডের অ্যাবারডিনে গিয়েছিলেন। May 1882-তে সেখানকার য়ুনিভার্সিটি থেকে এম. ডি. ডিগ্রি লাভ করে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে তিনি ১০ মাঘ [22 Jan 1883] কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।[*] কয়েকদিন পরেই [১৪ মাঘ] তিনি দেরাদুন যাত্রা করেন। মহর্ষি কন্যা-জামাতার স্বতন্ত্র বাসস্থানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেন; ক্যাশবহি-র হিসাবে দেখি ‘দং উঁহাকে [বর্ণকুমারী দেবী] দেওয়া যায় বিঃ ১৮৮৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৬৯১ নম্বরের বাঙ্গাল বেঙ্কের এক চেক দং শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবুমহাশয়ের ২১ মাঘের আদেশপত্র সহ এক বৌচর—১২০০০৲’ স্বর্ণকুমারী দেবী ইতিমধ্যেই কাশিয়াবাগানে বসবাস করছিলেন; মহর্ষি তাঁকেও গৃহনির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করেন: ‘ব° শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী দং উক্ত দেবীর বাটী নির্ম্মাণের জন্য দেওয়া যায়... দং ১২৮৯ সালের ২৯ ফাল্গুন তারিখের অনুমতীপত্র—১০০০০৲’। আমরা ইতিপূর্বেই [১২৮২] দেখেছি, শরৎকুমারী দেবীর জন্যও অনুরূপ আয়োজন করা হয়েছে।

অন্যান্য পারিবারিক ঘটনার মধ্যে দেখা যায়, ১২ শ্রাবণ [27 Jul] শরৎকুমারী দেবীর কন্যা সুশীলা একটি মৃত সন্তান প্রসব করেন; তাঁর স্বামী শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় তখন লাহোরের *Tribune* পত্রিকার সম্পাদক।

২ পৌষ ১২৮৯ [শনি 16 Dec 1882] দ্বিপেন্দ্রনাথের পুত্র দিনেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর সংগীত ও অভিনয়-কলার বিকাশে দিনেন্দ্রনাথ একটি অবিস্মরণীয় নাম। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ‘আমার সকল গানের ভাণ্ডারী’ আখ্যা দিয়েছিলেন।

সম্ভবত এই বৎসরের শেষ দিকে সত্যপ্রসাদের কন্যার নামকরণ অনুষ্ঠান হয়। মহর্ষি ১ বৈশাখ ১২৯০ 'মসূরী পর্ব্বত' থেকে সারদাপ্রসাদকে লেখেন, 'বোধ করি শ্রীমান্ সত্যপ্রসাদের কন্যার নাম-করণ সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।' অকাল-মৃত এই কন্যাটির সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা যায় না, এমন-কি তার নামটিও আমরা জানতে পারিনি।

আশ্বিন মাসে [27 Sep] স্বর্ণকুমারী দেবীর জ্যোতির্বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ 'পৃথিবী' প্রকাশিত হয়; গ্রন্থটি 'পরমারাধ্য শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর/পিতৃদেব শ্রীচরণকমলেষু' উৎসর্গীকৃত।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ২

আদি ব্রাহ্মসমাজের দিক থেকে বর্তমান বৎসরেও বিশেষ কর্ম-তৎপরতা লক্ষিত হয় না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যথারীতি সমাজের সম্পাদক ও হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন; মাঘ মাসের 'বিজ্ঞাপন'-এ দেখা যায় : 'আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিশ্বাস তাঁহার কর্ম্ম হইতে অবসর লওয়ায় উক্ত স্থানে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন সহকারী সম্পাদক পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।' প্রসন্নকুমার অবশ্য অন্যতম অধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত থাকেন। আর একটি উল্লেখযোগ্য শূন্যতা সৃষ্টি হয় সমাজের গায়ক বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তীর অবসর-গ্রহণে। তাঁর সম্পর্কে তত্ত্ববোধিনী-তে [ফাল্গুন। ২২০] লিখিত হয় : 'পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইল মহাত্মা রামমোহন রায়ের সময় হইতে শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আদি ব্রাহ্ম সমাজে অতি নিপুণতার সহিত সঙ্গীত করিয়া আসিয়াছেন। তিনি এক্ষণে বার্দ্ধক্য নিবন্ধন অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। অতঃপর ব্রাহ্মেরা এইরূপ মধুর কণ্ঠে ব্রহ্মসঙ্গীত আর শুনিতে পাইবেন কি না সন্দেহ। যাঁহারা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উপাসনায় যোগ দিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে প্রায় এমন কেহই নাই বিষ্ণুর মধুর সঙ্গীতে যাঁহার অশ্রুপাত না হইয়াছে। বহু দিনের পর ব্রাহ্মসমাজে গায়কের একটী অভাব উপস্থিত হইল। পূরণ হইবে কি না ঈশ্বর জানেন।' এরপর 'ব্রহ্মসঙ্গীতের একান্ত অনুরাগী কোন শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্ম বিষ্ণুর অবসর গ্রহণে ব্যথিত' হয়ে যে-ক'টি কবিতা লেখেন সেগুলি মুদ্রিত হয়।

১১ মাঘ [মঙ্গল 23 Jan 1883] আদি ব্রাহ্মসমাজের ত্রিপঞ্চাশ সাংবৎসরিক অনুষ্ঠিত হয়। প্রাতে আদি ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উপদেশ প্রদান করেন [দ্র তত্ত্ববোধিনী, ফাল্গুন। ২০১-০৫]; সায়ংকালে 'শ্রদ্ধাস্পদ বাগ্মী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর দণ্ডায়মান হইয়া প্রদীপ্ত উৎসাহের সহিত তেজোময় ও মধুময় বাক্যে একটি সারগর্ভ জ্ঞানগম্ভীর উপদেশ দিয়াছিলেন' [ঐ। ২০৬]—কিন্তু উপদেশটি মুদ্রিত হয় নি। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ চারটি ব্রহ্মসংগীত রচনা করেছিলেন, সে-কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এগুলি ছাড়া অন্য কোনো গান গাওয়া হয়েছিল কিনা, তত্ত্ববোধিনী-র বিবরণ সে-সম্পর্কে নীরব।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের দিক থেকে এ-বৎসরের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা 'নব বৃন্দাবন' নাটকের অভিনয়। চিরঞ্জীব শর্মা [ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল] নববিধানের আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য প্রচার করার উদ্দেশ্যে কেশবচন্দ্রের প্রেরণায় নাটকটি রচনা করেন। 1 Sep [শুক্র ১৭ ভাদ্র]-তারিখে কেশবচন্দ্রের বাসগৃহ কমলকুটীরে 'অর্ধপ্রকাশ্য' অভিনয়ের পর 16 Sep [শনি ১ আশ্বিন] নাটকটির পূর্ণাঙ্গ অভিনয় হয়। এরপর

বিভিন্ন স্থানে এটি অভিনীত হয়েছিল। নাটকটি তৎকালে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল—প্রচুর প্রশংসার সঙ্গে প্রভূত নিন্দাবাদ এর উদ্দেশ্যে বর্ষিত হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ [নরেন্দ্রনাথ দত্ত] না-কি নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রে একাধিকবার অভিনয় করেন—কিন্তু পরস্পরবিরোধী ও অস্পষ্ট কিছু স্মৃতিচারণ ছাড়া এ-বিষয়ে কোনো সমসাময়িক তথ্য আমাদের নজরে আসে নি।

এই সময়ে বাংলাদেশের ধর্মীয় পরিবেশটি ছিল জটিলতাময়। ব্রাহ্মসমাজের তিনটি শাখার মধ্যে পারস্পরিক দোষারোপ ও সমালোচনা তো ছিল-ই, উপরন্তু আরও কয়েকটি ধর্মীয় শক্তি ধীরে ধীরে গুরুত্বলাভ করেছিল। দক্ষিণেশ্বরের কালীসাধক শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নির্জন সাধনার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে তখন কলকাতার অনেকের কাছেই খুব পরিচিত ব্যক্তি, তাঁকে ঘিরে একটি শিষ্যমণ্ডলী গড়ে ওঠার মুখে। আমরা আগেই বলেছি 15 Mar 1875 [সোম ২ চৈত্র ১২৮১] তিনি বেলঘরিয়ার বাগানে গিয়ে কেশবচন্দ্র ও তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তারপর থেকেই তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। কেশবচন্দ্রের মাধ্যমেই তিনি বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে পরিচিত হন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রধানত তান্ত্রিক মতে কালীসাধনা করলেও বিভিন্ন ধর্মের সারসত্য পর্যালোচনায় আগ্রহী ছিলেন। এই কারণেই তিনি এক সময়ে আদি [কলিকাতা] ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা দেখতে গেছেন। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তত্ত্বালোচনা করতে গিয়েছেন সম্ভবত মাঘ ১২৭২-এ [Jan 1866]। দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে যথেষ্ট সমাদর করলেও তাঁর তীব্র পৌত্তলিকতা-বিরোধী মনোভাব ও আভিজাত্যের বেড়া অতিক্রম করা শ্রীরামকৃষ্ণের পক্ষে সম্ভব হয় নি। কিন্তু কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীরা তাঁকে সহৃদয়তার সঙ্গেই গ্রহণ করেন ও 28 Mar 1875 তারিখের *Indian Mirror*-এ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সপ্রশংস উক্তি প্রকাশিত হয়। এরপর বহুবার কেশবচন্দ্র ও শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে সাক্ষাৎকার ঘটে এবং *Indian Mirror*, ধর্ম্মতত্ত্ব, সুলভ সমাচার প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর বিষয়ে বহু সংবাদ প্রকাশিত হয়ে তাঁকে জনসমাজে সুপরিচিত করে তোলে। অপরপক্ষে তাঁর প্রভাবে কেশবচন্দ্রের ধর্মমত বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়—ক্রমশই তা ভক্তিবাদের দিকে ঝুঁকে পড়তে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণর সঙ্গে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক নেতারও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদের এটি অন্যতম কারণ। এখান থেকে তাঁর সবচেয়ে মূল্যবান সংগ্রহ অবশ্য নরেন্দ্রনাথ দত্ত—যিনি পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দ নামে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও আদর্শ প্রচারে তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

এইরকম সময়েই বাংলা দেশে থিয়োসফিক্যাল আন্দোলনের সূচনা। মাদাম ব্লাভাটস্কি [Madame Helena Petrovna Blavatsky, 1831-91], কর্নেল অলকট [Col. Henry Steel Olcott, 1832-1907] প্রভৃতি কয়েক জনে মিলে 17 Nov 1875 তারিখে আমেরিকায় থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। 16 Feb 1879 তাঁরা বোম্বাই পৌঁছন ও সেখানে সোসাইটির একটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়। 19 Mar 1882 [৭ চৈত্র ১২৮৮] কর্নেল অলকট ও 6 Apr [২৫ চৈত্র] মাদাম ব্লাভাটস্কি কলকাতায় আসেন। 6 Apr তারিখেই মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বৈঠকখানায় প্যারীচাঁদ মিত্রকে সভাপতি করে সোসাইটির বঙ্গীয় শাখা [Bengal Theosophical Society] স্থাপিত হয়। এইদিন যাঁরা সভ্য হন তাঁদের মধ্যে ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ, জানকীনাথ ঘোষাল ও মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়। 14 Apr [২ বৈশাখ ১২৮৯] যে নূতন কার্যনির্বাহক সমিতি-গঠিত হয় দ্বিজেন্দ্রনাথ তার অন্যতম সহ-সভাপতি ও মোহিনীমোহন অন্যতম সহকারী-সম্পাদক নির্বাচিত হন।[৬৩]

তারেশচন্দ্র মিত্র লিখেছেন : '৯ই এপ্রিল [১৮৮২] অলকট মিসেস গর্ডনের সহিত, জানকীনাথ ঘোষালের বাগান বাড়ীতে বেড়াইতে যান ও তাঁহার স্ত্রী স্বর্ণকুমারী দেবীকে...B. T. S.এর সদস্য করেন। তাঁহার সহিত আরও তিন জন ভারতীয় মহিলা B. T. S. এর সদস্যা হন।'[৬৪] এইভাবে সোসাইটির যে মহিলা-শাখা গড়ে ওঠে স্বর্ণকুমারী দীর্ঘদিন [1882-86] তার সভানেত্রী ছিলেন। সরলা দেবী লিখেছেন : 'আমাদের বাড়িতে মহিলা-থিয়সফিক্যাল সভা হত, তার প্রেসিডেন্ট মা। যাঁদের স্বামী বা বাড়ির পুরুষেরা থিয়সফিস্ট, তাঁদের স্ত্রী বা বাড়ীর মেয়েরা আসতেন। কলকাতার নানা পরিবারের মেয়েদের আনাগোনায় মায়ের সঙ্গে তাঁদের বেশ সখিত্ব স্থাপন হল।'[৬৫] 1886 [১২৯৩]-এ থিয়োসফিতে তাঁদের আস্থা কমতে শুরু করলে স্বর্ণকুমারী এঁদের নিয়েই 'সখিসমিতি' গড়ে তোলেন, রবীন্দ্রনাথ এই সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'মহিলা শিল্পমেলা' উপলক্ষে মায়ার খেলা [১২৯৫] গীতিনাট্যটি লিখে দেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর বাড়িতে সম্মোহনবিদ্যা-চর্চার কথা সরলা দেবী লিখেছেন, এ-ছাড়া প্রেত-চর্চাও যে হত সম্ভবত তার একটি প্রমাণ লিপিবদ্ধ আছে মালতীপুঁথির 53/২৮ক পৃষ্ঠায় [দ্র রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা ১।৭৮] রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে একটি প্ল্যান্‌চেট আসরের বিবরণে; 'গুণদাদা' অর্থাৎ গুণেন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ থাকায় 1881-এ তাঁর মৃত্যুর পরে আসরটি বসেছিল বলে মনে করা যায় এবং 'জানকীবাবু ও নদিদি' প্রশ্নকর্তাদের অন্যতম ছিলেন দেখে অনুমান করতে পারি, হয়তো কাশিয়াবাগানের বাগানবাড়িতেই প্ল্যান্‌চেটের আয়োজন করা হয়েছিল। বিলাত-প্রবাসকালে স্কটকন্যাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ প্ল্যানচেট-চর্চা করতেন, পরিণত বয়সেও একাধিকবার তিনি প্রেতলোকের রহস্য জানার চেষ্টা করেছেন, বর্তমান ঘটনাটি তারই একটি উদাহরণ। থিয়োসফি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব কী ছিল, তাঁর রচনায় সে-সম্বন্ধে কোনো বিশেষ উল্লেখ দেখা যায় না।

থিয়োসফি বাংলাদেশের ধর্মজীবনে একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। প্রাচীন ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র সমূহের গুণগানকীর্তন ও ধর্মীয় আচার-আচরণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার যে ঢেউ নব্যহিন্দুধর্মের নামে বাংলায় আছড়ে পড়েছিল, তার মূলে থিয়োসফি-চর্চার কিছুটা অবদান আছে বলেই মনে হয়।

উল্লেখপঞ্জী

১ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৯৬

২। দ্র 'মানবসত্য', মানুষের ধর্ম ২০। ৪২৪

৩ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৯৬

৪ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ১ [১৩৯২]। ১৬৩-৬৪

৫ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৯৭

৬ ঐ ১৭। ৩৯৮

৭ ঐ [১৩৬৮]। ২১৬

৮ 'Some Celebrities', *The Modern Review*, May 1927, p. 542

৯ জীবনস্মৃতি ১৭। ৪০৩

১০ ঐ ১৭। ৪০৩-০৪

১১ দ্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি। ৭১

১২ ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭। ৯৭

১৩ সমালোচনা অ-২। ৭৩

১৪ জীবনস্মৃতি ১৭। ৪০৫

১৫ ঐ ১৭। ৪০৪-০৫

১৬ দ্র শনিবারের চিঠি, কার্তিক ১৩৪৬

১৭ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৯৪

১৮ আধুনিক সাহিত্য, গ্রন্থপরিচয় ৯। ৫৫৫-৫৬

১৯ রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা ১।১৪৯

২০ জীবনস্মৃতি ১৭। ৪০৪

২১ চিঠিপত্র ৮। ২, পত্র ২

২২ 'চণ্ডীদাস, বসন্তরায় ও বিদ্যাপতি'; ভারতী, আশ্বিন ২৯৭

২৩ শ্রীশ্রীপদকল্পতরু ৫। ১৫৮

২৪ ভারতী, আশ্বিন ৩০১

২৫ 'কালক্রম', রবীন্দ্রসাহিত্যের আদিপর্ব। ৪৫

২৬ ভারতী, আষাঢ়। ১৫২-৫৩

২৭ 'প্রত্যুত্তর'; ভারতী, ভাদ্র। ২৫৮

২৮ ঐ। ২৬০

২৯ ঐ। ২৬১

৩০ ঐ। ২৬১-৬২

৩১ জীবনস্মৃতি [১৩৬৮]। ২৫২, তথ্যপঞ্জী ১২২॥৩

৩২ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৯৮

৩৩ দ্র প্রভাত সংগীত ১। ৭৬-৮০

৩৪ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৯৯

৩৫ চিঠিপত্র ৮। ২, পত্র ২

৩৬ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৮২

৩৭ চিঠিপত্র ৮। ১, পত্র ১

৩৮ মন্মথনাথ ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ [১৩৩৪]। ১২০-২১

৩৯ রবীন্দ্রস্মৃতি। ৩২

৪০ ঐ। ৩৫

৪১ ঘরোয়া। ১০৬

৪২ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। ১২১

৪৩ *The Hindoo Patriot*, 25 Dec 1882, pp. 608-09

৪৪ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩৮২

৪৫ গীতবিতান : কালানুক্রমিক সূচী ১। ৪২

৪৬ বাল্মীকি রামায়ণ ১ [ভারবি-সংস্করণ : ১৩৮২]। ২৫০

৪৭ 'সূচনা', বউঠাকুরানীর হাট ১। ৩৬৯

৪৮ 'বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ' : সাধনা, শ্রাবণ ১৩০১। ২৫০

৪৯ 'বাউলের গান' : ভারতী, বৈশাখ ১২৯০। ৩৫; দ্র সমালোচনা অ-২। ১৩১

৫০ দ্র রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম। ২৩

৫১ ঐ। ৪

৫২ চিঠিপত্র ৮। ৫, পত্র ৭

৫৩ ঐ ৮। ৬, পত্র ৮

৫৪ ঐ ৮। ৩, পত্র ৩

৫৫ 'Some Celebrities' *The Modern Review*, May 1927, p. 542

৫৬ রবীন্দ্রজীবনী ১। ১৭০

৫৭ সাধারণী, ১২ চৈত্র ১২৮৯। ২৩৭

৫৮। ঐ। ২৩৭

৫৯ ভারতী, ফাল্গুন। ৫১১

৬০ জীবনস্মৃতি ১৭। ৪০২

৬১ ভারতী, চৈত্র। ৬০০

৬২ দ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৪৭৪

৬৩ দ্র তারেশচন্দ্র মিত্র, থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির ইতিহাস [1964]। ১১২-১৪

৬৪ ঐ। ১১৪

৬৫ জীবনের ঝরাপাতা। ৫৭

---

* "আমি সেই দিনই সমস্ত মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ন 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' লিখিলাম। ....একটি অপূর্ব [অভূতপূর্ব] অদ্ভুত হৃদয়স্ফূর্তির দিনে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' লিখিয়াছিলাম কিন্তু সেদিন কে জানিত এই কবিতায় আমার সমস্ত কাব্যের ভূমিকা লেখা হইতেছে।"—প্রথম পাণ্ডুলিপি, দ্র জীবনস্মৃতি ১৭।৩৯৬, পাদটীকা

*১ 'A wedding of peculiar interesting nature took place this week. The marriage of the daughter of Mr. R.C. Dutt, C.S., about 17 years of age, with Babu Promatha Nath Bose, of the geological survey, who has returned from England, was performed *last Monday* according to Hindu rites. The necessary ceremonies prescribed by the Hindu religion, we are informed, were gone through. The desire of England-returned Hindus to rejoin Hindu Society ought to be encouraged.' [Italics mine]-*The Hindoo Patriot,* Vol. XXIX, No. 31, July 31, p. 362

*২ **সোমপ্রকাশ-এর [২৬।৩৮, ২৩ শ্রাবণ] বিবরণে কন্যার নাম সরলা।**

* এই অধিবেশনের 'রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক লিপিবদ্ধ এবং শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত' একটি কার্য বিবরণী মন্মথনাথ ঘোষ তাঁর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ [১৩৩৪] গ্রন্থের ১১২-১৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করেছেন, তথ্য ও উদ্ধৃতিগুলি উক্ত গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

* পরবর্তী এক ভ্রমণের [ভাদ্র ১২৯৪] বর্ণনায় স্বর্ণকুমারী দেবী কৌতুককর ভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম ভ্রমণের উল্লেখ করেছেন, দ্র 'দারজিলিং পত্র', ভারতী ও বালক, আষাঢ় ১২৯৫। ১৩১

* স্বরবিতান ২৯-এ কয়েকটি গানের সুর ও তাল আলাদা, এগুলি তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে প্রদর্শিত হল।

* এটিকে একটি স্বতন্ত্র গান বলে বিবেচনা করা যায় না, সেইজন্য সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করা হল না।

* দ্র ৪ মাঘ ১২৮৮ তারিখে সৌদামিনী দেবীকে লেখা মহর্ষির পত্র, পত্রাবলী। ২০৩-০৪, পত্র ১৩৩; অপিচ ইন্দিরা দেবীর অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা : 'হঠাৎ কেন জানিনে, যখন একদিন [সারদাপ্রসাদ] পেলিটির উপরতলায় থাকতে গেলেন, তখনো আমি আবদার করে' তাঁর সঙ্গে গেলুম।...অবশ্য জ্যোতিকাকামশায় পরদিনই গিয়ে তাঁকে ধরে' নিয়ে এলেন...স্ত্রী বা শ্বশুরপক্ষের উপরে কোনকারণে রাগ করে' চলে এসেছিলেন'।

* চন্দ্রনাথ বসুও তাঁর রিপোর্টে বইটির বেশি প্রশংসা করতে পারেন নি : "Though not very successful, was much better than most Bengali novels are.' দ্র চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সরকারী দলিলে রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনা' : বি. ভা. প., মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯। ২৮৬

* প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "কালমৃগয়ার 'যাও রে অনন্তধামে মোহ-মায়া পাসরি' গানটি উৎসবে ব্রহ্মসংগীতরূপে গীত হইল" [রবীন্দ্রজীবনী ১। ১৫৬]-তত্ত্ববোধিনী-তে প্রকাশিত মাঘোৎসবের বিবরণ থেকে এই তথ্যের যথার্থ্য প্রতিপন্ন হয় না।

*১ Theophile Gautier [1811-72]-রচিত বিখ্যাত উপন্যাস [1835]।

*২ চিঠিপত্র। ১৬, পত্র ২৫। এই 'পুনশ্চ' অংশটি একটি খামের উপরে লেখা; আমাদের ধারণা, এটি ভ্রমক্রমে পরবর্তীকালে লিখিত একটি পত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

* ভারতী-র এই সংখ্যাটির সমালোচনা করতে গিয়ে *The Hindoo Patriot* [Vol. XXX, No. II, Mar 12, p. 122] প্রবন্ধটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছে : 'The second article "Screaming" will be read with interest and pleasure. It is so apt and appropriate.'

* নগেন্দ্রনাথ গুপ্তও এই কথাই লিখেছেন : 'He was doing all the editorial work of the Bengali magazine *Bharati*, though the name of his eldest brother, Dwijendranath Tagore, appeared as Editor.'—'Some Celebrities', *The Modern Review*, May 1927, p. 542.

* ভারতী, চৈত্র। ৫৯৯; সাধারণী-তে [২০।২, ১০ বৈশাখ ১২৯০।২৮] বারো পৃষ্ঠার এই 'কাব্য'-গ্রন্থখানির সপ্রশংস আলোচনা করে মন্তব্য-সহ দুটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি চয়ন করা হয়েছে:

'আনন্দদায়িনি চিন্তা সজনি আমার
তব সখী কল্পনারে বলগো হাসিতে,—
এই ধরিলাম আমি লেখনী আবার।
এ প্রতিজ্ঞা কেন হায় করেছিনু আমি
'লিখিব না'—সুধু কিরে "ভারতী'র তরে?
এই ধরিলাম পুনঃ সাধের লেখনী,
মনের খেয়াল মম পূরাবার তরে,
রঙ্গ-রসে ব্যঙ্গ-কাব্য করিব রচনা,
এস সুখে হাস্য-মুখে সাধের কল্পনা।

সাধারণী সম্পাদক কৃত প্রাচীন কাব্যের টীকায় ভারতী ভ্রম দেখাইবার বিশেষ প্রয়াস পান, আর সাধারণীতে পূর্ব্বের মত সমালোচনা থাকে না, এই দুইটি
কথা একত্র করিয়া কাব্যকার বলিতেছেন :—

“সাধারণী” উৎসে নাহি শৈত্য গুণ আর
উত্তপ্ত মস্তিষ্ক বল, শীতলিবে কিসে?
ওঝারে কেটেছে সাপে কে দিবে ঔষধ?
তবে যদি হে পাঠক বল তুমি হায়
ঢোঁড়ার বিষেতে কভু ওঝা কি ডরায়
‘ভারতী’ ঢক্কার রবে কাঁপায়ে ভুবন
কহিতেছে উচ্চ রবে বঙ্গবাসি গণে
“বঙ্গের মাঝারে নাহি পাঠক তেমন।”
অক্ষয় টিপ্পনীকার প্রাচীন পদের
সূক্ষ্মদর্শী পাঠকের পড়েছেন হাতে,
এ ক্ষেত্রে নিস্তার বুঝি নাহিক তাঁহার
ভারতী ধরিয়া ভুল ‘আয় আয় বলি’
ডাকিছে পাঠক দলে দোষ দেখাবারে।

...লেখকের ক্ষমতা আছে এবং বাঙ্গালাভাষার রীতিমত অনুশীলন আছে।’

—উক্ত ‘সমালোচক কাব্য’ এবং এই সমালোচনা রবীন্দ্র- ও ভারতী-বিরোধিতার একটি দিককে স্পষ্ট করে তুলতে সাহায্য করে।

* ‘বিলেত থেকে ডাক্তার হয়ে যেদিন বাড়ী এলেন তখন ১০ই মাঘে উঠানে থাম পোঁতা হচ্ছিল’,—ইন্দিরা দেবীর অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা।

ত্র য়ো বিং শ অ ধ্যা য়

১২৯০ [1883-84] ১৮০৫ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের ত্রয়োবিংশ বৎসর

রবীন্দ্রজীবনে ১২৯০ বঙ্গাব্দের প্রথম দিনটির [শুক্র 13 Apr 1883] সূচনা হল মহর্ষি-ভবনে নববর্ষের উপাসনা দিয়ে। এই উৎসবে রবীন্দ্রনাথ-রচিত দুটি ব্রহ্মসংগীত গীত হয় : 'সখা, তুমি আছ কোথা' ও 'প্রভু, এলেম কোথায়'। মাঘোৎসবের জন্য ব্রহ্মসংগীত রচনার সূত্রপাত আগে হলেও, নববর্ষ উপলক্ষে তিনি এই প্রথম গান রচনা করলেন—সেদিক দিয়ে গান-দুটির ঐতিহাসিক মূল্য আছে। তাছাড়া উৎসবে প্রদত্ত দ্বিতীয় উপদেশটিতে তাঁর 'তুমি কি গো পিতা আমাদের' গানটি উদ্ধৃত হয় [দ্র তত্ত্ব°, জ্যৈষ্ঠ। ২৭]।

এ কিছুদিন পরেই ২০ বৈশাখ [বুধ 2 May] রবীন্দ্রনাথ নন্দনবাগানে কাশীশ্বর মিত্র-প্রতিষ্ঠিত শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের বিংশ সাংবৎসরিক উৎসবে যোগ দেন। আমন্ত্রিত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। *The Statesman* পত্রিকায় সংবাদটি প্রকাশিত হয় : '...In the afternoon Ramkisto Parankrisna, the sage of Duckhineswar, discoursed on morality and religion. The evening service commenced at 7-30, ...The Choir was led by Baboo Rabindra Nath Tagore.'[১] 'শ্রীম-' বলেছেন: 'ঠাকুর প্রথমে আসিয়া নীচে একটি বৈঠকখানা ঘরে আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে ঘরে ব্রাহ্ম ভক্তগণ ক্রমে ক্রমে আসিয়া একত্রিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র (ঠাকুর) প্রভৃতি ঠাকুরবংশের ভক্তগণ এই উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন।'[২] তাঁর ভগ্নীপতি জানকীনাথ ঘোষাল প্রভৃতি কেউ কেউ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসন গ্রহণ করে 'ঈশ্বরীয় কথা' শ্রবণ করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপস্থিতি সম্পর্কে আদৌ সচেতন ছিলেন বলে মনে হয় না, সেই কারণেই তিনি পরবর্তীকালে কোনো উপলক্ষেই এই সাক্ষাৎকারের কথা উল্লেখ করেন নি। তাই ঘটনাটি ঐতিহাসিক হলেও যথেষ্ট গুরুত্ব অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।

বৈশাখ মাসে সাময়িক পত্রে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি মুদ্রিত হয়:

তত্ত্ববোধনী, বৈশাখ ১৮০৫ শক [১১শ কল্প ১ম ভাগ, ৪৭৭ সংখ্যা]:

১৪-১৫ 'স্রোত' দ্র প্রভাতসংগীত ১।৯২-৯৩

ভারতী, বৈশাখ ১২৯০ [৭।১]:

৭-৯ সাধ' দ্র প্রভাতসংগীত ১।৯৬-১০০

সঞ্জীবনী (১।৯, ২৭ জ্যৈষ্ঠ। ৩৫) সাপ্তাহিকে ভারতী-র বর্তমান সংখ্যাটির সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখা হয় : '...বঙ্গের উদীয়মান কবি বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একঘেয়ে কবিতা পাঠ করিয়া আমরা অনেক সময় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি বটে; কিন্তু "সাধ" নামক কবিতার সর্ব্বশেষ প্যারাগ্রাফে তিনি হৃদয়ের যে উচ্চারণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আমরা মোহিত হইয়াছি।...বাবু রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এরূপ উচ্চ, মহান্ উদার ও বিশ্বজনীন ভাব এই নূতন নহে; তাঁহার অনেক কবিতার মধ্যেই এরূপ ভাববিকাশ দেখা গিয়াছে। কিন্তু আমাদর ক্ষোভ, এই অসাধারণ প্রতিভা কেবল এক দিকেই—কেবল এক ভালবাসার কবিতাতেই পর্য্যবসিত হইতেছে। তাঁহার ২।১টী "জাতীয় সংগীত" শুনিয়া বঙ্গবাসীর নিদ্রিত হৃদয় চমকিয়া উঠিয়াছিল; সে দিকে তাঁহার বীণা নীরব দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি।'—এই সমালোচনা পড়ে রবীন্দ্রনাথও দুঃখিত হয়েছিলেন, তাঁর ক্ষোভ তির্যক-রূপে প্রকাশিত হয় 'জিহ্বা আস্ফালন' প্রবন্ধে।]

৩৪-৪১ 'বাউলের গান।/সঙ্গীত সংগ্রহ। বাউলের গাথা' দ্র সমালোচনা অ-২।১৩১-৩৭

ভারতী-র ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯১-সংখ্যায় গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ড সমালোচিত হয়; এই দুটি আলোচনা সম্পাদিত হয়ে সমালোচনা গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই প্রবন্ধে বর্তমান আলোচনার যে-অংশটি পরিত্যক্ত হয়, সেটি আমরা এখানে উদ্ধৃত করছি—পরবর্তীকালে এই জাতীয় রচনার প্রতি রবীন্দ্রনাথ যে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছেন, এখানে তার সূচনা : 'সঙ্গীত সংগ্রহের অপরাপর খণ্ডের জন্য উৎসুক হইয়া রহিলাম। গ্রাম্য গাথা ও প্রচলিত গীত সমূহ (যে বিষয়ের ও যে সম্প্রদায়েরই হউক না কেন) সকলে মিলিয়া যদি সংগ্রহ করেন, তবে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের বিস্তর উপকার হয়। আমরা আমাদের দেশের লোকদের ভাল করিয়া চিনিতে পারি, তাহাদের সুখ দুঃখ আশা ভরসা আমাদের নিকট নিতান্ত অপরিচিত থাকে না। ভিক্ষুকরা, মাঝীরা যে সকল গান গাহে, তাহা লিখিয়া লইতে অধিক পরিশ্রম নাই। আমরা এইরূপ দুই একটি গান লিখিয়া লইয়াছিলাম, তাহাই প্রকাশ করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করি। এইখানে বলিয়া রাখিতেছি, পাঠকেরা যদি কেহ কেহ নিজ নিজ সাধ্যানুসারে প্রচলিত গ্রাম্য গীত সকল সংগ্রহ করিয়া আমাদের নিকট প্রেরণ করেন তবে তাহা ভারতীতে সাদরে প্রকাশিত হইবে।'[৩]—এর পরে তিনটি গান মুদ্রিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধ রক্ষিত হয়েছিল—৪টি গান ভারতী-র দপ্তরে প্রেরিত ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'গীত সংগ্রহ' [পৃ ৯৫-৯৬] বিভাগে মুদ্রিত হয়।

উপরের তালিকায় দেখা যায় যে, প্রভাতসংগীত-এর অন্তর্গত দুটি কবিতা 'স্রোত' ও 'সাধ' বৈশাখের তত্ত্ববোধিনীও, ভারতী-তে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই সময়েই উক্ত কাব্যগ্রন্থটি মুদ্রণের কাজ চলছিল এবং এই মাসেরই শেষ দিকে কাব্যটি প্রকাশিত হয়—বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকা অনুযায়ী গ্রন্থটির প্রকাশ। তারিখ 11 May 1883 [শুক্র ২৯ বৈশাখ], মূল্য আট আনা। গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি এইরূপ:

প্রভাত সঙ্গীত।/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/প্রণীত।/কলিকাতা/আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে/শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী দ্বারা/ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।/বৈশাখ ১৮০৫ শক।

পৃষ্ঠাসংখ্যা : আখ্যাপত্র [৴০-ল০], 'সূচিপত্র' [ল০], 'অশুদ্ধি সংশোধন' [।০], 'বিজ্ঞাপন' [৷৴০]+ 'স্নেহ উপহার' [২]+'প্রভাত বিহঙ্গের গান' [৴০-।ল০]+১২০।

রবীন্দ্রনাথ 'বিজ্ঞাপন'-এ লেখেন:

প্রভাত-সঙ্গীত প্রকাশিত হইল। "অভিমানিনী নির্ঝরিণী" নামক কবিতাটি আমার লিখিত নহে। "নির্ঝরের স্বপ্ন-ভঙ্গ" রচিত হইলে পর আমার কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধু তাহারই প্রসঙ্গক্রমে "অভিমানিনী নির্ঝরিণী" রচনা করেন। উভয় কবিতাই একত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। অতএব উভয়ের মধ্যে যে একটি আজন্ম-বন্ধন স্থাপিত হইয়াছে, তাহা বিচ্ছিন্ন না করিয়া দুটিকেই একত্রে রক্ষা করিলাম।

"শরতে প্রকৃতি", "শীত", ও গুটিকতক অনুবাদ ব্যতীত প্রভাত সঙ্গীতের আর সমুদয় কবিতাগুলিই সম্প্রতি লিখিত হইয়াছে।/গ্রন্থকার।

'অভিমানিনী নির্ঝরিণী'-কে বাদ দিয়ে এবং উপহার ও প্রবেশক কবিতা-দুটিকে নিয়ে মোট একুশটি কবিতা প্রভাত সঙ্গীত-এর প্রথম সংস্করণে ছিল, যার মধ্যে ষোলোটি কবিতা গ্রন্থপ্রকাশের পূর্বেই ভারতী বা তত্ত্ববোধিনী-তে মুদ্রিত হয়েছিল, মাত্র পাঁচটি গ্রন্থাকারেই প্রথম প্রকাশিত হয়।

নূতন কবিতাগুলি হল:

১ স্নেহ উপহার।/শ্রীমতী ইন্দিরা—/প্রাণাধিকাসু।

এই উপহার-কবিতাটির মাধ্যমে গ্রন্থটি দশ বছরের ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণ [চৈত্র ১২৯৮] থেকেই কবিতাটি বর্জিত হয়। পুলিনবিহারী সেন-কৃত রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী [পৃ ৭৫-৭৭] ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রথম খণ্ডে [আষাঢ় ১৩৮৭] প্রভাতসংগীত-এর 'সংযোজন' অংশে [পৃ ১০৭] এটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

২ প্রভাত বিহঙ্গের গান।/(আহ্বান সঙ্গীত)/ওরে তুই জগৎ ফুলের কীট

এটি সম্ভবত গ্রন্থপ্রকাশের সমকালেই রচিত। দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে কবিতাটির নাম শুধু 'আহ্বানসঙ্গীত'। ২০৮ ছত্রের মূল কবিতাটির বর্তমান ছাত্র-সংখ্যা ১৪৩।

৩ প্রতিধ্বনি/অয়ি প্রতিধ্বনি

৪ চেয়ে থাকা/মনেতে সাধ যে দিকে চাই

৫ সমাপন/আজ আমি কথা কহিব না

'শরতে প্রকৃতি' দ্বিতীয় ও পরবর্তী সংস্করণগুলিতে বর্জিত হয়; রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী [পৃ ৯৬-৯৯] ও রবীন্দ্র-রচনাবলী ১ [প. ব. ১৩৮৭]-এর 'সংযোজন' অংশে [পৃ ১০৮-১০] পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। 'শীত' মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ ৭ম ভাগ [১৩১০]-এর 'শিশু' বিভাগে খণ্ডিত আকারে গ্রথিত হয়; পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রকাশিত উক্ত সংস্করণের 'সংযোজন' অংশে [পৃ ১১০-১২] পূর্ণাঙ্গ রূপটি সংকলিত হয়েছে।

প্রভাতসংগীত প্রকাশিত হবার পর ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তৎ-সম্পাদিত এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ পত্রিকার ২ আষাঢ় [শুক্র 15 Jun]-সংখ্যায় কাব্যটির একটি দীর্ঘ সপ্রশংস সমালোচনা লেখেন।[৪] এ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি-র প্রথম পাণ্ডুলিপিতে লিখেছিলেন, 'ভূদেববাবু এডুকেশন গেজেটে আমার প্রভাতসংগীতের সম্বন্ধে যে অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাই বোধ করি আমার শেষ লাভ। প্রথম হইতে সাধারণের নিকট হইতে বাহবা পাইয়া আমি যে রচনাকার্যে অগ্রসর হইয়াছি, এ-কথা আমি স্বীকার করিতে পারিব না।'[৫] তাঁর এই অভিযোগ যে সর্বাংশে সত্য নয়, এর আগে অনেকগুলি সমালোচনা উদ্ধৃত করে আমরা তা দেখিয়েছি। প্রভাতসংগীত-এর অনুরূপ একটি অনুকূল সমালোচনা প্রকাশিত হয় সঞ্জীবনী পত্রিকায় [১।১৪, ৩১ আষাঢ়, পৃ ৫৫]; দুষ্প্রাপ্য-বোধে আমরা সেটি উদ্ধৃত করে দিচ্ছি:

সমালোচনা।/প্রভাত সঙ্গীত—বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত মূল্য ॥০ আনা। কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকের দোকানে প্রাপ্তব্য।

বাবু রবীন্দ্রনাথ স্বভাবের কবি—প্রকৃতি বর্ণনায় আধুনিক বঙ্গীয় কবিদিগের কাহাকেও আমরা এ পর্য্যন্ত তাঁহার সমকক্ষ দেখি নাই। আমাদের উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন জন্য তাঁহার প্রাকৃতিক বর্ণনার কোন অংশটুকু ছাড়িয়া কোন অংশটুকু উদ্ধৃত করিব, তাহা বুঝিয়া উঠিতেছি না। শীত, শরতে প্রকৃতি, স্রোত, নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ, পুনর্ম্মিলন, প্রভৃতি কবিতার স্থানে স্থানে যে প্রাকৃতিক বর্ণনা আছে, তাহাতে পাঠক দেখিতে পাইবেন, রচনা কেমন সরল ও স্বাভাবিক;—অথচ তাহাতে কত কবিত্ব, কল্পনার কেমন চাতুর্য্য, চিন্তার কিরূপ বিকাশ। উপহারটী কেমন স্বাভাবিক,—কেমন সুন্দর। যাহার হৃদয় কবির উপাদানে গঠিত নহে, বাবু রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে সে প্রবেশ করিতে পারে না—রসাস্বাদন করিতে সমর্থ হয় না। প্রভাত সঙ্গীতের কবিতা পাঠ করিতে ২ অনেক সময় কবির স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বোধ থাকে না,—কবির চিন্তা ও পাঠকের চিন্তা এক হইয়া যায়—যদি এরূপ না হইবে, তবে আর কবির কবিত্ব কিসে? তাই একদিন বলিয়াছিলাম, এই অসাধারণ প্রতিভা যদি স্বভাব সঙ্গীত ও ভালবাসার "একঘেয়ে" কবিতায় পর্য্যবসিত না হইয়া দেশ হিতৈষণা ও স্বদেশানুরাগ সঙ্গীতে নিয়োজিত হইত, তবে বাঙ্গালীর নিদ্রিত হৃদয়ে ও জড় দেহে তাড়িত বেগ সঞ্চারিত হইত।

বাঙ্গালি কবিদিগের রুচিবিকৃতি দেখিয়া আমরা অনেক সময় সন্তপ্ত হইয়া থাকি; সুখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের কবিতার রুচি দিন দিনই পরিমার্জ্জিত হইতেছে। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, মহাস্বপ্ন, সাধ, অনন্ত জীবন ও অনন্ত মরণের স্থানে স্থানে অতি উচ্চ দরের কবিত্ব আছে। স্থানাভাব বশতঃ ইচ্ছা সত্ত্বেও আমরা তাহা পাঠকদিগকে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারিলাম না।

তার পর অনুবাদ। কবিতার অনুবাদে বাবু রবীন্দ্রনাথের সহিত কাহারও তুলনা হয় না। যে দিন ভারতীতে সেলীর Love's Philosophy নামক কবিতার অনুবাদ (প্রেমতত্ত্ব) পড়িয়া ছিলাম, সেই দিনই বুঝিয়াছিলাম রবি বাবুর অনুবাদ শক্তি অসাধারণ, কবিত্ব শক্তি প্রশংসনীয়। এ সম্বন্ধে যাঁহাদের মত বৈষম্য আছে তাঁহারা যেন মূল কবিতার সহিত প্রভাত সঙ্গীতের অনুবাদগুলি মিলাইয়া লন।

এ ছাড়া সোমপ্রকাশ [২৭।৩৮, ২২ শ্রাবণ, পৃ ৬০৫] পত্রিকাতেও একটি অনুকূল সমালোচনা মুদ্রিত হয়। সমালোচক 'অধিকাংশ কবিতায় উদাত্তভাবের সমধিক সমাবেশ' লক্ষ্য করে 'সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়' কবিতাটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করেছেন।

কাব্যটি মুদ্রিত হলে রবীন্দ্রনাথ সেটিকে অবলম্বন করে একটি লঘু রসের গদ্য প্রবন্ধ রচনা করেন—'লেখা কুমারী ও ছাপা সুন্দরী' নামে প্রবন্ধটি ভারতী-র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় [পৃ ৭১-৭৪] প্রকাশিত হয়। এতে তিনি লিখলেন, 'গুটিকতক কবিতা লেখা ছিল, অনেক দিন ধরিয়া খাতায় পড়িয়াছিল, যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই সে লেখাগুলিকে ভাল বলিয়া জ্ঞান হইতে লাগিল। অবশেষে সম্প্রতি সেগুলি ছাপা হইয়া গেছে। ধারণা ছিল, নিজের লেখা ছাপার অক্ষরে পড়িতে বুঝি বড়ই আনন্দ হইবে। কিন্তু কই, তাহাত হইল না! আজ সমস্ত দিন ধরিয়া মুদ্রাযন্ত্রের লৌহগর্ভ হইতে সদ্যপ্রসূত বইখানি হাতে লইয়া এ পাত ওপাত করিতেছি, কিছুই ভাল লাগিতেছে না।'[৬] এই ভালো না লাগার কারণ, পাণ্ডুলিপির হস্তাক্ষরে যে ব্যক্তিগত স্পর্শ ছিল ছাপাখানার হরফে ঢালাই কাব্যগ্রন্থখানির মধ্যে সেই স্পর্শ খুঁজে পাওয়া যায় না : 'সেই কাঁচা অক্ষর, কাটাকুটি, কালির

দাগ দেখিলেই, আমার সমস্ত কথা মনে পড়ে; কখন লিখিয়াছিলাম, কি ভাবে লিখিয়াছিলাম, লিখিতে কি সুখ পাইয়াছিলাম, সমস্ত মনে পড়ে। সেই বর্ষার রাত্রি মনে পড়ে; সেই জান্‌লার ধারটি মনে পড়ে, সেই বাগানের গাছগুলি মনে পড়ে, সেই অশ্রুজলে সিক্ত আমার প্রাণের ভাবগুলিকে মনে পড়ে। আর, আর-একজন যে আমার পাশে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে মনে পড়ে, সে যে আমার খাতায় আমার কবিতার পার্শ্বে হিজিবিজি কাটিয়া দিয়াছিল, সেইটে দেখিয়া আমার চোখে জল আসে। সেই ত যথার্থ কবিতা লিখিয়াছিল। তাহার সে অর্থপূর্ণ হিজিবিজি ছাপা হইল না, আর আমার রচিত গোটাকতক অর্থহীন হিজিবিজি ছাপা হইয়া গেল! তাদের সেই সুখদুঃখপূর্ণ শৈশবের ইতিহাস আর তেমন স্পষ্ট দেখিতে পাই না, তাই আর তেমন ভাল লাগে না।'[৭] অনুমান করা যায়, উক্ত 'আর-এক জন' তাঁর নতুন বউঠান-কাদম্বরী দেবী, সদর স্ট্রীটে ও দার্জিলিঙে প্রভাতসংগীত-এর অনেকগুলি কবিতা লেখার সময়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে ছিলেন এই তথ্যটি এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু প্রভাতসংগীত-এর পাণ্ডুলিপি আমাদের হাতে এসে পৌঁছয় নি, সুতরাং সেই অর্থপূর্ণ হিজিবিজিগুলি প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য থেকে আমরা বঞ্চিত। [প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে তাঁর বিরূপতা এই প্রবন্ধেও প্রকাশিত হয়েছে—'দম্ভোলি, ইরম্মদ ও কড়কড় শব্দ নহিলে যেন ছাপার অক্ষর সাজে না।'[৮]]

ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৯০ [৭।২]:

৭১-৭৪ 'লেখা কুমারী ও ছাপা সুন্দরী'

৮৮ 'ভানুসিংহের কবিতা।/মিশ্র বেহাগ।/আজু সখি মুহু মুহু' দ্র ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ২।১৫-১৬ [১১ নং]

গানটি ছবি ও গান [ফাল্গুন ১২৯০] কাব্যগ্রন্থে 'দুহুঁ (ব্রজভাষা)' শিরোনামে প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয়, কাব্যগ্রন্থাবলী [১৩০৩]-তে শীর্ষনাম 'রসাবেশ'। দ্র রবিচ্ছায়া। ৩৬-৩৮ [বিবিধ ৪১], মিশ্র বেহাগ—ঝাঁপতাল : গীতবিতান ৩।৭৫৯; স্বরবিতান ২১-এ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি কিঞ্চিৎ সম্পাদিত আকারে মুদ্রিত।

'ভানুসিংহের কবিতা' এর আগে শেষবারের মতো ভারতী-তে প্রকাশিত হয়েছিল শ্রাবণ ১২৮৮ সংখ্যায় —'মরণরে, তুহুঁ মম শ্যাম সমান'—প্রায় দু-বছর আগে। ঐ সংখ্যাতেই অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত বিদ্যাপতির পদাবলীর সমালোচনা 'প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ।/(বিদ্যাপতি') প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এতদিন পরে আবার 'ভানুসিংহের কবিতা' লেখার কারণও নতুন করে বিদ্যাপতি-চর্চা বলেই আমাদের ধারণা। বৈশাখ ১২৯০-সংখ্যা থেকেই ভারতী-তে 'জিজ্ঞাসা' নামে একটি নতুন বিভাগ প্রবর্তিত হয়, বর্তমান সংখ্যায় 'জিজ্ঞাসা ও উত্তর' শিরোনামে [পৃ ৯০-৯৫] উক্ত বিভাগে পূর্ব-প্রশ্নের ৭টি উত্তর মুদ্রিত করে (বিদ্যাপতি)'-শীর্ষক উপবিভাগে বিদ্যাপতির পদের অর্থ সম্পর্কে ১৫টি প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা প্রকাশিত হয় [পৃ ৯১-৯৫]। আমাদের অনুমান, এই অংশটি রবীন্দ্রনাথের রচনা। তৃতীয় প্রশ্নটিতে 'নয়ন নলিনী-দউ অঞ্জনে রঞ্জিত/ভাঙ-বিভঙ্গি বিলাস।/চকিত চকোর জোরি বিধি বান্ধিল/কেবল কাজর পাশ।' ছত্রগুলি উদ্ধৃত করে লেখা হয়েছে : 'ভারতীর পঞ্চম খণ্ডে প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ শীর্ষক প্রবন্ধে ইহার প্রথম দুই ছত্রের অর্থ আলোচিত হইয়া গিয়াছে' [পৃ ৯৩], এই মন্তব্যও আমাদের অনুমানকে দৃঢ় করে। সুতরাং এই বিদ্যাপতি-চর্চাই রবীন্দ্রনাথকে আবার ব্রজভাষায় পদ রচনায় উৎসাহিত করেছিল, এমন ভাবা কষ্ট-কল্পনা নয়।

৯১-৯৫ ‘জিজ্ঞাসা ও উত্তর।....(বিদ্যাপতি)’

রচনাটি সম্পর্কে আমরা উপরেই আলোচনা করেছি, এখানে শুধু সূচনা অংশটি উদ্ধৃত করে দিচ্ছি : ‘বিদ্যাপতির পদাবলীর নিকট আমাদের বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য যে অনেকটা ঋণী তাহার আর সন্দেহ নাই। তাঁহার পদাবলীর দুরূহ পদ সকলের অর্থ ও সেই প্রাচীন ভাষার নিয়ম সকল যতই পরিষ্কার হইয়া যায় ততই ভাল। ইহাতে কেবলমাত্র যে বাঙ্গলা সাহিত্যপ্রিয় ব্যক্তিদের আনন্দ বর্দ্ধন করিবে তাহা নহে, বাঙ্গলা ভাষাতত্ত্বজিজ্ঞাসুদের পক্ষেও ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে আমরা পাঠকদিগের সহায়তা প্রার্থনা করি। পদাবলীর দুরূহ পদ প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন নিম্নে প্রকাশ করিলাম, তৎসম্বন্ধে পাঠকদের যাঁহার যাহা মনে হয় যদি লিখিয়া পাঠান্ ও আমরা যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের মতামত ব্যক্ত করিয়া পাঠান, তবে বিস্তর উপকার হয়। শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক সম্পাদিত বিদ্যাপতি অবলম্বন করিয়া আমরা নিম্ন-লিখিত প্রশ্ন ও সিদ্ধান্ত পাঠক সমীপে স্থাপিত করিলাম। অনেকগুলি প্রশ্ন সামান্য বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু এ সম্বন্ধে কিছুই সামান্য মনে করা উচিত নহে।’[৯]

বৈশাখ-সংখ্যায় প্রকাশিত ‘বাউলের গান’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত গ্রাম্য গীত সংগ্রহ করার জন্য পাঠকদের অনুরোধ করেছিলেন; বর্তমান সংখ্যায় ‘আমরা “বাউলের গান” নামক প্রবন্ধে পাঠকদিগকে প্রচলিত গীত সংগ্রহ করিয়া ভারতীতে প্রকাশের জন্য পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম, তদনুসারে নিম্নলিখিত গানগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি’ উল্লেখ-সহ ৪টি গান ‘গীত সংগ্রহ’ [পৃ ৯৫-৯৬] বিভাগে মুদ্রিত হয়।

ভারতী-র জ্যৈষ্ঠ ১২৯০-সংখ্যার শুরুতে ৪৯-৬৪ পৃষ্ঠায় দ্বিজেন্দ্রনাথের লেখা ‘যৌতুক কি কৌতুক’ নামে রূপকথা-জাতীয় একটি নাতিদীর্ঘ কাব্য প্রকাশিত হয়; কাব্যটির শেষে একটি উৎসর্গ-কবিতা যুক্ত হয়েছে:

ছদ্মবেশধারী উৎসর্গ/—এক কথায়—/উপসর্গ।

শর্ব্বরী গিয়াছে চলি’! দ্বিজ-রাজ শূন্যে একা পড়ি
প্রতীক্ষিছে রবির পূর্ণ উদয়।
গন্ধ-হীন দু-চারি রজনীগন্ধা ল’য়ে তড়িঘড়ি
মালা এক গাঁথিয়া সে অসময়
সঁপিছে রবির শিরে এই আজ আশিষিয়া তা’রে
“অনিন্দিতা স্বর্ণ-মৃণালিনী হো’ক্
সুবর্ণ তুলির তব পুরস্কার! মদ্রজা’র কারে
যে পড়ে সে পড়ুক্ খাইয়া চোক॥” [পৃ ৬৪]

—স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এই উপহারের লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর বিবাহ উপলক্ষ করেই কাব্যটি উৎসর্গীকৃত হয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হয়েছিল ২৪ অগ্র° [9 Dec] তারিখে, সুতরাং সেই উপলক্ষে জ্যৈষ্ঠ মাসেই কাব্য রচনা ও ভারতী-তে প্রকাশ করা একটু অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। এই সমস্যার সমাধানের একটু ইঙ্গিত হয়তো পাওয়া যায় পরবর্তীকালে [১৩৪৫:1938] মংপুতে থাকার সময়ে রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা মৈত্রেয়ী দেবী [সেন]]-র সঙ্গে তাঁর কথোপকথনে : “জানো একবার আমার একটি বিদেশী অর্থাৎ অন্য province [? মাদ্রাজ]-এর মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছিল। সে এক পয়সাওয়ালা লোকের মেয়ে, জমিদার আর কি, বড় গোছের। সাত লক্ষ টাকার উত্তরাধিকারিণী সে। আমরা কয়েকজন গেলুম মেয়ে দেখতে, দুটি অল্পবয়সী মেয়ে এসে বসলেন—একটি নেহাৎ সাদাসিদে, জড়ভরতের মত এক কোণে ব’সে

রইল; আর একটি যেমন সুন্দরী, তেমনি চটপটে। চমৎকার তার স্মার্টনেস্। একটু জড়তা নেই, বিশুদ্ধ ইংরেজি উচ্চারণ। পিয়ানো বাজালে ভালো—তারপর music সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হ'ল। আমি ভাবলুম এর আর কথা কি? এখন পেলে হয়!—এমন সময় বাড়ির কর্তা ঘরে ঢুকলেন। বয়েস হয়েছে, কিন্তু সৌখীন লোক। ঢুকেই পরিচয় করিয়ে দিলেন মেয়েদের সঙ্গে—সুন্দরী মেয়েটিকে দেখিয়ে বল্লেন,—'Here is my wife' এবং জড়ভরতটিকে দেখিয়ে 'Here is my daughter'!... আমরা আর ক'রব কি, পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রে চুপ ক'রেই রইলুম।"[১০] সীতা দেবী তাঁর স্মৃতিচারণে এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন : 'এক মান্দ্রাজী জমিদার কিরকম তাঁহাকে কন্যাদান করিবার চেষ্টায় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, সে গল্প শুনিলাম। গল্প শেষ করিয়া বলিলেন, 'সে বিয়ে যদি করতুম তা হলে কি আর আজ কাছে দাঁড়াতে পারতে? সাত লাখ টাকা আয়ের জমিদারির মালিক হয়ে, কানে হীরের কুণ্ডল প'রে, মান্দ্রাজে বসে থাকতুম, তা না এখন two ends meet করাতে পারি নে, ব'সে ব'সে কবিতা লিখছি।'[*] এরূপ আন্তঃ-প্রাদেশিক সম্বন্ধ কার দ্বারা উত্থাপিত হয়েছিল, মহর্ষি এ-ধরনের সম্বন্ধ অনুমোদন করেছিলেন কি-না, পাত্রী-দেখা ইত্যাদি ব্যাপার কোন্ সময়ে সংঘটিত হয়েছিল—এ-সম্পর্কে কোনো তথ্য আমাদের জানা নেই, কিছু অনুমান করাও শক্ত। দ্বিজেন্দ্রনাথের কাব্যটি সম্ভবত এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। এই অ-সম বিবাহ-প্রস্তাব ভেঙে যাওয়ায় রক্ষণশীল দ্বিজেন্দ্রনাথের পক্ষে খুশি হওয়াই স্বাভাবিক, উৎসর্গ-কবিতাটিতে তার প্রমাণ রয়েছে—'রবি'র জন্য 'স্বর্ণ-মৃণালিনী' লাভের কামনাও কবিতাটিতে ব্যক্ত হয়েছে। সম্ভবত এরই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের পত্নীর 'ভবতারিণী' নাম বদলে 'মৃণালিনী' রাখা হয়েছিল।

এর পরেই হয়তো রবীন্দ্রনাথের জন্য পাত্রী সন্ধান করতে ঠাকুরবাড়ির বধূদের চিরাচরিত 'আকর' যশোহরের উদ্দেশে যাত্রা করা হয়েছিল। ইন্দিরা দেবী লিখেছেন, 'পূর্বপ্রথানুসারে রবিকাকার কনে খুঁজতেও তাঁর বউঠাকুরাণীরা, তার মানে মা আর নতুন কাকিমা, জ্যোতিকাকামশায় আর রবিকাকাকে সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যশোর যাত্রা করলেন। বলা বাহুল্য, আমরা দুই ভাইবোনেও সে-যাত্রায় বাদ পড়ি নি। যশোরে নরেন্দ্রপুর গ্রামে ছিল আমার মামার বাড়ি। সেখানেই আমরা সদলবলে আশ্রয় নিলুম।...যদিও এই বউ-পরিচয়ের দলে আমরা থাকতুম না, তা হলেও শুনেছি যে তাঁরা দক্ষিণডিহি চেঙ্গুটিয়া প্রভৃতি আশেপাশের গ্রামে যেখানেই একটু বিবাহযোগ্যা মেয়ের খোঁজ পেতেন সেখানেই সন্ধান করতে যেতেন। কিন্তু বোধ হয় তখন যশোরে সুন্দরী মেয়ের আকাল পড়েছিল, কারণ এত খোঁজ করেও বউঠাকুরানীরা মনের মতো কনে খুঁজে পেলেন না। আবার নিতান্ত বালিকা হলেও তো চলবে না। তাই অবশেষে তাঁরা জোড়াসাঁকোর কাছারির একজন কর্মচারী বেণী রায় মশায়ের অপেক্ষাকৃত বয়স্থা [? দশ বছরেরও কম] কন্যাকেই মনোনীত করলেন।'[১১] পাত্রী অনুসন্ধান-পর্বটি সংঘটিত হয়েছিল সম্ভবত জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি থেকে আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি [Jun 1883] কোনো সময়ের মধ্যে। কারণ এর পর থেকেই কাদম্বরী দেবীর একটি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতার সংবাদ আমরা ক্যাশবহি থেকে লাভ করি : 'শ্রীমতী নূতন বধূ ঠাকুরাণীর পিড়া হওয়ায় ডাক্তার ভগ্নচন্দ্র রুদ্র আসার ফি ৪৲' [২০ আষাঢ়], 'শ্রীমতী নূতন বধু ঠাকুরাণীর পিড়ার জন্য এলোপেথিক ঔষধ ক্রয়:৪ ল০ [৫ শ্রাবণ], নূতন বধূ ঠাকুরাণীর পিড়া হওয়ায় ভগবৎন্দ্র রুদ্র ডাক্তারের ফি শোধ ৪৲/উক্ত শ্রীমতী নূতন বধূ ঠাকুরাণীর গাত্রে মালিশ করিবার জন্য টার্পিন তের্ল৬/ ...পিড়ার জন্য এনজ ফ্রুট সল্ট ১শিশি...২'[২৩ ভাদ্র] ইত্যাদি—এই সব হিসাব

থেকে তাঁর অসুস্থতার প্রকৃতিটি বোঝা না গেলেও, এটুকু অনুমান করা যায় যে এই অসুস্থতার পূর্বেই তিনি কন্যা-সন্ধান পর্বটি সেরে এসেছিলেন; এর পর ৮ আশ্বিন [সোম 24 Sep] থেকে রবীন্দ্রনাথের বিবাহের আয়োজন পুরো মাত্রায় শুরু হয়ে গিয়েছিল।

অন্যান্যদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও যশোহরে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তিনি ভাবী বধূকে দেখে 'পছন্দ' করেছিলেন কিনা বলা শক্ত। আনা তড়খড় বা স্কট ভগ্নীদের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যলাভের পর ও বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে প্রগতিশীল মনোভাব পোষণ ক'রে রবীন্দ্রনাথ স্বেচ্ছায় একটি দশ বছরেরও কম প্রায় অশিক্ষিতা মেয়েকে ভাবী জীবনসঙ্গী মনোনীত করবেন একথা বিশ্বাস করা কঠিন। তিনি মৈত্রেয়ী দেবীকে বলেছিলেন, "আমার বিয়ের কোনো গল্প নেই। বৌঠানরা যখন বড় বেশি পীড়াপীড়ি শুরু করলেন, আমি বল্লুম 'তোমরা যা হয় কর, আমার কোনো মতামত নেই।' তাঁরাই যশোরে গিয়েছিলেন, আমি যাইনি।" যশোহরে অবশ্য তিনি গিয়েছিলেন, কিন্তু মতামত দিয়েছিলেন বউঠাকুরানীরা। সম্ভবত পিতার দিক থেকেও কিছু চাপ ছিল। হয়তো সেই কারণেই মহর্ষি ২২ ভাদ্র [শুক্র 7 Sep] তারিখের একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথকে মুসৌরীতে আহ্বান করেন।* এই পত্র পাওয়ার পর সম্ভবত ১ আশ্বিন [সোম 17 Sep] রবীন্দ্রনাথ মুসৌরী যাত্রা করেন; ওই দিনের হিসাবে দেখা যায় 'জায়/বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মসূরীতে কর্ত্তামহাশয়ের নিকট গমন করায় বিঃ ১ বৌচর-২০০৲'। রবীন্দ্রনাথ নিজের খরচে যে পোশাক প্রস্তুত করিয়েছিলেন, মহর্ষির নির্দেশে তাও তাঁকে দিয়ে দেওয়া হয় : 'দং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু মহাশয়ের কাপড় তৈয়ারি ৯৬৲ টাকার বিলের মধ্যে উক্ত বাবু মহাশয়ের নিজ তহবিল হইতে যে টাকা দিয়াছেন তাহা সরকারি তহবিল হইতে দেওয়া যায় বিঃ শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের ৯৬৲ টাকা দিবার আজ্ঞাপত্র মধ্য ৩০৲' [৩০ ভাদ্র]। হেমেন্দ্রনাথও এই সময়ে মুসৌরীতে পিতার কাছে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে সম্মত করা যে সম্ভব হয়েছিল, তার প্রমাণ তিনি মুসৌরীতে যাওয়ার কয়েক দিন পরেই ৮ আখিন ক্যাশবহি-তে 'রবীন্দ্রবাবুর বিবাহের হিসাব' লেখা শুরু হয় : 'বঃ মেঃ গ্লানডাস সার বতনট এণ্ড কো° দং ৬৯ রতি হিরা ২৫৲ হিঃ ১৭২৫ টাকার মধ্যে কমিশন বাদ ১ লও বাকী ১৭১২৲০ গাড়ি ভাড়া ১।/০/ ১৭১৩।লও'; ১৭ আশ্বিন সেরেস্তার কর্মচারী অভয়চরণ ঘোষ 'জশরে গমন জন্য' ২৫ টাকা গ্রহণ করেন।

রবীন্দ্রনাথ মুসৌরী যাত্রার সময়ে সম্ভবত ইন্দিরা দেবী ও সুরেন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। ইন্দিরা দেবী তাঁর অপ্রকাশিত স্মৃতিকথায় লিখেছেন : 'একবার সুরেন ও আমি তাঁর সঙ্গে মসূরী পাহাড়ে যাই। রাস্তায় ট্রেনে মনে আছে আমি যত এঁটো খাবার বাসন নাবার ঘরের কলতলায় ধুতে ২ গিয়েছি—মেয়েদের উপযুক্ত কাজ। সেখানে পাহাড়ের উপর বসে আছি, এমন সময় সুরেন হাত দিয়ে মাটি খুঁড়ছে কেন রবিকা তাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বল্লে—"যদি কেউ বলে আমি মুরগী নই!"—সবাই একটু ছিটস্থ—কি আর করা যাবে।'

রবীন্দ্রনাথ মুসৌরী থেকে আশ্বিনের মাঝামাঝি ফিরে আসেন, কারণ ১৮ আশ্বিনের হিসাবে দেখা যায় : 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বাবু মহাশয় মসুরীতে গমন আগমনের ব্যয় বিঃ এক বৌচর কৈঃ হা° আদায় ২০০৲'। এই দিনই তিনি কার্তিক মাসের মাসোহারা ১০০ টাকা অগ্রিম গ্রহণ করেন এবং কয়েকদিনের মধ্যেই কারোয়ারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সময়-নিরূপণটি যে যথার্থ, একটি অঘটনের জন্য সংবাদপত্রে তার প্রমাণ রক্ষিত হয়েছে। সাধারণী [২১।১, ২৬ কার্তিক 11 Nov পৃ ৭] লেখে : 'পূজার পূর্ব্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কয়েকজন পুত্র বোম্বাইয়ে গমন উদ্দেশে হাবড়ার ষ্টেসনে গমন করিয়া মেল গাড়ির একখানি গাড়ি রিজার্ভ করেন।

অন্যান্য দ্রব্যাদি ঐ গাড়িতেই তুলেন, সুতরাং তাহার আর ওজন করেন নাই। যখন তাঁহারা জব্বলপুর যান তখন দেখেন যে, তাঁহাদিগের একটি সিন্দুক পাওয়া যায় নাই। ঐ সিন্দুকের ভিতর দামী রেসমের বস্ত্র ও কিছু সোনার অলঙ্কার আন্দাজী ১,৫০০ টাকার ছিল। ঐ সিন্দুক যে কি প্রকারে গেল, তাহার কোন সংবাদ অদ্যাবধি পাওয়া গেল না।' এই বৎসর দুর্গাপূজা ২২ আশ্বিন [সোম 8 Oct] আরম্ভ হয়, সুতরাং তাঁদের যাত্রার সম্ভাব্য তারিখ ১৮-২১ আশ্বিনের মধ্যে তা স্বচ্ছন্দে বলা যায়।

কারোয়ার-প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে ভারতী-তে রবীন্দ্ররচনার প্রকাশ-সূচীটি আলোচনা করে নেওয়া যাক।

ভারতী, আষাঢ় ১২৯০ [৭।৩]:

১০৩-০৫ 'নিশীথ-চেতনা' দ্র ছবি ও গান ১।১৫৮-৬২

ছবি ও গান [Feb 1884]-এর 'বিজ্ঞাপন'-এ রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'এই গ্রন্থে প্রকাশিত ছোট ছোট কবিতাগুলি গত বৎসরে লিখিত হয়। কেবল শেষ তিনটি কবিতা পূর্ব্বেকার লেখা, এই নিমিত্ত তাহারা কিছু স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে।' এখানে গত বৎসর বলতে অবশ্যই 1883 বোঝানো হয়েছে, কারণ কয়েকটি কবিতা যে ১২৯০ বঙ্গাব্দেই রচিত এ-সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং যে-তিনটি কবিতার কথা বিজ্ঞাপন-এ বলা হয়েছে—'নিশীথ জগৎ', 'নিশীথ-চেতনা', ও 'অভিসার'—এগুলি 1883-এর পূর্ববর্তী সময়ের লেখা বলে সিদ্ধান্ত করতে হয়। 'অভিসার' ['মরণের তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান'] কবিতার প্রকাশ-কাল শ্রাবণ ১২৮৮। আমাদের ধারণা, অপর দুটি কবিতাও [হয়তো 'আর্ত্তস্বর' ও 'পোড়ো বাড়ি'ও] এই সময়ে লিখিত হয়েছিল—কবিতাগুলির মধ্যে সন্ধ্যাসংগীত-এর আবহ অনেক বেশি পরিমাণে অনুভূত হয়।

১১৩-১৮ 'গোঁফ এবং ডিম'

লঘুস্বাদের এই রচনাটিকে রবীন্দ্রজীবনী-কার ছাড়া আর কেউ রবীন্দ্র-রচনা বলে দাবি করেন নি। প্রবন্ধটির ভাষা ও অলস কল্পনার স্বচ্ছন্দ বিস্তারটি লক্ষ্য করলে এই দাবি স্বীকার করতেই হয়। অন্যান্য কয়েকটি প্রমাণও উদ্ধার করা যায়। 'তোমাদের কল্পনাশক্তি সামান্য, এই জন্যই ছোট কথাকে বড় করিয়া না বলিলে তোমাদের কানে পৌঁছায় না। বাজের শব্দ তোমরা শুনিতেই পাও না, কাজেই তোমাদের জন্য ইরম্মদের কড়্‌কড়্ করা আবশ্যক।' [পৃ ১১৩]—মেঘনাদবধ কাব্য-এর প্রতি এই তির্যক কটাক্ষ রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের রচনায় সুপ্রচুর, পাঠক পূর্বেই তার যথেষ্ট পরিচয় পেয়েছেন। দ্বিতীয়ত, 'ভারতবর্ষে যখন বৃহভাবের জন্ম হইত, তখন ঋষিদের বড় বড় গোঁফ ছিল। অবশেষে ভাবের জন্ম যখন বন্ধ হইল, কেবল মাত্র সঞ্চয়ের ও শ্রেণীবিভাগের পালা পড়িল, তখন গোঁফের আবশ্যকতা রহিল না। তখন সঞ্চিত ভাবের দলকে মাঝে মাঝে টিকি টানিয়া জাগাইয়া দিলেই যথেষ্ট হইত, তখন আর তা' দিয়া ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়োজন রহিল না। কিন্তু আর্য্যদের অবনতির আরম্ভ হইল কখন হইতে? না, যখন হইতে তাঁহারা গোঁফ কামাইয়া টিকি রাখিতে আরম্ভ করিলেন।' [পৃ ১১৬-১৭]—টিকি-মাহাত্ম্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে বহুবারই ব্যঙ্গ-মুখর হয়ে উঠেছেন, উদ্ধৃত অংশটি তাদের মধ্যে প্রথমতম এই হিসেবে এর একটি ঐতিহাসিক গুরুত্বও আছে।

[১৩০-৩৮ 'সমাজ সংস্কার ও কুসংস্কার।/ * বঙ্গ-মহিলা সভায় শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী কর্ত্তৃক পঠিত।' রবীন্দ্র-জীবনবৃত্তান্তে এই প্রবন্ধটির বিশেষ গুরুত্ব আছে এইজন্যে যে, এর সূত্রে যে বিতর্ক উপস্থিত হয় রবীন্দ্রনাথও তার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। ভাদ্র-সংখ্যার ২০৮-১৬ পৃষ্ঠায় 'শ্রীমতী—' -লিখিত যে

'প্রতিবাদ' প্রকাশিত হয়, 'শ্রীরঃ-' স্বাক্ষর রবীন্দ্রনাথ 'তৃতীয় পক্ষ' নামে তার প্রত্যুত্তর দেন আশ্বিন সংখ্যায়। তাছাড়া, আমাদের ধারণা, জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর প্রবন্ধটি আগাগোড়া রবীন্দ্রনাথের দ্বারা পুনর্লিখিত। '...আমরা যে সহসা আকাশ হইতে পড়ি নাই, আমাদের যে পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ আছে, অতীতের সহিত যোগ আছে, হঠাৎ ভূমিকম্পের সহিত, আগ্নেয় গিরির অগ্নি উৎপাতের সহিত একতাল কাদার মত উঠি নাই, হঠাৎ আগুন লাগিয়া হাউই বাজির মত সোঁ করিয়া আকাশে উঠিয়া পড়ি নাই, স্থিরদীপ্তি তারার ন্যায় অতীত কাল হইতে আমাদের ইতিহাস চলিয়া আসিতেছে, ইহা মনে করিয়া কি আমরা হৃদয়ে বল পাই না? আমি যদি সংস্কৃত ভাষায় বৈদিক মতে বিবাহ করি, তবে আমার মনে বিবাহের গাম্ভীর্য্য যতটা প্রতিভাত হইবে, পরিপাটি বাঙ্গালা ভাষায় কি ততটা হইবে? কখনই না।...ইহার কারণ কি? আর কিছু না, প্রাচীন ভাষার মধ্যে আমরা শত সহস্র বৎসরের কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাই, প্রাচীন প্রথায় আমরা শত সহস্র পূর্ব্ব-পুরুষের সম্মতি দেখিতে পাই, বিবাহ সভায় বসিয়া আমাদের মহর্ষি পিতামহদিগের আশীর্ব্বাদ অনুভব করি।' (পৃ ১৩৪-৩৫)—জ্ঞানদানন্দিনী দেবী লিখিত পূর্ববর্তী 'কিণ্টার গার্টেন' (ভারতী, চৈত্র ১২৮৮।৫৪৯-৫৯) বা পরবর্তী 'ব্যায়াম' (বালক, বৈশাখ ১২৯২।৩৩-৪১) প্রবন্ধের ভাষার সঙ্গে তুলনা করলে উপরের উদ্ধৃতির ভাষার পার্থক্য সহজেই বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথের গদ্যের অলংকৃত ভঙ্গিটিও এখানে দুর্লক্ষ্য নয়। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সঙ্গে তাঁর লোয়ার সার্কুলার রোডের ভাড়াবাড়িতে বাস করতেন, এই তথ্যটিও এক্ষেত্রে স্মরণীয়।]

[১৪২-৪৪ 'জিজ্ঞাসা ও উত্তর'। এই বিভাগে পূর্ববর্তী সংখ্যার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর ও নূতন কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে, মনে হয় এর সব-কটিই পাঠকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত। শ্রাবণ-সংখ্যায় সম্ভবত রবীন্দ্রনাথই প্রশ্নগুলির উত্তর দেন।]

ভারতী, শ্রাবণ ১২৯০ *[৭।৪]:*

১৪৫-৪৯ 'অনাবশ্যক' দ্র সমালোচনা অ-২।৫৭-৬১

১৫৪-৫৭ 'নিশীথ জগৎ' দ্র ছবি ও গান ১।১৫২-৫৮

১৭৯-৮৪ 'জিহ্বা আস্ফালন'

রচনাটি স্বাক্ষরবিহীন হলেও এটিকে অনেকেই রবীন্দ্রনাথের লেখা বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। বস্তুত, পূর্ববর্তী 'চেঁচিয়ে বলা' ও পরবর্তী 'ন্যাশনল ফণ্ড', 'টৌনহলের তামাশা' প্রভৃতি প্রবন্ধের সঙ্গে ভাষা ও বক্তব্যের সাদৃশ্য এটিকে রবীন্দ্র-রচনা বলে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। প্রবন্ধটি এখনও গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত বলে আমরা এটি থেকে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি : 'আমাদের সমাজে একদল পালোয়ান লোক আছেন, তাঁহারা লড়াই ছাড়া আর কোন কথা মুখে আনেন না। তাঁহাদের অস্ত্রের মধ্যে একখানি ভোঁতা জিহ্বা, ও একটি ইষ্টিল্ পেন্। তাঁহারা ম্লেচ্ছ অনার্য্যদের প্রতি অবিরত শব্দভেদী বাণ বর্ষণ করিতেছেন, ও পরমানন্দে মনে করিতেছেন তাহারা যে-যাহার বাসায় গিয়া মরিতেছে। [পৃ ১৭৯]...ইঁহারা চান্ বঙ্গসাহিত্য কেবলমাত্র দাঁত ও নখের চর্চ্চা করিতে থাকুক্ আর কিছু নয়। ক্ষমতাভেদে ও অবস্থাভেদে যে প্রত্যেকে স্ব স্ব উপযোগী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে ও এইরূপে সমাজের অন্তর্নিহিত বিচিত্র শক্তি চারিদিক হইতে বিকশিত হইয়া উঠিবে তাহা তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে। আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া এই শ্রেণীর কতক গুলি সঙ্কীর্ণদৃষ্টি সমালোচক কবিদিগকে কবিত্ব শিখাইয়া আসিতেছেন ও অবিরত বীররস ফরমাস করিতেছেন, [সঞ্জীবনী-তে প্রকাশিত

'সাধ' কবিতা ও প্রভাত সংগীত-এর সমালোচনা স্মর্তব্য]...তাহার কতকটা ফল ফলিয়াছে, বীররসটা ফ্যাসান্ হইয়া পড়িয়াছে। [পৃ ১৮০]...কৃত্রিমতা মাত্রেই মন্দ, তথাপি মতের কৃত্রিমতা সহ্য করা যায়, কিন্তু হৃদয়ের অনুভাবের কৃত্রিমতা একেবারে অসহ্য।...যে ভাব ও যে কথার অর্থ ভুলিয়া যাই, যাহারা আর হৃদয় হইতে উঠে না, কেবল মুখে মুখে বিরাজ করে, তাহারা মরিয়া যায় ও জীবন অভাবে ক্রমশই পচিয়া উঠিতে থাকে। দেশহিতৈষিতার বুলিগুলিরও সেই দশা ধরিবে। [পৃ ১৮১]...যাঁহারা বক্তৃতা দেন ও উদ্দীপক গদ্য পদ্য লেখেন তাঁহারা যেন একটা উদ্দেশ্য দেখাইয়া দেন, একটা কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দেন। আমাদের সমাজের পদে পদে এতশত প্রকার কর্ত্তব্য রহিয়াছে যে, কতকগুলা অস্পষ্ট বাঁধিবোল বলিয়া সময় ও উদ্যম নষ্ট করা উচিত হয় না।...গড়ের মাঠে, বা কেল্লার মধ্যেই কেবল বীরত্বের রঙ্গভূমি নাই, হয়ত গৃহের মধ্যে, অন্তঃপুরের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে তাহা অপেক্ষা বিস্তৃত রণস্থল রহিয়াছে। এত সামাজিক শত্রু চারিদিকে রহিয়াছে তাহাদিগকে কে নাশ করিবে! [পৃ ১৮৩]...আগে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে উদাহরণ সংগ্রহ কর, ভাবিতে আরম্ভ কর ও বলিতে শেখ, তাহা হইলে আর সকলে শুনিতে আরম্ভ করিবে। বেশী করিয়া বলিলে কিছুই হয় না, ভাল করিয়া বলিলে কি না হয়! আতিশয্যের দিকে যাইও না, কারণ যেখানেই যুক্তিহীন আতিশয্যপ্রিয় প্রজা, সেই খানেই স্বেচ্ছাচারী-প্রভুতন্ত্র শাসন প্রণালী।' [পৃ ১৮৪] এই প্রসঙ্গেই তিনি লেখেন, 'সুযোগ্য বক্তা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সে দিন বঙ্গবাসীকে moderation, অর্থাৎ মিতব্যবহার অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম।'

হাইকোর্টের জজ নরিস সাহেবের অভিযোগক্রমে আদালত অবমাননার দায়ে দু-মাস কারাদণ্ড ভোগ করে সুরেন্দ্রনাথ 4 Jul [বুধ ২১ আষাঢ়] মুক্তি লাভ করেন। এই বিচার ও কারাদণ্ড সেই সময়ে বাংলাদেশে ও সমগ্র ভারতে প্রচণ্ড উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। তাঁর মুক্তির দিন নিমতলার ফ্রী চার্চ কলেজে সুরেন্দ্রনাথকে যে সংবর্ধনা দেওয়া হয়, সেই সভায় ও পরে 17 Jul [মঙ্গল ২ শ্রাবণ] তারিখের বিরাট জনসভায় সুরেন্দ্রনাথ জনসাধারণকে ধৈর্য ও মিতব্যবহার অবলম্বনের উপদেশ দেন। এর পরে ফ্রী চার্চ কলেজের ছাত্রেরা ৪ শ্রাবণ [বৃহ 19 Jul] আর একটি সভার আয়োজন করে ও রবীন্দ্রনাথ সেখানে সংগীত পরিবেশন করেন। এ-বিষয়ে সঞ্জীবনী [১।১৫, ৬ শ্রাবণ 21 Jul, পৃ ৬০] লেখে : 'সুরেন্দ্র বাবুর অভ্যর্থনার জন্য গত বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে ফ্রিচার্চ ইনষ্টিটিউসনে ছাত্রসভার অধিবেশন হয়। বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কয়েকটি সঙ্গীত করেন এবং বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা দেন। ফ্রিচার্চের ছাত্রগণ জাতীয়-ধনভাণ্ডারে ৪৫ টাকা দান করেন।'

সুরেন্দ্রনাথের কারাবরণ ও রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া বিষয়ে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারাবরণ সম্বন্ধে তাঁহাকে একটি ছত্র কোথায়ও লিখিতে না দেখিয়া মনে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে যে এতবড় একটা ঘটনা তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ কেন করিল না। ...আমাদের মনে হয় তখন তিনি কারোয়ারে সত্যেন্দ্রনাথের কাছে ছিলেন, কলিকাতার ছাত্রজনতার উত্তেজনা তিনি দেখেন নাই, দেখিলে কবির স্পর্শচেতন মন নিশ্চয়ই সাড়া দিত।'[১২] কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে কলকাতাতেই ছিলেন এবং ছাত্রজনতার উত্তেজনা তাঁর না দেখারও কথা নয়, বিশেষত ঘরের মেয়ে ভাগিনেয়ী সরলা দেবীই যখন 'কালরঙের ফিতে আস্তিনে'[১৩] বেঁধে স্কুলে যেতে শুরু করেছিলেন। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়াও প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু তা বাংলা সংবাদপত্রগুলির মাত্রাহীন আতিশয্যের বিরুদ্ধে : 'সম্প্রতি নরিস্ সাহেব ও

জুরিস্‌ডিক্‌সন্‌ বিল্‌ প্রভৃতি লইয়া কোন কোন বাঙ্গালা কাগজ যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তাহা দেখিলেই আমাদের কথা সপ্রমাণ হইবে। তিরস্কার করিবার সময়, এমন কি, গালাগালি দিবার সময়েও ভদ্রলোক ভদ্রলোকই থাকে, কিন্তু বানরের মত মুখ ভেংচাইয়া দাঁত বাহির করিয়া রুচিহীন অভদ্রের মত অতিবড় শত্রুকেও অপমান করিতে চেষ্টা করিলে নিজেকেই অপমান করা হয়, তাহাতে বিপক্ষপক্ষের যত না মানহানি হয় ততোধিক আত্মগৌরবের লাঘব করা হয়। এরূপ ব্যবহারকে যাঁহারা নির্ভীকতা ও বীরত্ব মনে করেন তাঁহারা ভীরু, হীন, কারণ প্রকৃত বীরত্ব আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া চলে।'[১৪] যে-কোনো প্রকার রুচিহীনতাকে ধিক্কার জানাতে রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন কখনোই ক্লান্তি বোধ করেন নি।

[১৮৮-৯০ 'জিজ্ঞাসা ও উত্তর।' আষাঢ়-সংখ্যায় কয়েকটি ইংরেজি শব্দের পরিভাষা বিষয়ে ও কয়েকটি ব্যাকরণ-সংক্রান্ত প্রশ্ন করা হয়েছিল, বর্তমান সংখ্যায় সেই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া হয়েছে। উত্তরের ভাষা ও আলোচনা-প্রণালী দেখে এগুলি রবীন্দ্রনাথের রচনা বলে মনে হয়।]

১৯০-৯২ 'সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।/সিন্ধু-দূত' দ্র ছন্দ ২১।৩৭৯-৮১ ['বাংলাভাষার স্বাভাবিক ছন্দ']

'সিন্ধু-দূত' কবি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের রচিত তৃতীয় কাব্য [22 Jun 1883]। এঁরই বেনামী রচনা 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' কাব্যের সমালোচনা দিয়েই সমালোচক রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। বর্তমান গ্রন্থটির আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ প্রধানত ছন্দ নিয়েই আলোচনা করেছেন এবং সেই অংশটুকুই 'ছন্দ' গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংকলিত হয়েছে। এই আলোচনার শেষে তিনি লেখেন : আমাদের সমালোচ্য কবিতার বিষয়টি—"জাতীয় স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গীকৃত-প্রাণ জনৈক নির্ব্বাসিত ফরাসীস্‌ সাধারণতান্ত্রিক বীরবর কর্ত্তৃক স্বদেশ সমীপে সাগরদূত দ্বারা সংবাদ প্রেরণ।" এই গ্রন্থ সচরাচর-প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থ হইতে অনেক ভাল। তবে সত্য কথা বলিতে কি ইহাতে ভাষার অবিরাম প্রবাহ যেমন দেখিলাম কবিতার উচ্ছ্বাস তেমন দেখা গেল না।'[১৫]

ভারতী, ভাদ্র ১২৯০ [৭।৫]:

২৪০ 'কে?' ['আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে'] দ্র ছবি ও গান ১।১০৫-০৬

'রাগিণী মিশ্র কালাংড়া' সুর-নির্দেশ-সহ গানটি ভারতী-তে মুদ্রিত হয়। দ্র রবিচ্ছায়া। ৭৯-৮০ [বিবিধ ৯৭], মিশ্র কালাংড়া-একতালা; গীতবিতান ২।৩৪৭; স্বরবিতান ২০-তে সংকলিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপির সুর-তাল 'বেহাগ। আড়খেমটা'।

[২৩৬-৪০ 'জিজ্ঞাসা ও উত্তর।' এই বিভাগে প্রথম প্রশ্নটি—আদিশূরের সময়ে পাচজন কায়স্থের বাংলায় আসার কারণ কি—উত্তর দিয়েছেন কৈলাসচন্দ্র সিংহ। দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল 'জাতীয়তার লক্ষণ কি?' ২৩৭-৪০ পৃষ্ঠায় বিভিন্ন দিক দিয়ে প্রশ্নটি আলোচিত হয়েছে। স্বাক্ষর-বিহীন এই আলোচনার লেখক রবীন্দ্রনাথ কি না নিশ্চিত করে বলা শক্ত; তবে বিভাগটি তিনি পরিচালনা করতেন বলে এটি তাঁরই রচনা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। উল্লেখ্য যে, এই সংখ্যাটির পরেই বিভাগটি বন্ধ হয়ে যায়। পিতার কাছে মুসৌরী যাত্রা, কারোয়ার-ভ্রমণ ও বিবাহ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা রবীন্দ্রনাথের জীবনে পর পর ঘটতে থাকার ফলেই বিভাগই বন্ধ হয়েছিল, এমন অনুমান করা ভুল হবে না।]

এই মাসেই রবীন্দ্রনাথের একাদশ পুস্তক, তৃতীয় গদ্যগ্রন্থ ও প্রথম প্রবন্ধ-সংকলন 'বিবিধ প্রসঙ্গ' প্রকাশিত হয়; বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকানুযায়ী বইটির প্রকাশের তারিখ 11 Sep 1883 [মঙ্গল২৬ ভাদ্র], মুদ্রণসংখ্যা ১০০০, মূল্য ।॥০। আখ্যাপত্র [২]+ সূচিপত্র [ল০]+১৪৯ পৃষ্ঠার বইটির আখ্যাপত্র এইরূপ:

'বিবিধ প্রসঙ্গ।/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/প্রণীত।/কলিকাতা/আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে/শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা/মুদ্রিত ও প্রকাশিত।/ভাদ্র ১৮০৫ শক।'

এই গ্রন্থের অন্তর্গত ছোটো-বড়ো রচনাগুলি ভারতী পত্রিকায় শ্রাবণ ১২৮৮ থেকে বৈশাখ ১২৮৯ সংখ্যা [কার্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যা বাদে] পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। পৌষ সংখ্যা পর্যন্ত রচনাগুলির কোনো শিরোনাম ছিল না, নামগুলি গ্রন্থভুক্তির সময়ে দেওয়া হয়। পত্রিকায় প্রকাশের ধারাবাহিকতাও গ্রন্থে রক্ষিত হয় নি; তিনটি প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ ও একটির শেষাংশ গ্রন্থে বর্জিত হয়। 'সমাপন' নামে একটি প্রসঙ্গ [সূচিতে 'সমাপন ও উৎসর্গ'] পুস্তকাকারে প্রকাশের সময়েই রচিত, এটি পড়ে মনে হয় উৎসর্গের লক্ষ্য ছিলেন কাদম্বরী দেবী।

গ্রন্থটি স্বতন্ত্রভাবে আর কখনো পুনর্মুদ্রিত হয় নি। রবীন্দ্র-রচনাবলী-র অচলিত সংগ্রহ প্রথম খণ্ড [আশ্বিন ১৩৪৭]-তে বিবিধ প্রসঙ্গ অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্জিত রচনাগুলিও 'সংযোজনী' অংশে সংকলিত হয়েছে।

বইটির কোনো সমালোচনা আমাদের চোখে পড়ে নি, শুধু হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার ৪ Oct 1883 [Vol. XXX, No 41, p. 482] সংখ্যায় গ্রন্থটির প্রাপ্তিস্বীকার দেখা যায় : 'Bibidha Prosunga or Essays on various subjects in Bengali. By Rabeendranath Tagore.' **চন্দ্রনাথ বসু** তাঁর রিপোর্টে বইটি সম্পর্কে লিখেছেন: 'Written with great cleverness and in a distinctly original vein. Babu Rabindra Nath is not always sound, but his shrewdness, his ingenuity, his wit, his thoughts cast in a mould of playful fancy, his occasional flashes of genius, make him out as a unique and independent figure in Bengali literature. His style is also as unique as his matter and manner. It is a poetical and figurative style, with an element of quaint humour in it which seems traceable to a strong and somewhat queer individuality.'[১৬]

ভারতী, আশ্বিন ১২৯০ [৭।৬]:

২৪১-৪৬ 'তার্কিক' দ্র সমালোচনা অ-২।৬৩-৬৯

আমাদের ধারণা, 'বিবিধ প্রসঙ্গ' গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে বর্তমান প্রবন্ধটির একটি সম্পর্ক আছে। বস্তুত উক্ত গ্রন্থের 'সমাপন' রচনাটির সঙ্গে এই প্রবন্ধটির বক্তব্যের আন্তরিক যোগ দেখা যায়। 'সমাপন'-এ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'এই গ্রন্থে সেই অবিশ্রান্ত কার্য্যশীল পরিবর্ত্ত্যমান মনের কতকটা ছায়া পড়িয়াছে। কাজেই ইহাতে বিস্তর অসম্পূর্ণ মত, বিরোধী কথা, ক্ষণস্থায়ী ভাবের নিবেশ থাকিতেও পারে। জীবনের লক্ষণই এইরূপ। একেবারে স্থৈর্য্য, সমতা ও ছাঁচে-ঢালা ভাব মৃতের লক্ষণ'—আর 'তার্কিক'-এ লিখলেন : 'আমার তার্কিক বন্ধু এই বলিয়া আমার নিন্দা করেন যে, আমি এক সময়ে যাহা বলিয়াছি আর-এক সময়ে তাহার বিপরীত কথা বলি—সে কথাটা ঠিক।...আমরা যে বিরোধের মধ্যেই বাস করি।...এত বিরোধের মধ্যে থাকিয়াও যাহার কথার পরিবর্ত্তন হয় না, যাহার মত অবিরোধে থাকে, তাহার বুদ্ধিটা ত একটা কলের পুতুল, যত বার দম

দিবে তত বার একই নাচন নাচিবে'; সমাপন'-এ লিখেছিলেন : 'আমি কল্পনা করিতেছি, পাঠকদের মধ্যে এইরূপ আমার কতকগুলি অপরিচিত বন্ধু আছেন, আমার হৃদয়ের ইতিহাস পড়িতে তাঁহাদের ভাল লাগিতেও পারে। তাঁহারা আমার লেখা লইয়া অকারণ তর্কবিতর্ক অনর্থক সমালোচনা করিবেন না, তাঁহারা কেবল আমাকে চিনিবেন ও পড়িবেন।...নহিলে কেবলমাত্র শকুনি গৃধিনীদের দ্বারা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য নির্ম্মমতার অনাবৃত শ্মশানক্ষেত্রের মধ্যে নিজের হৃদয়খানা কে ফেলিয়া রাখিতে পারে?', 'তার্কিক'-এ লিখেছেন : 'তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি সাহিত্যে প্রতিকূল সমালোচনা কি ভাল? ভাল বইয়ের ভাল সমালোচনা ভাল, কুরুচিবিকাশক হানিজনক বইয়ের নিন্দা করাও দোষের নহে, কিন্তু লেখকের ক্ষমতার অভাবে বা বুদ্ধির দোষে অসম্পূর্ণ গ্রন্থগুলিকে কঠোর ভাবে সমালোচনা করিলে তাহাতে কি ভাল হয় বুঝিতে পারি না।' এই জন্যই মনে হয় 'তার্কিক' প্রবন্ধটির রচনাভঙ্গি যতই লঘু হোক, রচয়িতার মনোভবটি তত গুরুত্বহীন ছিল না।

২৬৯-৭৫ 'তৃতীয় পক্ষ/(সমাজ সংস্কার ও কুসংস্কার।)'

আষাঢ়-সংখ্যায় জ্ঞানদানন্দিনী দেবী-পঠিত 'সমাজ সংস্কার ও কুসংস্কার' নামক যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়, ভাদ্র-সংখ্যায় 'শ্রীমতী—' তার একটি 'প্রতিবাদ' লেখেন। বর্তমান প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'শ্রীরঃ—' স্বাক্ষরে উভয় পক্ষের যুক্তিতর্কগুলির সার-সংক্ষেপ ও বিচার করে নিরপেক্ষ 'তৃতীয় পক্ষ' হিসেবে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন : '...যতদূর দেখা গেল, তাহাতে দেবী জ্ঞানদানন্দিনীর অপ্রকৃতিস্থতার কোন লক্ষণ পাওয়া গেল না, তাঁহার লেখায় হৃদয় প্রকাশ পাইয়াছে, যুক্তিরও অভাব দেখিলাম না, এবং তাঁহার কথার প্রকৃত প্রতিবাদও দেখিলাম না, সুতরাং এখনও তাঁহারই মত প্রবল রহিল।' [পৃ ২৭৫] প্রথম প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের হস্তক্ষেপের সম্ভাবনার কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি, 'তৃতীয় পক্ষ'-এর লঘু বিচারপদ্ধতি ও সিদ্ধান্ত ঘোষণার প্রকৃতিটি দেখে সন্দেহ হয় 'প্রতিবাদ'কারিণী 'শ্রীমতী' শরৎকুমারী চৌধুরাণী নন তো, না-কি তাঁর বেনামীতে স্বয়ং অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী?

২৮৮ 'যোগী' দ্র ছবি ও গান ১।১২৩-২৪

ভারতী, কার্তিক ১২৯০ [৭।৭]:

২৮৯-৯৫ 'ন্যাশনল ফণ্ড'

সুরেন্দ্রনাথের কারামুক্তির পর 17 Jul [মঙ্গল ২ শ্রাবণ] কলকাতার অনাথনাথ দেবের বাজারে একটি বিরাট জনসভা হয়। এই সভার বিবরণে সোমপ্রকাশ [২৭।৩৬, ৮ শ্রাবণ। ৫৬৯-৭০] লেখে, 'প্রায় ৫।৬ হাজার লোক একত্র মিলিত হইয়া একটী সভা করিয়াছিলেন। সভাস্থলে এই প্রস্তাব হয়, ইংলণ্ডে ও ভারতে রাজনীতি সংক্রান্ত আন্দোলনার্থ ছয় লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহ করা আবশ্যক। এই প্রস্তাবটি সভার অঙ্গীকৃত ও অবধারিত হইয়াছে।...অনেকে টাকা নোট ঘড়ী ও ঘড়ীর চেন পর্য্যন্ত দিয়াছেন।' ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য ইংরেজেরা প্রায় দেড় লক্ষ টাকা চাঁদা তুলেছিল। তাদের সাফল্যে উৎসাহিত হয়েই এই ন্যাশনাল ফাণ্ডের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। রবীন্দ্রনাথ বর্তমান প্রবন্ধে কয়েকটি বিশেষ প্রশ্নে প্রস্তাবটির সমালোচনা ও কতকগুলি গঠনমূলক পরিকল্পনা পেশ করেন। উল্লেখযোগ্য যে, 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত' [প্রবাসী, অগ্র° ১৩৩৬।১৭১-৭৬; কালান্তর ২৪।৪৩৬-৪৪] প্রবন্ধে দীর্ঘকাল পরে তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শের যে বিশ্লেষণ তিনি করেছিলেন, তার সঙ্গে বর্তমান প্রবন্ধে ব্যক্ত মতামতের আশ্চর্য সাদৃশ্য—এমন-কি প্রকাশ-

ভঙ্গিতেও—লক্ষিত হয়। এই কারণে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটির পুনর্মুদ্রণ না হওয়া খুবই দুঃখজনক। এখানে তিনি সূচনাতেই লিখেছেন, 'ন্যাশনল্ বলিতে আমি ত এই বুঝি, সমস্ত নেশন [ভাদ্র সংখ্যায় 'জিজ্ঞাসা ও উত্তর' বিভাগে নেশন বা জাতির সংজ্ঞা-নিরূপণের প্রয়াসটি স্মরণীয়] যাহা করিতেছে, সমস্ত নেশনের ভিতর হইতে যাহা স্বতঃ উদ্ভিন্ন হইয়া বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে' [পৃ ২৮৯]। ন্যাশনাল ফাণ্ডের প্রধান উদ্দেশ্য political agitation-এর বিরোধিতা করে তিনি লিখলেন যে, এই ব্যাপারটাই ন্যাশনাল নয় ও 'যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষা অবহেলা করেন, বাঙ্গালা ভাষা জানেন না, ইংরেজী ভাষায় বাগ্মিতা প্রদর্শন করাই যাঁহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, তাঁহারাই ইহার প্রধান। গোড়াতে ইহার নামই হইয়াছে national fund, ইংরাজিতেই ইহার উদ্দেশ্য প্রচার হইয়াছে, আজ পর্য্যন্ত ইংরাজিতেই ইহার কাণ্ডকারখানা চলিতেছে। অথচ মুখে বলা হইতেছে, peopleরাই আমাদের সহায়, peopleদের জন্যই আমরা এতটা করিতেছি, peopleদের উপরেই আমাদের ভরসা। এ সব ভাণ করিবার দরকার কি? Peopleরা যে তোমাদের কথাই বুঝিতে পারে না। ইংরেজি ভাষায় তোমাদের তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিয়া সে বেচারিরা যে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকে!' [পৃ ২৯০] 'যে সকল দেশহিতৈষীদিগের Political agitation একমাত্র ব্যবসায় তাহাদের উপর আমার বড় শ্রদ্ধা নাই। আমাদের দেশে Political agitation করার নাম ভিক্ষাবৃত্তি করা।...ভিক্ষুক মানুষেরও মঙ্গল নাই, ভিক্ষুক জাতিরও মঙ্গল নাই, ক্রমশই তাহাকে হীন হইতে হয়।...ইংরাজদের কাছে ভিক্ষা করিয়া আমরা আর সব পাইতে পারি, কিন্তু আত্মনির্ভর পাইতে পারি না। আর, তাহাই যদি না পাই, তবে আসল জিনিষটাই পাইলাম না। কারণ, ভিক্ষার ফল অস্থায়ী, আত্ম নির্ভরের ফল স্থায়ী।' [পৃ ২৯১] 'ইহা বোধ করি কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, যথেষ্ট টাকা সংগ্রহ করিলে আমাদের দেশে এমন ঢের কাজ আছে যাহা আমরা নিজেই করিতে পারি, এবং যাহা-কিছু আমরা নিজে করিব তাহা সফল না হইলেও তাহার কিছু না কিছু শুভফল স্থায়ী হইয়া থাকিবে।...সত্য বটে পরাধীন জাতি নিজের সমস্ত হিত নিজে সাধন করিতে পারে না, কিন্তু যতখানি পারে ততখানি সাধন করাই তাহার প্রথম কর্ত্তব্য।' [পৃ ২৯২] 'যখন কেবল দুই চারিজন নয়, আমরা সমস্ত জাতি অধিকার বিশেষের জন্য প্রস্তুত হইব, তখন কি আমরা ভিক্ষা চাহিব, তখন আমরা দাবী করিব, গবর্ণমেণ্টকে দিতেই হইতে।...এইরূপ প্রস্তুত হইবার উপায় কি? তাহার এক উত্তর আছে বিদ্যাশিক্ষার প্রচার। আজ যে ভাবগুলি কেবল গুটি দুই তিন মাত্র লোক জানে, সেই ভাব সাধারণে যাহাতে প্রচার হয় তাহারই চেষ্টা করা, এমন করা, যাহাতে দেশের গাঁয়ে গাঁয়ে, পাড়ার পাড়ায়, নিদেন গুটীকতক করিয়া শিক্ষিত লোক পাওয়া যায়, এবং তাঁহাদের দ্বারা অশিক্ষিতদের মধ্যেও কতকটা শিক্ষার প্রভাব ব্যাপ্ত হয়। কেবল ইংরাজি লিখিলে কিংবা ইংরাজিতে বক্তৃতা দিলে ইটি হয় না! ইংরাজিতে যাহা শিখিয়াছ তাহা বাঙ্গালায় প্রকাশ কর, বাঙ্গালা সাহিত্য উন্নতি লাভ করুক ও অবশেষে বঙ্গ-বিদ্যালয়ে দেশ ছাইয়া সেই সমুদয় শিক্ষা বাঙ্গালায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ুক। ইংরাজিতে শিক্ষা কখনই দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইতে পারিবে না।...যথার্থ দেশোপকার ব্রত অতি গুরুতর ব্রত, সে কাজ অতি কঠিন কাজ—তাহাতে ছোট ছোট কাজে হাত দিতে হয়, ক্রমে ক্রমে কাজ করিতে হয়, প্রত্যহ সংবাদ পত্রের দৈনিক বাহবাই উদ্যমের একমাত্র জীবন ধারণের উপায় নহে।'* [পৃ ২৯৪] আমরা প্রবন্ধটি থেকে এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিগুলি দিলাম তার কারণ, রচনাটি পাঠকের কাছে সুলভ নয়। লক্ষণীয়, এখানে রবীন্দ্রনাথ যে বক্তব্য প্রকাশ করেছেন সেটি তাঁর রাজনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষা-সংক্রান্ত পরিণত চিন্তারও ভিত্তিরূপে

গণ্য হতে পারে। [জ্যৈষ্ঠ ১২৯১-সংখ্যা ভারতী-তে শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রবন্ধটির একটি দীর্ঘ প্রতিবাদ প্রকাশ করেন, দ্র পৃ ৫৪-৬১।]
৩২৬-২৭ 'মধুর স্মৃতি' দ্র ছবি ও গান ১।১২১-২২ [সুখের স্মৃতি']।

আমরা আগেই বলেছি, মুসৌরীতে পিতার সঙ্গে দেখা করার পর রবীন্দ্রনাথ আশ্বিনের মাঝামাঝি কলকাতায় ফিরে কয়েকদিনের মধ্যেই কারোয়ারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন, '১৮৮৩ সালের মার্চ মাসে [সত্যেন্দ্রনাথ] ফিরিয়া যাইবার পর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবী এবং রবীন্দ্রনাথ কারোয়ার যাত্রা করেন। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীও সন্তানদের গ্রীষ্মাবকাশের জন্য বিদ্যালয় বন্ধ হইয়া গেলে তাহাদের লইয়া চলিলেন।'[১৭] প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য : '১৮৮৩ সালের জুন মাসের শেষ দিকে কারোয়ার-অভিযাত্রীদল কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। জ্ঞানদানন্দিনীকে আসিতে হইল, সন্তানদের স্কুল গ্রীষ্মবকাশের পর খুলিয়াছে।'[১৮] তাঁর প্রমাণ-হীন এই সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে ড সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় 'পূর্ণিমায়' কবিতাটির রচনাকাল নির্ধারণের জন্য বিস্তৃত গবেষণা করেছেন।[১৯] কিন্তু ২২ অগ্রহায়ণ [শুক্র 7 Dec 1883] বক্সার থেকে রবীন্দ্রনাথকে লেখা মহর্ষির পত্র—'কারবার হইতে নির্ব্বিঘ্নে বাটিতে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে যে পত্র লিখিয়াছ, ইহাতে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম।'[২০] থেকে বোঝা যায় যে, তিনি এর কিছুদিন পূর্বে কারোয়ার থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। ইন্দিরা দেবীও লিখেছেন, 'রবিকা'র বয়স যখন বছর বাইশেক হবে, তখন তিনি আমাদের সঙ্গে বোম্বাইয়ের কারোয়ার বন্দরে ছিলেন। সেখানে থাকতেই বিয়ের জন্যে বাড়ি থেকে তাঁর ডাক পড়ে'।[২১] এ থেকেও বোঝা যায়, বিবাহের [২৪ অগ্র°] কিছুদিন পূর্বেই তিনি কারোয়ার থেকে ফিরে আসেন—এক্ষেত্রে 'জুন মাসের শেষ দিকে'-র কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'কিছুদিনের জন্য আমরা সদর স্ট্রীটের দল কারোয়ারে সমুদ্রতীরে আশ্রয় লইয়াছিলাম।'[২২] 'সদর স্ট্রীটের দল' বলতে প্রধানত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, কাদম্বরী দেবী ও রবীন্দ্রনাথকে বোঝায়; কিন্তু আমাদের ধারণা দলটি আরও বড়ো ছিল। ইন্দিরা দেবীর অপ্রকাশিত স্মৃতিকথায় দেখি : সে সময়ে অনেকেই আমাদের সঙ্গে কারোয়ারে ছিলেন—জ্যোতিকামশায়, রবিকা, বড়পিসিমা, স্বর্ণপিসিমা, জানকীপিসেমশায়, প্রতিভাদিদি।' স্বর্ণকুমারী দেবী নীলগিরি-যাত্রার বিবরণ-সংবলিত 'সমুদ্রে' [ভারতী, ভাদ্র ১৩০২] প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'এই আমার প্রথম সমুদ্রযাত্রা নহে। প্রায় ১২ বৎসর পূর্বে প্রথমে বম্বে হইতে তিন দিনের সমুদ্রপথে কারোয়ার যাই'—এই বর্ণনা সম্ভবত বর্তমান ভ্রমণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

কর্ণাটক রাজ্যের প্রধান সমুদ্র-বন্দর কারোয়ারের প্রাকৃতিক শোভা রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি লিখেছেন : 'এই ক্ষুদ্র শৈলমালাবেষ্টিত সমুদ্রের বন্দরটি এমন নিভৃত এমন প্রচ্ছন্ন যে, নগর এখানে নাগরীমূর্তি প্রকাশ করিতে পারে নাই। অর্ধচন্দ্রাকার বেলাভূমি অকূল নীলাম্বুরাশির অভিমুখে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া দিয়াছে—সে যেন অনন্তকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিবার একটি মূর্তিমতী ব্যাকুলতা।'[২৩] সত্যেন্দ্রনাথের বর্ণনায় স্থানটি সম্পর্কে আরও বেশি তথ্য পাওয়া যায় : 'আমি বোম্বায়ে যে যে স্থানে কর্ম্ম করিয়াছি, তন্মধ্যে কারওয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য হিসাবে সর্ব্বাগ্রগণ্য, ইহা সমুদ্র তীরবর্ত্তী একটি সুন্দর বন্দর, গিরি নদী উপবনে সুশোভিত। প্রশস্ত বালুতটের প্রান্তে বড় বড় ঝাউগাছের অরণ্য, এই অরণ্যের এক সীমায় কালানদী নামে

একটি ক্ষুদ্র নদী তাহার দুই গিরিবন্ধুর উপকূল রেখার মাঝখান দিয়া সমুদ্রে আসিয়া মিলিয়াছে। জজের বাঙ্গলা ব্রহ্মদেশ হইতে আনীত বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড দিয়া নির্ম্মিত। সমুদ্রতীরে তাহার ভিত্তিভূমি, এত কাছে যে বর্ষার সময় সমুদ্রের ঢেউ বাঙ্গলার সীমানায় আসিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে থাকে।।সমুদ্রে সাঁতার দিবার আরাম, এমন অন্য কোথাও ভোগ করা যায় না।।বাঙ্গালার ক্রোশভর দূরে গুঢেলী নামে একটি ছোট পাহাড় আছে, উপরে একটি ক্ষুদ্র কুটীর, সেখানে গিয়া আমাদের অনেক সময় বনভোজন হইত।...কালা নদীতে অনেক সময় আমরা নৌকা করিয়া বেড়াইতাম, তাহার পরপারে হাইদার আলির গিরিদুর্গ* একটি দেখিবার স্থান।'[২৪] একদিন শুক্লপক্ষের গোধূলিতে একটি ছোটো নৌকোয় রবীন্দ্রনাথেরাও সদলবলে এই দুর্গ দেখতে গিয়েছিলেন; এরপর উজানে নৌকো ভাসিয়া এক জায়গায় তীরে নেমে একটি চাষীর কুটীরের বেড়া দেওয়া পরিষ্কার নিকানো আঙিনার সামনে বসে রাত্রের আহার সমাপ্ত করে অনেক রাত্রে সমুদ্রের মোহানায় ফিরে আসেন। সেখানে নৌকো থেকে নেমে সকলে বালুতটের উপর দিয়ে বাড়ির দিকে চললেন। 'তখন নিশীথরাত্রি, সমুদ্র নিস্তরঙ্গ, ঝাউবনের নিয়তমর্মরিত চাঞ্চল্য একেবারে থামিয়া গিয়াছে, সুদূরবিস্তৃত বালুকারাশির প্রান্তে তরুশ্রেণীর ছায়াপুঞ্জ নিস্পন্দ, দিক্‌চক্রবালে নীলাভ শৈলমালা পাণ্ডুরনীল আকাশতলে নিমগ্ন। এই উদার শুভ্রতা এবং নিবিড় স্তব্ধতার মধ্য দিয়া আমরা কয়েকটি মানুষ কালো ছায়া ফেলিয়া নীরবে চলিতে লাগিলাম। বাড়িতে যখন পৌঁছিলাম তখন ঘুমের চেয়েও কোন্ গভীরতার মধ্যে আমার ঘুম ডুবিয়া গেল। সেই রাত্রেই যে-কবিতাটি লিখিয়াছিলাম তাহা সুদূর প্রবাসের সেই সমুদ্রতীরের একটি বিগত রজনীর সহিত বিজড়িত।'[২৫] কবিতাটি হচ্ছে —'পূর্ণিমায়', ভারতীর পৌষ-সংখ্যায় [৪০৭-০৮] প্রকাশিত ও পরে 'ছবি ও গান' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

কারোয়ারে অবস্থানকালেই 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' 'নাট্য কাব্য' রচিত হয়। এ-সম্বন্ধে জীবনস্মৃতি-র প্রথম পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'এই কারোয়ারে সমুদ্রতীরের বাংলায় "প্রকৃতির প্রতিশোধ" লিখিয়াছিলাম। এই কাব্যের নায়ক সন্যা[ন্ন্যা]সী সমস্ত মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রকৃতির উপরে জয়ী হইয়া অনন্তের মধ্যে আপনাকে বিশুদ্ধভাবে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিল। অবশেষে একটি বালিকা তাহাকে স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়া অনন্তের ধ্যান হইতে সংসারের মধ্যে ফিরাইয়া আনে। যখন ফিরিয়া আসিল তখন সে ইহাই দেখিল ক্ষুদ্রের মধ্যেই বৃহৎ, সীমার মধ্যেই অসীম, প্রেমের মধ্যেই মুক্তি।' জীবনস্মৃতি-র মুদ্রিত পাঠে গ্রন্থটির ভাববস্তু সম্পর্কে তিনি দীর্ঘ আলোচনা করেছেন, অন্যান্য উপলক্ষেও তিনি বহুবার ভাবটি ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন [দ্র রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী। ১১৬-২২]—কিন্তু এগুলি যে শুধু পরবর্তীকালের পরিণত চিন্তার প্রক্ষেপ মাত্র নয়, তার পরিচয় আছে সমসাময়িক কালে লিখিত আলোচনা গ্রন্থের অন্তর্গত কয়েকটি ক্ষুদ্র রচনায় যেখানে তিনি প্রকৃতির প্রতিশোধ থেকে কিছু-কিছু উদ্ধৃতি সহযোগে তত্ত্ব-ব্যাখ্যার প্রয়াস পেয়েছেন।

নাট্যকাব্যটি কারোয়ারে লেখা শুরু হলেও, সেখানেই এটি সম্পূর্ণ হয়েছিল এমন মনে করার কারণ নেই। রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন, 'কারোয়ার হইতে ফিরিবার সময় জাহাজে প্রকৃতির প্রতিশোধ-এর কয়েকটি গান লিখিয়াছিলাম। বড়ো একটি আনন্দের সঙ্গে প্রথম গানটি জাহাজের ডেকে বসিয়া সুর দিয়া-দিয়া গাহিতে-গাহিতে রচনা করিয়াছিলাম।'[২৬] গানটি হল মিশ্র ভৈরবী সুরে রচিত 'হেদে গো নন্দরানী,/আমাদের শ্যামকে

ছেড়ে দাও।' এইরকম আরও কয়েকটি গান ও প্রাসঙ্গিক সংলাপ পরবর্তী কালে রচিত হয়ে থাকতে পারে। উল্লেখযোগ্য যে, নাট্যকাব্যটি প্রকাশিত হয় ১২৯১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে।

কারোয়ার থেকে জাহাজে বোম্বাইতে এসে রেলপথে রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবী কলকাতায় ফিরে আসেন সম্ভবত কার্তিক মাসের শেষ দিকে। এইরূপ অনুমানের কারণ ২৭ কার্তিক [সোম 27 Nov] তারিখে 'রবীবাবুর বিবাহের হিসাব'-এ দেখা যায় 'শ্রীমতী নতুন বধূ ঠাকুরাণী কাপড় ও পাড় ক্রয়ের মূল্য ৭০' টাকা খরচ করেছেন, যা এই সময়ে তাঁর কলকাতায় উপস্থিতিকে সপ্রমাণ করে। সপরিবারে সত্যেন্দ্রনাথ ও সৌদামিনী দেবী কারোয়ারেই ছিলেন, ইন্দিরা দেবীর স্মৃতিকথায় তার উল্লেখ পাওয়া যায়;[২৭] কিন্তু স্বর্ণকুমারী দেবী প্রভৃতিরা রবীন্দ্রনাথদের সঙ্গে ফিরে আসেন কি না নিশ্চিত করে বলা শক্ত।

রবীন্দ্রনাথের বিবাহ উপলক্ষে প্রথম ব্যয়ের হিসাব পাওয়া যায় ৮ আশ্বিন [সোম 24 Sep] তারিখে, হিসাবটি আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি। এর পর ২ চৈত্র [শুক্র 14 Mar 1884] পর্যন্ত মোট ২২ দিন 'রবীবাবুর বিবাহের হিসাব' খাতে বিভিন্ন ব্যয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। শেষে ২৮ শ্রাবণ ১২৯১ [সোম 9 Aug 1884] তারিখে মোট ব্যয়ের হিসাব লেখা হয় : 'ব° কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায়/শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শুভবিবাহের ব্যয়/বিঃ এক হিসাব (১২৯০ সালের ২৪ অগ্রহায়ণ বিবাহ হয়) কৈঃ হা° আদায় ৩১৫৬ ৴৩/গুঃ খোদ নোট ও রোক ১২৬ল°/৩২৮৩৯৩'। মোট খরচ অবশ্য আরও বেশি, কিন্তু দু-দফায় ৯৮৯|° মূল্যে স্বর্ণালঙ্কার বিক্রয় করে ব্যয়ের অঙ্ক কমিয়ে আনা হয়েছে। এই স্বর্ণালঙ্কার সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের মাতৃধন, কিন্তু এগুলি বিক্রয় করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল কেন এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া দুরূহ।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'বিবাহে ঘটকালি করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথের মাতুল ব্রজেন্দ্রনাথ রায়ের পিসিমা আদ্যাসুন্দরী।'[২৮] তিনি আরও লিখেছেন : 'এই প্রস্তাব স্বীকৃত হইলে মহর্ষি দক্ষিণডিহির বাড়িতে নানাবিধ খেলনা, বসনভূষণাদি কর্মচারী সদানন্দ মজুমদারের সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন। সদানন্দ মহর্ষির কথানুসারে গ্রামে নানা মিষ্টান্ন প্রস্তুত করাইয়া কন্যার ও প্রতিবেশীদের বাড়িতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।' এই বিবরণের সঙ্গে ক্যাশবহি-র হিসাবের কিছু অসংগতি লক্ষিত হয়। কারণ ১৭ আশ্বিনের [3 Oct] হিসাবে দেখা যায় যে, ঐ দিন 'অভয়চরণ ঘোষ জশরে গমন জন্য' ২৫ টাকা এবং প্রিয়নাথ সেন [প্রিয়নাথ সেনগুপ্ত, সেরেস্তার একজন কর্মচারী] ২৭ কার্তিক [12 Nov] 'জশর লইয়া যান ২৫০্ ও ২৩ অগ্রহায়ণ [8 Dec] তাঁর 'জশহর যাওয়ার ব্যয় মধ্যে ২১্' গ্রহণ করেন; কিন্তু সদানন্দ মজুমদারের যশোহর যাতায়াতের কোনো সংবাদ ক্যাশবহি থেকে পাওয়া যায় না।

'নিমন্ত্রণের পত্র লেখা চিটীর কাগজ' ক্রয় ও 'নিমন্ত্রণের পত্রের মাশুল'-এর [একটি পত্র রবীন্দ্রনাথের বাল্য ও কৈশোরের বন্ধু বৃদ্ধ কিশোরীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে প্রেরিত হয়েছিল] হিসাব দেখে মনে হয় বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র ছাপা হয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথ সেন, প্রভৃতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন স্বহস্ত-লিখিত একটি বিচিত্র বয়ানের পত্রে :

'প্রিয়বাবু—/আগামী রবিবার ২৪শে অগ্রহায়ণ তারিখে শুভদিনে শুভলগ্নে আমার পরমাত্মীয় শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভবিবাহ হইবেক। আপনি তদুপলক্ষে বৈকালে উক্ত দিবসে ৬নং যোড়াসাঁকোস্থ

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবনে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহাদি সন্দর্শন করিয়া আমাকে এবং আত্মীয়বর্গকে বাধিত করিবেন। ইতি।/অনুগত/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'[২৯]

—চিঠির কাগজের শীর্ষে এম্‌বস্‌-করা সচিত্র 'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়' ছত্রটির পাশে তিনি মন্তব্য লিখেছেন—'আমার motto নহে।'

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখেছেন যে, তিনিও প্রায় একই বয়ানের একটি পত্র পেয়েছিলেন : 'He sent me a characteristic invitation in which he wrote that his intimate relative Rabindranath Tagore was to be married—"আমার পরম আত্মীয় শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভবিবাহ হইবে।"'[৩০]

আমরা আগেই বিভিন্ন উপলক্ষে দেখেছি যে, মহর্ষির পরিবারে বিভিন্ন ধরনের হিন্দু-আচার প্রতিপালিত হত। সুতরাং সেই ভাবেই রবীন্দ্রনাথের বিবাহেও গায়ে-হলুদ, আইবুড়োভাত প্রভৃতি স্ত্রী-আচারের আয়োজন হয়েছিল। এই আইবুড়ো-ভাতের একটি বর্ণনা দিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ : 'গায়ে হলুদ হয়ে গেল। আইবুড়োভাত হবে। তখনকার দিনে ও বাড়ির কোনো ছেলের গায়ে হলুদ হয়ে গেলেই এ বাড়িতে তাকে নেমন্তন্ন করে প্রথম আইবুড়োভাত খাওয়ানো হত।...মা গায়ে হলুদের পরে রবিকাকাকে আইবুড়োভাতের নেমন্তন্ন করলেন। মা খুব খুশি, একে যশোরের মেয়ে, তায় রথীর মা মার সম্পর্কের বোন। খুব ধূমধামে খাওয়ার ব্যবস্থা হল। রবিকাকা খেতে বসেছেন উপরে, আমার বড়োপিসিমা কাদম্বিনী দেবীর ঘরে, সামনে আইবুড়োভাত সাজানো হয়েছে—বিরাট আয়োজন। পিসিমারা রবিকাকাকে ঘিরে বসেছেন, এ আমাদের নিজের চোখে দেখা। রবিকাকা দৌড়দার শাল গায়ে, লাল কী সবুজ রঙের মনে নেই, তবে খুব জমকালো রঙচঙের। বুঝে দেখো, একে রবিকাকা, তায় ওই সাজ, দেখাচ্ছে যেন দিল্লির বাদশা! তখনই ওঁর কবি বলে খ্যাতি, পিসিমারা জিজ্ঞেস করছেন, কী রে, বউকে দেখেছিস, পছন্দ হয়েছে? কেমন হবে বউ ইত্যাদি সব। রবিকাকা ঘাড় হেঁট করে বসে একটু করে খাবার মুখে দিচ্ছেন, আর লজ্জায় মুখে কথাটি নেই।'[৩১]

রবীন্দ্রনাথের বিবাহের একটি বিশেষত্ব এই যে, তিনি প্রথামতে বিয়ে করতে কন্যাপক্ষের বাড়িতে যান নি, তাঁর বিয়ে হয়েছিল জোড়াসাঁকোয় মহর্ষি-ভবনে। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতির বিবাহ যশোহরে হয়েছিল, কিন্তু সেইসব ক্ষেত্রে কন্যাপক্ষ কলকাতায় এসে বাড়ি ভাড়া করেছিলেন এবং সেই বাড়িতেই বিবাহের অনুষ্ঠান হয়। রবীন্দ্রনাথের শ্বশুর বেণীমাধব রায়চৌধুরীও আত্মীয়স্বজন-সহ এইরূপ একটি ভাড়াবাড়িতে ওঠেন; ক্যাশবহি-তে এ-বাবদ দুটি হিসাব দেখা যায় : 'বেণীমাধব রায়ের পাথেয় রাহা খরচ ৬০' এবং 'বেণীমাধব রায়ের থাকিবার বাটীর ভাড়ার মধ্যে টেক্স দেওয়া যায় গুঃ অভয়চরণ ঘোষ ২২৲৩।' কিন্তু এ-সত্ত্বেও সেখানে বিবাহ হয় নি সম্ভবত সামাজিক মর্যাদার বৈষম্যের জন্য।

রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হয় অত্যন্ত সাদাসিধে ভাবে। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখেছেন, 'The marriage took place in Rabindranath's own house and was a very quiet affair, only a few friends being present.'[৩২] হেমলতা দেবী [দ্বিপেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, এই সময়ে কুমারী] এই বিবাহের একটি বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন : 'ঘরের ছেলে নিতান্ত সাধারণ ঘরোয়া-ভাবে রবীন্দ্রনাথের বিয়ে হয়েছিল। ধূমধামের সম্পর্ক ছিল না তার মধ্যে। পারিবারিক বেনারসী শাল ছিল একখানি—যার যখন বিয়ে হত সেইখানি ছিল বরসজ্জার উপকরণ। নিজেরই বাড়িতে পশ্চিমের বারান্দা ঘুরে রবীন্দ্রনাথ বিয়ে করতে এলেন অন্দরমহলে—স্ত্রী-

আচারের সরঞ্জাম যেখানে সাজানো। বরসজ্জার শালখানি গায়ে জড়ানো[*১] রবীন্দ্রনাথ এসে দাঁড়ালেন পিঁড়ির উপর। নূতন কাকিমার আত্মীয়া যাঁকে সবাই ডাকতেন 'বড়ো গাঙ্গুলীর স্ত্রী' [? শিরোমণি দেবী, জগন্মোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী] বলে—রবীন্দ্রনাথকে বরণ করলেন তিনি। তাঁর পরনে ছিল একখানি কালোরঙের বেনারসীর ডুরে।

'...কনে এনে সাত পাক ঘুরানো হল—শেষে বরকনে দালানে চললেন সম্প্রদান-স্থলে। বাড়ির অবিবাহিত বড়ো মেয়েগুলি সঙ্গে সঙ্গে চলল। আমিও জুটে গেলুম তাদের সঙ্গে। দালানের একধারে বসবার জায়গা ছিল আমাদের। দেখলুম সেখানে বসে স্বচক্ষে কাকিমার সম্প্রদান।

'সম্প্রদানের পর বরকনে এসে বাসরে বসলেন। রবীন্দ্রনাথের বউ এলে তার থাকবার জন্যে একটি ঘর নির্দিষ্ট করা ছিল আগে থেকেই। বাসর বসল সেই ঘরেই। বাসরে বসেই রবীন্দ্রনাথ দুষ্টুমি আরম্ভ করলেন। ভাঁড়কুলো খেলা আরম্ভ হল, ভাঁড়ের চালগুলি ঢালা-ভরাই হল ভাঁড়কুলো খেলা। রবীন্দ্রনাথ ভাঁড় খেলার বদলে ভাঁড়গুলো উপুড় করে দিতে লাগলেন ধরে ধরে। তাঁর ছোটো কাকিমা ত্রিপুরাসুন্দরী বলে উঠলেন, ও কি করিস রবি? এই বুঝি তোর ভাঁড় খেলা? ভাঁড়গুলো সব উল্টে পাল্টে দিচ্ছিস কেন?...রবীন্দ্রনাথ বললেন, জানো না কাকিমা—সব যে উলট পালট হয়ে যাচ্ছে—কাজেই আমি ভাঁড়গুলো উল্টে দিচ্ছি।

'...তাঁর কাকিমা আবার বললেন, তুই একটা গান কর। তোর বাসরে আর কে গাইবে—তুই এমন গাইয়ে থাকতে?...

'বাসরে গান জুড়ে দিলেন—

আ মরি লাবণ্যময়ী

কে ও স্থির সৌদামিনী—...[*২]

'দুষ্টুমি করে গাইতে লাগলেন কাকিমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। বেচারী কাকিমা রবীন্দ্রনাথের কাণ্ড দেখে জড়োসড়ো। ওড়নায় মুখ ঢেকে মাথা হেঁট করে বসে আছেন। আরও একটা গান তখন গেয়েছিলেন—সেটা আমার স্মরণ নেই।'[৩৩]

২৮ অগ্র° 'দ° সম্ভুনাথ গড়গড়ির পাথেয় বাবদ দেওয়া ২॥' ও ২২ পৌষ 'নিজ রোজ হেরম্বনাথ তর্করত্নের দক্ষিণা দেওয়া যায়...৮্' হিসাব দুটি রবীন্দ্রনাথের বিবাহের হিসাবের অঙ্গীভূত হওয়ায় মনে হয় হেরম্বনাথ তর্করত্ন [এঁর কাছেই কি রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে মুগ্ধবোধ পাঠ করেছিলেন?] পৌরোহিত্য এবং শম্ভুনাথ গড়গড়ি উপাসনার কার্য করেছিলেন। বিবাহের সংবাদটি সাধারণী [২১।৬, ২ পৌষ 18 Dec, পৃ ৬৯] পত্রিকায় প্রকাশিত হয় : "গত রবিবার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভবিবাহ অতি সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিবাহটী যে ব্রাহ্মমতে সাধন হইয়াছে বলা বাহুল্য। পাত্রীটিকে নাকি যশোহর হইতে আনা হইয়াছে।' তত্ত্ববোধিনী-র চৈত্র সংখ্যায় [পৃ ২৩৮] অগ্র°, পৌষ ও মাঘ মাসের 'আয়-ব্যয়'-এর হিসাবে দেখা যায় : 'আনুষ্ঠানিক দান।/শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০৲ '—এই দান অবশ্যই বিবাহ উপলক্ষে।

রবীন্দ্রনাথের বিবাহের রাত্রেই শিলাইদহে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভগ্নীপতি সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের আকস্মিকভাবে মৃত্যু হয়। খবরটি জোড়াসাঁকোয় এসে পৌঁছয় পরদিন। সমস্ত আনন্দানুষ্ঠান শোকের ছায়ায়

ম্লান হয়ে পড়ে। সৌদামিনী দেবী তখন কারোয়ারে। ইন্দিরা দেবী এ-সম্পর্কে লিখেছেন, 'এই দুঃখের সংবাদ জ্যোতিকাকা তারযোগে বড়ো পিসিমাকে কারোয়ারে পাঠান। তখন তিনিও আমাদের সঙ্গে সেখানে ছিলেন। অবশ্য প্রকৃত ঘটনার স্পষ্ট উল্লেখ না করে কেবল সংকটাপন্ন অবস্থার কথা জানিয়েছিলেন। সেই শুনে বড়োপিসিমাকে সঙ্গে নিয়ে মা আর আমরা কলকাতায় ফিরে এলাম। এখনো মনে পড়ে জোড়াসাঁকোর দেউড়িতে নেমে বড়োপিসিমা জ্যোতিকাকামশায় প্রভৃতির নীরব মুখের দিকে দু-একবার চেয়ে কিরকম করে সোজা তেতলার ঘরে উঠে গিয়ে একটি বিছানায় মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।'[৩৪] ক্যাশবহি-তে এই বিবরণের সমর্থন পাওয়া যায় ৫ পৌষ [বুধ 19 Dec] তারিখের হিসাবে : 'সারদা বাবু মহাশয়ের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া স্মেলিং সল্ট এক শিশি ক্রয়... ০', হয়তো এই দিনই সৌদামিনী দেবী-সহ অন্যান্যেরা কারোয়ার থেকে কলকাতায় এসে পৌঁছন। অন্তত 'শ্রীযুক্ত মেজবাবু মহাশয় ও শ্রীমতী মেজ বধূ ঠাকুরাণী ও বিবি প্রভৃতি বাটীতে আসায় আহারাদির ব্যয় ৬ না° ১৫ পৌষ পর্যন্ত শোধ'—এই হিসাব থেকে বোঝা যায় সত্যেন্দ্রনাথ সপরিবারে এই সময় জোড়াসাঁকোয় ছিলেন। এর পর স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে লোয়ার সার্কুলার রোডের ভাড়াবাড়িতে রেখে তিনি কারোয়ারে ফিরে যান। উল্লেখযোগ্য যে কয়েকদিন পরেই তিনি শোলাপুরে বদলি হয়ে 18 Jan 1884 [শুক্র ৫ মাঘ] থেকে শোলাপুর-বিজাপুরের সেশন্‌স্ জজ হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেন।[৩৫]

মহর্ষি কার্তিকের শেষে বা অগ্রহায়ণের গোড়ায় [Nov 1883] মুসৌরী ত্যাগ করে রেলপথে কাশী আসেন। ৭ অগ্র° কাশীতে, ১২ অগ্র° গাজিপুরে ও ১৪ অগ্র° বক্সারে তাঁর কাছে পত্র প্রেরণ করতে দেখা যায়। এই বক্সার থেকেই ২২ অগ্র° [শুক্র 7 Dec] তিনি রবীন্দ্রনাথকে লেখেন, '...এইক্ষণে তুমি জমীদারির কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য প্রস্তুত হও; প্রথমে সদর কাছারিতে নিয়মিত রূপে বসিয়া সদর আমিনের নিকট হইতে জমাওয়াশিল বাকী ও জমাখরচ দেখিতে থাক এবং প্রতিদিনের আমদানি রপ্তানি পত্র সকল দেখিয়া তার সারমর্ম্ম নোট করিয়া রাখ। প্রতিসপ্তাহে আমাকে তাহার রিপোর্ট দিলে উপযুক্তমতে তোমাকে আমি উপদেশ দিব এবং তোমার কার্য্যে তৎপরতা ও বিচক্ষণতা আমার প্রতীতি হইলে আমি তোমাকে মফঃস্বলে থাকিয়া কার্য্য করিবার ভার অর্পণ করিব। না জানিয়া শুনিয়া এবং কার্য্যের গতি বিশেষ অবগত না হইয়া কেবল মফঃস্বলে বসিয়া থাকিলে কিছুই উপকার হইবে না।'[৩৬] শেষ বাক্যটি পড়ে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ মফঃস্বলে থেকে জমিদারির দায়িত্ব পালন করার প্রার্থনা পিতার কাছে জানিয়েছিলেন।

এর পর বাঁকিপুরে থাকার সময়ে তাঁর কাছে জামাতা সারদাপ্রসাদের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছয়। অজিতকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন যে, মহর্ষি পুনরায় মুসৌরী যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন।[৩৭] কিন্তু এই সংবাদ পেয়ে তিনি সেই সংকল্প ত্যাগ করেন। ২৯ অগ্রহায়ণ তিনি গাজিপুরে ও ১০ পৌষ বোলপুরে ছিলেন, ক্যাশবহি-তে তার প্রমাণ আছে। সম্ভবত পৌষ মাসের প্রথম সপ্তাহে [Dec 1883] তিনি শান্তিনিকেতনে যান, এইটিই তাঁর শেষ শান্তিনিকেতন-বাস। এরপর ১২ পৌষ [বুধ 26 Dec] তিনি জোড়াসাঁকোয় আসেন ও ১৭ পৌষ পর্যন্ত সেখানে থাকেন।* নববিবাহিত দম্পতিকে তিনি ৪টি মোহর দিয়ে আশীর্বাদ করেন ['শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের নিকট কোম্পানীর মোহর ৪ থান (জোত্তুক দিবার জন্য) দেওয়া যায় তাহার মূল্য শোধ...৭৩ ল০']। এছাড়াও তিনি কলকাতায় অবস্থানকালে ১৪ পৌষ [শুক্র 28 Dec] সাধারণ

ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ে আচার্যের কার্য করেন যা তাঁর সাম্প্রদায়িক উদারতার প্রমাণ। এর পর তিনি কিছুদিন গঙ্গাবক্ষে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে চুঁচুড়ায় গঙ্গার তীরে একটি ভাড়া বাড়িতে বাস করতে থাকেন।

বিবাহের পর রবীন্দ্রনাথের পত্নীর নাম 'ভবতারিণী' পরিবর্তন করে 'মৃণালিনী' রাখা হয়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'মনে হয় এই মৃণালিনী নাম রবীন্দ্রনাথেরই দেওয়া, তাঁহার অতিপ্রিয় 'নলিনী' নামেরই প্রতিশব্দ।'[৩৮] আমাদের ধারণা, 'যৌতুক কি কৌতুক' কাব্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ 'অনিন্দিতা স্বর্ণ-মৃণালিনী হোক্' বলে যে আশীর্বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, তারই সূত্রে এই নাম-পরিবর্তন।

মৃণালিনী দেবী বিয়ের পর পৌষ মাসটি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে কাটান। কিন্তু মাঘ মাসের শুরুতেই তিনি জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর কাছে লোয়ার সার্কুলার রোডের বাড়িতে চলে যান, মাঝে মাঝে জোড়াসাঁকোয় এসেছেন, কিন্তু স্থায়ীভাবে বসবাসের সূত্রপাত হয়েছে আরও পরে। ক্যাশবহি-র হিসাব থেকেই সংবাদটি জানা যায়; ২২ পৌষের হিসাব : 'শ্রীমতী ছোট বধূ ঠাকুরাণীর দুগ্ধ লুচি ফলকরা ক্রয় ইস্তক ২৭ অগ্রহায়ণ না° ২০ পৌষ শোধ...১০৷৴°', ৯ মাঘের হিসাব : 'শ্রীমতী ছোট বধূ ঠাকুরাণীর দুগ্ধ জলপান ইত্যাদি ক্রয় ২১ না° ২৮ পৌষের এক বৌচর ২ ল৯', অপরপক্ষে ৪ ফাল্গুনের হিসাবে লিখিত হয়েছে : 'শ্রীমতী মেজ বধূ ঠাকুরাণী প্রভৃতি চৌরঙ্গীর বাটী হইতে এ বাটীতে আসিয়া মধ্যে ২ আহার করায় ১৬ মাঘ পর্য্যন্ত শোধ ৩ বৌচর ১॥ ল৩'—এইরূপ হিসাব পরেও দেখা যায়। সুতরাং খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় যে লিখেছেন, 'বিবাহের পর নব বধূকে বিদ্যাশিক্ষা ও গার্হস্থ্য শিক্ষা দানের ভার লন হেমেন্দ্রনাথের স্ত্রী শ্রীমতী নীপময়ী দেবী'[৩৯] এই তথ্যটি সম্ভবত বর্তমান সময়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

মৃণালিনী দেবীর বাল্যশিক্ষা সম্বন্ধে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'দক্ষিণডিহি গ্রামে এমন কি গ্রামের চতুর্দিকে ক্রোশের মধ্যেও উচ্চশিক্ষার বিদ্যালয় ছিল না। গ্রামে একটি প্রাইমারী পাঠশালা ছিল, এই পাঠশালায় মৃণালিনীর বিদ্যাশিক্ষার সূত্রপাত হয়। প্রথম বর্গ পর্যন্ত অবাধে পড়াশোনা চলিয়াছিল। কিন্তু সমাজে নিন্দার ভয়ে সুদূর পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া পরীক্ষা দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠে নাই; কাজেই বাঙলা লেখাপড়ার সাধ ইচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে এইখানেই মিটাইতে হইয়াছিল।'[৪০] সুতরাং ঠাকুরপরিবারের বধূর উপযুক্ত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে মহর্ষি ৭ ফাল্গুন [সোম 18 Feb] চুঁচুড়া থেকে একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথকে লেখেন, 'ইংরাজি শিক্ষার জন্য ছোটবৌকে লারেটো হৌসে পাঠাইয়া দিবে। ক্লাসে অন্যান্য ছাত্রীদিগের সহিত একত্র না পড়িয়া তাহার স্বতন্ত্র শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত উত্তম হইয়াছে। তাহার স্কুলে যাইবার কাপড় ও স্কুলের মাসিক বেতন ১৫ টাকা সরকারী হইতে খরচ পড়িবে।'[৪১] পত্রের দ্বিতীয় বাক্যটি থেকে অনুমান হয়, এই নির্দেশপ্রাপ্তির পূর্বেই লোরেটো হাউসে তাঁর শিক্ষার জন্য বিশেষ আয়োজন করা হয়েছিল, সম্ভবত জ্ঞানদানন্দিনী দেবীরই আগ্রহাতিশয্যে। রবীন্দ্রনাথ ৪ ফাল্গুন [15 Feb] পিতাকে যে পত্র লেখেন [পত্রটি পাওয়া যায় নি, ক্যাশবহি-তে উল্লেখ পাওয়া যায়], তাতেই হয়তো সংবাদটি দেওয়া হয়েছিল। ক্যাশবহি-তে ২৩ ফালুন এ-সম্পর্কে একটি হিসাব পাওয়া যায় : 'দ° ১৯ ফাল্গুন ১ মার্চ্চ খরচ—৮৷ল° ব° লরেটো হাউস স্কুল দ° শ্রীযুক্ত রবীবাবু মহাশয়ের স্ত্রীর জন্য পুস্তক স্লেট কাগজ আদি ক্রয় ল°/১৮৮৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রাইভেট টিউসনের ফি ৭॥°বিঃ এক বিল শোধ ৮৷ল° গুঃ সত্যবাবু'। হিসাবটির মধ্যে 'ফেব্রুয়ারী মাসের প্রাইভেট টিউসনের ফি ৭॥° ' কথাটি লক্ষণীয়, এ থেকে বোঝা যায় ফেব্রুয়ারী

মাসের মাঝামাঝি সময়ে অন্যান্য ছাত্রীদের থেকে স্বতন্ত্রভাবে মৃণালিনী দেবী লরেটো হাউসে শিক্ষাগ্রহণ শুরু করেন। মহর্ষির অন্য নির্দেশটিও প্রতিপালনের সংবাদ পাওয়া যায় ১২ চৈত্র তারিখের হিসাবে : 'ব° বাবু সত্য প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় দ° শ্রীযুক্ত রবীবাবু মহাশয়ের স্ত্রীর স্কুলে পরিচ্ছদ আদি তৈয়ারীর জন্য কাপড় ক্রয়ের মূল্য শোধ বিঃ ৯ চৈত্রের এক বৌচর...৪২্'। '১৮ বৈশাখের [১২৯১] খরচ'-এ দেখা যায় : 'ব° লোরেট হাউস স্কুল দং শ্রীযুক্ত রবীবাবু মহাশয়ের স্ত্রীর উক্ত স্কুলে শিক্ষার ব্যয় বোর্ড ও টিউসনী ব্যয় ১৮৮৪ সালের এপ্রেল মাসের ১৫্ /মিউজিক শিক্ষার ব্যয় ৮্ /২৩্ '—সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সংগীতবিদ্যাতে তাঁকে পারদর্শিনী করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে, হিসাবটি তারই প্রমাণ। এই শিক্ষা অন্তত Dec 1885 [পৌষ ১২৯২] পর্যন্ত চালু ছিল, ক্যাশবহি-তে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। এরপর সন্তান-সম্ভবা হয়ে পড়ার পর হয়তো তাঁর বিদ্যালয়-শিক্ষার অবসান ঘটে।

বিবাহের পর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বালিকা বধূর সম্পর্কটি কি রকম দাঁড়িয়েছিল, অনুমান করা শক্ত। প্রিয় ভাইঝি ইন্দিরার সমবয়সী এই বালিকাকে তাঁর পূর্ণযৌবনের আকাঙ্ক্ষায় জড়িত করে নেওয়া সম্ভব ছিল বলে মনে হয় না। হয়তো এই অবস্থাটিকেই পরবর্তীকালে তিনি সকৌতুকে চিত্রিত করেছিলেন 'নববঙ্গদম্পতির প্রেমালাপ' কবিতায় [গাজিপুর, ২৩ আষাঢ় ১২৮৮, দ্র মানসী ২।২৪২-৪৫]। প্রিয়নাথ সেনকে লেখা একটি তারিখ-হীন পত্রে এই প্রসঙ্গের আভাস আছে : 'Honeymoon কি কোনোকালে একেবারে শেষ হবার কোনো সম্ভাবনা আছে—তবে কি না moon-এর হ্রাস বৃদ্ধি পূর্ণিমা অমাবস্যা আছে বটে। অতএব আপনি Honeymoon-এর কোনো খাতির না রেখে হঠাৎ এসে উপস্থিত হবেন।'[৪২] আর-একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন হেমলতা দেবী : 'কাকিমার বিবাহের তিনমাস পরে আর-একটি ঘটনা না বলে পারছি না। ন পিসিমার প্রথমা কন্যা হিরণ্ময়ীর বিবাহ। গায়ে হলুদে দুপুরে আমরা নিমন্ত্রণে গিয়েছি। মধ্যাহ্নভোজনে বসতে প্রায় একটা বেজে গেল। খেয়ে উঠতে দুটো। সেই সময়ে কলকাতা মিউজিয়মে প্রদর্শনী খুলেছে নূতন। সেই প্রথম কলকাতায় প্রদর্শনীর প্রচলন। তিনটের সময় প্রদর্শনীতে যাবার জন্যে সকলে প্রস্তুত; আমরাও বাড়ি ফেরবার মুখে। মেজো কাকিমার সঙ্গে কাকিমাও যাবেন প্রদর্শনীতে। বাসন্তী রঙের জমিতে লাল ফিতের উপর জরির কাজ করা পাড় বসানো শাড়ি পরেছেন কাকিমা। বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। সেই রোগা কাকিমা দিব্যি দোহারা হয়ে উঠেছেন তখন। রবীন্দ্রনাথ কোথা থেকে এসে জুটলেন সেই সময় সেখানে হাতে একটা প্লেটে কয়েকটা মিষ্টি নিয়ে খেতে খেতে। কাকিমাকে সুসজ্জিত বেশে দেখে দুষ্টুমি করে গান জুড়ে দিলেন তাকে অপ্রস্তুত করবার জন্যে—

> হৃদয়কাননে ফুল ফোটাও
> আধো নয়নে সখি চাও চাও।

এমন চড়া সুরে ধরেছেন যে জোর পৌঁছে যায় সবার কানে—

> ধীরি ধীরি প্রাণে আমার এসো হে
> মধুর হাসিয়ে ভালোবেসে হে।...'[৪৩]

—এখানে যে প্রদর্শনীর কথা বলা হয়েছে, সেটি হল 1883-84-এর বিখ্যাত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী, কলকাতা মিউজিয়ম ও সংলগ্ন ময়দানে 4 Dec 1883 [মঙ্গল ১৯ অগ্র°] তারিখে লর্ড রিপন এর উদ্বোধন করেন। প্রদর্শনী শেষ হয় 10 Mar 1884 [সোম ২৮ ফাল্গুন] তারিখে। এর আগের দিনটি [২৭ ফাল্গুন রবি 9 Mar] একান্ত ভাবে দেশীয় মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, সুতরাং উপরে বর্ণিত ঘটনাটি হয়তো এই তারিখেই ঘটেছিল। এখানে যে গানটি উদ্ধৃত হয়েছে, সেটি হিরণ্ময়ী দেবীর বিবাহোপলক্ষে অভিনীত 'বিবাহ-উৎসব' গীতিনাট্যের অন্তর্গত, সম্ভবত কিছুকাল পূর্বেই রচিত হয়।

অগ্রহায়ণ, মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যা ভারতী-তে রবীন্দ্রনাথের কোনো রচনা প্রকাশিত হয় নি, কেবল পৌষ-সংখ্যায় [৭।৯] তাঁর দুটি রচনা মুদ্রিত হয় :

৪০৭-০৮ 'পূর্ণিমায়' দ্র ছবি ও গান ১১৪৮-৪৯

কবিতাটি কারোয়ারে রচিত, এটির সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

৪১৮-২১ 'টৌনহলের তামাশা'

রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটি আর পুনর্মুদ্রিত হয় নি। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার জমিদার-রায়তের মধ্যে সম্বন্ধ এবং খাজনাপত্র আদায়বিষয়ক বিধিবিধানের বহুকাল কোনো সংস্কার হয় নাই। স্যার রিভার্স টম্‌সন ছোটলাট হইয়া [1882-87] এই বিষয়ে মনোযোগী হন [বস্তুত তাঁর পূর্বে স্যার অ্যাসলি ইডেনের শাসনকালেই Rent Bill উত্থাপিত হয়]।...জমিদারগণ প্রজার ন্যায্য দাবী মানিতে অনিচ্ছুক। এই লইয়া দীর্ঘকাল বাদানুবাদ চলে। সেই অবস্থায় ১৮৮৩ সালের ১৯ ডিসেম্বর টৌনহলে বাংলাদেশের জমিদারদের এক সভা হয়। ইতিপূর্বে আইনের খসড়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিবার জন্য যে সিলেক্ট কমিটি বসে তাহাতে দশজন সদস্য ছিলেন সবাই ইংরেজ—দুইজন ভারতীয়—উত্তরপাড়ার প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ও দ্বারভাঙ্গার মহারাজা। টৌনহলের সভায় জমিদাররা সমবেত হইয়া যে সভা করেন রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ তাহারই ব্যঙ্গ সমালোচনা।'[৪৪] প্রভাতকুমার Rent Bill বা খাজনা আইনের যে ঐতিহাসিক বিবরণ দিয়েছেন তা মোটামুটি যথার্থ হলেও, প্রবন্ধটির অব্যবহিত উপলক্ষটি নির্ধারণ করতে সক্ষম হন নি [এ-বিষয়ে জাতীয় গ্রন্থাগার তাঁর কাছে ভুল তথ্য প্রেরণ করেছিল]। 19 Dec 1883 বা ১৫ পৌষ শনিবার যে সভা হয়েছিল, তার সমালোচনা পৌষ-সংখ্যা ভারতী-তে মুদ্রিত হওয়া সম্ভব ছিল না [ভারতী সাধারণত বাংলা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হত।] তাছাড়া ঐ তারিখে টাউন হলে যে সভা হয়েছিল তা ছিল বাঙালি ভূম্যধিকারীদের সভা, দ্বিজেন্দ্রনাথও সেখানে উপস্থিত ছিলেন—জমিদারির উপস্বত্বভোগী পরিবারের সন্তান হিসেবে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই সভাকে ব্যঙ্গ করা সম্ভব ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তিনি টাউন হলে অনুষ্ঠিত যে সভাকে 'তামাশা' বলে অভিহিত করেছেন, সেটি হয়েছিল 17 Nov 1883 [শনি ২ অগ্র°] তারিখে। এই সভার বিবরণ দিয়ে হিন্দু পেট্রিয়ট [Vol. XXX, No. 46, Nov 19, pp. 547-48] লেখে : 'A grand meeting of the Central Committee of the Landholders of Bengal and Behar was held at the Town Hall on Saturday last at 3-30 p.m. Although, strictly speaking, it was a meeting of the Committee, still it was open to those interested in the land question and to sympathisers, and the attendance was unexpectedly large. There were present about six

hundred picked gentleman, representing the landed property of the country, and the flower of native society....

The meeting was a great success. By far the most interesting feature of the meeting was the union of Europeans and Natives. Both went hand in hand in denouncing the confiscatory policy of the Government, the inequitableness of its proceedings, and its utter disregard of honesty and justice in connection with the matter. It remains to be seen what effect will this united protest of Europeans and Natives have upon Her Majesty's Government both here and in England.' প্রতিবেদনের 'union of Europeans and Natives', 'both went hand in hand' প্রভৃতি মন্তব্যই রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গপ্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করেছিল। কিছুদিন আগে জুরিসডিকশন বিল [ইলবার্ট বিল নামে সুপরিচিত] নিয়ে য়ুরোপীয় ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা দেশীয়দের বিরুদ্ধে যে কটূক্তির ঝড় বইয়ে দিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি এই ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে পঠনীয়। এইজন্যই তিনি লিখেছেন, 'সেদিন টাউনহালে একটা মস্ত তামাশা হইয়া গিয়াছে। দুই চারিজন ইংরাজে মিলিয়া আশ্বাসের ডুগ্‌ডুগি বাজাইতেছিলেন ও দেশের কতকগুলি বড়লোক বড় বড় পাগ্‌ড়ি পরিয়া নাচন আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন।...যাঁহারা উইল্‌সনের সার্কস্‌ দেখিতে গিয়াছেন তাঁহারা সকলেই দেখিয়াছেন ইংরাজ ঘোড়া নাচাইয়াছে এবং অরণ্যের বড় বড় প্রাণীদের পোষ মানাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা যে বাঙ্গালার গোটাকতক জমিদার ধরিয়া আনিয়া এত সহজে বশ করিতে পারিবেন এ কে জানিত? / বশ করা কিছু আশ্চর্য্য নয়, কিন্তু ইহার কিছু পূর্ব্বেই যে লাথি ঝাঁটা বই আর কিছু খোরাকি জোটে নাই, সেগুলি যে এত শীঘ্র হজম করিয়া ফেলিয়া দানার লোভে তোমরা উহাদের কাছে ঘেঁসিয়া যাইতেছ এইটেই আশ্চর্য্য!'[৪৫] রবীন্দ্রজীবনীকারের মতে, 'বলা বাহুল্য কবির এ-মনোভাব কখনো স্থায়ী হইতে পারে না; মনের উত্তেজিত অবস্থায় ইহা লিখিত[৪৬]—কিন্তু তা যে ঠিক নয় রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী বক্তব্য তারই প্রমাণ। কার্যোদ্ধারের উদ্দেশ্যেই য়ুরোপীয়দের সঙ্গে সাময়িক আপসের যুক্তিকে ধিক্কার দিয়ে জমিদারদের সম্বোধন করে তিনি লিখেছেন, '...তোমরাই যদি এমন কাজ করিতে পার, তবে ভারতবর্ষ এতকাল তাহার নিজের ক্ষীরটুকু সরটুকু খাওয়াইয়া তোমাদিগকে পোষণ করিল কেন?...তোমরা যে জন্মাবধি এতকাল এত অবসর পাইয়া আসিয়াছ, একটা মহৎ sentiment চর্চ্চা করিতেও কি পারিলে না? তবে আর কুলীন্‌ ধনী পরিবারদিগকে দেশ কেন পোষণ করিতেছে? তাহারা না খাটিবে, না তাহাদের অবকাশের সদ্ব্যবহার করিবে! দেশের সমস্ত স্বাস্থ্য শোষণ করিয়া মস্ত মস্ত জম্‌কালো বিস্কো[স্ফো]টকের মত শোভা পাওয়াই কি তাহাদের একমাত্র কাজ! আমাদের বিশ্বাস ছিল, কুল-ক্রমাগত সচ্ছল সম্ভ্রান্ত অবস্থা উদারতা ও মহত্ব[ত্ত্ব] সঞ্চয়ের সাহায্য করে—এরূপ কুলীনেরা সামান্য হীন সুবিধার খাতির অগ্রাহ্য করে ও মানের কাছে প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করে—দেশের সম্ভ্রম তাহারাই রাখে; আর তাই যদি না হয়, একটু মাত্র কাল্পনিক সুবিধার আশা পাইলেই অম্‌নি তাহারা যদি নীচত্ব করিতে প্রস্তুত হয়, নিজের অপমান ও দেশের অপমানকে গুলি পাকাইয়া অম্লানবদনে গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিতে পারে তবে তাহারা যত শীঘ্র সরিয়া পড়ে ততই দেশের মঙ্গল।'[৪৭] জমিদারি-প্রথার অনৌচিত্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা দানা বাঁধতে শুরু করেছিল অনেক পরে, কিন্তু

বর্তমান সময়ে এই সুবিধাভোগী শ্রেণীর কাছে তাঁর প্রত্যাশা কী ছিল, উপরের উদ্ধৃতিতে তা যথেষ্ট স্পষ্ট আকারেই প্রকাশ পেয়েছে।

আদি-ব্রাহ্মসমাজের চতুঃপঞ্চাশ সাংবৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ১১ মাঘ [বৃহ 24 Jan 1884] তারিখে। এই অনুষ্ঠানের জন্য রবীন্দ্রনাথ মোট ন'টি ব্রহ্মসংগীত রচনা করেন—এ পর্যন্ত সর্বাধিক। আদি-ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে প্রাতঃকালীন উপাসনায় তাঁর রচিত নিম্নলিখিত গানগুলি গীত হয় :

[১] 'শুভ্র আসনে বিরাজ অরুণ ছটা মাঝে' দ্র গীতবিতান ৯।১৭৮; তত্ত্ব°, ফাল্গুন ১৮০৫ শক। ২০১, ভৈরব-আড়া চৌতাল; রবিচ্ছায়া। ১১৮ [ব্রহ্ম ২১]; মূল গান: সঙ্গীতমঞ্জরী-ধৃত মানদাস-রচিত 'রুদ্রদেব ত্রিনয়ন অরুণ জটাজুট'; স্বরবিতান ৫

[২] 'সংসারেতে চারিধার করিয়াছে অন্ধকার' দ্র গীতবিতান ৩।৮৩২-৩৩; তত্ত্ব°, ঐ। ২০২, আলাইয়া-আড়াঠেকা; রবিচ্ছায়া। ১১৯ [ব্রহ্ম ২২]; স্বরবিতান ৮

[৩] 'কি দিব তোমায়! নয়নেতে অশ্রুধার' দ্র গীতবিতান ৩।৮৩৩; তত্ত্ব°, ঐ। ২০৮-০৯, আসোয়ারি-আড়াঠেকা; রবিচ্ছায়া। ১১৯ [ব্রহ্ম ২৩]; স্বরবিতান ৪৫, 'মিশ্র আসাবরী। ত্রিতাল।'

[৪] 'কে রে ওই ডাকিছে' দ্র গীতবিতান ১।১৮২; তত্ত্ব°, ঐ। ২০৯, আলাইয়া-ধামাল; রবিচ্ছায়া। ১২০ [ব্রহ্ম ২৪]; মূল গান : সঙ্গীতমঞ্জরী-ধৃত অদারঙ্গ-রচিত 'ডঙ্ক বাজত মোহন সব সাজত নাচত'; স্বরবিতান ২৫

[৫] 'সকলেরে কাছে ডাকি' দ্র গীতবিতান ৩।৯৪৯; তত্ত্ব. ঐ। ২০৯, ভৈরব-ঝাঁপতাল; রবিচ্ছায়া। ১২০-২১ [ব্রহ্ম ২৫]; স্বরবিতান ৪৫

[৬] 'তোমারেই প্রাণের আশা কহিব' দ্র গীতবিতান ৩।৮৩৩; তত্ত্ব°, ঐ ২০৯, ভজন-তাল ছেপ্‌কা; রবিচ্ছায়া। ১২১-২২ [ব্রহ্ম ২৬]; স্বরবিতান ৪৫, 'মিশ্র। কাহারবা'

নিম্নলিখিত গানগুলি মহর্ষি-ভবনে সায়ংকালীন উপাসনায় গীত হয় :

[৭] 'হাতে লয়ে দীপ অগণন' দ্র গীতবিতান ৩।৮৩৩-৩৪ তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২১২ ও চৈত্র। ২২৯, মিশ্র-ঝাঁপতাল; রবিচ্ছায়া। ১১৪-১৫ [ব্রহ্ম ১৬]; স্বরবিতান ৩৫। তত্ত্ববোধিনী-র ফাল্গুন-সংখ্যায় গানটির প্রথম আটটি ছত্র ['...জ্যোৎস্নাসুধা বিতরিব স্বামি' পর্যন্ত] মাত্র মুদ্রিত হয়। সেইজন্য মহর্ষি চুঁচুড়া থেকে ৭ ফাল্গুনের পত্রে রবীন্দ্রনাথকে লেখেন, '...তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে অনেক ভুল হয়—[হেমচন্দ্র] বিদ্যারত্নকে এ বিষয়ে সাবধান করিয়া দিবে। "হাতে লয়ে দীপ অগণন" আবার চৈত্র মাসের পত্রিকাতে তাহা ছাপাইয়া তাহার অসম্পূর্ণতা দোষ পরিহার করিবে।'[৪৮] এই নির্দেশানুযায়ী চৈত্র-সংখ্যায় সম্পূর্ণ গানটি 'পূর্ব্বপত্রিকায় ভ্রমক্রমে এই গীতটি সম্পূর্ণ আকারে প্রকাশ করা হয় নাই এজন্য পুনর্মুদ্রিত করিতে হইল' মন্তব্য-সহ মুদ্রিত হয়।

[৮] 'অনিমেষ আঁখি সেই কে দেখেছে' দ্র গীতবিতান ১।২০১; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২১২, দেশ-আড়াঠেকা; রবিচ্ছায়া। ১২২-২৩ [ব্রহ্ম ২৭]; স্বরবিতান ২৫

[৯] 'সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে' দ্র গীতবিতান ৩।৮৩৪; তত্ত্ব°, ঐ। ২১৩, কর্ণাটি ভজন-একতালা; রবিচ্ছায়া। ১২৩-২৪ [ব্রহ্ম ২৮]; মূল গান : 'চারি বর্ষ পুর্যন্ত আজু পাসুন' [কানাড়ী, ইন্দিরা দেবী-সংগৃহীত]; স্বরবিতান ৮। কারোয়ারে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান সম্পর্কে ইন্দিরা দেবী তাঁর অপ্রকাশিত স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'রবিকা কি করতেন ঠিক মনে নেই; কিন্তু এক মাদ্রাজী নর্ত্তকীর দল যখন কানাড়ী গান গাইতে এসেছিল,

তখন “বড়ো আশা করে”, “আজি শুভদিনে” “সকাতরে ওই” সম্ভবতঃ ওখানেই ভেঙ্গে থাকবেন।’—১২৮৯ বঙ্গাব্দের মাঘোৎসবে গীত প্রথম দুটি গান সম্পর্কে এই উক্তি সঠিক না হলেও শেষোক্ত গানটির সুর সম্ভবত কারোয়ারে অবস্থান-কালেই সংগৃহীত। এই গানটির সম্পর্কে সরলা দেবী তাঁর স্মৃতিচারণ করেছেন, ‘তখন আমার বয়স বার বৎসর। হঠাৎ সেই জন্মদিনের [9 Sep 1884 মঙ্গল ২৫ ভাদ্র ১২৯১] সকালে রবিমামা এলেন কাশিয়াবাগানে হাতে একখানি য়ুরোপীয় music লেখার manuscript খাতা নিয়ে। তার উপর সুন্দর করে বড় বড় অক্ষরে লেখা—“‘Socatare’—Composed by Sarola।”/‘সকাতরে ঐ কাঁদিছে সকলে’ বলে রবিমামার একটি ব্রহ্মসঙ্গীতকে আমি রীতিমত একটি বাজনার pieceএ পরিণত করেছিলুম। পুরোদস্তুর ইংরেজী piece, পিয়ানোতে বা ব্যাণ্ডে বাজাবার মত।—না জানলে কেউ চিনতে পারবে না এর ভিতরটা দিশী গান, জানলে—তারা উদারা মুদারা তিনটে গ্রামে ছড়ান কর্ডের বহুস্বরের বৈচিত্র্যের ভিতর থেকে আসল সুরটির উঁকিঝুঁকি ধরে ফেলে বিস্ময়ামোদিত হবে।/ ইংরেজী বিধানে সপ্তাঙ্গে সম্পূর্ণ সেই বাজনাখানি আমার মাথায় স্তরে স্তরে লেখা ছিল। কাউকে শোনাতে গেলেই সবটা মনের থেকে হাতে বেরিয়ে এসে বাজত। রবিমামা খাতাখানি দিয়ে বল্লেন—“এইতে লিখে রাখ, ভুলে যাবি।”’[৪৯] দুর্ভাগ্যবশত খাতাটি সংরক্ষিত হয় নি। কিন্তু ‘স্বরমিলন’ নামে গানটির একটি স্বরলিপি ভারতী, আষাঢ় ১৩০১ [১৮৪-৮৬] সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে এইরূপ প্রচেষ্টা আরও হয়েছে, এইটি তার প্রথমতম—এখানেই এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ষষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ ছবি ও গান-এর মুদ্রণকার্যে ব্যস্ত। প্রিয়নাথ সেনকে একটি তারিখ-হীন [সম্ভবত পৌষ মাসে লেখা] পত্রে লিখেছেন, ‘...নগেন্দ্রবাবু একদিন আহ্বান করেছিলেন, গিয়েছিলেম। তাঁকে আমার কাব্যখানাও শুনিয়েছিলুম। সেটা ছাপাখানায় পাঠিয়ে দিয়েছি, এক ফর্মা ছাপাও হয়ে গেছে।’[৫০]

বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা অনুযায়ী গ্রন্থটি প্রকাশের তারিখ 23 Feb 1884 [শনি ১২ ফাল্গুন], মুদ্রণ-সংখ্যা ১০০০। গ্রন্থটির আখ্যাপত্র :

‘ছবি ও গান/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ প্রণীত।/ কলিকাতা / আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে / শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা / মুদ্রিত ও প্রকাশিত / ফাল্গুন ১৮০৫ শক।/ মূল্য ১ এক টাকা।’

পৃষ্ঠাসংখ্যা : আখ্যাপত্র [২] + উৎসর্গ [২] + বিজ্ঞাপন [২] + সূচীপত্র [০...ল০] + ১০৪।

কাব্যটি সম্ভবত কাদম্বরী দেবীকে ‘উৎসর্গ’ করে লেখা হয়েছে :

‘গত বৎসরকার বসন্তের ফুল লইয়া এ বৎসরকার বসন্তে মালা গাঁথিলাম।/ যাঁহার নয়নকিরণে প্রতিদিন প্রভাতে এই ফুলগুলি একটি একটি করিয়া ফুটিয়া উঠিত,/ তাঁহারি চরণে ইহাদিগকে উৎসর্গ করিলাম।’

‘বিজ্ঞাপন’-এ রবীন্দ্রনাথ লেখেন, ‘এই গ্রন্থে প্রকাশিত ছোট ছোট কবিতাগুলি গত বৎসরে লিখিত হয়। কেবল শেষ তিনটি কবিতা পূর্ব্বেকার লেখা, এই নিমিত্ত তাহারা কিছু স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে।

ছন্দের সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। এই পুস্তকের কোন কোন গানে ছন্দ নাই বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। যে সকল পাঠকের কান আছে, তাঁহারা ছন্দ খুঁজিয়া লইবেন, দেখিতে পাইবেন বাঁধাবাঁধি ছন্দ অপেক্ষা তাহা শুনিতে মধুর,—হসন্ত বর্ণকে অকারান্ত করিয়া পড়িলে কোন কোন স্থলে ব্যাঘাত হইবে।/ গ্রন্থকার।’

আমরা আগেই বলেছি, 'গত বৎসরে' বলতে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত 1883কেই বুঝিয়েছেন, কারণ ১২৯০ বঙ্গাব্দে রচিত বেশ কয়েকটি কবিতাই এই সংকলনে রয়েছে। ছন্দ প্রসঙ্গে তিনি যা বলেছেন, সে সম্পর্কে প্রবোধচন্দ্র সেন ছন্দ [১৩৮২]-গ্রন্থের "'ছবি ও গান' কাব্যের মুক্তবৃত্ত ছন্দ" প্রবন্ধে দীর্ঘ পর্যালোচনা করেছেন [দ্র পৃ ৩০৩-১২], আগ্রহী পাঠককে সেই মূল্যবান আলোচনাটি পড়ে নিতে অনুরোধ করি।

ছবি ও গান-এর প্রথম সংস্করণে ৩০টি কবিতা ছিল, তার মধ্যে মাত্র ৮টি ভারতী-তে মুদ্রিত হয়, বাকি ২২টি সম্ভবত গ্রন্থাকারেই প্রথম প্রকাশিত। ছবি ও গান-এর অধিকাংশ কবিতা লোয়ার সার্কুলার রোডের ভাড়া বাড়িতে অবস্থান-কালে লেখা। এ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'চৌরঙ্গীর নিকটবর্ত্তী সার্কুলর রোডের একটি বাগান-বাড়িতে* আমরা তখন বাস করিতাম। তাহার দক্ষিণের দিকে মস্ত একটা বস্তি ছিল। আমি অনেক সময়েই দোতলার জানলার কাছে বসিয়া সেই লোকালয়ের দৃশ্য দেখিতাম। তাহাদের সমস্ত দিনের নানাপ্রকার কাজ, বিশ্রাম, খেলা ও আনাগোনা দেখিতে আমার ভারি ভালো লাগিত—সে যেন আমার কাছে বিচিত্র গল্পের মতো হইত।'[৫১]

'একাকিনী', 'গ্রামে', 'বাদল', 'মধ্যাহ্নে' প্রভৃতি কবিতা সম্ভবত এই মানসিকতা থেকেই লিখিত। তাছাড়া ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ও ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা হয়তো 'দোলা', 'আদরিণী', 'খেলা', 'ঘুম', 'অভিমানিনী' প্রভৃতি কবিতার আলম্বন।

ছবি ও গান-প্রসঙ্গে সাধারণী-তে [২২।২, ৯ বৈশাখ ১২৯১।১৭-১৮] একটি বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশিত হয় :

'সমালোচন।/ ছবি ও গান। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব শক্তি ক্রমেই ফুটিতেছে; চারিদিকের বাষ্প ক্রমেই সরিয়া যাইতেছে; তাঁহার তরুণ-স্বভাব-সুলভ আবেশ ভাব, কাটাইয়া ক্রমেই তাঁহার কবিত্ব শক্তি নব যৌবনের উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছে। কবি রবীন্দ্রনাথ প্রথম প্রথম নূতন পন্থার অনুসন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া, মধ্যে মধ্যে কত বন জঙ্গলে গিয়াছেন, কত অন্ধকারে বিচরণ করিয়াছেন, কত বার বাঙ্গালির মনের স্তরের ভিতর দিয়া সুড়ঙ্গ কাটিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এখানে আমাদের বোধ হইতেছে, যেন এতদিনের পর তিনি পরিষ্কৃত পথ পাইয়াছেন, প্রশস্ত পথে স্ফূর্ত্তির সহিত বিচরণ করিতেছেন। [এরপর 'যোগী' কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হয়েছে।]

কেমন প্রশস্ত ভাব, কেমন উদার ভাব, কেমন গম্ভীর অথচ উৎসাহপূর্ণ ভাব। কেমন একটি অনুপম পৌরাণিক আর্য্য ভাব কবিতার সর্ব্বাঙ্গে যেন মাখা রহিয়াছে; আধুনিকতা ইহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে নাই; কবিতার আলম্বন ও বিভাবন বড় উচ্চতর। সূর্য্য প্রত্যহই উঠেন। এমন লোক নাই, যে সে কথা একরূপে বলেন নাই; কিন্তু এ সূর্য্য সমুদ্র কূল হইতে উঠিতেছেন; ব্রহ্মাণ্ড ফুটিতেছে; জলতলে, গগন তলে স্বর্গ ছটা ছুটিতেছে। তুমি আমি সকলেইত সূর্য্য উঠিতে দেখিয়াছি—কিন্তু এ সূর্য্যোদয় আর্য্য ঋষির লক্ষ্যস্থল। মধ্যে অনন্ত বিস্তৃত সমুদ্র—এক দিকে সুবর্ণ কিরীট ধারণ করিয়া হাসিতেছে, অন্য দিকে ভক্তিভরে যোগীবরের পদ প্রক্ষালন করিয়া দিতেছে। দেখিতে দেখিতে কিরণ মৃণালোপরি জ্যোতির্ম্ময় কনক কমল ফুটিয়া উঠিল; ঋষিবর ভুর্ভুবস্ব প্রকাশক বরেণ্য সবিতাকে লক্ষ্য করিয়া বেদ গান করিতে লাগিলেন। সমস্তই সাজন্ত। সমুদ্র তটের সূর্য্যোদয় আর্য্য যোগী নহিলে, দেখিবে কে? বুঝিবে কে? —আর কাহাকে সাজে বল? আর সে স্থলে সেই মুখে—বেদ গান ভিন্ন অন্য গান সাজে কি?

এইরূপ কবিতা পাঠ করিয়াই আমরা বলিতেছি—কবি রবীন্দ্র—এখন প্রশস্ত পথে বিচরণ করিতেছেন, তাঁহার কবিতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, সৌরভে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।'

—যথেষ্ট প্রশস্তি সত্ত্বেও এই সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ কতখানি উৎফুল্ল হয়েছিলেন তা বলা শক্ত।

চন্দ্রনাথ বসু সমকালীন কবি ও কবিতার অন্তঃসারশূন্যতার তীব্র সমালোচনা করে ছবি ও গান-সম্পর্কে তাঁর রিপোর্টে লিখেছেন : 'There is, however, in Bengali literature poetry of a far higher kind than this, genuine poetry proceeding from genuine thought and feeling. There was enough of such higher poetry in Babu Rabindra Nath Thakur's Chhabi O Gan...in which sentiments of the deepest and most delicate kind is expressed in a more concrete or realistic form than it is in any of the author's previous poems.'[৫২]

সম্ভবত ফাল্গুন মাসের শেষ সপ্তাহে [Mar 1884] স্বর্ণকুমারী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের [1860-1927] বিবাহ হয়। সরলা দেবী লিখেছেন, 'বাসরের আমোদ-উৎসব-স্ব-রূপ রবিমামা 'বিবাহোৎসব' বলে একটি গীতি-নাটিকা রচনা করে অভিনয় করালেন দিদির সমবয়সী বা তাঁর চেয়ে কিছু বড় বোনেদের দিয়ে। এতে দিদির খুসীও [ব্রাহ্মনেতা দুর্গামোহন দাসের কনিষ্ঠা কন্যা শৈলবালা] ছিল। সরোজাদিদি [দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা] তাতে ছিলেন নায়িকা—অন্যরা সব তাঁর সখী। দুজন পুরুষ ছিল [আরও একটি পুরুষ চরিত্র ছিল পিতার ভূমিকায়], একজন নায়ক ও একজন তার আমুদে সখা। দ্বিপুদাদার প্রথমা স্ত্রী দিনুর মা—সুশীলা বৌঠান ও সুপ্রভাদিদি [শরৎকুমারী দেবীর দ্বিতীয়া কন্যা]—এই দুজনে ঐ পুরুষ সেজেছিলেন।'[৫৩] সরলা দেবী গীতিনাট্যটি রবীন্দ্রনাথের রচনা বলে উল্লেখ করলেও বস্তুত এটি একটি যৌথ রচনা—মোট ৭টি দৃশ্যে ৪৫টি গানের মধ্যে শুধু রবীন্দ্রনাথের রচিত ২৮টি গান থাকলেও অন্যগুলি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অক্ষয় চৌধুরী ও স্বর্ণকুমারী দেবীর লেখা।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গান পূর্ব-রচিত, কয়েকটি গান আবার পরবর্তী কোনো কোনো গ্রন্থে [নলিনী, মায়ার খেলা] গৃহীত হয়েছে—অপর পক্ষে প্রকৃতির প্রতিশোধ-এ ব্যবহৃত কয়েকটি গান হয়তো বিবাহ-উৎসব-এর জন্যই রচিত হয়েছিল, পরে প্রয়োজন-মতো উক্ত নাট্য-কাব্যে ব্যবহৃত হয়। বিবাহ-উৎ-সব-এর অন্তর্ভুক্ত রবীন্দ্রনাথের গানের একটি তালিকা প্রাসঙ্গিক তথ্য-সহ নীচে দেওয়া হল :

[১] 'নাচ শ্যামা তালে তালে'। খাম্বাজ; ভগ্নহৃদয় কাব্যের দ্বিতীয় সর্গের অন্তর্গত গানটির সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য পূর্বেই দেওয়া হয়েছে।

[২] 'ওই জানালার কাছে বসে আছে' দ্র গীতবিতান ৩।৭৭৮; ছবি ও গান ১।১০৬-০৭ ['মিশ্র খাম্বাজ', গানে ১৬টি ছত্র রক্ষিত], 'সুখস্বপ্ন'; বিবাহ-উৎসব। ৫, ২য় দৃশ্য, কবির গান, মিশ্র খাম্বাজ—একতালা; স্বরবিতান ২০

[৩] 'সাধ করে কেন সখা ঘটাবে গেরো' দ্র গীতবিতান ৩।৭৭৮; বিবাহ-উৎসব। ৫-৬, ২য় দৃশ্য, সখার গান, ঝিঁঝিট খেমটা; স্বরবিতান ৫১

[৪] 'ধীরি ধীরি প্রাণে আমার এসো হে' দ্র গীতবিতান ৩।৭৭৮-৭৯; বিবাহ-উৎসব। ৬, ২য় দৃশ্য, কবির গান, বেহাগড়া—ঝাঁপতাল; নলিনী পাণ্ডুলিপি; স্বরবিতান ৩২

[৫] ‘তুমি আছ কোন পাড়া’ দ্র গীতবিতান ৩।৭৭৯; বিবাহ-উৎসব। ৬, ২য় দৃশ্য, সখার গান, [সিন্ধু-একতালা]; স্বরবিতান ৫১। লক্ষণীয়, কালমৃগয়া-য় বিদূষকের ‘আঃ বেঁচেছি এখন’ গানটির সুর এটিতে ব্যবহৃত হয়েছে। এই গানটি ও ৩ সংখ্যক ‘সাধ করে কেন সখা ঘটাবে গেরো’ গান দুটি ‘রবীন্দ্রনাথের আর কোনো গীতগ্রন্থে মুদ্রিত নাই’ যুক্তিতে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এগুলি অক্ষয় চৌধুরীর রচনা বলে অনুমান করেছেন।[৫৪] কিন্তু সরলা দেবী ‘বাঙ্গলার হাসির গান ও তাহার কবি’ [ভারতী, ফাল্গুন ১৩০১।৬৭৯-৯২] প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের হাস্যরসাত্মক গান হিসেবে এই দুটি গান উদ্ধৃত করে লিখেছেন, ‘বোধ করি কবি নিজে তাঁহার এ গানগুলির বিলোপ ইচ্ছা করেন। তাঁহার সঙ্কলিত “গানের বহি”তে এগুলি স্থান পায় নাই, এবং শুনা যায় সখিসমিতির শিল্পমেলায় [চৈত্র ১২৯৬, Mar 1890] অভিনয়োদ্দেশ্যে যখন এই গীতিনাটিকাখানি [‘বিবাহ-উৎসব’] মুদ্রিত করিবার প্রস্তাব হয় তখন কবি মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, না ছাপাইলেই ভাল হয়।’[৫৫] তাছাড়া ভারতী-র বৈশাখ ১৩০০ সংখ্যায় [পৃ ২৩-২৬] ২ ও ৩-সংখ্যক গান দুটির এবং জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় [পৃ ৮২-৮৪] ৪ ও ৫-সংখ্যক গান দুটির স্বরলিপি-কার হিসেবে সরলা দেবীর নামই সূচীপত্রে দেখা যায়, প্রভাতবাবু ‘স্বরলিপিকার অনুল্লিখিত’ ইত্যাদি মন্তব্য কেন করেছেন বোঝা শক্ত। এইরূপ মন্তব্য স্বরবিতানেও আছে।

[৬] ‘রিমঝিম ঘন ঘন রে’ দ্র গীতবিতান ৩।৬৪৪; বিবাহ-উৎসব। ৭, ৩য় দৃশ্য, সখীদের গান, মল্লার—কাওয়ালি; কালমৃগয়া-য় ‘ঝম্‌ঝম্ ঘন ঘন রে বরষে’ পাঠে প্রথম ব্যবহৃত, বাল্মীকি প্রতিভা-র ২য় সংস্করণে [১২৯২] বর্তমান পাঠটি গৃহীত হয়।

[৭] ‘তারে দেখাতে পারিনে কেন প্রাণ’ দ্র গীতবিতান ২।৩৯৬, ৩।৬৬২-৬৩; বিবাহ-উৎসব। ৭-৮, ৩য় দৃশ্য, কবির গান, জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল; মায়ার খেলা [১২৯৫]; স্বর ৪৮

[৮] ‘দেখ ঐ কে এসেছে’ দ্র গীতবিতান ৩।৭৭৯; বিবাহ-উৎসব। ৮, ৩য় দৃশ্য, সখীদের গান, সিন্ধু খাম্বাজ—খেমটা; স্বর ৩৫

[৯] ‘ভাল যদি বাস সখি’ দ্র গীতবিতান ৩।৭৭৯; বিবাহ-উৎসব। ৮, ৩য় দৃশ্য, কবির গান, পিলু—ঝাঁপতাল; মালতীপুঁথি, 70/৩৬ খ; স্বর ৩৫

[১০] ‘ও কেন ভালবাসা জানাতে আসে’ দ্র গীতবিতান ৩।৭৮০; বিবাহ-উৎসব। ৯, ৩য় দৃশ্য, নায়িকার গান, পিলু—খেমটা; নলিনী অ-১।৪০৪; স্বর ২০

[১১] ‘ভাল বাসিলে যদি সে ভাল না বাসে’ দ্র গীতবিতান ৩।৭৮০; বিবাহ-উৎসব। ৯, ৩য় দৃশ্য, কবির গান, কালাংড়া-খেমটা; নলিনী অ-১।৪০৪-০৫; স্বর ২০

[১২] ‘বনে এমন ফুল ফুটেছে’ দ্র গীতবিতান ২।৪১৬; বিবাহ-উৎসব। ৯-১০ ৩য় দৃশ্য, সখীদের গান, খাম্বাজ—আড়খেমটা; প্রকৃতির প্রতিশোধ ১।১৮৩-৮৪; স্বর ২০

[১৩] ‘কেনরে চাস্ ফিরে ফিরে’ দ্র গীতবিতান ৩।৭৮০; বিবাহ-উৎসব। ১০, ৩য় দৃশ্য, কবির গান, ভৈরবী—আড়খেমটা; পুষ্পাঞ্জলি-পাণ্ডুলিপি; স্বর ৩২

[১৪] ‘মনে রয়ে গেল মনের কথা’ দ্র গীতবিতান ২।৩৪৮; বিবাহ-উৎসব। ১০-১১, ৪র্থ দৃশ্য, নায়িকার গান, বেহাগড়া—কাওয়ালি; নলিনী অ-১।৪০৮-০৯; স্বর ২০ [বেহাগড়া—ঝাঁপতাল]

[১৫] ‘প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন’ দ্র গীতবিতান ৩।৭৮০-৮১; বিবাহ-উৎসব। ১১, ১২, ৪র্থ দৃশ্য নায়িকার গান, বেহাগ—কাওয়ালি; স্বর ৩২

[১৬] 'বুঝি বেলা বহে যায়' দ্র গীতবিতান ২।৪১৬; বিবাহ-উৎসব। ১২-১৩, ৪র্থ দৃশ্য, নায়িকার গান, মূলতান—আড়খেমটা; প্রকৃতির প্রতিশোধ ১।১৭০; স্বর ২০

[১৭] 'কথা কসনেলো রাই' দ্র গীতবিতান ৩।৭৭৮; বিবাহ-উৎসব। ১৪, ৪র্থ দৃশ্য, সখীদের গান, ভৈরবী—আড়খেমটা; প্রকৃতির প্রতিশোধ ১।১৭৯; স্বর ২০। রবিচ্ছায়া-তে সংকলিত হয় নি বলেই সম্ভবত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'মনে হয় গানটি অক্ষয় চৌধুরীর রচনা',[৫৬] কিন্তু স্বরলিপি-গীতিমালা [১৩০৪] বা গান [১৩১৬] গ্রন্থে অন্তর্ভুক্তি এই অনুমানের বিরোধিতা করে।

[১৮] 'ও কেন চুরি করে চায়' দ্র গীতবিতান ২।৪২১; বিবাহ-উৎসব। ১৪, ৪র্থ দৃশ্য, কবির গান, বেহাগ—খেমটা; স্বর ৩২

[১৯] 'সখা সাধিতে সাধাতে কত সুখ' দ্র গীতবিতান ৩।৭৮১; বিবাহ-উৎসব। ১৬, ৫ম দৃশ্য, কবির গান, গৌড়সারঙ্গ—আড়খেমটা; স্বর ৩৫। কানাই সামন্ত লিখেছেন, "স্বরলিপি-গীতিমালা পুস্তকে মুদ্রিত দীর্ঘতর পাঠ রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা বলিয়া নির্দিষ্ট। 'গানের বহি' প্রভৃতি গ্রন্থে পূর্বোক্ত রচনার প্রথমার্ধ মাত্র গৃহীত, এজন্য ঐটুকুই রবীন্দ্ররচনা মনে হয়। অবশিষ্ট রচনাংশের শ্রী ও শৈলী পৃথক—উহাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা হইতে পারে।/'গানের বহি'তে ও 'বিবাহ-উৎসব' গীতিনাট্যে এক পাঠ দেখা যায়, উহাই গীতবিতানে সংকলিত।"[৫৭]

[২০] 'এতে ফুল কে ফুটালে (কাননে)' দ্র গীতবিতান ৩।৭৮১; বিবাহ-উৎসব। ১৭, ৬ষ্ঠ দৃশ্য, সখীদের গান, মিশ্রকালাংড়া—খেমটা; স্বর ৩৫

[২১] 'আমাদের সখিরে কে নিয়ে যাবেরে' দ্র গীতবিতান ৩।৭৮১; বিবাহ-উৎসব। ১৭, ৬ষ্ঠ দৃশ্য, ১ম সখীর গান, মিশ্রজয়জয়ন্তী—খেমটা; স্বর ৫১

[২২] 'সখি সে গেল কোথায়' দ্র গীতবিতান ২।৪১৯, ৩।৬৫৮, ৯১৮; বিবাহ-উৎসব। ১৭-১৮, ৬ষ্ঠ দৃশ্য, ২য় সখীর গান, মিশ্রবেহাগ—খেমটা; মায়ার খেলা ১।২৩৪; স্বর ৪৮

[২৩] 'কোথা ছিলি সজনি লো' দ্র গীতবিতান ৩।৭৮১-৮২; বিবাহ-উৎসব। ১৮, ৬ষ্ঠ দৃশ্য, সখীদের গান, মূলতানি—কাওয়ালি; স্বর ৩৫ [মিশ্র ভৈরবী—ত্রিতাল]

[২৪] 'ওকি কথা বল সখি ছি ছি' দ্র গীতবিতান ৩।৭৮২; বিবাহ-উৎসব।[*] ১৯, ৬ষ্ঠ দৃশ্য, সখীদের গান, দেশখাম্বাজ—কাওয়ালি; স্বর ৫১

[২৫] 'মধুর মিলন' দ্র গীতবিতান ৩।৭৮২; বিবাহ-উৎসব। ১৯-২০, ৬ষ্ঠ দৃশ্য, বেহাগ—তাল ফেরতা; স্বর ৩৫

[২৬] 'দেখে যা দেখে যা দেখে যালো তোরা' দ্র গীতবিতান ২।৪১৮; বিবাহ-উৎসব। ২০-২১, ষষ্ঠ দৃশ্য, কবির গান, কালাংড়া—আড়খেমটা; মালতীপুঁথি 24/১৩খ; 'ফুলবালা', ভারতী, কার্তিক ১২৮৫।৩০৬; নলিনী-পাণ্ডুলিপি; স্বর ২০

[২৭] 'মা একবার দাঁড়াগো হেরি চন্দ্রানন' দ্র গীতবিতান ৩।৭৮২-৮৩; বিবাহ-উৎসব। ২১-২২, ৭ম দৃশ্য, নেপথ্যে পিতার গান, ভৈরবী—আড়াঠেকা; স্বর ৩২

[২৮] 'মা আমার কেন তোরে ম্লান নেহারি' দ্র গীতবিতান ৩।৭৮৩; বিবাহ-উৎসব। ২২, ৭ম দৃশ্য, পিতার গান, ভূপালি—কাওয়ালি; স্বর ৩২

এরপর পিতার মুখে ‘যে তোরে বাসেরে ভাল, তারে ভাল বেসে বাছা’ ইত্যাদি ১৬ ছত্রের একটি কবিতা আশীর্বচন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কবিতাটি য়্যুগোর ‘15 FÉVRIER 1843/ *Aime celui qui táime, et sois heureuse en hui*’-র অনুবাদ, আষাঢ় ১২৮৮-সংখ্যায় পৃ ১৪৬] ভারতী-তে ‘সম্পাদকের বৈঠক’ বিভাগে প্রকাশিত ও প্রভাতসংগীত [১২৯০] গ্রন্থে ‘বিসর্জ্জন’ নামে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

বিবাহ-উৎসব ঠাকুরবাড়ির বিভিন্ন বিবাহ উপলক্ষে অভিনীত হয়েছিল। প্রথমবার অভিনীত হয় হিরণ্ময়ী দেবীর বিবাহোপলক্ষে ফাল্গুন ১২৯০-এ, একথা বলা হয়েছে। এই অভিনয়ের স্মৃতিচারণ করেছেন সরলা দেবী। পরবর্তী একটি অভিনয়ের [১১ আষাঢ় ১২৯২ বুধ 24 Jun 1885] বিবরণ দিয়েছেন ইন্দিরা দেবী, অভিনয়টি হয় সুপ্রভা দেবীর সঙ্গে সুকুমার হালদারের বিবাহের দিনে : “দিনুর মা সুশীলা-বউঠান নায়ক সেজেছিলেন। তিনি গান এবং অভিনয় দুইই সুন্দর করতেন। তাঁর একটি গান ‘ও কেন চুরি করে চায়’ তখন খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। নায়িকাকে দেখে মোহিত হয়ে তিনি গাইতেন, ‘ওই জানালার পাশে বসে আছে’...তার উত্তরে সরলাদিদি সখা সেজে তাঁর মোহভঙ্গের উদ্দেশ্যে...গান করতেন ‘তুমি আছ কোন্ পাড়া’...।”[৫৮] পরে স্বর্ণকুমারী দেবী-প্রতিষ্ঠিত সখি সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মহিলা শিল্পমেলা উপলক্ষে [মেলাটি অনুষ্ঠিত হয় ৫-৭ ফাল্গুন ১২৯৮ : 16-18 Feb 1892 তিন দিন ধরে দ্র রবিজীবনী ৩।২১০] গীতিনাট্যটি অভিনীত হয়েছিল এবং অভিনয়-পত্রী হিসেবে বিবাহ-উৎসব গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

চৈত্রসংখ্যা [৭।১২] ভারতী-তে রবীন্দ্রনাথের দুটি গদ্যরচনা মুদ্রিত হয় :

৫২৯-৪৪ ‘অকাল কুষ্মাণ্ড’

৫৬৭-৭৩ ‘বিবিধ প্রসঙ্গ/ধর্ম্ম’ দ্র আলোচনা অ-২/১৭-২৬

‘অকাল কুষ্মাণ্ড’ প্রবন্ধটি ‘সাবিত্রী লাইব্রেরীর সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে লিখিত।’ ১২৮৬ বঙ্গাব্দে ১৮নং অক্রূর দত্ত লেনে প্রতিষ্ঠিত সাবিত্রী লাইব্রেরির ৫ম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে ১১ চৈত্র [রবি 23 Mar 1884] প্রবন্ধটি পঠিত হয়। লাইব্রেরির বাৎসরিক বিবরণীতে এ-সম্পর্কে লেখা হয়েছে : ‘১২৯০ সালে ১১ই চৈত্র অপরাহ্ন ৬টার সময় ৫ম বার্ষিক অধিবেশন হয়। সভায় বহু সুশিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। অনুমান ৫।৬ শত ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক “বন্দেমাতরং” সঙ্গীতটী গীত হইলে বাৎসরিক বিবরণী পঠিত হয়। তারপর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর “অকাল কুষ্মাণ্ড” নামে প্রবন্ধ পাঠ করেন। [এরপর প্রবন্ধটি সারমর্ম দেওয়া হয়েছে।] তার পর দুচার জনের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বলিবার পর সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু বলিলেন :—বাঙ্গালা সাহিত্য কেবল দোষে পূর্ণ নহে; দোষ বলা খুব উচিত বলিয়া গুণের কথা না বলা অন্যায়। আমাদের দেশে রাজা বিদেশী বলিয়া আমাদের সাহিত্যে দোষ ঢুকিয়াছে; তথাপি আমাদের সাহিত্যে বহুল পরিমাণে দেশীয় ভাব আছে। আমাদের সাহিত্য আমাদের জাতীয়তা লাভের কারণ হইবে। বিশেষ আমাদের দেশে রবীন্দ্র বাবুর মত বিচক্ষণ বুদ্ধিমান্ ও সাহসী লেখক জন্মাইতে থাকিলে সাহিত্য ব্যবসায়ে ভেল চলিবে না। এই যে ইংলণ্ডে প্রত্যহই রাশি রাশি পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে তাহার মধ্যে Immortal Shelfএ খুব অল্প পুস্তকই স্থান পায়। আমাকে ত প্রতিদিন বাঙ্গালা সাহিত্যের সমস্ত জঞ্জাল ঘাঁটিতে হয় [এই সময় তিনি বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান ছিলেন], কিন্তু তাহার মধ্য হইতেও প্রকৃত হৃদয়ের কথা—অনুভব করিয়া লেখা পুস্তকও অনেক

পাইয়াছি। আগে আমাদের দোষ দেখা উচিত বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মন্দ লেখকগণের সংশোধন করিবার উপায়ও দেখিতে হইবে। বক্তা সাময়িক পত্রের নিয়ত যোগান-দেওয়ার কুফলের কথা যাহা বলিয়াছেন তাহা যথার্থ বটে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে সাময়িক পত্রে বিলক্ষণ চিন্তাপূর্ণ উৎকৃষ্ট প্রবন্ধও অনেক বাহির হইতে দেখা যায়। এবং এই দশ বৎসরে সাময়িক পত্রের দ্বারা যে সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে তাহাও কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

'...পরিশেষে "তোমারি করে [তরে] মা সঁপিনু প্রাণ [এ দেহ]" এবং "দেশে দেশে ভ্রমি" ইত্যাদি সঙ্গীত গীত হয়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও "বন্দে মাতরং" গানটি গাইয়া সভাস্থ সকলকে পরিতুষ্ট করেন। সভাপতি এবং বক্তা মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।'*

চন্দ্রনাথ বসুর সভাপতির অভিভাষণের সারমর্মটিকে আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের সমালোচনা রূপে গ্রহণ করতে পারি। এইরূপ আর-একটি সমালোচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় হিন্দু পেট্রিয়ট-এ [Vol. XXXI, No. 15, 14 Apr 1884, p. 170] ভারতী-র চৈত্র সংখ্যা সম্পর্কে মন্তব্যে : '...We hope the Editor will guard himself against being betrayed into mere frivolousness. The first article in the present number ['অকাল কুষ্মাণ্ড'] ought not to have found a place in a journal of the *Bharuti*'s character.' সাধারণী-তে 'বাঙ্গালা গ্রন্থকারের আশা কৈ?'[২২।১, ২ বৈশাখ ১২৯১।৩-৪] প্রবন্ধেও ভাষণটি সমালোচিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে বাংলা সাহিত্যের অন্তঃসারশূন্যতা, বড়ো বড়ো ভাবের চিন্তাহীন পুনরাবৃত্তি ও ভানের চর্চাকে অত্যন্ত কঠোরভাবে ধিক্কার দিয়েছিলেন। তাঁর মতে য়ুরোপের অনুকরণই এর কারণ। কিন্তু য়ুরোপে লেখক ও চিন্তাশীল ব্যক্তির অভাব নেই, ফলে সাময়িক পত্রিকাদি সহজেই চলে; পক্ষান্তরে 'আমাদের দেশে লেখক নাই বলিলেও হয়, তবুও ত এতগুলো কাগজ চলিতেছে। কেমন করিয়া চলে। লেখার ভাণ করিয়া চলে। সহৃদয় লোকদের হৃদয়ের অন্তঃপুরবাসী পবিত্র ভাবগুলিকে সাহিত্য সমাজের অনার্য্যেরা যখনি ইচ্ছা অসঙ্কোচে তাহাদের কঠিন মলিন হস্তে স্পর্শ করিয়া অশুচি করিয়া তুলিতেছে।' [পৃ ৫৩৪] এই জাতীয় রচনাকেই 'অকাল কুষ্মাণ্ড' অ্যাখ্যা দিয়ে তিনি লিখেছেন, 'গম্ভীর ভাবে অপ্রতিহত প্রভাবে আপনার কাজ আপনি করিব, আপনার উদ্দেশ্যের মহত্ত্বে[ত্ত্ব] আপনি পরিপূর্ণ হইয়া তাহারি সাধনায় অবিশ্রাম নিযুক্ত থাকিব, সুদূর লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দক্ষিণে বামে কোন দিকে দৃকপাতমাত্র না করিয়া সীধা রাস্তা ধরিয়া চলিব; চটক লাগাইতে করতালি জাগাইতে চেঁচাইয়া ভূত ভাগাইতে নিতান্তই ঘৃণা বোধ করিব, কোথাকার কোন্ গোরা কি-বলে-না-বলে তাহার প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ করিব না এমন ভাব আমাদের মধ্যে কোথায়!' [পৃ ৫৪২] রবীন্দ্রজীবনী-কার প্রবন্ধটি সম্পর্কে বলেছেন, 'ইহাও রঙের বাক্স লইয়া বালকের যেমন-তেমন খেলার মতই প্রচেষ্টা।'[৫৯] একথা সত্য যে, সমকালীন সাহিত্য, সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রায় একই ধরনের কথা বার-বার লিখে চলেছিলেন, কিন্তু সেগুলি শূন্যগর্ভ ছিল না। আজ যখন সেই যুগের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলি ও প্রধান প্রধান রাষ্ট্র-ও সমাজ-নায়কদের মূর্তিগুলিই আমাদের সামনে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়, তখন ভাবা শক্ত যে, সেই সময়ে কণ্ঠে ও লেখনীতে কী পরিমাণ আবর্জনা সৃষ্টি হচ্ছিল—যা তৎকালীন কিছু সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা ধারাবাহিকভাবে পড়ে গেলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের এই ধরনের রচনাগুলি সেই পরিপ্রেক্ষিতটি স্মরণে রেখেই পাঠ করা উচিত, এবং তা হলেই তাঁর ইতি-বাচক মনোভাবটি অনুধাবন করা দুরূহ হয় না।

শ্রাবণ ১২৮৮ থেকে বৈশাখ ১২৮৯ পর্যন্ত ভারতী-তে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' নামে যে ছোটো ছোটো গদ্যরচনা প্রকাশিত হয় [ভাদ্র ১২৯০-এ গ্রন্থাকারে মুদ্রিত], সেই একই শীর্ষ-নামে নূতন রচনাধারার সূত্রপাত হয় বর্তমান সংখ্যায়—কিন্তু লেখকের মনোভঙ্গির পার্থক্যটি স্পষ্ট করার জন্য পরবর্তী সংখ্যা [বৈশাখ ১২৯১] থেকেই শীর্ষ-নাম পরিত্যক্ত হয়ে রচনাগুলি স্বতন্ত্র নামে অভিহিত হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই এ-সম্পর্কে লিখেছেন, 'এই দুই গদ্যগ্রন্থে ['বিবিধ প্রসঙ্গ' ও 'আলোচনা'] যে-প্রভেদ ঘটিয়াছে তাহা পড়িয়া দেখিলেই লেখকের চিত্তের গতি নির্ণয় করা কঠিন হয় না।'[৬০] বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত একাদিক্রমে বিভক্ত রচনা-গুচ্ছের উপনাম 'ধর্ম্ম'—আলোচনা গ্রন্থে [বৈশাখ ১২৯২] ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রচনাগুলির নামকরণ করা হয়। রচনাগুলি অবশ্যই কার্তিক ১২৯০-র পরে লেখা, কারণ ওই মাসে লিখিত 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাট্যকাব্য থেকে দুটি অংশ এতে উদ্ধৃত হয়েছে, পরবর্তী সংখ্যার 'ডুব দেওয়া' রচনা-গুচ্ছতেও এইরূপ উদ্ধৃতি দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ এ-সম্পর্কে লেখেন, '...আলোচনা নাম দিয়া যে ছোটো ছোটো গদ্যপ্রবন্ধ বাহির করিয়াছিলাম তাহার গোড়ার দিকেই প্রকৃতির প্রতিশোধ-এর ভিতরকার ভাবটির একটি তত্ত্বব্যাখ্যা লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সীমা যে সীমাবদ্ধ নহে তাহা যে অতলস্পর্শ গভীরতাকে এককণার মধ্যে সংগ্রহ করিয়া দেখাইতেছে, ইহা লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে।'[৬১] পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ নানা উপলক্ষেই নিজের রচনার ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন, এই নিবন্ধগুলিকে তার সূচনা বলে মনে করা যায়।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যনাট্য 'নলিনী' রচিত হয়। নাটকটি রচনার ইতিহাস একটু বিচিত্র। রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন, '...একটি অভিনয় করিবার প্রস্তাব হইল। যৌথ-রচনা বিবাহ-উৎসবের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া তরুণ তরুণীরা স্থির করিলেন নাটকের রচয়িতা হইবেন অভিনেতারা স্বয়ং। সেইজন্য মোটামুটিভাবে একটা প্লট খাড়া করিয়া অভিনয়ের অংশ নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইল। একজন নিজ অংশ লিখিয়া দিলে অপরজন তাঁহার অংশ লিখিবেন, এইরূপে অভিনেতা-লেখকদের হাতে-হাতে ঘুরিয়া একটা জিনিস খাড়া হইল বটে, তবে তাহাকে সাহিত্য নাম দেওয়া যায় না।...শেষকালে রবীন্দ্রনাথকেই সেই খসড়াকে ছাঁটিয়া কাটিয়া একটা চলনসই নাটক খাড়া করিতে হইল।'[৬২] ইন্দিরা দেবীর অপ্রকাশিত স্মৃতিকথায় প্রায় একই ধরনের তথ্য পাওয়া যায় :'আর একরকম যৌথ নাটক বড়রা লিখতে আরম্ভ করেছিলেন মনে আছে, তার নাম "নলিনী"। অর্থাৎ প্রত্যেকে ঘুরে ফিরে এক একটি পাত্রের বক্তব্য নিজের হাতে লিখবেন।' প্লটটি নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের রচনা, কারণ তাঁর পূর্বপ্রকাশিত গীতিকাব্য 'ভগ্নহৃদয়'-এর কাহিনীর উপর ভিত্তি করে প্লটটি গঠিত, নায়িকা নলিনীর নামটিও সেখান থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। বর্তমান নাটকে দুটি পুরুষ চরিত্র—নীরদ ও নবীন—এবং চারটি স্ত্রী চরিত্র—নলিনী, ফুলি, প্রতিবেশিনী ও নীরজা। প্রভাতকুমারের বক্তব্য অনুযায়ী ছ'জনের মধ্যে এই চরিত্রগুলি বণ্টন করে দেওয়া হয় ও তাঁরাই নিজ নিজ সংলাপ লিখে যে খসড়া তৈরি করেন রবীন্দ্রনাথ তাকেই কেটে ছেঁটে অভিনয়যোগ্য রূপ দেন। ইন্দিরা দেবীর প্রদত্ত নলিনী-র একটি খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি বর্তমানে রবীন্দ্রভবন-অভিলেখাগারে সংরক্ষিত আছে, তার অভিজ্ঞান-সংখ্যা 93A। পাণ্ডুলিপিটির প্রথম ও শেষাংশ মিলিয়ে মাত্র পাঁচটি পাতা [১০ পৃষ্ঠা] পাওয়া গিয়েছে, মধ্যবর্তী আনুমানিক চার [৮ পৃষ্ঠা] বা তদধিক পাতা স্খলিত। উল্লেখযোগ্য যে, প্রথম তিনটি পাতা [পৃ 1-6] সম্পূর্ণ বর্জন-চিহ্নাঙ্কিত, এর 1-2 পৃষ্ঠার কিয়দংশে সম্ভবত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে কয়েকটি সংলাপ এবং 4 পৃষ্ঠায়

মেয়েলি হস্তাক্ষরে [কানাই সামন্তের অনুমান, হাতের লেখা সম্ভবত জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর[৬৩]] দুটি সংলাপ লিখিত হয়েছিল, 1-6 পৃষ্ঠার বাকি অংশ এবং 7-10 পৃষ্ঠার সবটাই রবীন্দ্রনাথের লেখা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবী উভয়েই নলিনীর সংলাপ লিখেছেন, সুতরাং অভিনেতারা নিজের অংশ নিজের হাতে লিখবেন এমন পরিকল্পনা নিয়ে রচনা যদি শুরু হয়েও থাকে প্রথম থেকেই সেই পদ্ধতি অনুসৃত হয় নি। হারিয়ে যাওয়া পৃষ্ঠাগুলিতে প্রতিবেশিনী ও নীরজা চরিত্রগুলির ক্ষেত্রে কোন্ রীতি গ্রহণ করা হয়েছিল বলা সম্ভব নয়, কিন্তু নবীনের সংলাপ যে রবীন্দ্রনাথই লিখেছিলেন তার প্রমাণ পাণ্ডুলিপির প্রথমাংশেই আছে। হয়তো এইরূপ বিশৃঙ্খল পদ্ধতিতে প্রথমে পুরো নাটকটিই লিখিত হয়, পরে তার সবটুকু কেটে দিয়ে সেই খসড়ার ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথ একাই সেটিকে মুদ্রণযোগ্য রূপ দেন। 7-10 পৃষ্ঠাতে সামান্যই কাটাকুটি আছে, 'এই অংশে মুদ্রিত গ্রন্থ প্রায় সর্বথা পাণ্ডুলিপির অনুরূপ'[৬৪]—এই তথ্য থেকে মনে হয় এগুলি প্রেসকপিরই অংশ।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যৌথ নাটক লেখার পরিকল্পনা হলেও ঠিক আক্ষরিকভাবে অভিনেতা-লেখকদের 'হাতে-হাতে ঘুরিয়া একটা জিনিস খাড়া' হয় নি, রবীন্দ্রনাথই ছিলেন প্রধান লেখক এবং সেইজন্য নাটকটি তাঁর নামেই মুদ্রিত হয়, মানময়ী বা বিবাহ-উৎসব-এর মতো রচয়িতার নাম ছাড়াই প্রকাশিত হয় নি। আমাদের ধারণা, নীরদ, ফুলি ও নলিনী চরিত্রে অভিনয়ের জন্য যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথ, ইন্দিরা দেবী ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবী মনোনীত হয়েছিলেন। এরূপ অনুমানের কারণ, সংগীতকুশলতার জন্য জ্ঞানদানন্দিনীর কোনো খ্যাতির কথা শোনা যায় নি এবং সেই জন্যেই নলিনীর মনের কথা গানের মাধ্যমে বলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ফুলি-রূপিণী বালিকা ইন্দিরাকে। অনুমান করা যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হয়তো নবীন চরিত্রে অভিনয়ের জন্য নির্বাচিত হন, নীরজা চরিত্রের সম্ভাব্য অভিনেত্রীর নাম হয়তো-বা কাদম্বরী দেবী।

ছ-টি দৃশ্যে বিভক্ত নাটকটিতে প্রথম দৃশ্যে চারটি গান আছে, যার মধ্যে প্রথমটি ছাড়া বাকিগুলি বিবাহ-উৎসব গীতিনাট্যের অন্তর্ভুক্ত :

[১] 'হা কে ব'লে দেবে' দ্র গীতবিতান ৩।৭৮০; নীরদের গান, পিলু-কাওয়ালি; রবিচ্ছায়া। ৭৭ [বিবিধ ৯৫]; স্বরবিতান ২০, পিলু-ত্রিতাল

[২] 'ও কেন ভালবাসা জানাতে আসে', ফুলির গান, পিলু

[৩] 'ভালবাসিলে যদি সে ভাল না বাসে', নবীনের গান, কালাংড়া

[৪] 'মনে রয়ে গেল মনের কথা', ফুলির গান, বেহাগড়া-কাওয়ালী

পাণ্ডুলিপির নবম [9] পৃষ্ঠায় পঞ্চম দৃশ্যে নীরদের কণ্ঠে 'দেখে যা দেখে যা ইত্যাদি' [ভারতী, কার্তিক ১২৮৫-সংখ্যায় মুদ্রিত 'ফুলবালা' গাথার অন্তর্গত] নির্দেশ ছিল, কিন্তু মুদ্রিত গ্রন্থে গানটি [সম্ভবত অনবধানে] পরিত্যক্ত হয়েছে।

নাটকটি অভিনয়ের জন্য রচিত হয়েছিল, কিন্তু কাদম্বরী দেবীর আকস্মিক মৃত্যুর জন্য অভিনয় করা সম্ভব হয় নি। রবীন্দ্রভারতী সংগ্রহশালায় রক্ষিত নাটকটির একটি মুদ্রিত কপিতে* রবীন্দ্রনাথ-কৃত সংযোজন-পরিবর্ধন দেখে মনে হয়, পরবর্তীকালে এটি আর-একবার অভিনয়ের কথা ভাবা হয়েছিল, অবশ্য সে প্রচেষ্টা কার্যকরী হয়েছিল কিনা বলা যায় না। শেষ পৃষ্ঠায় কিছু অতিরিক্ত সংলাপ যোগ করা ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ এতে কয়েকটি গান সংযোজিত করেন :

[১] 'কেন রে চাস্ ফিরে ২', প্রথম দৃশ্যে নীরদের গান দ্র গীতবিতান ৩।৭৮০; রবিচ্ছায়া। ৫৭-৫৮ [বিবিধ ৬৩], ভৈরবী—আড়খেমটা; স্বরবিতান ৩২

[২] 'গেল গো ফিরিল না', প্রথম দৃশ্যে নীরদের গান দ্র গীতবিতান ২।৪২২; রবিচ্ছায়া। ৬১ [বিবিধ ৬৮], গৌড় মল্লার—কাওয়ালি; স্বরবিতান ৩২, গৌড় মল্লার—ত্রিতাল

[৩] 'কেহ কারো মন বুঝে না', দ্বিতীয় দৃশ্যে নবীনের গান দ্র গীতবিতান ২।৪২২; 'পুষ্পাঞ্জলি' [? বৈশাখ ১২৯১] পাণ্ডুলিপি, পৃ 14, সিন্ধু কাফি; রবিচ্ছায়া। ৫৬ [বিবিধ ৬১], সিন্ধু কাফি-আড়াঠেকা; স্বরবিতান ৩২

['দেখে যা'—তৃতীয় দৃশ্যে নীরদ ও নীরজার গান। এই গানটি নলিনী-র পাণ্ডুলিপিতে পঞ্চম দৃশ্যে নীরদের গান হিসেবে নির্দিষ্ট ছিল, কিন্তু মুদ্রিত গ্রন্থে গানটি নেই। আলোচ্য কপিতে সেই জায়গায় 'সখী, ওই বুঝি বাঁশি বাজে' গানটি 'ঐ বুঝি'-রূপে উল্লিখিত হয়েছে।]

[৪] 'ধীরে ধীরে প্রাণে আমার' তৃতীয় দৃশ্যে নীরদের গান

[৫] 'দুখের মিলন [টুটিবার নয়]', তৃতীয় দৃশ্যে নীরদের গান দ্র গীতবিতান ৩।৬৮১; রবিচ্ছায়াতে গানটি নেই। মায়ার খেলা [অগ্র° ১২৯৫] সপ্তম দৃশ্যে মায়াকুমারীদের গান; গানের বহি [১৩০০]। ১৬৬, টোড়ি—ঝাঁপতাল; স্বরবিতান ৪৮

[৬] 'ঐ বুঝি' ['সখি, ওই বুঝি বাঁশি বাজে'], পঞ্চম দৃশ্যে নীরদের গান দ্র গীতবিতান ২।৩২৭-২৮, রবিচ্ছায়াতে গানটি নেই। রাজা ও রানী[১২৯৭], ৩য় অঙ্ক ৫ম দৃশ্য, প্রথম সখীর গান; গানের বহি [১৩০০]। ৯৩, মিশ্রসিন্ধু—একতালা; স্বরবিতান ২৮

[৭] 'কিছুই ত হল না', পঞ্চম দৃশ্যে নীরজার গান দ্র গীতবিতান ৩।৭৭৩; ভগ্নহৃদয় [১২৮৮] ১১শ সর্গে অনিলের গানের কিয়দংশ; রবিচ্ছায়া। ৩৬ [বিবিধ ৪০], ঝিঁঝিট-আড়াঠেকা; স্বরবিতান ৩৫

[৮] 'কেন এলি রে', ষষ্ঠ দৃশ্যের পরিবর্ধিত অংশে নবীনের গান, দ্র গীতবিতান ৩।৬৮১; পুষ্পাঞ্জলি-পাণ্ডুলিপি, পৃ 19, ভৈরবী; রবিচ্ছায়া। ১১ [বিবিধ ১৫], ভৈরবী-ঝাঁপতাল; স্বরবিতান ৪৮

আদি ব্রাহ্মসমাজের বর্ষ-শেষ উপাসনা হয় ৩০ চৈত্র [শুক্র 11 Apr] সন্ধ্যায়, কিন্তু এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ কোনো গান রচনা করেছিলেন বলে মনে হয় না। পরের দিন মহর্ষিভবনে প্রাতঃকালে 'নববর্ষ ব্রাহ্মসমাজ'-এর জন্য তিনি অবশ্য চারটি গান লিখেছিলেন, এগুলি বর্তমান বৎসরেই রচিত বলে আমরা এদের সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্য এই অধ্যায়েই সন্নিবিষ্ট করছি :

[১] 'রজনী পোহাইল, চলেছে যাত্রীদল' দ্র গীতবিতান ৩।৮৩৪-৩৫; তত্ত্ব° জ্যৈষ্ঠ ১৮০৬ শক। ২৫-২৬, বিভাস—ঝাঁপতাল; রবিচ্ছায়া। ১১৫-১৬ [ব্রহ্ম ১৭]; সুরটি রক্ষিত হয় নি।

[২] 'এ কি, সুগন্ধ-হিল্লোল বহিল' দ্র গীতবিতান ১।২১৩-১৪; তত্ত্ব°, ঐ। ২৬, মিশ্র-ঝাঁপতাল; রবিচ্ছায়া। ১১৬-১৭ [ব্রহ্ম ১৮]; স্বরবিতান ২৩

[৩] 'আজি এনেছে তাঁহারি আশীর্ব্বাদ' দ্র গীতবিতান ৩।৮৩৫; তত্ত্ব°, ঐ। ২৬, টোড়ি-ঝাঁপতাল; রবিচ্ছায়া। ১১৭ [ব্রহ্ম ১৯]; স্বরবিতান ৪৫

[৪] 'বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি' দ্র গীতবিতান ১।৫৮; তত্ত্ব°, ঐ। ২৬, আশা ভৈরব-ঠুংরি; রবিচ্ছায়া। ১১৭-১৮ [ব্রহ্ম ২০]; স্বরবিতান ২৬।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ১

এই বৎসরের প্রথমেই ৬ বৈশাখ [বুধ 14 Apr] নীতীন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ, হিতেন্দ্রনাথ, ক্ষিতীন্দ্রনাথ, ঋতেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ ও জ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল এই সাতজনের উপনয়ন-সংস্কার হয়। ৪ চৈত্র ১২৮৯ [শনি 17 Mar 1883] দেরাদুন থেকে এক পত্রে [দ্র পত্রাবলী। ২১০-১১, পত্র ১৩৮] মহর্ষি হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নকে এই অনুষ্ঠান-সম্পর্কে বিস্তৃত নির্দেশ পাঠান। ৩ জ্যৈষ্ঠ [বুধ 16 May] সমরেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের উপনয়ন হয়। এক্ষেত্রে অবশ্য হিন্দুরীতি অনুসৃত হয়েছিল।

বৈশাখের শেষ দিকে গুণেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা বিনয়িনী দেবীর সঙ্গে শেষেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়।[*১] এই বিবাহ হওয়ার কথা ছিল ১২৮৮ বঙ্গাব্দের প্রথম দিকে, কিন্তু গুণেন্দ্রনাথের আকস্মিক মৃত্যুর জন্য তা স্থগিত হয়ে যায়।

২৫ বৈশাখ [সোম 7 May] সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র সুপ্রকাশের জন্ম হয়। মহর্ষি মুসৌরী থেকে ২ জ্যৈষ্ঠ সারদাপ্রসাদকে একটি পত্রে লেখেন, '...সত্যপ্রসাদের একটি পুত্র-সন্তান হইয়াছে, ইহা অতি আহ্লাদের বিষয়।' [অপ্রকাশিত পত্র, রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত।]

১৪ জ্যৈষ্ঠ [রবি 27 May] হেমেন্দ্রনাথের একটি কন্যাসন্তান [? সুদক্ষিণা] জন্মগ্রহণ করেন। ১৫ জ্যৈষ্ঠের হিসাবে দেখি, 'গতরাত্রে উঁহার একটী কন্যাসন্তান হওয়ায় বিবিদাই'কে ৩৬ টাকা দেওয়া হয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে, ফাল্গুন মাসের শেষ দিকে [Mar 1884] স্বর্ণকুমারী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। সরলা দেবী লিখেছেন, 'দিদির বিয়ে হয় ষোল বৎসর বয়সে আমাদের পিসেমশায়ের [পরেশনাথ মুখোপাধ্যায়] ভ্রাতুষ্পুত্র ফণিভূষণ মুখখাপাধ্যায়ের সঙ্গে। সিমলার বাড়িতে থাকতেই ফণিদাদা পিসেমশায়ের সঙ্গে প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতেন। তখন থেকেই তাঁর দিদিকে বিয়ে করবার ইচ্ছা হয়। সেই অভিলাষ পূর্ণ করার জন্যে গিলক্রিস্ট স্কলারশিপের প্রচেষ্টায় কৃতকার্য হয়ে বিলেত যান।[*২] সেখান থেকে গবর্নমেন্টের এডুকেশন সার্ভিস নিয়ে এসে প্রথমে প্রেসিডেন্সী কলেজে বোটানির অধ্যাপক হন। ...যতদিন কলকাতায় ছিলেন দিদিরা কাশিয়াবাগানেই থাকতেন।'[৬৫] যোগেশচন্দ্র বাগল লিখেছেন, Jul 1883-তে ফণিভূষণ রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন ও সেই সময়েই হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।[৬৬] স্পষ্টতই সরলা দেবীর দেওয়া বিবরণের সঙ্গে এই তথ্যের পার্থক্য রয়েছে।

দ্বিপেন্দ্রনাথের পুত্র রবীন্দ্রনাথের 'সকল গানের ভাণ্ডারী' দিনেন্দ্রনাথের অন্নপ্রাশন হয় চৈত্র মাসের প্রথম দিকে [Mar 1884]; ২ চৈত্র 'দ্বিপুবাবুর পুত্রের অন্নপ্রাসন' বাবদে ৭০ টাকা অগ্রিম দেওয়া হয়, অবশ্য মোট ব্যয়ের হিসাব লেখা হয়েছে ২৮ চৈত্র তারিখে : 'শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পুত্র দীনেন্দ্র নাথ ঠাকুরের শুভ অন্নপ্রাসনের ব্যয়...১২২॥৩'।

দ্বিজেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা উষাবতী দেবীর সঙ্গে রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। উল্লেখযোগ্য যে, এঁরই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মোহিনীমোহনের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা সরোজার বিবাহ হয়েছিল। উপযুক্ত তথ্যের অভাবে উষাবতীর বিবাহের তারিখ বা মাসটি নির্ণয় করা শক্ত। ১২ চৈত্রের হিসাবে দেখা যায় : 'শ্রীমতী ঊষাবতী দেবীর বিবাহের হিসাবে ১০ চৈত্র তারিখে...৩১৮৲', এ থেকে অনুমান করা যায় ফাল্গুন

মাসেই বিবাহটি নিষ্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু মহর্ষির ‘নিজ স্বতন্ত্র কেশ বহি’র ৯ শ্রাবণ ১২৯১-এর হিসাবে দেখি : ‘দং শ্রীমতী ঊষাবতী দেবীর শুভবিবাহ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয় চুঁচুড়ার বাটী হইতে যৌতুক দেন ৫০০্’, মহর্ষি সাধারণত বিবাহানুষ্ঠানের কয়েকদিন পরেই এইরূপ যৌতুক দিতেন, সুতরাং মনে হতে পারে শ্রাবণ ১২৯১-এর গোড়ার দিকে [Jul 1884] ঊষাবতীর বিবাহ হয়েছিল। কিন্তু বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে পর পর দুটি ঘনিষ্ঠ স্বজন-বিয়োগের পর শ্রাবণ মাসেই বিবাহানুষ্ঠান কিছুটা অসম্ভাব্য বলে মনে হয়। তত্ত্ববোধিনী-র কার্তিক ১৮০৬-সংখ্যায় ফাল্গুন থেকে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত ‘আনুষ্ঠানিক দান’-এর তালিকায় দ্বিজেন্দ্রনাথের নামে ১৫ টাকা দানের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুনির্দিষ্ট তথ্য না পাওয়া পর্যন্ত উল্লিখিত কাল-সীমায় এই বিবাহ হয়েছিল বলে ধরে নিতে হবে। এই সময়ে ঊষাবতী দেবীর বয়স বারো বৎসর মাত্র।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ২

এই বৎসর ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুতর ঘটনা ২৫ পৌষ [মঙ্গল 8 Jan 1884] তারিখে কেশবচন্দ্রের মৃত্যু। নানা কারণে ইতিপূর্বেই তিনি বাংলাদেশের ধর্ম ও সমাজসংস্কারের বৃহত্তর ক্ষেত্র থেকে নির্বাসিত হয়ে নববিধান-এর সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তবু তাঁর বিচিত্রমুখী কর্মোৎসাহ, অপূর্ব বাগ্মিতা এবং অতীত কার্যকলাপের জন্য তিনি তখনও যথেষ্ট সম্মানিত ব্যক্তি রূপে বিবেচিত হতেন। আর সেই কারণেই তাঁর দুই প্রধান প্রতিপক্ষ আদি ও সাধারণ সমাজের মুখপত্রে তাঁর মৃত্যু উপলক্ষে গভীর আন্তরিকতাপূর্ণ শোক-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁর শূন্যস্থান দখলের জন্য নববিধানীদের মধ্যে যে ন্যক্কারজনক চক্রান্ত আরম্ভ হয়ে যায়, তা সাধারণভাবে ব্রাহ্মধর্মান্দোলনের পক্ষেই ক্ষতিকর হয়েছিল।

আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্যকলাপ এ বৎসর খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। ১ বৈশাখ [শুক্র 13 Apr 1883] মহর্ষিভবনে প্রাতঃকালে নববর্ষের উপাসনা ও ৩০ চৈত্র [শুক্র 11 Apr 1884] আদি ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে বর্ষশেষ উপাসনার কথা আগেই বলা হয়েছে। ১১ মাঘ [বৃহ 24 Jan] চতুঃপঞ্চাশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে প্রাতঃকালীন উপাসনায় বেচারাম চট্টোপাধ্যায় উদ্বোধন ও উপদেশ পাঠ করেন এবং হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন ‘স্ববক্তব্যের সহিত একটী উপদেশ’ [রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কর্তৃক ১১ মাঘ ১৭৫১ শক শনিবার 23 Jan 1830 তারিখে ব্রাহ্মসমাজের নবগৃহে প্রবেশ উপলক্ষে পঠিত বক্তৃতা] পাঠ করেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ রামমোহনের স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য যে প্রচেষ্টা আরম্ভ করেন, এই উপদেশ পাঠ সম্ভবত তারই প্রতিক্রিয়া। এই অনুষ্ঠানে গীত ৮টি ব্রহ্মসংগীতের মধ্যে ৬টি রবীন্দ্রনাথ-রচিত, অন্যগুলি হল :

রামকেলি—কাওয়ালি / প্রভু দয়াময়, কোথাহে দেখা দাও* [তত্ত্ব, ফাল্গুন। ২০৮]

গারাভৈরবী-মধ্যমান / পাপে তাপে জরজর [ঐ। ২০৯]

মহর্ষিভবনে সায়ংকালীন উপাসনায় শম্ভুনাথ গড়গড়ি উদ্বোধন করেন ও উপদেশ দেন। রবীন্দ্রনাথ-রচিত ৩টি ব্রহ্মসংগীত ছাড়া আর-একটি গান গীত হয় :

দক্ষিণী সুর—তাল একতালা / অন্তরতম সখা অন্তরে দেহ দেখা [ঐ। ২১২-১৩]

২২ ফাল্গুন [মঙ্গল 3 Mar] আদি ব্রাহ্মসমাজের ট্রাস্টীরা যে কর্মচারী নিয়োগ করেন [দ্র তত্ত্ব°, চৈত্র। ২৩৭], তার মধ্যে মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ও প্রসন্নকুমার বিশ্বাসের নাম নতুন সংযোজন, অন্যদের ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন করা হয় নি; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্পাদক এবং হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন সহকারী-সম্পাদক ও তত্ত্ববোধিনী-সম্পাদক হিসেবেই বহাল থাকেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩

এই বৎসরের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জাহাজী ব্যবসায়ের সূচনা। তাঁর পিতামহ দ্বারকানাথ এক সময়ে এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এবং 'ইণ্ডিয়া' নামে একটি সমুদ্রগামী জাহাজেরও তিনি মালিক ছিলেন। বলা চলে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অন্য পদ্ধতিতে তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন। ইতিপূর্বে তিনি ভগ্নীপতি জানকীনাথকে সহযোগী হিসেবে নিয়ে হাটখোলায় পাটের আড়ৎ করেছিলেন। সেই ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দিতেই তিনি শিলাইদহে নীল চাষ শুরু করেন ও প্রচুর লাভ করতে থাকেন। কিন্তু কৃত্রিম রাসায়নিক নীল আবিষ্কৃত হওয়ায় তিনি উক্ত ব্যবসা বন্ধ করে দেন। এখন সমস্যা দেখা দিল, এই লাভের টাকা নিয়ে তিনি কী করবেন। 'এই সময়ে একদিন হঠাৎ Exchange Gazette-এ দেখিলাম, একটা জাহাজের খোল নীলাম হইবে। ভালই হইল, এই খোলটা কিনিয়া একখানা জাহাজ তৈরি করিয়া চালান যাইবে, স্থির করিলাম। এই সময়ে আবার, কলিকাতা হইতে খুলনা পর্যন্ত রেলও হইবে, কথা ছিল। তাহা হইলেই খুলনা হইতে বরিশাল পর্যন্ত বেশ জাহাজ চালান' যাইতে পারে। খোল কেনার পক্ষে এ একটা বেশ সুযুক্তিও হইল।...ক্রমে সাত হাজারে শেষ নিষ্পত্তি হইল। আমিই সর্বোচ্চ ডাকে কিনিলাম।...বাঙ্গালায় বাঙ্গালী কর্তৃক আমিই সর্বপ্রথম "জাহাজ-চালান" প্রবর্তন করিব, এই গর্ব।'* ক্যাশবহি-তে ২৭ বৈশাখ [বুধ 9 May] তারিখে এই ক্রয়ের হিসাব পাওয়া যায় :'ব° মে° মেকেঞ্জিলাল এণ্ড কো°/দং এষ্টিমার ক্রয়ের মূল্য শোধ দিবার জন্য ১৯০৮ ন° বাঙ্গাল বেঙ্কের ৫০০০ টাকার চেকের মধ্যে ৪০০০', বাকি টাকা সম্ভবত নীলামের সময়ে নগদে মেটানো হয়েছিল। 'বুশ্‌বী (Bushby) গবর্ণমেণ্টের জাহাজসমূহের একজন ইঞ্জিনিয়ার, তাঁহাকে যোলটাকা ফী দিয়া এই খোলটি দেখান হইল, তিনি বলিলেন, "It will make a splendid steamer"...। আমি অমনি হাওড়ায় বড় বড় সব জাহাজের কারখানায় ঘুরিতে লাগিলাম, কে আমার এই জাহাজখানি প্রস্তুত করিয়া দিবে! কিন্তু তাহাদের হাতে এত বেশী কাজ ছিল যে, বড় বড় কোম্পানির মধ্যে কেহই এ কাজ লইতে স্বীকৃত হইল না। শেষে Kelso Stewart কোম্পানি এই জাহাজ-নির্মাণের ভার লইল।'[৬৭] জাহাজ নির্মাণ সম্পর্কে ক্যাশবহি-তে দুটি সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়; ১৫ শ্রাবণ [সোম 30 Jul] হিসাব :'ব° বামার লোরী কো° আপিস দ° বয়লার ক্রয়ের মূল্য শোধ...২৯৮১॥' এবং ১৬ শ্রাবণের হিসাব : 'ব° কেল্স ষ্টুয়ার্ড এণ্ড কো° এষ্টীমার মেরামত এষ্টিমেট মধ্যে ১৯২১ ন° এক চেক দেওয়া যায় ২৯২৫'। কথা ছিল কেল্স স্টুয়ার্ড কোম্পানি জাহাজটি শীঘ্রই নির্মাণ করে দেবে, কিন্তু তারা তা পারল না এবং জাহাজটি যথেষ্ট মজবুতও হল না। তাঁর বিখ্যাত মঞ্চসফল নাটকের নামানুসারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জাহাজটির নাম রাখেন 'সরোজিনী'। কিন্তু এই বিলম্ব তাঁর পক্ষে শুভ হয়নি। কারণ 'দি বেঙ্গল সেন্ট্রাল ফ্লোটিলা কোম্পানি লিঃ' নামে এক বিদেশী

জাহাজী প্রতিষ্ঠান 23 May 1884 [শুক্র ১১ জ্যৈষ্ঠ ১২৯১] তারিখ থেকে খুলনা ও বরিশালের মধ্যে যাত্রী ও মাল পরিবহনের কাজ আরম্ভ করে; রবীন্দ্রনাথের বর্ণনানুযায়ী ঐদিন 'সরোজিনী' কলকাতার জাহাজঘাটা থেকে খুলনার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছিল মাত্র। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জাহাজ দ্রুত নির্মিত হয়ে যদি আগেই কাজ শুরু করে দিতে পারত, তাহলে হয়তো ফ্লোটিলা কোম্পানি ঐ পথে ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হত না। কিন্তু দুটি জাহাজী-প্রতিষ্ঠান একই পথে জাহাজ চালাতে গিয়ে প্রতিযোগিতা ও অহেতুক জেদের বশে প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করে। কিন্তু সে আরও পরের কথা।

উল্লেখপঞ্জী

১ *The Statesman* 5 May 1883, Quoted in 'Hundred Years Ago', *The Statesman*, 5 May 1983

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৪ [১৩৮৮]। ১৬

৩ ভারতী, বৈশাখ। ৪০

৪ দ্র জীবনস্মৃতি [১৩৬৮]। ২০০-০৪

৫ জীবনস্মৃতি, [গ্র. প.] ১৭। ৪৭৭

৬ ভারতী, জ্যৈষ্ঠ। ৭১

৭ ঐ। ৭২।

৮ ঐ। ৭৪

৯ ঐ। ৯১-৯২

১০ মৈত্রেয়ী দেবী, মংপুতে রবীন্দ্রনাথ [১৩৭৪]। ১৪

১১ রবীন্দ্রস্মৃতি। ৫৪

১২ রবীন্দ্রজীবনী ১ [১৩৯২]। ১৮৩

১৩ দ্র জীবনের ঝরাপাতা। ২৮

১৪ ভারতী, শ্রাবণ। ১৮৩

১৫ ঐ।১৯২

১৬ চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধ : বি. ভা. প., মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯। ২৮৬-৮৭

১৭ রবীন্দ্রজীবনী ১।১৭০

১৮ ঐ।১৭৬

১৯ দ্র 'রবীন্দ্ররচনা-পরিচয়'। ৩৩

২০ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। ১৯৬

২১ রবীন্দ্রস্মৃতি। ৫৫

২২ জীবনস্মৃতি ১৭। ৪০৬

২৩ ঐ ১৭।৪০৬

২৪ আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস। ১১৫

২৫ জীবনস্মৃতি ১৭। ৪০৭

২৬ ঐ ১৭। ৪১০

২৭ দ্র রবীন্দ্রস্মৃতি। ৫৫

২৮ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কবির কথা [১৩৬১]। ১২

২৯ চিঠিপত্র ৮ | ৮, পত্র ১২

৩০ 'Some Celebrities', *The Modern Review*, May 1927, p. 543

৩১ ঘরোয়া। ১০৬-০৭

৩২ *The Modern Review*, May 1927, p. 543

৩৩ 'রবীন্দ্রনাথের বিবাহ-বাসর' : সমকালীন, বৈশাখ ১৩৬৪; চিঠিপত্র ১ [১৩৭২]। ৯০-৯২-এ উদ্ধৃত

৩৪ রবীন্দ্রস্মৃতি। ৫৫

৩৫ দ্র সা-সা-চ ৬। ৬৭। ১৬

৩৬ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। ১৯৬, পত্র ৩

৩৭ দ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৪৯৪

৩৮ রবীন্দ্রজীবনী ১। ১৯২

৩৯ রবীন্দ্র-কথা। ২৫৫

৪০ কবির কথা। ১১

৪১ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। ১৯৭

৪২ চিঠিপত্র ৮ । ৯, পত্র ১৩

৪৩ 'রবীন্দ্রনাথের বিবাহ-বাসর' : সমকালীন, বৈশাখ ১৩৬৪; দ্র চিঠিপত্র ১ । ৯২-৯৩

৪৪ রবীন্দ্রজীবনী ১।১৮৬

৪৫ ভারতী, পৌষ। ৪১৮-১৯

৪৬ রবীন্দ্রজীবনী ১। ১৮৬

৪৭ ভারতী, পৌষ । ৪২০

৪৮ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। ১৯৭, পত্র ৪

৪৯ জীবনের ঝরাপাতা। ৩১-৩২

৫০ চিঠিপত্র ৮। ৯, পত্র ১৩

৫১ জীবনস্মৃতি ১৭। ৪১১

৫২ দ্র চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধ : বি. ভা. প., মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯। ২৮৭

৫৩ জীবনের ঝরাপাতা। ৫৬-৫৭

৫৪ গীতবিতান : কালানুক্রমিক সূচী ১। ২৭-২৮

৫৫ ভারতী, ফাল্গুন ১৩০১। ৬৮২

৫৬ গীতবিতান : কালানুক্রমিক সূচী ১। ২৯

৫৭ গ্রন্থপরিচয়, গীতবিতান ৩। ৯৮৫

৫৮ রবীন্দ্রস্মৃতি। ৩১

৫৯ রবীন্দ্রজীবনী। ১। ১৮৬

৬০ জীবনস্মৃতি ১৭। ৪০৩

৬১ ঐ ১৭। ৪১০

৬২ রবীন্দ্রজীবনী ১। ১৯৩

৬৩ দ্র কানাই সামন্ত, 'রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি-বিবরণ/নলিনী' : বি. ভা. প., কার্তিক-পৌষ ১৩৭৫। ১৭৯-৮০

৬৪ ঐ।১৮৪

৬৫ জীবনের ঝরাপাতা। ৫৬

৬৬ ঐ। ২১১

৬৭ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি। ৭৫

---

* পুণ্যস্মৃতি। ১৭৪; ঘটনাটি সম্পর্কে কৃষ্ণ কৃপালনী লিখেছেন : 'There is an amusing anecdote preserved in the family regarding the first hunting expedition for a suitable bride. Word was received that the head of a principality in the neighbouring State of Orissa had a daughter of marriageable age to offer to the handsome young poet of aristocratic lineage. So the two brothers, Jyotirindranath and Rabindranath, set out to see her and were invited to the ruler's palace.'—*Rabindranath Tagore: A Biography* [1980], p. 114.

* প্রাণাধিক রবি

তুমি অবিলম্বে এখানে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। অনেকদিন পরে তোমাকে দেখিয়া আমার মন অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিবে'। তুমি সঙ্গে একটা বিছানা এবং একটা কম্বল আনিবে। তুমি এই পত্র জ্যোতিকে দেখাইয়া সরকারি তহবিল হইতে এখানে আসিবার ব্যয় লইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর রেলগাড়ির Return Ticket লইবে। আমার স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ইতি ২২ ভাদ্র ৫৪ [ব্রাহ্মসংবৎ, ১২৯০]

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

মসূরী

—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। ১৯৫-৯৬

* লক্ষণীয়, বাক্যটি রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি থেকে প্রায় অবিকল উদ্ধৃত।

* রবীন্দ্রনাথ গিরিদুর্গটিকে শিবাজির বলে উল্লেখ করেছেন, সেটি সম্ভবত ভুল।

*১ এই তথ্য সম্ভবত ঠিক নয়। ক্যাশবহি-তে ১৯ পৌষ 'গুঃ রবীবার সাল ১৭৫ ও গরদ ৩০ একুনে ২০৫ মধ্যে ১০০ ও গোপাল চক্রবর্তী ৪৮/১৪৮' এবং ২৪ পৌষ 'দ° সালের জোড়া ও বেনারসী জোড়ের মূল্য ২০৫ টাকার বাকী শোধ দেওয়া যায়...৫৭' প্রভৃতি হিসাব দেখা যায়। অনুমান করতে পারি, মূল্য পরে পরিশোধ করা হলেও বিবাহের প্রয়োজনেই এগুলি কেনা হয়েছিল।

*২ গানটি স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনা, দ্র বসন্ত-উৎসব, ২য় অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্ক, সিন্ধু-ভৈরবী—আড়া।

* রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন, 'তার পর সেই যে ঐ বাড়ি ত্যাগ করিয়া বাহির হইলেন, মৃত্যুর অত্যল্পকাল পূর্ব ব্যতীত আর সেখানে আসিয়া কখনো বাস করেন নাই।' [রবীন্দ্রজীবনী ১।১৯১]—একথা ঠিক নয়। ক্যাশবহি থেকে জানা যায় যে, তিনি ১৫ মাঘ জোড়াসাঁকোয় এসেছিলেন। তাছাড়া '[২০ ফাল্গুন রবি 3 Mar] মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই দিন চুঁচুড়া হইতে কলিকাতা যাইতেছিলেন—স্থানীয় ব্রাহ্মদিগের আগ্রহ অতিক্রম করিতে না পারিয়া মহর্ষি সে দিন নৌকার উপর গঙ্গাবক্ষে কোন্নগর ঘাটে অবস্থিতি করেন।'—তত্ত্বকৌমুদী-র [৬।২৩, ১ চৈত্র। ২৭৫] এই বর্ণনা থেকে জানা যায় তিনি সেই সময়ে আরও একবার কলকাতায় অথাৎ জোড়াসাঁকোতে এসেছিলেন।

* '২৩৭ নং লোয়ার সার্কুলার রোড-এর বাড়ি, সত্যেন্দ্রনাথ ভাড়া লইয়াছিলেন।'—জীবনস্মৃতি ১৭।৪১১, পাদটীকা ৩; লোয়ার সর্ক্যুলর রোডে ভুবনমোহন দাসের বাড়ী...আমরা সংক্ষেপে তাকে ভবানীপুরের বাড়ী বলতুম...নম্বরটা এখনো মনে হচ্ছে যেন ২৩৪ না ৩৫।'—ইন্দিরা দেবীর অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা; প্রিয়নাথ সেনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের দুটি পত্রে '১৪ নং South Circular Road'-এর উল্লেখ আছে, দ্র চিঠিপত্র ৮।৫ ও ৬, পত্র ৭ ও ৮

* গীতবিতান-এর সম্পাদক জানিয়েছেন : 'বিবাহ-উৎসবের যে মুদ্রিত প্রতি আমরা পাইয়াছি তাহার প্রচ্ছদে বা ভিতরে কোথাও কোনো রচয়িতার নাম নাই।' [পৃ ৯৮৪] কিন্তু জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত একটি গ্রন্থের প্রচ্ছদে আছে : 'বিবাহ-উৎসব।/ (গীতি-নাট্য।)/ শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত।/ কাশিয়াবাগান।/ শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।/ কাশিয়াবাগান।/ কলিকাতা,/বহুবাজার, শ্রীনাথ দাসের লেন, ১৭নং ভবনে,/বি, কে, দাস এবং কোম্পানির যন্ত্রে,/শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।/মূল্য।০ চারি আনা।'—এর মধ্যে 'শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। কাশিয়াবাগান।' ও 'শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।/কাশিয়াবাগান।' শব্দগুলি দুটি স্বতন্ত্র ফালি কাগজে ছেপে সেঁটে দেওয়া হয়েছে। বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় গ্রন্থটি প্রকাশের তারিখ 13 May 1982 [১ জ্যৈষ্ঠ ১২৯১] হলেও এটি যে অভিনয়-পত্রী হিসেবে পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল তার প্রমাণ ভারতী, পৌষ ১২৯৯ সংখ্যায় [পৃঃ ৫২৬] মুদ্রিত একটি মন্তব্য : 'মহিলাশিল্পমেলায় অভিনীত হইবার উদ্দেশ্যে "বিবাহ উৎসব" পুস্তক ছাপাইবার পূর্ব্বে....ইত্যাদি'।

* 'সাবিত্রী লাইব্রেরী/ ৬ষ্ঠ ও ৭ম বাৎসরিক বিবরণী/ ও/ পুস্তকের তালিকা।/ সংস্থাপিত—১২৮৬ সাল।/ কলিকাতা,/ বহুবাজার, ১৮নং অক্রূর দত্তের গলি।/ ৯ই চৈত্র ১২৯২ সাল।/ 78, College Street, People's Press.' পৃ 8-9

* কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক বসন্তবিহারী চন্দ্র রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী বৎসরে এই বিশেষ কপিটি রবীন্দ্রভারতী-কে উপহার দেন। ড সুকুমার সেন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ৩য় খণ্ডে [১৩৬৮] এই সংযোজনের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ও শেষ পৃষ্ঠাটির প্রতিলিপি দেন।

*১ দ্র ২৩ বৈশাখের [শনি 5 May]-হিসাব : 'বাবু গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহের মাছ দধি সন্দেশ দিগর আসায়...৩্'

*২ ফণিভূষণ 'বিলাতে ছাত্রজীবন' প্রবন্ধে লিখেছেন, '১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এক দিন আমাদিগের জাহাজ লণ্ডনে পৌঁছিল।' [ভারতী, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১২৯১।৮৩] উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথও এই মাসেই লণ্ডনে পৌঁছন। উভয়ের মধ্যে কি কোনো যোগাযোগ ঘটেছিল?

* গানটি রবিচ্ছায়া-র ১৩৮ পৃষ্ঠায় [ব্রহ্ম ৪৭] ও গান [1909] গ্রন্থে সংকলিত এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-প্রকাশিত 'ব্রহ্মসঙ্গীত' সংকলনের সূচীপত্রে রবীন্দ্রনাথ-রচিত বলে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু গীতবিতান-এ বর্জিত গানের তালিকার [পৃ ৯৬৯] গানটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা ও তৎসম্পর্কিত প্রমাণ হিসেবে তত্ত্ববোধিনী, আশ্বিন ১৮৩৭ শক। ১১৫-র উল্লেখ দেখা যায়। প্রথম সংস্করণ [১৩৩৮] গীতবিতান-এর (খ) পরিশিষ্টে গানটি * চিহ্নিত।

* জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি। ৭৪-৭৫; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সুলভ সমাচার' [21 Jun 1879] থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের একজন পূর্বসূরীর সংবাদ উদ্ধৃত করেছেন : 'ভবানীপুরের শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী কলিকাতা হইতে কাল্না পর্য্যন্ত যাত্রী ও মাল যাতায়াতের জন্য দুইখানি ষ্টীমার চালাইতেছেন...।' দ্র সা-সা-চ। ৬।৬৮।৩৯

চতুর্বিংশ অধ্যায়

১২৯১ [1884-85] ১৮০৬ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের চতুর্বিংশ বৎসর

মহর্ষিভবনে আদি ব্রাহ্মসমাজের নববর্ষ-উৎসবের জন্য রবীন্দ্রনাথ চারটি ব্রহ্মসংগীত রচনা করেন : 'রজনী পোহাইল চলেছে যাত্রীদল', 'এ কি সুগন্ধ হিল্লোল বহিল', 'আজি এনেছে তাঁহারি আশীর্বাদ' ও 'বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি'। গানগুলিতে একটি আশার সুর শোনা যায়, কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই মৃত্যুর প্রচণ্ড আঘাত তাকে চূর্ণ করে দিল। রবীন্দ্রনাথ যাঁকে 'জীবনের ধ্রুবতারা' বলে সম্বোধন করেছিলেন, সেই নতুন বউঠান কাদম্বরী দেবী পঁচিশ বছর পূর্ণ হবার আগেই আত্মহত্যা করলেন। ঠাকুর-পরিবারে আধুনিকতার মুক্ত হাওয়া প্রবাহিত করে দেবার ক্ষেত্রে মহর্ষির পুত্রবধূদের মধ্যে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর পরেই কাদম্বরী দেবীর স্থান। এক সময়ে তিনি লোকলজ্জাকে তুচ্ছ করে স্বামীর পাশাপাশি চিৎপুরের রাস্তায় ও গড়ের মাঠে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতেন; জোড়াসাঁকোর বহির্বাটির ত্রিতলে তাঁর বানানো 'নন্দনকানন' সংগীত ও সাহিত্য-চর্চায় নিত্য মুখরিত হয়ে উঠত; ভারতী-গোষ্ঠীর তিনি ছিলেন মক্ষীরানী, শরৎকুমারী চৌধুরানীর ভাষায় : 'ফুলের তোড়ার ফুলগুলিই সবাই দেখিতে পায়, যে-বাঁধনে তাহা বাঁধা থাকে, তাহার অস্তিত্বও কেহ জানিতে পারে না। মহর্ষি-পরিবারের গৃহলক্ষ্মী শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী ছিলেন এই বাঁধন।'[১] বিহারীলাল এঁরই প্রদত্ত হাতে-বোনা 'সাধের আসন' অবলম্বন করে ঐ নামের কাব্যগ্রন্থ [১২৯৫-৯৬] রচনা করেন; রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি, ছেলেবেলা এবং বিভিন্ন রচনায় ও কথোপকথনে এই নারীর প্রতি তাঁর অকৃত্রিম অনুরাগ ও শ্রদ্ধার কথা জানিয়েছেন। সুতরাং তাঁর আত্মহনন স্বভাবতই সকলের কৌতূহল উদ্রেক করে। কিন্তু মৃত্যুর যথার্থ কারণ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ব্যক্তিরা এমন সুকঠোর নীরবতা অবলম্বন করেছিলেন যে ঐ স্বাভাবিক কৌতূহল প্রায়শই অসুস্থ বিকারের চেহারা নিয়েছে ও অনেক মুখরোচক গালগল্পের জন্মদান করেছে। এর মধ্য থেকে প্রকৃত তথ্যের উদ্‌ঘাটন আজ দুরূহ, এমন-কি অসম্ভবও বলা যেতে পারে।

রবীন্দ্রজীবনী-কার পূর্বে লিখেছিলেন : 'কাদম্বরী দেবীর আকস্মিক মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে লোকে বহুরূপ কল্পনা করিয়া থাকেন—আমাদের যতদূর জানা আছে তাহা মহিলাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের পরিণাম'[২], কিন্তু পরবর্তী সংস্করণে তিনি আরও কয়েকটি লোকশ্রুতির উল্লেখ করেছেন— তার মধ্যে অন্যতম কাজী আবদুল ওদুদ-সংগৃহীত একটি তথ্য।[৩] ওদুদ লিখেছেন, '...এ-সম্বন্ধে আর একটু স্পষ্ট বিবরণ আমরা শ্রীযুক্ত অমল হোমের কাছ থেকে পেয়েছি—তিনি পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের ছোটদিদি বর্ণকুমারী দেবীর কাছ থেকে, বোধ হয় ১৯৪৬ সালে। বিবরণটি এই : জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ধোপার বাড়িতে দেওয়া জোব্বার পকেটে সেইদিনের একজন বিখ্যাত অভিনেত্রীর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতার পরিচায়ক কতকগুলো চিঠি পাওয়া যায়। সেই চিঠিগুলো পেয়ে কাদম্বরী দেবী ক'দিন বিমনা হয়ে কাটান। সেই চিঠিগুলোই তাঁর আত্মহত্যার কারণ এই কথা নাকি

কাদম্বরী দেবী লিখে গিয়েছিলেন। তাঁর সেই লেখাটি ও চিঠিগুলো সবই মহর্ষির আদেশে নষ্ট করে ফেলা হয়।' কিন্তু ওদুদ পাদটীকায় লিখেছেন : 'ঠাকুরবাড়ির একজন খ্যাতনামা ব্যক্তির মুখে শুনেছি, যে মহিলার সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গতা জন্মেছিল তিনি অভিনেত্রী ছিলেন না, এবং তাঁর সঙ্গে এই অন্তরঙ্গতার জন্য কাদম্বরী দেবী আরও একবার (রবীন্দ্রনাথের বিবাহের পূর্বে) আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন।'[৪] এ-বিষয়ে অমল হোমের কোনো লেখা আমরা দেখি নি, সুতরাং বর্ণকুমারী দেবীর মুখে তাঁর শোনা কথা এবং তাঁর মুখে ওদুদ সাহেবের শোনা কথা—যার কিছু গুরুতর অংশ সম্বন্ধে ঠাকুরবাড়িরই একজন অনুল্লিখিত 'খ্যাতনামা ব্যক্তি' অন্যরকম বলেছেন—কতখানি নির্ভরযোগ্য সে-সম্বন্ধে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। তাছাড়া আত্মহত্যার কারণ বিবৃত করতে গিয়ে স্বামীর চরিত্র সম্বন্ধে সোজাসুজি ইঙ্গিত করা কাদম্বরী দেবীর মতো সূক্ষ্মরুচি-সম্পন্না মহিলার পক্ষে কতখানি স্বাভাবিক এবং যে-চিঠি করোনারের ফাইলে রক্ষিত হওয়ার কথা তা মহর্ষির আদেশে কি করে নষ্ট করা হল এ-সব প্রশ্ন অবশ্যই বিবেচ্য।

জগদীশ ভট্টাচার্য এ-প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা ভগিনী সুনয়নী দেবীর একটি বক্তৃতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেছেন : 'আর একদিনের কথা মনে আছে। যেদিন জ্যোতিকাকার স্ত্রী কাদম্বিনী [কাদম্বরী] দেবী মারা যান। আপনারা জানেন তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। কারণটা আমরা ঠিক জানি নে। তবে শুনেছি জ্যোতিকাকার সঙ্গে তাঁর কি নিয়ে মনোমালিন্য হয়েছিল। সেই সময়ে আমাদের বাড়িতে এক কাপড়উলী প্রায়ই কাপড় বেচতে আসত। তার নাম ছিল বিশু। তাকে টাকা দিয়ে তিনি লুকিয়ে আফিম আনান—তাই খেয়ে আত্মহত্যা করেন। আমরা এ বাড়ির জানালা থেকে দেখছি। ঘরে তাঁর মৃতদেহ পড়ে আছে। সারা বাড়িতে শোকের ছায়া। পরে পুলিশ এসে সেই মৃতদেহ নিয়ে যায় এবং ময়নাতদন্তে পাকস্থলীতে আফিম পাওয়া যায়।'[৫] এই বক্তব্যের প্রথমাংশের যাথার্থ্য নিরূপণ করা আজ দুঃসাধ্য, কিন্তু পুলিশ এসে যে তাঁর মৃতদেহ মর্গে নিয়ে যায় নি, ময়নাতদন্ত যদি হয়ে থাকে তা জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই হয়েছিল, তৎ-সম্পর্কিত প্রমাণ আমরা কিছু পরেই উপস্থাপন করব।

ইন্দিরা দেবীর অপ্রকাশিত স্মৃতিকথায় বিষয়টি এই ভাবে বর্ণিত হয়েছে : 'নতুন কাকিমার মৃত্যু আমাদের যোড়াসাঁকোর বাল্যজীবনে প্রথম শোকের ছায়া ফেলে বলে মনে হয়। তখন আমরা ত বিশেষ কিছু বুঝতুম না। তবে রবিকাকাকে খুব বিমর্ষ হয়ে বসে থাকতে দেখতুম। আর শুনেছিলুম (তখন না পরে?) যে তিনি আফিম খেয়ে আত্মহত্যা করে ছিলেন। কেন, তা' পরে অনুসন্ধান করেও পরিষ্কার জানতে পারিনি। তবে একবার শুনেছিলুম যে, জাহাজে যাওয়া নিয়ে কি এক মনোমালিন্য ঘটেছিল। জ্যোতিকাকামশায় যে জাহাজের ব্যবসা ধরেছিলেন, সেই জাহাজে একদিন গান-বাজনা আমোদ প্রমোদ কি হবে, তাই নতুনকাকিমাকে পরে নিয়ে যাবার কথা ছিল; কিন্তু ভাঁটা পড়ে' যাওয়াতে জ্যোতিকামশায় বুঝি নিতে আসতে পারেন নি। শুধু এইটুকুর জন্য অমন প্রচণ্ড আঘাত ও অভিমান ত আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে স্বাভাবিক বলে' মনে হয়না। তবে ভিতরে আরও কিছু হয়ত ছিল যা' এখন জানবার সম্ভাবনাও নেই, প্রয়োজনও নেই যদিও অনেকের দেখি এ বিষয়ে বিশেষ কৌতূহল আছে।'

ইন্দিরা দেবীর এই উক্তির পর আমাদের কৌতূহল-প্রবৃত্তির কিছুটা উপশম হওয়া উচিত, কিন্তু কয়েকটি আনুষঙ্গিক বিষয় আলোচনা করে নেওয়া প্রয়োজন। জগদীশ ভট্টাচার্য তাঁর কবিমানসী প্রথম খণ্ডে ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রজীবনী প্রথম খণ্ডের নবতম সংস্করণে কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যার জন্য প্রায়

সরাসরি জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে দায়ী করেছেন। উপরের উদ্ধৃতিগুলিতেও তাঁর নাম বারবার উচ্চারিত হয়েছে। অবশ্য তেমনভাবে দেখলে তাঁর অন্তত পরোক্ষ দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন বিচিত্রকর্মা পুরুষ। নাট্য-রচনা ও অভিনয়, সংগীত-চর্চা, ভারতী-প্রকাশ ইত্যাদি সাংস্কৃতিক কাজকর্মের সঙ্গে পাট, নীল ও জাহাজী ব্যবসায়ের বিপুল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তিনি আত্মহারা ভাবে জড়িত ছিলেন। তাছাড়া দ্বিজেন্দ্রনাথের বৈষয়িক বুদ্ধির অভাবের জন্য অত্যন্ত অল্প বয়স থেকেই জমিদারির ও আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের দায়িত্ব তাঁকে বহন করতে হয়েছে। অপরপক্ষে কাদম্বরী দেবী ছিলেন নিঃসন্তান; মহর্ষির পুত্র ও কন্যাদের ঘর যখন শিশুর কলকাকলিতে মুখর, তখন তিনি বাহির-তেতালার ছাদে উদ্যান-রচনা, পশুপক্ষী-পালন ইত্যাদির মধ্যে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে চেয়েছেন। মধ্যে কিছুদিন স্বর্ণকুমারী দেবীর কনিষ্ঠা কন্যা ঊর্মিলাকে নিজের মেয়ের মতো করে তিনি লালন করেছিলেন, কিন্তু তার অকালমৃত্যুতে সেই সান্ত্বনার আশ্রয়টুকুও দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। মাতৃহারা দেবর রবীন্দ্রনাথকে তিনি প্রায় মাতার স্নেহেই যত্ন করেছেন, স্নেহ-বুভুক্ষু রবীন্দ্রনাথও তাঁকে এক সময়ে একান্তভাবেই আশ্রয় করেছিলেন—কিন্তু তাঁর ক্রমবর্ধমান কবিখ্যাতি, জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর পরিবারের মুক্ত আবহাওয়া তাঁকেও ধীরে ধীরে কাদম্বরী দেবীর স্নেহচ্ছায়ার বাইরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এই অবস্থায় স্বামীর প্রতিমুহূর্তের সাহচর্য তাঁর কাছে অপরিহার্য ছিল। বিশেষত আমরা দেখেছি, ১২৯০ বঙ্গাব্দের আষাঢ় থেকে ভাদ্র তিনি যথেষ্ট অসুস্থ ছিলেন। যদিও তার অব্যবহিত পরেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁকে কারোয়ারে বেড়াতে নিয়ে গেছেন, তবু মনে হয় এক ধরনের একাকীত্বের বোধ তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। আর ঠিক সেই সময়েই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জাহাজ নির্মাণ ও চালু করার ব্যাপারে প্রচণ্ড রকম ব্যস্ত। আমাদের ধারণা, এই অবস্থার মধ্যেই সামান্য কোনো কথা-কাটাকাটি বা অন্য কোনো তুচ্ছ উপলক্ষে কাদম্বরী দেবীকে আত্মহত্যার নিদারুণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে প্ররোচিত করেছিল। নতুবা মহর্ষির পুত্রদের মধ্যে নৈতিকতার এমন একটি উচ্চ আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায় যে, সেখানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চারিত্রিক দুর্বলতার সম্ভাবনা কোনো সুনিশ্চিত প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের কাছে অবাস্তব বলে মনে হয়। তাছাড়া সেক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজেরই দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী শাখা ও গোঁড়া হিন্দুদের মুখপত্রসমূহ এমন ছিদ্রান্বেষণের সুযোগ সহজে হাতছাড়া করত না। মনে রাখা দরকার, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য অক্ষয় চৌধুরীর লেখা 'অভিমানিনী নির্ঝরিণী' কবিতা ও বিহারীলালের 'সাধের আসন' কাব্যের অংশবিশেষে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনৈতিকতার ইঙ্গিত নিয়ে যে জল্পনা করেছেন, তা খানিকটা পূর্বনির্ধারিত বলে মনে হয়।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ৮ বৈশাখ ১২৯১ [শনি 19 Apr] কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু-তারিখ বলে উল্লেখ করেছেন এবং তারিখটি বর্তমান প্রসঙ্গে প্রায় সর্বত্রই উল্লিখিত হয়। কিন্তু রবীন্দ্রজীবনী-কার তাঁর সংবাদ-সূত্রের উল্লেখ করেন নি, তাছাড়া বলেন্দ্রনাথ যে খাতায় পারিবারিক রাশিচক্র সংকলন করেছিলেন সেখানে 'মৃত্যু' কথাটি লিখেও তারিখের স্থানটি শূন্য রেখেছেন। সুতরাং মৃত্যু-তারিখটি যাথার্থ্য একটু সন্দেহের বিষয় হয়ে পড়ে; বিশেষত কাদম্বরী দেবীর চিকিৎসা বিষয়ে ক্যাশবহি-তে যে ব্যাপক ও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় তাতে মনে হয়, সুনয়নী দেবীর বর্ণনা-মতো আফিম-সেবনের ফলে মৃত অবস্থায় তাঁর দেহ আবিষ্কৃত হয় নি, তাঁর জীবনরক্ষার জন্য বহু ডাক্তার প্রাণপণ চেষ্টা করার সুযোগ পেয়েছেন—অবশ্য বলা বাহুল্য যে তাঁদের প্রয়াস শেষ পর্যন্ত সার্থক হয়নি। এই চিকিৎসা-সম্পর্কে ক্যাশবহি-তে বহু হিসাব দেখা যায়, কৌতূহলী পাঠকদের

অনুসন্ধিৎসা চরিতার্থ করার জন্য আমরা তার অনেকগুলিই এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। ৮ ও ৯ বৈশাখ ক্যাশবহি-তে কোনো হিসাবই লেখা হয় নি, এতে বোঝা যায় পারিবারিক এই দুর্যোগের ফলে উক্ত দুদিন সেরেস্তার কাজকর্ম বন্ধ ছিল। এরপর ১৩ বৈশাখ [বৃহ 24 Apr] চিকিৎসা-বিষয়ে প্রথম হিসাবটির সাক্ষাৎ মেলে : 'ব° ডাক্তার ডি, বি, এস্মিথ [Dr. D. B. Smith] দং নূতন বধূ ঠাকুরাণীর চিকিৎসা করায় ফি শোধ বিঃ ১৯৫৩ ন° বাঙ্গাল বেঙ্কের এক চেক গুঃ খোদ হস্তে সোভারাম সিং ৪০০্'; এরপর ১৯ জ্যৈষ্ঠ : 'শ্রীমতী নূতন বধূ ঠাকুরানীর পীড়া হওয়ায় নগদ ঔষধি ক্রয় ও দাইয়ের ফি/ঔষধ আনিতে ও ডাক্তার আনিতে জাতাতের গাড়ি ভাড়া প্রভৃতি ব্যয় ইস্তক ৯ না° ১৩ বৈশাখ বিঃ ১ বৌচর ২৫।ল৬', 'উক্ত বধূ ঠাকুরাণীর পীড়া উপলক্ষে তেতালার ঘরে আলোর জন্য বাতিক্রয় বিঃ ১ বৌচর ১।৬' এবং 'শ্রীমতী নূতন বধূ ঠাকুরানীর পীড়ার জন্য রাত্রে ডাক্তর নীলমাধব হালদার ও সতীশ[চন্দ্র মুখোপাধ্যায়] বাবু মহাশয় এবাটীতে থাকায় উঁহাদের জল-খাবার ও আহারের ব্যয় বিঃ ১০ বৈশাখের ১ বৌচর ৩ল৩'; ২৪ আষাঢ় :'ব° ভগ্বৎচন্দ্র রূদ্র ডাক্তার দং নুতন বধূ ঠাকুরাণীর চিকিৎসা করায় ফি শোধ (রাত্রে থাকার) বি: একবিল ৬২' ও 'ব° উইলসন হটেল দং নূতন বধূ ঠাকুরানীর পিড়ার সময় ডাক্তার বাবুরা ও সতীশবাবু ও সত্যবাবুদিগের এখানে থাকায় উইলসেনের বাটী হইতে ২ দিবস খাবার আসায় তাহার মূল্য শোধ...৩৮্' ইত্যাদি। এই হিসাবগুলি থেকে কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর তারিখটি নির্দিষ্ট করা সম্ভব না হলেও, অনুমান করা যায় ৮ ও ৯ বৈশাখ দুদিন ডাক্তাররা তাঁর জীবন রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সম্ভবত ৯ বৈশাখ [রবি 20 Apr] রাত্রে বা ১০ বৈশাখ [সোম 21 Apr] প্রভাতে তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

অস্বাভাবিক মৃত্যু বলেই পুলিশকে জানাবার দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল। কিন্তু সম্ভবত মহর্ষির পরিবারের উচ্চ মর্যাদার জন্যই কাদম্বরী দেবীর মৃতদেহ মর্গে প্রেরিত হয় নি, পরিবর্তে করোনার কোর্ট বসেছিল জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই। তথ্যটি ক্যাশবহি-তে একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে, তার মধ্যে ১৪ বৈশাখ ও ৩১ বৈশাখের হিসাব-দুটি উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট : 'নূতন বধূ ঠাকুরাণীর মৃত্যু হওয়ার দরুণ ব° বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় দং কাঁউসেলের ফি ৫১/ কেমিকেল এগজামিনার আসায় গাড়ি ভাড়া ২/ করোনারের ক্লার্কর গাড়ি ভাড়া ২/ উহাদিগে্র জন্য ব্রাণ্ডি ৩ ০/৫৮ ০' এবং '...করনার সাহেব বাটীতে আসিয়া তদারক করিবার দরুণ ফি ৫১্ টাকা/গাড়ি ভাড়া ইত্যাদি ৭ ০ একুনে ৫৮ ০'। করোনার নিশ্চয়ই এই মৃত্যু সম্পর্কে কোনো রিপোর্ট লিখেছিলেন, যা হয়তো আজও কোনো সরকারী দপ্তরে রক্ষিত আছে। এই রিপোর্টটি উদ্ধার করতে পারলে কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু সম্পর্কে আরও নির্দিষ্ট তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব বলে মনে করি।

পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের তত্ত্বাবধানে নিমতলা ঘাটের শ্মশানে কাদম্বরী দেবীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যথোচিত মর্যাদা-সহকারে সম্পন্ন করা হয়। এ-প্রসঙ্গে ১৯ জ্যৈষ্ঠ তারিখে লিখিত কয়েকটি হিসাব [প্রত্যেকটিতেই 'বিঃ ১১ বৈশাখের ১ বৌচর' কথাটি উল্লিখিত] : 'নূতন বধূ ঠাকুরাণীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার ব্যয়/কাঠ খাট ঘৃত চন্দন কাষ্ঠ ধুনা (শবদাহন জন্য) প্রভৃতি ক্রয় ও হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন নিমতলার ঘাট জাতাতের গাড়ি ভাড়া ব্যয়...১৩ল৯', 'অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাধা করিয়া বাটীতে আসার পর যাহারা শবদাহন করিতে গিয়াছিল তাহাদের জলখাবার ব্যয়...১।৹', 'অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার পর স্নান করিয়া পরিধানের জন্য বাটীর রশুয়ে ব্রাহ্মণ ৩ জনের ধুতি উড়ানী ক্রয়...৩্', 'শবদাহন করায় ও তথায় উপস্থিত থাকায় বাটীর রশুয়ে ব্রাহ্মণ ৩ জনের খোরাকী ব্যয়...৷৷

ল০' এবং 'সোমবাবু দ্বিপুবাবু রবীবাবু অরুবাবু ও দ্বিপুবাবু মহাশয়ের স্ত্রী সকলের পরিধানের জন্য কাপড় ক্রয়...১১৷০'। শেষ হিসাবটি থেকে বোঝা যায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ে সোমেন্দ্রনাথ, দ্বিপেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও অরুণেন্দ্রনাথ শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন।

আশ্চর্যের বিষয়, সমকালীন যে-ক'টি পত্রিকা আমরা দেখার সুযোগ পেয়েছি তার কোনোটিতেই কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু-সংবাদ প্রকাশিত হয় নি। এ-বিষয়ে ২৮ জ্যৈষ্ঠ ক্যাশবহি-তে একটি হিসাব দেখা যায় : 'ব° কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায় দং ঁনূতন বধূ ঠাকুরাণীর মৃত্যু হওয়ায় খবরের কাগজে উক্ত সম্বাদ নিবারণ করার জন্য ব্যয় বিঃ ১ বৌচর...৫২'।—এই কারণেই কি কোনো সংবাদ পত্রিকাতে প্রকাশিত হয় নি?

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কাদম্বরী দেবীর সম্পর্ক কতখানি ঘনিষ্ঠ ছিল, তা আমরা বিভিন্ন প্রসঙ্গে আগেই লক্ষ্য করেছি। সুতরাং এই মৃত্যুশোক তাঁর কাছে কতটা বেদনাদায়ক হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। রবীন্দ্রনাথও প্রায় সারাজীবন এই শোককে বিভিন্ন ভাবে স্মরণ করেছেন। এতদিন পর্যন্ত মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না। মায়ের মৃত্যু যখন ঘটেছিল তখন তিনি নিদ্রিত, বড়ো বউঠাকুরানী সর্বসুন্দরী দেবীর মৃত্যুর সময়ে তিনি আমেদাবাদে অবস্থান করছেন, জ্যেষ্ঠ ভগ্নীপতি সারদাপ্রসাদের মৃত্যু হয় তাঁর বিবাহের রাত্রে শিলাইদহে। কিন্তু কাদম্বরী দেবীর যন্ত্রণাকাতর মৃত্যু ঘটল তাঁর চোখের সামনে; এইজন্যই জীবনস্মৃতি-র 'মৃত্যুশোক' অধ্যায়ে লিখেছেন : 'ইতিপূর্বে মৃত্যুকে আমি কোনোদিন প্রত্যক্ষ করি নাই।...কিন্তু আমার চব্বিশবছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে-পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদশোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে। শিশুবয়সের লঘু জীবন বড়ো বড়ো মৃত্যুকেও অনায়াসেই পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া যায়—কিন্তু অধিক বয়সে মৃত্যুকে অত সহজে ফাঁকি দিয়া এড়াইয়া চলিবার পথ নাই। তাই সেদিনকার সমস্ত দুঃসহ আঘাত বুক পাতিয়া লইতে হইয়াছিল।[৬]

এই বেদনার সুস্পষ্ট পরিচয় রয়েছে 'পুষ্পাঞ্জলি' নামক সমসাময়িক রচনাটিতে। এটি যদিও মুদ্রিত হয়েছিল ভারতী-র বৈশাখ ১২৯২ সংখ্যায় [পৃ ৪-১৩], কিন্তু এটির রচনাকাল অন্তত ভাদ্র ১২৯১-র পূর্ববর্তী, কারণ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত 'পুষ্পাঞ্জলি'-র পাণ্ডুলিপির [অভিজ্ঞান সংখ্যা ৮৫] অন্তর্গত 'তোরা বসে গাঁথিস্ মালা' [পাণ্ডুলিপি-পৃষ্ঠা : 9] গানটি 'হায়' শিরোনামে ভারতী-র ভাদ্র-সংখ্যায় [পৃ ১৯১-৯২] প্রকাশিত হয়। রচনাটি সম্ভবত একটানা লেখা নয়, ডায়ারির মতো এক-এক দিনে একটি বা দুটি করে অনুচ্ছেদ, কবিতা বা গান লিখিত হয়েছে—সব-কটি রচনাই কাদম্বরী দেবীর স্মৃতি-সুরভিত। এ-কথার সাক্ষ্য রচনাটির মধ্যেই রয়েছে : 'হে জগতের বিস্মৃত, আমার চিরস্মৃত,...এ-সব লেখা যে আমি তোমার জন্য লিখিতেছি। পাছে তুমি আমার কণ্ঠস্বর ভুলিয়া যাও, অনন্তের পথে চলিতে চলিতে যখন দৈবাৎ তোমাতে আমাতে দেখা হইবে তখন পাছে তুমি আমাকে চিনিতে না পার, তাই প্রতিদিন তোমাকে স্মরণ করিয়া আমার এই কথাগুলি তোমাকে বলিতেছি, তুমি কি শুনিতেছ না!'[৭]

কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পরেই 'ভারতী' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তত্ত্ববোধিনী জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথের লেখা 'স্থান-মান' [পৃ ২৮-৩৭][*১] প্রবন্ধটির পাদটীকায় [পৃ ২৮] লেখা হয়, "ভারতী বিশেষ কারণে আর প্রকাশ হইবে না। কিন্তু স্থান-মান প্রস্তাবটী প্রকাশ হওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়া আমরা আপাতত ভারতীতে যতটুকু প্রকাশ হইয়াছিল তাহা এই স্থলে গ্রহণ করিলাম।"

এই সিদ্ধান্ত অবশ্য শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হয় নি। স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী-র সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হিন্দু পেট্রিয়ট-এ [Vol. XXXI, No. 21, 26 May, p. 249] দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বাক্ষরে এ-বিষয়ে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় : 'BHARATI/The public are hereby informed that the "Bharati" Magazine has been transferred to Srimati Swarna Kumari Devi from the 12th April 1884. The present Proprietor and Editor has appointed Babu Satis Chandra Mukherji Manager, to whom all communications should in future be addressed at 5 Kashia Bagan Garden House, Ultadingee Calcutta. There will be no change in the staff of contributors./Sd. DWIJENDRA NATH TAGORE'.

কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পূর্বেই সম্ভবত ভারতী-র বৈশাখ-সংখ্যার ৫টি ফর্মা [৪০ পৃষ্ঠা] ছাপা হয়ে গিয়েছিল, ৪১ পৃষ্ঠা থেকে 'জ্যৈ ১২৯১' চিহ্নিত হয়ে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা যুগ্মসংখ্যা রূপে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ দিকে[*২] স্বর্ণকুমারী দেবীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। প্রারম্ভে তাঁর লিখিত ৮ পৃষ্ঠার একটি 'ভূমিকা' সংযোজিত হয়; অন্যান্য বিষয়ে পূর্ব-অবলম্বিত পদ্ধতি অনুসরণের সংকল্প ঘোষণা করে তিনি লেখেন, 'আমরা এখন হইতে বিজ্ঞানের মাত্রা কিছু বাড়াইতে ইচ্ছা করি—আমাদের মতে বিজ্ঞান শিক্ষার বিশেষ উপকারিতা আছে এবং আজকাল এদেশে বিজ্ঞান আলোচনার কতক অনুরাগও দেখা যাইতেছে।' বিজ্ঞান-চর্চা তিনি পূর্বেও করেছেন, 'পৃথিবী' [১২৮৯] গ্রন্থই তার প্রমাণ; এরপর ভারতী-তেও তিনি নিজে, জামাতা ফণিভূষণ ও অন্যান্যেরা বিজ্ঞান-বিষয়ক অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। উল্লেখযোগ্য যে, স্বর্ণকুমারী পত্রিকার সম্পাদিকা ও স্বত্বাধিকারিণী হলেও জোড়াসাঁকোর সরকারী তহবিল থেকে ভারতী বাবদ প্রতি মাসে ২৫্ টাকা করে সাহায্য করে যাওয়া হয়েছে।

বর্তমান বৎসরের প্রথম তিন মাসে রবীন্দ্রনাথের চারটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় : প্রকৃতির প্রতিশোধ, নলিনী, শৈশব সঙ্গীত ও ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী। প্রথম দুখানি সম্ভবত চৈত্র ১২৯০-র মধ্যেই মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল, পারিবারিক দুর্যোগের ফলেই আনুষ্ঠানিক প্রকাশ বিলম্বিত হয়। নলিনী ছাড়া অপর তিনটি গ্রন্থই কাদম্বরী দেবীর স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাট্যকাব্যের আখ্যাপত্রটি এইরূপ :

'নাট্য কাব্য।/ প্রকৃতির প্রতিশোধ।/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / প্রণীত।/ কলিকাতা / আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে/ শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক / মুদ্রিত ও প্রকাশিত। / সন ১২৯১।'

বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তকতালিকা-অনুযায়ী গ্রন্থটির প্রকাশ-তারিখ 29 Apr 1884 [মঙ্গল ১৮ বৈশাখ], মুদ্রণসংখ্যা ১০০০, মূল্য আট আনা।

পৃষ্ঠাসংখ্যা : আখ্যাপত্র+উৎসর্গ+৮১।

গ্রন্থটির উৎসর্গ-পত্রে লিখিত হয়েছে : 'উৎসর্গ।/তোমাকে দিলাম।' এর দ্বারা কাদম্বরী দেবী-ই উদ্দিষ্ট হয়েছেন, এমন অনুমান যথার্থ বলেই মনে হয়। তবে উৎসর্গের ভাষা দেখে অনুমান করা যায় যে, এটি লেখার সময়ে কাদম্বরী দেবী জীবিত ছিলেন—কারণ পরবর্তীকালে প্রকাশিত 'শৈশব সঙ্গীত' ও 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র উৎসর্গ-পত্রের ভাষা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের।

নাট্যকাব্যটি রচনার সূত্রপাত হয়েছিল কারোয়ারে, কয়েকটি গান পরবর্তীকালে রচিত হয় এমন অনুমানের কথা আমরা পূর্বেই ব্যক্ত করেছি। এতে মোট ১১টি গান আছে, তার মধ্যে 'আজ তোমায় ধরব চাঁদ' গানটি অক্ষয় চৌধুরীর রচনা।*১

[১] 'হেদে গো নন্দরানী'। ১ম দৃশ্য, ঝিঁঝিট খাম্বাজ—খেম্‌টা; রবিচ্ছায়া। ৭৫ [বিবিধ ৯১], মিশ্র ভৈরবী—খেম্‌টা; গীতবিতান ২।৫৮২; স্বর ২০

[২] 'বুঝি বেলা বহে যায়'। ২য় দৃশ্য, মূলতান—আড়খেম্‌টা; বিবাহ-উৎসব, ৪র্থ দৃশ্য; গীতবিতান ২। ৪১৬; স্বর ২০

[৩] 'ভিক্ষে দে গো, ভিক্ষে দে'। ২য় দৃশ্য, ছায়ানট—কাওয়ালি; গীতবিতান ৩।৭৭৭; স্বরলিপি নেই

[৪] 'কথা কোস্‌নে লো রাই'। ৪র্থ দৃশ্য, ভৈরবী—খেম্‌টা; রবিচ্ছায়া-য় নেই; গান [১৩১৬]।১১৯; গীতবিতান ৩।৭৭৮; স্বর ২০

[৫] 'প্রিয়ে, তোমার ঢেঁকি হলে'। ৪র্থ দৃশ্য, রামপ্রসাদী সুর; গীতবিতান ৩।৭৭৭; স্বর ২০

[৬] 'আয় রে আয় সাঁঝের বা'। ৬ষ্ঠ দৃশ্য, গৌড় সারং—একতালা; গীতবিতান ৩।৭৭৭; স্বরলিপি নেই

[৭] 'বনে এমন ফুল ফুটেছে'। ৭ম দৃশ্য, খাম্বাজ; গীতবিতান ২।৪১৬; স্বর ২০

[৮] 'মরিলো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে'। ৭ম দৃশ্য, পূরবী; গীতবিতান ২।২৯৬; স্বর ২০, মিশ্র পূরবী—দাদ্‌রা

[৯] 'যোগি হে, কে তুমি হৃদি-আসনে'। ৭ম দৃশ্য, কেদারা; গীতবিতান ৩।৭৭৭; স্বর ২০

[১০] 'মেঘেরা চ'লে চ'লে যায়'। ৮ম দৃশ্য, বেহাগ; গীতবিতান ২।৬০৪; স্বরলিপি নেই।

নাট্যকাব্যটি সম্পর্কে কিছু আলোচনা আগেই করা হয়েছে।*২ পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ যে ভাব-মূলক প্রতীক নাটকের সূচনা করেন, এটিতে তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। জীবনস্মৃতি-তে তিনি লিখেছেন : 'আমার নিজের প্রথম জীবনে আমি যেমন একদিন আমার অন্তরের একটা অনির্দেশ্যতাময় অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহিরের সহজ অধিকারটি হারাইয়া বসিয়াছিলাম, অবশেষে সেই বাহির হইতেই একটি মনোহর আলোক হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ করিয়া মিলাইয়া দিল—এই প্রকৃতির প্রতিশোধ-এও সেই ইতিহাসটিই একটু অন্যরকম করিয়া লিখিত হইয়াছে। পরবর্তী আমার সমস্ত কাব্যরচনার ইহাও একটা ভূমিকা।'৮

'নলিনী' নাট্য-গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি এইরূপ :

'নলিনী।/ (নাট্য) / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক / প্রণীত। /কলিকাতা /আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে / শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক/ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।/ সন ১২৯১।' ['মলাটে মূল্য।০চারি আনা।' উল্লিখিত হয়েছে।]

বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা-অনুযায়ী গ্রন্থটির প্রকাশ-তারিখ **10 May 1884** [শনি ২৯ বৈশাখ], মুদ্রণসংখ্যা ১০০০, মূল্য চার আনা।

পৃষ্ঠাসংখ্যা : [২]+৩৬, ১২ পেজী। গ্রন্থটিতে কোনো উৎসর্গ-পত্র নেই। এটির সম্পর্কে আমরা পূর্বেই দীর্ঘ আলোচনা করেছি।

এর কিছুদিন পরেই রবীন্দ্রনাথের কৈশোরক কবিতার নির্বাচিত সংকলন 'শৈশব সঙ্গীত' নামে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির মলাট ও আখ্যাপত্রটি এইরূপ :

‘শৈশব সঙ্গীত।/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / প্রণীত। কলিকাতা / আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে / শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক / মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সন ১২৯১।’

বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় গ্রন্থটির প্রকাশ তারিখ 29 May 1884] বৃহ ১৭ জ্যৈষ্ঠ], মুদ্রণসংখ্যা ১০০০, মূল্য এক টাকা।

পৃষ্ঠাসংখ্যা : আখ্যাপত্র [২]+ভূমিকা [২]+উপহার [২]+সূচীপত্র [২]+১৪৯+ভ্রম সংশোধন [‘ভ্রমবশতঃ ছিন্ন লতিকা দুইবার ছাপা হইয়াছে।’]।

রবীন্দ্রনাথ ‘ভূমিকা’-য় লেখেন, ‘এই গ্রন্থে আমার তেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের কবিতাগুলি প্রকাশ করিলাম, সুতরাং ইহাকে ঠিক শৈশব সঙ্গীত বলা যায় কিনা সন্দেহ। কিন্তু নামের জন্য বেশী কিছু আসে যায় না। কবিতাগুলির স্থানে স্থানে অনেকটা পরিত্যাগ করিয়াছি, সাধারণের পাঠ্য হইবে না বিবেচনায় ছাপাই নাই। হয়ত বা এই গ্রন্থে এমন অনেক কবিতা ছাপা হইয়া থাকিবে যাহা ঠিক প্রকাশের যোগ্য নহে। কিন্তু লেখকের পক্ষে নিজের লেখা ঠিকটি বুঝিয়া উঠা অসম্ভব ব্যাপার—বিশেষতঃ বাল্যকালের লেখার উপর কেমন-একটু বিশেষ মায়া থাকে যাহাতে কতকটা অন্ধ করিয়া রাখে। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি আমি যাহার বিশেষ কিছু-না-কিছু গুণ না দেখিতে পাইয়াছি তাহা ছাপাই নাই। / গ্রন্থকার’

যদিও কোথাও নাম উল্লিখিত হয় নি, তবু স্পষ্ট বোঝা যায় যে গ্রন্থটি কাদম্বরী দেবীর স্মৃতির উদ্দেশেই উৎসর্গীকৃত : ‘উপহার / এ কবিতাগুলিও তোমাকে দিলাম। বহুকাল হইল, তোমার কাছে বসিয়াই লিখিতাম, তোমাকেই শুনাইতাম। সেই সমস্ত স্নেহের স্মৃতি ইহাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। তাই, মনে হইতেছে তুমি যেখানেই থাক না কেন, এ লেখাগুলি তোমার চোখে পড়িবেই।’

মোট ১৭টি কবিতা বা গান শৈশব সঙ্গীত-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। এর মধ্যে অনেকগুলি কবিতার প্রাথমিক রূপের সন্ধান পাওয়া যায় মালতীপুঁথি-তে, সে-সম্পর্কে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করেছি। বহুদিন পরে রবীন্দ্র-রচনাবলী-র অচলিত সংগ্রহ প্রথম খণ্ডে [আশ্বিন ১৩৪৭] শৈশব সঙ্গীত পুনর্মুদ্রিত হয়। অবশ্য কয়েকটি কবিতা ও গান অল্প-বিস্তর পরিবর্তন-সহ কাব্য-গ্রন্থাবলী-র [১৩০৩] ‘কৈশোরক’ অংশে গৃহীত হয়েছিল।

শৈশব সঙ্গীত প্রকাশের এক মাস পরেই ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির আখ্যাপত্র :

‘ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী। / শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক / প্রকাশিত। / কলিকাতা / আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে / শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা / মুদ্রিত।/ সন ১২৯১’

[‘শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রকাশিত’ কথাগুলির মধ্যে এখনও আত্মগোপনের প্রয়াসটি লক্ষণীয় : অবশ্য প্রকাশকের ‘বিজ্ঞাপন’-এ গোপনীয়তার আবরণ অনেকটাই উদঘাটিত।]

বেঙ্গল লাইব্রেরির প্রকাশ-তালিকা অনুযায়ী গ্রন্থটির প্রকাশ-তারিখ 1 Jul 1884 [মঙ্গল ১৮ আষাঢ়], মুদ্রণসংখ্যা ১০০০, মূল্য আট আনা।

পৃষ্ঠাসংখ্যা : আখ্যাপত্র [২]+উৎসর্গ [২]+প্রকাশকের বিজ্ঞাপন [২]+সূচীপত্র [২]+৬০।

এই বইটিও কাদম্বরী দেবীর স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত, ‘উৎসর্গ’-এর ভাষায় তা স্বতঃপ্রকাশিত : ‘ভানুসিংহের কবিতাগুলি ছাপাইতে তুমি আমাকে অনেকবার অনুরোধ করিয়াছিলে। তখন সে অনুরোধ পালন করি নাই। আজ ছাপাইয়াছি, আজ তুমি আর দেখিতে পাইলে না।’

প্রকাশকের বিজ্ঞাপন : 'ভানুসিংহের পদাবলী শৈশব সঙ্গীতের আনুষঙ্গিক স্বরূপে প্রকাশিত হইল। ইহার অধিকাংশই পুরাতন কালের খাতা হইতে সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছি। /প্রকাশক।'

গ্রন্থে মুদ্রিত মোট ২১টি পদের ১৩টি ভারতী-তে 'ভানুসিংহের কবিতা' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশকালে সব-কটি গানেই সুরনির্দেশ ছিল, কিন্তু তার মধ্যে মাত্র ৯টির সুর পাওয়া গিয়েছে এবং সেগুলি স্বরবিতান ২১-এ সংকলিত হয়েছে। কাব্যগ্রন্থাবলী-তে [১৩০৩] ১৯টি পদ শিরোনাম-সহ মুদ্রিত হয়।

পরবর্তী সংস্করণগুলিতে বিভিন্ন পদের প্রচুর পাঠান্তর সাধিত হয়। শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়-কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণে [আশ্বিন ১৩৭৬] এ-বিষয়ে যাবতীয় তথ্য একত্রিত করা হয়েছে।[*১]

এতদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের বই প্রধানত জোড়াসাঁকোর বাড়ি ও আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস থেকে বিক্রয় করা হত, অন্যান্য বিখ্যাত পুস্তকবিক্রেতা [পিপ্‌ল্‌স্‌ লাইব্রেরি, ক্যানিং লাইব্রেরি, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি ইত্যাদি] কিছু কিছু বই বিক্রি করলেও তার পরিমাণ আশানুরূপ ছিল না—বৌ-ঠাকুরাণীর হাট প্রকাশ প্রসঙ্গে আমরা এ-বিষয়ে কিছু তথ্য উল্লেখ করেছি। সম্ভবত সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথ 12 Jul [শনি ২৯ আষাঢ়] বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরির[*২] প্রতিষ্ঠাতা গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়কে তাঁর কতকগুলি বইয়ের বিক্রয়-স্বত্ব প্রদান করে লেখেন :

'শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় / বেঙ্গল্‌ মেডিক্যাল্‌ লাইব্রেরি।/ ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট্‌।

আমার ফর্দ্দে লিখিত পুস্তকগুলি আমি আপনার নিকট দুই হাজার তিন শত নয় ২৩০৯ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিলাম। তন্মধ্যে অদ্য এগার শত ১১০০ টাকা বুঝিয়া পাইলাম। বাকী টাকা আপনি দুই মাসের মধ্যে দুই বারে পরিশোধ করিবেন। ইহা ব্যতীত দোকানদারদিগের নিকটে যে সকল পুস্তক আছে তাহা ক্রমে পাঠাইয়া দিব, তাহা নগদ মূল্যে লইবেন। এ সকল পুস্তক যতদিন না আপনার বিক্রয় শেষ হইবে ততদিন আর এগুলি পুনর্মুদ্রিত করিবনা। এ সকল পুস্তক অল্প অবশিষ্ট থাকিতে আমাকে জানাইতে হইবে। পুস্তক আপনার ইচ্ছামত মূল্যে আপনি বিক্রয় করিতে পারিবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি

জোড়াসাঁকো / কলিকাতা'[৯]

১২ জুলাই

১৮৮৪

এই চিঠির সঙ্গে লিখিত একটি ফর্দে বিক্রীত গ্রন্থগুলির নাম ছিল, সেটি পাওয়া যায় নি। কিন্তু এর কিছুদিন পরে সোমপ্রকাশ-এর [২৮।৩৭, পৃ ৬০৬-০৭] ১৪ শ্রাবণ-সংখ্যায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের একটি বিজ্ঞাপন থেকে পুস্তকগুলির নাম অনুমান করা যায় [রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথও সম্ভবত সরোজিনী, অশ্রুমতী ও স্বপ্নময়ী-র বিক্রয়-স্বত্ব প্রদান করেছিলেন, বিজ্ঞাপনটিতে বইগুলির উল্লেখ আছে] :

'বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরির / নূতন পুস্তক।/ ছাপা পরিষ্কার, কাগজ অতি উৎকৃষ্ট, লেখা ভাবুকতায় পূর্ণ।/ সাহিত্য সমাজের সুপরিচিত গ্রন্থকার দ্বয়ের / গ্রন্থাবলী—/...

সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুত বাবু রবীন্দ্রনাথ / ঠাকুর প্রণীত—

১। প্রভাত সঙ্গীত। মূল্য ॥০ / ২। সন্ধ্যা সঙ্গীত। ॥০ / ২[৩]। বৌঠাকুরাণীর হাট। উৎকৃষ্ট উপন্যাস। ১। ০ / ৪। ভগ্ন হৃদয়। ১/ ৫। রুদ্রচণ্ড। ॥০ / ৬। ইউরোপ প্রবাসীর পত্র। [এরপর দীর্ঘ বর্ণনা, একবিংশ অধ্যায় ১৫২-৫৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত] মূল্য ১॥০ / ৭। বিবিধ প্রসঙ্গ মূল্য ॥০

উক্ত কবিবরের নব প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। শৈশব সঙ্গীত। কবির শৈশব কালের / লিখিত কতকগুলি সুন্দর সুন্দর কবিতা। মূল্য ১/ ২। প্রকৃতির প্রতিশোধ। সুন্দর নাট্য কাব্য। মূল্য ॥০ / ৩। ভানু সিংহ ঠাকুরের পদাবলী। প্রাচীন গ্রন্থ।/ বঙ্গবাসীর অবশ্য পাঠ্য। মূল্য ॥০ / ৪। ছবি ও গান। মূল্য ১/ ৫। নলিনী। নাট্যপুস্তক মূল্য। ।০

রবীন্দ্র বাবুর কবিত্ব নূতন ধরণের। লেখা ললিত, মধুর ও সুখ পাঠ্য। কবিবরের সমস্ত গ্রন্থের সমালোচনা এই ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপনে স্থানাভাব বলিয়াই সুদ্ধ য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রের বিষয় যৎকিঞ্চিৎ বলা হইল। কবির প্রত্যেক গ্রন্থেই প্রচুর পরিমাণে নূতনত্ব আছে।

কোন পুস্তকেরই ডাক মাশুল লাগিবে না। বরং সমস্ত পুস্তকগুলি একত্র লইলে যথেষ্ট কমিসন দেওয়া যাইবে।...'

এই বিজ্ঞাপন থেকে দেখা যাচ্ছে, গুরুদাসবাবু রবীন্দ্রনাথের মোট বারোটি গ্রন্থের বিক্রয়-স্বত্ব লাভ করেছিলেন, যেখানে তাঁর এতাবৎ-প্রকাশিত গ্রন্থ-সংখ্যা ষোলো। কবি-কাহিনী ও বন-ফুল কাব্যগ্রন্থদ্বয়ের প্রকাশক ভিন্ন ব্যক্তিবর্গ এবং বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়া অভিনয়ের প্রোগ্রাম হিসেবেই মুদ্রিত হয়েছিল, সম্ভবত সেই কারণেই এই চারটি গ্রন্থ উক্ত ফর্দের অন্তর্গত হয় নি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জাহাজী-ব্যবসায়ের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তাঁর প্রথম জাহাজ 'সরোজিনী' ১১ জ্যৈষ্ঠ [শুক্র 23 May] সকালে কলকাতার কয়লাঘাট জেটি থেকে বরিশালে তার কর্মস্থলে যাত্রা শুরু করে। জাহাজে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহযাত্রী হন রবীন্দ্রনাথ, পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ও কন্যা ইন্দিরা-সহ জ্ঞানদানন্দিনী দেবীও তাঁদের সঙ্গে যান। রবীন্দ্রনাথ 'সরোজিনী প্রয়াণ' নামে এক দীর্ঘ গদ্য-রচনায় এই ভ্রমণের এক সরস বর্ণনা দিয়েছেন,[*] রচনাটি তিনটি কিস্তিতে ভারতী-র শ্রাবণ, ভাদ্র-আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। রচনার মধ্যেই ইঙ্গিত আছে যে, এর মধ্যে প্রথম দুটি অংশ জাহাজে বসেই লেখা, শেষেরটি লেখেন ভ্রমণ-শেষে বাড়িতে ফিরে এসে।

'সরোজিনী প্রয়াণ' রচনাটি অনেকটা লঘু ভঙ্গিতে লেখা। কাদম্বরী দেবীর শোকাবহ মৃত্যুর মাত্র এক মাসের মধ্যে এইরূপ হালকা চালে ভ্রমণবৃত্তান্ত রচনা করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে একটু বিসদৃশ লাগতে পারে, বস্তুত রবীন্দ্রজীবনীকার সেইরকম মন্তব্যই করেছেন।[১০] 'বিচিত্র প্রবন্ধ' [বৈশাখ ১৩১৪, দ্র ৫।৪৮৬-৯৭] গ্রন্থে রচনাটি যেরূপ বহুল পরিমাণে বর্জিত আকারে মুদ্রিত হয়েছে, সেটি পড়লে এইরূপ মন্তব্য খুব সংগতও মনে হবে। কিন্তু ভারতী-তে মূল রচনাটি আপাতদৃষ্টিতে হাস্যপরিহাসে মুখর লঘুচিত্ততার পরিচায়ক হলেও, সেইটিই তার শেষ পরিচয় নয়। প্রকৃতপক্ষে যে-অংশগুলি পরে পরিত্যক্ত হয়েছে, তারই মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সমকালীন মানসিকতাটি যথার্থভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। শ্রাবণ-সংখ্যার এইরূপ একটি অংশ : 'হাসি তামাসা অনেক সময়ে পর্দ্দার কাজ করে, হৃদয়ের বে-আব্রুতা দূর করে। অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কাছে সকলই শোভা পায়, কিন্তু নগ্ন প্রাণ লইয়া কিছু বাহিরে বেরোন যায় না—সে সময়ে প্রাণের উপর আবরণ দিবার জন্য

গোটাকতক হাল্কা কথা গাঁথিয়া ঢিলেঢালা একপ্রকার সাদা আলখাল্লা বানাইতে হয়, সেটার রঙ কতকটা হাসির মত দেখায় বটে। কিন্তু সকল সময়ে এ রকম কাপড়ও জোটে না। সে অবস্থায় অসভ্যদের মত গায়ে রঙ করিয়া, উল্কি পরিয়া, এক ছটাক শুষ্ক দন্তচ্ছটা আধ সের জলে গুলিয়া সর্ব্বাঙ্গে তাহারি ছাপ মারিয়া সমাজে বাহির হইতে হয়—...লেখাই লোকে দেখে, লেখকের কথা কি আর কেউ ভাবে।'[১১] ভাদ্র-সংখ্যার শুরুই হয়েছে এইভাবে : 'আবার কেমন হৃদয়ের মধ্যে মেঘ করিয়া আসে—লেখার উপরে গম্ভীর ছায়া পড়ে,—মনের কথাগুলি শ্রাবণের বারিধারার মত অশ্রুর আকারে ঝর্‌ঝর্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে চায়। কিন্তু এ লেখার বাদ্‌লা কাহারো ত ভাল লাগিবে না। আমার মনের মধ্যে যাহাই হউক, আমি নিজের মেঘে পাঠকের সূর্য্যকিরণ রোধ করিয়া রাখিতে চাই না—সুতরাং নিশ্বাস ফেলিয়া আমি সরিয়া পড়িলাম, আর সমস্ত প্রকাশ হউক।'[১২] এই মনোভাব থেকেই তিনি গঙ্গাতীরের সৌন্দর্য বর্ণনা-প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'এই যে-সব গঙ্গার ছবি আমার মনে উঠিতেছে, এ কি সমস্তই এইবারকার স্টীমার-যাত্রার ফল? তাহা নহে। এ-সব কতদিনকার কত ছবি, মনের মধ্যে আঁকা রহিয়াছে। ইহারা বড়ো সুখের ছবি, আজ ইহাদের চারি দিকে অশ্রুজলের স্ফটিক দিয়া বাঁধাইয়া রাখিয়াছি। এমনতরো শোভা আর এ জন্মে দেখিতে পাইব না।'[১৩] কাদম্বরী দেবীর স্মৃতি-সুরভিত দীর্ঘনিশ্বাস এইরূপে বার বার এই রচনার আপাত-লঘুতাকে অতিক্রম করে ধ্বনিত হয়েছে।

কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পর মাসাধিক কালের মধ্যেই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে আবার শোকের ছায়া নেমে আসে। রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ ৩১ জ্যৈষ্ঠ [বৃহ 12 Jun] মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথ এই মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়ার কথা কোথাও ব্যক্ত করেন নি—যদিও ইংরেজি পড়ানোর অত্যুৎসাহের যুগে যিনি সাহস করে তাঁদের দীর্ঘকাল বাংলা শেখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন, জীবনস্মৃতি-তে সেই 'স্বর্গগত সেজদাদার উদ্দেশে সকৃতজ্ঞ প্রণাম' নিবেদন করেছেন।

আমরা পূর্বের অধ্যায়ে বলেছি যে, বিবাহের পরে মৃণালিনী দেবী প্রধানত জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর কাছেই থাকতেন এবং লরেটো স্কুলে ভর্তি হবার পর প্রথম দিকে সেখান থেকেই স্কুলে যাতায়াত করতেন। কিন্তু কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পর থেকে তিনি মোটামুটি স্থায়ীভাবে জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই থাকা শুরু করেন। ক্যাশবহি-র ৩০ ও ৩২ শ্রাবণের হিসাবে দেখি : 'শ্রীমতী ছোট বধূ ঠাকুরাণীর আহারের দুগ্ধ জলপাণ ইত্যাদি ১২ বৈশাখ না° ৩১ আষাঢ়ের ১ বৌচর শোধ ২৩।ল'০ এবং '১৫ না° ৩১ শ্রাবণের দুগ্ধ জলপাণ ইত্যাদি ১ বৌচর—১১৷৷০'; এর সঙ্গে 'রেশম মাথাঘসা সাবান, দোয়াত ফিতে খ্যালনা দিগর ক্রয়ের' হিসাবও পাওয়া যায়। মহর্ষি তাঁর এই কনিষ্ঠা পুত্রবধূটির জন্য কোনো আয়োজনেরই ত্রুটি রাখেন নি। বৈশাখ মাস থেকেই আট আনা বেতনে তাঁর জন্যে দর্শনী নামে একটি দাসী নিযুক্ত হয়েছে। অন্যান্য বধূরা যেখানে দশ টাকা মাসোহারা পেতেন, ভাদ্র মাস থেকে মৃণালিনী দেবীর জন্য সেখানে বরাদ্দ হয়েছে মাসিক পঁচিশ টাকা, তখন রবীন্দ্রনাথের মাসোহারা একশো টাকা মাত্র। স্কুলের বইপত্র কেনার হিসাবও পাওয়া যায় : 'দং শ্রীমতী ছোট বধূ ঠাকুরাণীর স্কুলের পড়িবার নিম্ন পুস্তক ক্রয় ও লিখিবার ২খানা খাতা ক্রয় আর্থমেটিক ফ্রাষ্ট বুক সেকেন্ড বুক ও ইউজফুল নলেজ প্রভৃতি ক্রয় বিঃ ২৭ আষাঢ়ের ১ বৌচর...৭৲'—বইগুলি লরেটো স্কুলের পাঠক্রমের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। কিন্তু কৌতূহলোদ্দীপক হিসাব দেখা যায় তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে : 'ব° উমেশ চন্দ্র দে* দং শ্রীমতী ছোট বধূ ঠাকুরাণীর জন্য নয়ানশুক কাপড়ের গাউন ৪টা তৈয়ারির ব্যয় শোধ' [২০ ভাদ্র],

'কামিজ ৬টা ও ইজেরবডী ৬টা' [২৯ ভাদ্র], 'একটা ঘাগরা ক্রয় করা হয়' [১৫ অগ্র°], 'ওড়না একটা ক্রয়ের মূল্য শোধ' [২২ অগ্র°] ইত্যাদি। ওয়াকিবহাল পাঠিকারা হয়তো বলতে পারবেন বাঙালি গৃহবধূর সাধারণ পোশাক শাড়ি-শায়া-ব্লাউজের পরিবর্তে এই সব পোশাক কী ভাবে ব্যবহৃত হত!

রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথ সেনকে একটি তারিখ-হীন পত্রে লিখেছেন : 'আমার নূতন গৃহ-প্রতিষ্ঠা হয়েছে, আজ নানা কারণে আপনার দর্শন প্রার্থনীয়—নিরাশ করিবেন না।'[১৪] এই নূতন গৃহপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি নিষ্পন্ন হয় সম্ভবত শ্রাবণ মাসের শেষে বা ভাদ্রের গোড়ার দিকে [Aug 1884]। ১৪ ভাদ্রের একটি হিসাবে দেখা যায় : 'ব° ধর মল্লিক এণ্ড কোম্পানী দং বাটীর মধ্যের রবীবাবু মহাশয়ের ঘর তৈয়ারী প্রভৃতির ব্যয় সমুদায় শোধ দেওয়া যায়...১৮৫০॥'। ব্যয়ের পরিমাণ দেখেই বোঝা যায় 'গৃহ'টি নূতনভাবেই নির্মিত হয়েছিল। এর সঙ্গে তিনি একটি বৈঠকখানারও অধিকারী হন, যে 'বৈটক ঘরের মেটীং আঁটান' ও 'সতরঞ্চি ১টা ও জাজিম ২টা ও ছোট বড় বালিশ ৪টা তৈয়ারী ও ক্রয়' বাবদ ৩ ভাদ্র [18 Aug] ৪৪ ॥/৩ ব্যয় করা হয়।

এই বৈঠকখানাটি রবীন্দ্রনাথের বন্ধুসমাগমের একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। তাঁর চিঠিতে এখানে বন্ধুদের আহ্বানের অনেক উল্লেখ আছে। প্রিয়নাথ সেনকে লিখেছেন : 'আজ বিকেলে আপনি একবার এ দিকে আস্‌বেন? নগেন্দ্র বাবু আজ এখানে আস্‌চেন। আজ আপনার যদি কোন বাধা না থাকে তবে আমাদের এখেনে সন্ধে বেলায় আহারের নিমন্ত্রণ রইল' [চিঠিপত্র ৮।১১], কিংবা 'কাল দুপুর বেলায় যদি আপনি ও নগেন্দ্র বাবু আসেন ত বেশ হয়' [ঐ।১২], অথবা 'কাল সমস্ত দুপুর বেলা আমার সময় আছে—যখন ইচ্ছা হয় আসিবেন।...তা ছাড়া আপনাকে একটি কবিতা শুনাইবার আছে' [ঐ।১৩]।

এই বৈঠকখানার আর একজন নিয়মিত অতিথি ছিলেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'এদিকে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব জমিয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যার সময় প্রায় আমার সেই ঘরের কোণে তিনি এবং প্রিয়বাবু আসিয়া জুটিতেন। গানে এবং সাহিত্যালোচনায় রাত হইয়া যাইত। কোনো-কোনোদিন দিনও এমনি করিয়া কাটিত।'[১৫] শ্রীশচন্দ্রকে লেখা চিঠিতেও তিনি এই বিশ্রম্ভালাপের স্মৃতিচারণ করেছেন : 'আপনি এসে নানা কৌশলে আমাকে গোটাকতক ছোটো ছোটো কল্পনার গুলি গেলাতেন, আমার স্বপ্ন জাগিয়ে তুলতেন, আমাকে আমারই প্রভাতসংগীত-সন্ধ্যাসংগীতের মধ্যে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলতেন, আমি চোখ বুজে আনন্দে আমার নিজের মধ্যে প্রবেশ ক'রে বসে থাকতুম এবং সেইখান থেকে নেশার ঝোঁকে স্বগত উক্তি প্রয়োগ করতুম, আপনি শুনে মনে মনে হাসতেন।'[১৬]

শ্রীশচন্দ্রের সঙ্গে ঠিক কবে কি সূত্রে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটে, সে-সম্বন্ধে তাঁরা কেউই কিছু লিখে যান নি। তবে আমাদের ধারণা, অগ্র°-পৌষ ১২৮৯ [Dec 1882]-এর কোনো সময়ে এই পরিচয় ঘটেছিল [প্রিয়নাথ সেনের সূত্রে। প্রিয়নাথকে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লিখছেন : 'শ্রীশ বাবুর স্ত্রীর clairvoyance-ব্যাপারটা আমার দেখ্‌বার খুবই ইচ্ছে আছে—আপনাদের সুবিধে অনুসারে একদিন নিয়ে গেলে বড় ভাল হয়'[১৭] পত্রটিতে কালমৃগয়া-মুদ্রণের প্রসঙ্গ থাকাতে আমরা এটিকে অগ্র° ১২৮৯-তে লেখা বলে পূর্বেই অনুমান করেছি। শ্রীশচন্দ্রও লিখেছেন : '২৬শে চৈত্র [রবি ৪ Apr 1883] সন্ধ্যার পর সাক্ষাৎ কালে বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "রবীন্দ্র কাল এসে ছিলেন, তাঁর কাছে তোমার পরিবারের সম্বাদ পাই।'[১৮] এই উক্তি থেকেও

অনুমিত হয়, শ্রীশচন্দ্রের স্ত্রীর অদ্ভুত অসুস্থতার সম্বন্ধে কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে পরিচিত হন এবং এই পরিচয় কালক্রমে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

যাই হোক, আলোচ্য পর্বে সম্ভবত উপরে কথিত গান ও সাহিত্যালোচনার সূত্র ধরেই রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্রের সম্পাদনায় পদরত্নাবলী প্রকাশের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। শ্রীশচন্দ্র প্রখ্যাত বৈষ্ণব-পদাকার বলরামদাসের বংশোদ্ভূত ছিলেন। আর রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির অনুকরণে ১২৮৩-৮৪ বঙ্গাব্দে 'ভানুসিংহের কবিতা' লেখা শুরু করলেও পদগুলি সংকলিত হয়ে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' নামে আষাঢ় ১২৯১-র মাঝামাঝি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, এবং এই গ্রন্থ-প্রকাশের সূত্র ধরে তিনি 'ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী' নামক রস-রচনাটি লেখেন—এটি মুদ্রিত হয় শ্রাবণ সংখ্যা নবজীবন-এ। হয়তো এইসব কার্যকারণের যোগেই 'মহাজন পদাবলীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিতাগুলির একত্র সংগ্রহ'-এর ভাবনা তাঁদের মনে উদিত হয়। সম্ভবত ভাদ্র-আশ্বিনের কোনো সময় থেকে এই সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছিল। কার্তিক-সংখ্যা নবজীবন-এ 'বৈষ্ণব কবির গান' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'বৈষ্ণব জ্ঞানদাসের একটি গান পাইয়াছি, তাহাই ভাল করিয়া বুঝিতে গিয়া আমার এত কথা মনে পড়িল'—গানটি হল 'আজু কে গো মুরলী বাজায়', পদরত্নাবলী-র ৭৮ সংখ্যা পদ [পৃ ৭৩]। প্রবন্ধটি নিশ্চয়ই আশ্বিন মাসে লিখিত হয়েছিল এবং আমাদের অনুমান উক্ত পদ-সংকলনের কাজে যুক্ত থাকার সময়েই পদটি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি ও মন আকর্ষণ করে।

ড বিমানবিহারী মজুমদার উক্ত গ্রন্থটি সম্বন্ধে লিখেছেন : 'ভূমিকায় কেবলমাত্র শ্রীশচন্দ্রের স্বাক্ষর আছে। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে পদগুলি নির্বাচন করিবার ভার লইয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং ভূমিকায় বৈষ্ণব পদাবলীর ঐতিহাসিক পটভূমিকা ব্যাখ্যা করিবার দায়িত্ব লইয়াছিলেন শ্রীশচন্দ্র।'[১৯] এই অনুমান অনিবার্য বলে আমাদের মনে হয় না। শ্রীশচন্দ্র লিখেছেন : 'তখন রবীন্দ্র বাবুর সঙ্গে বৈষ্ণব কাব্যগুলি পড়িয়া পদরত্নাবলী সংগ্রহ করিতে ছিলাম, প্রত্যহ মধ্যাহ্ন হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত আমাদের বৈঠক হইত।' এই উক্তি থেকে পদনির্বাচনে উভয়ের যৌথ দায়িত্বই স্বীকৃত হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রিয় এবং তাঁর দ্বারা পূর্বেই ব্যবহৃত বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের অনেকগুলি উৎকৃষ্ট পদ গৃহীত না হওয়ায় এবং লোচনদাস প্রভৃতির গৌরনাগরী ভাবের দীর্ঘ ও নিকৃষ্ট পদের সংকলন দেখে আমাদের ধারণা, পদ সংগ্রহ ও পুঁথির সাহায্যে পাঠনির্ণয় ইত্যাদি কাজগুলি প্রধানত শ্রীশচন্দ্রই নিষ্পন্ন করেছিলেন—রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা এক্ষেত্রে নিতান্তই গৌণ ছিল। বৈষ্ণববংশোদ্ভূত হওয়ায় ও পুটিয়ার রাজগ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ থাকায় উক্ত ক্ষেত্রে শ্রীশচন্দ্র বিশেষ সুবিধার অধিকারী ছিলেন—'নবদ্বীপের কোন বৈষ্ণবের' সহযোগিতাও তাঁর কাছে সহজলভ্য ছিল। তাছাড়া বলরামদাসের প্রতি আপেক্ষিক পক্ষপাতিত্ব শ্রীশচন্দ্রের বিশেষ ভূমিকাটি প্রকট করে তোলে। সজনীকান্ত দাসের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় ৮২-১১০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত 'রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক, ২৭টি পদ ও 'নিবেদন' পদরত্নাবলী-র প্রথম প্রকাশকালে গ্রন্থে ছিল না, পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়।[২০] আমাদের মনে হয়, এই পদগুলি রবীন্দ্রনাথের দ্বারা নির্বাচিত—তাঁর দ্বারা ব্যাখ্যাত ও বিশেষ প্রিয় পদকর্তা রায় বসন্তের ৬টি পদই এই অংশে সংকলিত হয়েছে। কিন্তু একথাও ঠিক, শ্রীশচন্দ্র-নির্বাচিত পদগুলি নিয়ে আলোচনা ও রসাস্বাদন রবীন্দ্রনাথ সমভাবেই করে গেছেন—এই সূত্রেই বৈষ্ণব-রসতত্ত্ব ও শ্রীচৈতন্যের সামাজিক পটভূমিকাটি তাঁর কাছে উন্মুক্ত হয়েছিল।

অগ্র°-পৌষ মাসের মধ্যেই পদরত্নাবলী-র পাণ্ডুলিপি যে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল, তা বোঝা যায় মাঘ-সংখ্যা প্রচার-এর চতুর্থ মলাটে ৩১ সাঁকারিটোলা-র সুরেশচন্দ্র মজুমদারের নামে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনে :

মুদ্রিত হইতেছে—/পদরত্নাবলী।/অর্থাৎ বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবি সকলের একত্র সংগ্রহ। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক সম্পাদিত। সম্পাদকের লিখিত উৎকৃষ্ট ভূমিকা ও টীকা সহিত। কোন অনিবার্য্য কারণ বশতঃ মুদ্রাঙ্কন আজিও শেষ হইয়া উঠে নাই। যে সকল গ্রাহক অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়াছেন, ভরসা করি তাঁহারা এ বিলম্ব মার্জ্জনা করিবেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য আমরা এবারে নিয়ম করিলাম, পুস্তক প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত যাঁহারা নাম পাঠাইবেন, তাঁহারাই এক টাকা মূল্যে ইহা পাইবেন। পশ্চাৎ মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

কিন্তু চৈত্র মাসেও গ্রন্থটি প্রকাশিত হল না। চৈত্র-সংখ্যা প্রচার-এর সঙ্গে একটি পৃথক সবুজ কাগজে ছাপা 'বিশেষ দ্রষ্টব্য' বিজ্ঞপ্তি জুড়ে দেওয়া হয়। এতে জানানো হয় :

প্রচলিত সকল মহাজন পদাবলীর পাঠাপেক্ষা এই পুস্তকের ধৃত পাঠ যাহাতে অধিকতর মৌলিক ও বিশুদ্ধ হইতে পারে তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহাতে সম্পাদকদ্বয়ের লিখিত দুইটী ভূমিকা আছে এবং প্রয়োজন মতে টীকাও করা হইয়াছে।
মুদ্রাঙ্কন প্রায় শেষ হইয়াছে।...

বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী গ্রন্থটির প্রকাশ-তারিখ 25 Jun 1885 [বৃহ ১২ আষাঢ় ১২৯২] হলেও বৈশাখেই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, আখ্যাপত্রেও 'বৈশাখ ১২৯২' উল্লিখিত হয়েছে। জ্যৈষ্ঠ ১২৯২-সংখ্যা প্রচার-এ বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় :

পদরত্নাবলী/প্রকাশিত হইয়াছে।/ কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। পূর্ব্বের হিসাব অপেক্ষা আকার ক্ষুদ্রতর হওয়ায় মূল্য ১ এক টাকাই রাখা গেল। এপর্য্যন্ত যাঁহারা পুস্তক লইয়াছেন, শীঘ্রই তাঁহারা বিনা মূল্যে আর দুই ফর্ম্মা পাইবেন।[*]

শুধু দুটি ফর্মা নয়, ২৮টি পৃষ্ঠা সংযোজিত হয়—সূচীপত্রটি নূতন করে ছেপে সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ-লিখিত 'নিবেদন'-সহ গ্রন্থটির আকার-বৃদ্ধি ঘটে। দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনটির উল্লেখ অনুযায়ী অন্যতম সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থটির জন্য কোনো ভূমিকা লেখেন নি।

আমরা আগেই বলেছি, কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পরে ভারতী পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়—কিন্তু স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদনার দায়িত্ব নেওয়ার ফলে দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁকে স্বত্বাধিকার হস্তান্তরিত করেন। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা যুগ্ম-সংখ্যা রূপে সম্ভবত জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যায় [৮।১-২] রবীন্দ্রনাথের মাত্র একটি রচনাই মুদ্রিত হয়েছে :

১৮-২৯ ডুব দেওয়া' দ্র আলোচনা অ-২।৫-১৭

রচনাটি অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আত্মভাবনা-মূলক প্রবন্ধের সমষ্টি :

১৮-২১ ছোট বড়; ২১-২২ ডুবিবার ক্ষমতা; ২১-২২ ডুবিবার স্থান : ২২ পুরাতনের নূতনত্ব; ২২-২৩ সাম্য; ২৩ স্বদেশ; ২৪ কেন; ২৪-২৫ এক কাঠা জমি; ২৫ জগৎ মিথ্যা; ২৫-২৭ তুলনায় অরুচি; ২৭-২৮ জগৎ সত্য; ২৮-২৯ প্রেমের শিক্ষা।

জগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছেন : '"ডুব দেওয়া" কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পূর্বেই রচিত হয়েছিল, কিন্তু এর শেষ অংশটি যুক্ত হয় মৃত্যুর পরে। এই অংশের নাম "প্রেমের শিক্ষা"।'[২১] এই বক্তব্য যথার্থ বলে আমাদের মনে হয় না। পূর্ববর্তী প্রবন্ধগুলির ভাবসূত্রেই বর্তমান অংশটি রচিত—প্রকৃতির প্রতিশোধ থেকে পূর্বাপর উদ্ধৃতিই তার প্রমাণ; বরং আমাদের ধারণা, কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পূর্বেই ভারতী-র বৈশাখ সংখ্যার যে-কটি ফর্মা মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল 'ডুব দেওয়া' রচনাটি তারই অন্তর্গত ছিল।

[এই যুগ্ম-সংখ্যার ৫৪-৬১ পৃষ্ঠায় 'ন্যাশন্‌ল ফণ্ড্‌' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় কার্তিক ১২৯০-সংখ্যায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের উক্ত নামের প্রবন্ধটির সমালোচনা করেন।]

ভারতী, আষাঢ় ১২৯১ [৮।৩] :

৯৬-১০৪ 'সৌন্দর্য্য ও প্রেম' দ্র আলোচনা অ-২।২৬-৩৬

৯৬-৯৭ সৌন্দর্যের কারণ; ৯৭ সৌন্দর্য্য বিশ্বপ্রেমী; মনের মিল; উপযোগিতা; ৯৭-৯৮ আমরা সুন্দর; ৯৮ সুদূর ঐক্য; সুন্দর সুন্দর করে; ৯৮-৯৯ শাস্তি; ৯৯ উদ্ধার; কবির কাজ; ৯৯-১০০ কবিতা ও তত্ত্ব; ১০০ তত্ত্বের বার্দ্ধক্য; ১০০-০১ সৌন্দর্য্যের কাজ; ১০১ স্বাধীনতার পথ প্রদর্শক; ১০২ পুরাতন কথা; জ্ঞান ও প্রেম; নগদ কড়ি; ১০৩ আংশিক ও সম্পূর্ণ অধিকার; সত্যং শিবং সুন্দরং; ১০৩-০৪ লক্ষ্মী।

উল্লেখযোগ্য, 'সুদূর ঐক্য' রচনাটির মধ্যে ভারতী আষাঢ় ১২৮৮ সংখ্যায় ও প্রভাত সংগীত কাব্যগ্রন্থে মুদ্রিত ভিক্টর য়্যুগোর কবিতার অনুবাদ 'মহীয়সী মহিমার আগ্নেয় কুসুম' কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হয়েছে এবং 'সত্যং শিবং সুন্দরং' রচনাটি গ্রন্থ-প্রকাশকালে সংকলিত হয় নি।

ভারতী, শ্রাবণ ১২৯১ [৮।৪] :

১৩৭-৪০ 'কথাবার্ত্তা/(সন্ধ্যাবেলায়)' দ্র আলোচনা অ-২।৩৭-৪০

১৫৩-৬০ 'সরোজিনী প্রয়াণ' [১] দ্র বিচিত্র প্রবন্ধ ৫।৪৮৬-৮৮ [সংক্ষেপিত]

রবীন্দ্রভবন-এ রক্ষিত একখণ্ড ভারতী-তে [Ms. 435] অনেকগুলি অংশ পেন্সিলে বর্জন চিহ্নিত এবং রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে দু-একটি শব্দ সংশোধিত হয়েছে, দেখা যায়। এই সংশোধন সম্ভবত গদ্যগ্রন্থাবলী-তে বিচিত্র প্রবন্ধ সংকলনের সময়ে [বৈশাখ ১৩১৪-র পূর্বে] করা হয়েছিল।

১৬৭-৭০ 'বিদেশী ফুলের গুচ্ছ।/সিন্ধুতীরে বিষণ্ণ হৃদয়ের গান।' দ্র র° র° ১ [১৩৮৭]। ২০৭-১১

১৬৭ (Shelley) ১/ 'মধুর সূর্য্যের আলো' দ্র ঐ। ২০৭-০৮

[Shelley-র 'Stanzas Written in Dejection, near Naples' (Dec 1818) কবিতার পাঁচটি স্তবকের মধ্যে প্রথম চারটি স্তবকের প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ।]

১৬৮ (Mrs. Browning)/ 'সারাদিন গিয়েছিনু বনে'	দ্র ঐ।২০৮-০৯
১৬৮ (Ernest Myers)/ 'আমায় রেখ না ধরে আর'	দ্র ঐ। ২০৯
১৬৯ (Aubrey De Verr)/'প্রভাতে একটি দীর্ঘশ্বাস'	দ্র ঐ। ২০৯
১৬৯ (Augusta Webster)/'গোলাপ হাসিয়া বলে'	দ্র ঐ। ২০৯-১০
১৬৯ (Ibid)/ 'এত শীঘ্র ফুটিলি কেনরে!'	দ্র ঐ। ২১০
১৬৯ (P. B. Marston)/ 'হাসির সময় বড় নেই'	দ্র ঐ।২১০
১৬৯-৭০ (Victor Hugo)/'বেঁচেছিল হেসে হেসে'	দ্র ঐ। ২১১

জগদীশ ভট্টাচার্য যথার্থই অনুমান করেছেন, 'নতুন বৌঠানের মৃত্যুর পর তাঁর উদ্দেশে তরুণ কবি যে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করেন,...তার প্রথম অর্ঘ্য তিনি আহরণ করেছেন বিদেশী কবিদের কাব্যমালঞ্চ থেকে।...সেদিন কবির হৃদ্গত শোকোচ্ছ্বাস তাঁর প্রিয় কবিদের রচনা থেকেই প্রতিধ্বনি আহরণ করেছে।'[২২]

Victor Hugo-র কবিতাটি তাঁর *Les Contemplations* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের Épitaphe ['Il vivait, il jouait, riante créature'] কবিতাটির অনুবাদ। রবীন্দ্রভবন-এ রক্ষিত উক্ত গ্রন্থের একটি কপিতে [Ms. 394(i)] ২৬০ পৃষ্ঠায় মূল ফরাসী কবিতাটির পাশে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে বাংলা অনুবাদটি পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের ফরাসী-চর্চা সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

তত্ত্ববোধিনী, শ্রাবণ ১২৯১ [১১ কল্প ২ ভাগ ৪৯২ সংখ্যা] :

৬৭-৭১ 'আত্মা' দ্র আলোচনা অ-২। ৪০-৪৬

নবজীবন, শ্রাবণ ১২৯১ [১১] :*

৫৭-৬২ 'ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী' দ্র ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী [১৩৭৬]। ৯১-৯৬

রচনাটির সঙ্গে রচয়িতার নাম ছিল না, পূর্বে কোনো গ্রন্থেও সংকলিত হয় নি; কিন্তু এটি রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালেই তাঁর লেখা বলে স্বীকৃত হয়।[২৩] 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' প্রকাশের উপলক্ষেই তিনি এই রস-রচনাটি লিখেছিলেন বলে মনে হয়। দেশীয় ও বিদেশী বহু ঐতিহাসিক ইতিহাসের সন-তারিখ নিয়ে সমকালে যে বিচিত্র গবেষণা প্রকাশ করছিলেন, সেগুলিকে ব্যঙ্গ করাও তাঁর অন্যতম লক্ষ্য ছিল। ইতিপূর্বে বিভিন্ন প্রবন্ধে নানা প্রসঙ্গে তাঁর ব্যঙ্গাত্মক মনোভাব প্রকাশ পেলেও, এটিই তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ ব্যঙ্গরচনা—এই হিসেবে এর একটি বিশেষ মূল্য আছে। এরই মধ্যে তিনি সুকৌশলে আত্ম-পরিচয়টিও উদ্ঘাটিত করেছেন : 'কোন কোন মূর্খ নির্ব্বোধ গোপনে আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদের নিকটে প্রচার করিয়া বেড়ায় যে ভানুসিংহ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ধরাধাম উজ্জ্বল করেন', কিংবা 'ভানুসিংহের বাসস্থান সম্বন্ধে অভ্রান্ত বুদ্ধি সূক্ষ্মদর্শী অপ্রকাশচন্দ্রবাবু যে তর্ক করেন তাহা নিতান্ত বাতুলের প্রলাপ বলিয়া বোধ হয়। তিনি ভানুসিংহের স্বহস্তে-লিখিত পাণ্ডুলিপির একপার্শ্বে কলিকাতা শহরের নাম দেখিয়াছেন। ইহার সত্যতা আমরা অবিশ্বাস করি না।'

মহর্ষি মাঘ ১২৯০-র শেষ ভাগ থেকেই চুঁচুড়ায় অবস্থান করছিলেন। ফলে ঠাকুর পরিবার থেকে কেউ-না-কেউ মাঝে মাঝেই তাঁর কাছে বিভিন্ন প্রয়োজনে যাতায়াত করতেন। রবীন্দ্রনাথের এইরূপ একটি সাক্ষাতের বিবরণ পাওয়া যায় ১৬ শ্রাবণ [বুধ 30 Jul]-এ লিখিত রাজনারায়ণ বসুর ডায়ারিতে : 'অদ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রধান আচার্য মহাশয়ের পরম বন্ধু অতিবৃদ্ধ ও জীর্ণ শ্রীকণ্ঠ সিংহ এবং নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রধান আচার্য মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শ্রীকণ্ঠবাবু ব্রহ্মসঙ্গীত গান করিয়া আমাদিগকে মোহিত করেন। এত বৃদ্ধ শরীরে এরূপ আনন্দের জোর ক্বচিৎ দেখা যায়।'[২৪] রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত এই সাক্ষাৎকারের কথাই লিখেছেন জীবনস্মৃতি-তে [দ্র ১৭।২৯৬]। পরের দিনও শ্রীকণ্ঠ সিংহ চুঁচুড়ায় ছিলেন ও 'বৈকাল বেলা গান করেন, তাহাতে অতিশয় আনন্দের উদয় হয়'। রবীন্দ্রনাথও সম্ভবত এইদিন সেখানে ছিলেন। এই সাক্ষাৎকারের দু-মাস পরেই শ্রীকণ্ঠ সিংহের মৃত্যু হয়। মহর্ষি ২০ আশ্বিন [রবি 5 Oct] একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথকে এই সংবাদ জানান : 'শ্রীকণ্ঠ বাবু আর এ লোকে নাই—তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার বিধবা কন্যার পত্রে এই সংবাদ

কল্য অবগত হইলাম। তাঁহার কন্যা আমাকে লিখিয়াছেন যে "কি মধুর তব করুণা"[২৫] গাইতে গাইতে একবারে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দিলেন।'[২৬] এর পূর্বে মহর্ষি তাঁকে একটি বড়ো দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেন; ৩১ ভাদ্র [15 Sep]-এর হিসাবে দেখা যায় : '১২৮২ সালের ৬ আশ্বিন ইং ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৭৫ সাল তারিখে উঁহার সম্পত্তি মর্টগেজ রাখিয়া যে ৬০০০৲ টাকা কর্জ্জ দেওয়া হইয়াছে ঐ টাকা উঁহার নিকট আদায় না লইয়া উঁহাকে দান করা গেল'।

৯ ভাদ্র [রবি 24 Aug] সাবিত্রী লাইব্রেরির অন্তর্গত সাবিত্রী-সভার অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ 'হাতে কলমে' শীর্ষক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন।* এর আগেও তিনি বহু প্রবন্ধে অন্তঃসারশূন্য স্বদেশহিতৈষিতার প্রতি ধিক্কার বর্ষণ করেছেন, সুতরাং সে দিক দিয়ে বর্তমান ভাষণে নূতনত্ব বিশেষ কিছু নেই। তবু নানা কারণে ভাষণটির বিশেষ গুরুত্ব আছে। তিনি বলেছেন, 'আজকাল প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়াই ইংরাজ-কর্ত্তৃক দেশীয়দের প্রতি অত্যাচারের কাহিনী একটা-না-একটা শুনিতেই হয়। কিন্তু কে সেই স্বদেশীয় অসহায়দের সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়!...এইত সেদিন শুনিলাম, স্বজাতি-দুঃখকাতর কতকগুলি লোক মিলিয়া একটি সভা স্থাপন করিয়াছেন, আমাদের দেশীয় ব্যারিষ্টর অনেকগুলি তাহাতে যোগ দিয়াছেন। কিন্তু বোধ করি, উক্ত ব্যারিষ্টারগুলির মধ্যে মহাত্মা মনোমোহন ঘোষ ব্যতীত এমন অল্পলোকই আছেন যাঁহারা বিদেশীয় অত্যাচারীর হস্ত হইতে স্বদেশীয় অসহায়কে মুক্তি দিবার জন্য প্রাণ ধরিয়া টাকার মায়া ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন।' রবীন্দ্রনাথের কথার মধ্যে কিছুটা অত্যুক্তি আছে বটে, কিন্তু এর মধ্যে তাঁর মনোভাবের দিক্-দর্শন সম্ভব। প্রতিকারের অন্য উপায়ও তিনি নির্দেশ করেছেন : 'অনেকের মতে মুষ্টিযোগের ন্যায় অত্যাচারের আর ঔষধ নাই—অবশ্য, রোগীর ধাত বুঝিয়া। যাহারা খৃষ্টান সভ্যতার ভান করিয়াও মনে মনে পশুবলের উপাসক, অকাতরে অসহায়দের প্রতি শারীরিক বল প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হয় না এবং তাহা ভীরুতা মনে করে না, খেলাচ্ছলে কালো মানুষের প্রাণহিংসা করিতে পারে, কড়া মুষ্টিযোগ ব্যতীত আর কোন ঔষধ কি তাহারা মানে!...ইহাদের ধাত ইহারাই বুঝে। তাহার সাক্ষী আইরিষ্ জাতি। তাহারাও খুণী;...এই জন্য ডাকের পরিবর্ত্তে ডাইনামাইটযোগে আগ্নেয় দরখাস্ত ইংলণ্ডের ঘরে ঘরে প্রেরণ করিতেছে!' আইরিশদের প্রতি তাঁর সহানুভূতির কথা রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র-তে স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু সারা জীবন তিনি সন্ত্রাসের রাজনীতিকে ধিক্কার দিয়েছেন, বর্তমান ক্ষেত্রেও তিনি আইরিশদের ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করেন নি : 'আমরা ত খুণী, জাত নহি, এবং ততদূর সভ্য হইয়া উঠিতে আমরা চাহিও না; মুষ্টিযোগ চিকিৎসাশাস্ত্রে আমাদের কিছুমাত্র ব্যুৎপত্তি নাই, এবং সে চিকিৎসা রোগীর পক্ষে আশুফলপ্রদ হইলেও চিকিৎসকের পক্ষে পরিণামে শুভকরী নহে।' সেইজন্য তিনি অন্য গঠনমূলক ব্যবস্থার সুপারিশ করেছেন : 'একবার একজন ইংরাজের হাত হইতে একজন দেশীয়কে ত্রাণ কর, একবার সে বুঝিতে পারুক্ ইংরাজ ও অদৃষ্ট একই ব্যক্তি নহে, একবার সে হৃদয়ের মধ্যে জয়গর্ব্ব অনুভব করুক, একবার তাহার হৃদয়ের ন্যায্য প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ হউক্! তখন আমাদের দেশের লোকের আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান বাস্তবিক হৃদয়ের মধ্যে অঙ্কুরিত হইতে থাকিবে। সে জ্ঞান যদি হৃদয়ের মধ্যে বদ্ধমূল না হয় তবে জাতির উন্নতি কোথায়!' এই আত্মমর্য্যাদা লাভের জন্য তিনি নিজের ক্ষেত্রেও কর্তব্য নির্ধারিত করে নিয়েছেন : 'আমরা আমাদের ভাষার আমাদের সাহিত্যের এমন উন্নতি করিতে চেষ্টা না করি কেন, যাহাতে আমাদের ভাষা আমাদের সাহিত্য পরম শ্রদ্ধেয় হইয়া উঠে!'

ভাষণটি ভারতী-র ভাদ্র-আশ্বিন যুগ্ম-সংখ্যায় [পৃ ২২৮-৪১] মুদ্রিত হয়েছিল। রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত একখণ্ড ভারতী-তে নীল পেন্সিলে রচনাটির অনেক অংশ বর্জন-চিহ্নিত; সম্ভবত কোনো সময়ে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটিকে গ্রন্থভুক্ত করার কথা চিন্তা করেছিলেন, কিন্তু সে-সংকল্প কোনোদিনই কার্যকরী হয় নি। অবশ্য গোবিন্দলাল দত্ত-প্রকাশিত 'সাবিত্রী' [১২৯৩] গ্রন্থে 'অকালকুষ্মাণ্ড' [পৃ ৯২-১০৯] ও 'হাতে কলমে' [পৃ ১১০-২৫] প্রবন্ধ দুটি সংকলিত হয়েছিল। উল্লেখ্য, 'নব্যভারত' পত্রিকায় [৪। ১০, মাঘ ১২৯৩। ৪৪৯-৫৬] বিজয়চন্দ্র মজুমদার গ্রন্থটির 'সমালোচনা'-প্রসঙ্গে বর্তমান প্রবন্ধটির কোনো কোনো বক্তব্যের বিরোধিতা করেন ও উক্ত পত্রিকার আষাঢ় ১২৯৪-সংখ্যায় গোবিন্দলাল দত্ত রবীন্দ্রনাথের পক্ষ সমর্থন করেন। ভারতী-র ফাল্গুন ১২৯৩-সংখ্যায় আশুতোষ চৌধুরী গ্রন্থটির 'সংক্ষিপ্ত সমালোচনা'-য় প্রবন্ধ দুটি সম্বন্ধে মন্তব্য করেন।[২৭]

ভারতী-র ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় [৮ |৫-৬] প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার তালিকাটি এইরূপ :

১৮৫-৯১ 'সরোজিনী প্রয়াণ' [২] দ্র বিচিত্র প্রবন্ধ ৫।৪৮৮-৯৩ [সংক্ষেপিত]

[রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত Ms. 435-চিহ্নিত ভারতী-তে কিছু-কিছু অংশ বর্জন-চিহ্নাঙ্কিত, তবে বর্জনের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম।]

১৯১-৯২ 'হায়।/রাগিণী ললিত।/তোরা বসে গাঁথিস মালা' দ্র গীতবিতান ৩।৮৭২ [গানটি 'পুষ্পাঞ্জলি' পাণ্ডুলিপি-র 19 পৃষ্ঠায় লিখিত; উপরে উল্লিখিত ভারতী-তে দুটি সংশোধন লক্ষিত হয়।]; রবিচ্ছায়া [বিবিধ ৬২]। ৫৭, ললিত—আড়াঠেকা; স্বরবিতান ৩৫।

২২৮-৪১ 'হাতেকলমে'

২৭৮-৭৯ 'সমালোচনা।/সঙ্গীত সংগ্রহ। (বাউলের গাঁথা)।/দ্বিতীয় খণ্ড।'

পাঠকের স্মরণ আছে, বৈশাখ ১২৯০-সংখ্যার ভারতী-তে রবীন্দ্রনাথ 'বাউলের গান' নামে গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডের সমালোচনা করেছিলেন। বর্তমান সমালোচনাটি উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডটি অবলম্বনে লেখা। পরে এই দুটি আলোচনা সম্পাদিত হয়ে সমালোচনা [১২৯৪] গ্রন্থে সংকলিত হয়। বর্তমান রচনাটির শেষাংশ ঈষৎ সংশোধন করে উক্ত প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদটি [দ্র অ-২। ১৩৬-৩৭] গঠিত হয়েছে। তথ্যটির এতাবৎ অনুল্লেখে একটু আশ্চর্য লাগে।

তত্ত্ববোধিনী, ভাদ্র ১৮০৬ শক [১১ কল্প ২ ভাগ, ৪৯৩ সংখ্যা] :

৮৪ ললিত—আড়াঠেকা। চলিয়াছি গৃহ-পানে খেলাধূলা অবসান দ্র রবিচ্ছায়া [ব্রহ্ম ৪]।১০৫;
গীতবিতান ৩। ৮৩৫; স্বরবিতান ৪৫

৮৪ টোড়ি—কাওয়ালি। দুখ দিয়েছ, দিয়েছ ক্ষতি নাই দ্র রবিচ্ছায়া [ব্রহ্ম ৫]। ১০৬;
গীতবিতান ১। ১০২; স্বরবিতান ৮।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ইঙ্গিত করেছেন যে, কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর সঙ্গে উপরোক্ত গান দু'টির সম্বন্ধ আছে।[২৯] আমাদেরও মনে হয়, কাদম্বরী দেবী বা হেমেন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধবাসরে হয়তো এ-দুটি গীত হয়।

আলোচনা, [*] *ভাদ্র ১২৯১ [১১] :*

২৯ 'সুখীপ্রাণ'/জান না ত নির্ঝরিণী, আসিয়াছ কোথা হতে দ্র র°র° [শতবার্ষিক সং] ৮৭১ Robert Buchanan-লিখিত কবিতার এই অনুবাদটি তত্ত্ববোধিনী-র আশ্বিন সংখ্যাতেও [পৃ ১০৪-০৫] 'আলোচনা নামক পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত' মন্তব্য-সহ মুদ্রিত হয়।

১৮ ভাদ্র [মঙ্গল 2 Sep] তারিখে মহর্ষি চুঁচুড়া থেকে একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথকে লেখেন, 'এই শনিবারের [২২ ভাদ্র, 6 Sep] মধ্যে একদিন এখানে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে আমি অতীব আনন্দিত হইব। যেদিন তুমি এইখানে আসিবে, সেই দিনে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নকে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কহিবে'।[২৯]

আশ্বিন মাসে আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে যে ব্যাপক পরিবর্তন করা হয় [দ্র তত্ত্ববোধিনী, আশ্বিন। ১২০] মহর্ষির এই আহ্বান সম্ভবত তার সঙ্গে সম্পর্কান্বিত। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর অভিঘাতে ও জাহাজী ব্যবসায়ের ব্যস্ততার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পক্ষে জমিদারি ও আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক পদের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা সম্ভব হচ্ছিল না। ক্যাশবহি-তে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শেষ বারের মতো স্বাক্ষর করেন ২৪ আষাঢ় [সোম 7 Jul], তারপর কিছুদিন দ্বিজেন্দ্রনাথ হিসাবপত্র দেখাশোনা করেছিলেন, দ্বিপেন্দ্রনাথ এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন ৮ ভাদ্র [শনি 23 Aug] থেকে। পাঁচ বছর পরে ২ আষাঢ় ১২৯৬ [15 Jun 1889] রবীন্দ্রনাথ এই কর্তৃত্ব লাভ করেন। কিন্তু আশ্বিন মাস থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অপর দায়িত্বটি মহর্ষি রবীন্দ্রনাথের উপর ন্যস্ত করলেন। হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন সহকারী সম্পাদকের পরিবর্তে যন্ত্রাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন, ঐ পদে আসেন কৈলাসচন্দ্র সিংহ। সম্ভবত এই সব পরিবর্তনের বিষয়ে আলোচনার জন্য মহর্ষি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হেমচন্দ্রকে আহ্বান করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এই নূতন দায়িত্বের সঙ্গে পিতার কাছ থেকে আরও কিছু লাভ করেছিলেন, ২৮ ভাদ্র ক্যাশবহি-র হিসাবে দেখি : 'ব° বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দং উহাকে পরম পূজ্যপাদ মহাশয় (চুঁচুড়ার বাটী হইতে) সাহার্য্য করেন বিঃ ৭০৬ ন° বাঙ্গাল বেঙ্কের এক চেক ৫০০৲'।

আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর রবীন্দ্রনাথ নতুন উৎসাহে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। এই উৎসাহের প্রমাণ আছে ৬ আশ্বিন [রবি 21 Sep] তারিখে লেখা মহর্ষির একটি পত্রে : 'কৈলাশচন্দ্র সিংহের বেতন আমার নিজ তহবিল হইতে দিতে শ্রীযদুনাথ চাটুয্যাকে অনুমতি করিলাম। যদি সমাজে একজন গায়ক রাখিতে ২৫৲ টাকা মাসে মাসে বেতন লাগে তাহা সমাজ হইতেই পড়িবে। যেহেতু এ সমাজের নির্দ্দিষ্ট ব্যয়ের মধ্যে গণ্য'।[৩০] বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী প্রথমাবধি ব্রাহ্মসমাজের গায়ক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি মাঘ ১২৮৯-এ বার্ধক্যের জন্য অবসর গ্রহণ করেন। তার পর থেকে বহুদিন আদি ব্রাহ্মসমাজে কোনো নিয়মিত গায়ক ছিলেন না। অথচ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় সংগীত ছিল অন্যতম আকর্ষণ। এই কারণেই বেতনভুক গায়কের প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন এবং দেবেন্দ্রনাথও তাতে বাধা দেন নি। অবশ্য ঠিক এই সময়ে এই পদে কাকে নিয়োগ করা হয়েছিল আমরা জানতে পারি নি। সরলা দেবী লিখেছেন, 'গান শেখার হাতেখড়ি হয় আমাদের অক্তবাবুর [অক্তকুমার ভদ্র] কাছে, বিষ্ণুবাবুর পরে যিনি ব্রাহ্মসমাজের গায়ক হয়েছিলেন।'[৩১]

রবীন্দ্রনাথের কর্তৃত্বাধীনে ব্রাহ্মসমাজের প্রথম মাসিক উপাসনা অনুষ্ঠিত হয় ৬ আশ্বিন [রবি 21 Sep] তারিখে [বাংলা মাসের প্রথম রবিবার এই উপাসনা হত], আচার্য হিসেবে দ্বিজেন্দ্রনাথ উপদেশ দেন [দ্র

তত্ত্ববোধিনী, কার্তিক। ১২২-২৫]। সম্ভবত এই উপাসনার জন্য রবীন্দ্রনাথ দুটি ব্রহ্মসংগীত রচনা করেন :

'(তাঁহারে) আরতি করে চন্দ্রতপন' দ্র তত্ত্ব°, কার্তিক। ১২১-২২, বড় হংস সারঙ্গ—চৌতাল; আলোচনা, কার্তিক। ৯৬; রবিচ্ছায়া [ব্রহ্ম ১]। ১০৩-০৪; গীতবিতান ৩। ১৮৭; স্বরবিতান ২২;

'তাঁহার আনন্দধারা জগতে যেতেছে বয়ে' দ্র তত্ত্ব°, কার্তিক। ১২২, আসাবরি—ঝাঁপতাল; আলোচনা, কার্তিক। ৯৬; রবিচ্ছায়া [ব্রহ্ম ২]। ১০৪-০৫; গীতবিতান ৩। ৮৩৯; স্বরবিতান ৪৫। পুলিনবিহারী সেন জানিয়েছেন, "রবিচ্ছায়ার একটি কপিতে ইন্দিরা দেবীর হস্তাক্ষরে সংশোধন আছে—'বাহার—আড়াঠেকা'।"[৩২] আলোচনা পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের নামেই গান দুটি মুদ্রিত হয়েছিল।

প্রধানত আদি ব্রাহ্মসমাজের কাজের জন্য মহর্ষির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পত্রালাপের সংবাদ ও নিদর্শন পাওয়া যায়। ক্যাশবহি থেকে জানা যায়, ১৯ ও ২৪ আশ্বিন রবীন্দ্রনাথ দুটি পত্র চুঁচুড়ায় মহর্ষির কাছে প্রেরণ করেন। ১৯ তারিখের পত্রে হয়তো তাঁর অসুস্থতা সম্বন্ধে কোনো খবর ছিল। তাই পরদিন [২০ আশ্বিন রবি 5 Oc] মহর্ষি তাঁকে লেখেন : 'আমি তোমার পত্র পড়িয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলাম যে তোমার শরীর অসুস্থ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, মাথার মধ্যে এক প্রকার কষ্ট ও বুক "ধড় ধড়" করে। তুমি একেবারে পুষ্টিকর আহার ছাড়িয়া দিয়াছ। তাহার জন্যই তোমার এই দুর্ব্বলতা ও পীড়া। মৎস্য মাংস আহার না করিলে তোমার শরীর পুষ্ট হইবে না। তুমি নীলমাধব ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিয়া এ বিষয়ে যাহা বিধান পাও, তদনুসারে চল, এই আমার পরামর্শ ও উপদেশ।'[৩৩] কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পর থেকেই রবীন্দ্রনাথের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় কিছু বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল, একথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন[৩৪]—নিরামিষ আহার ইত্যাদি তারই ফল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে দুঃখের বর্ষার মধ্যে শরতের অভিষেকেরও আয়োজন চলছিল, জীবনস্মৃতি-র 'বর্ষা ও শরৎ' অধ্যায়ের মধ্যে তার কিছু পরিচয় আছে। মহর্ষির উক্ত চিঠির মধ্যেই শ্রীকণ্ঠ সিংহের মৃত্যুসংবাদ ছিল, যার কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

এই সময়ে চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের একটি বিচিত্র সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমরা জানি, চন্দ্রনাথের আগ্রহেই রবীন্দ্রনাথ ১২৮২ বঙ্গাব্দে দ্বিতীয় বার্ষিক কলেজ রি-ইউনিয়নে কবিতা পাঠ করেছিলেন। এরপর বিভিন্ন সূত্রে রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসেছিলেন, এমন ভাবা অযৌক্তিক নয়। বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান হিসেবে বার্ষিক বিবরণীতে তিনি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গ্রন্থ সম্বন্ধে মন্তব্য রচনা করেছেন, তা আমরা যথাস্থানে উল্লেখ করেছি। বর্তমান পর্বে রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর কয়েকটি পত্র ও অন্যান্য তথ্য থেকে উভয়ের সম্পর্কের একটি দিগ্‌দর্শন করা সম্ভব। ১৭ আশ্বিন [বৃহ 2 Oct] তারিখের একটি পত্রে ৫নং রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের স্ট্রীট/বাহির সিমলা' থেকে চন্দ্রনাথ লেখেন : 'বিজয়ার পর বিজয়ার অভিবাদন বড়ই আনন্দদায়ক। অতএব প্রার্থনা করিতেছি যে স্বাস্থ্য এবং সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়া আপনি [....] তেজে এবং প্রতিভাবলে বঙ্গীয় সাহিত্য উজ্জ্বল করিয়া অতুল যশে শোভিত হয়েন।'[৩৫] বর্তমান বৎসরে বিজয়াদশমী ছিল ১৪ আশ্বিন [সোম 29 Sep] তারিখে, সুতরাং রবীন্দ্রনাথ ঐ দিন বা তার পরের দিনে চন্দ্রনাথ বসুকে পত্রটি প্রেরণ করেন। দুঃখের বিষয় পত্রটি পাওয়া যায় নি। তবে চন্দ্রনাথের পত্র থেকে তাঁর পত্রের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কিছুটা অনুমান করা চলে। রবীন্দ্রনাথ ১২৮৪ ও ১২৮৫ বঙ্গাব্দের ভারতী-র দু-খণ্ড চন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে 'করুণা' উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চাইলে তিনি এই পত্রে দীর্ঘ সমালোচনা করে মন্তব্য করেন,

‘গল্পটি পুস্তকাকারে ছাপান আবশ্যক।’ বয়সের বিপুল পার্থক্য সত্ত্বেও [প্রায় সতেরো বৎসর] রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রতি চন্দ্রনাথের সুগভীর শ্রদ্ধা পত্রটির অন্যতম বিশিষ্ট লক্ষণ। এই শ্রদ্ধা চন্দ্রনাথ আজীবন [মৃত্যু : ৬ আষাঢ় ১৩১৭] পোষণ করে গেছেন, রবীন্দ্রনাথকে লিখিত তাঁর অনেকগুলি পত্রে তার পরিচয় আছে।

কিন্তু উভয়ের সম্পর্ক নানা বিতর্ককে কেন্দ্র করে প্রায়শঃই তিক্ত হয়ে উঠেছে। আলোচ্য পর্বে অনুরূপ একটি ঘটনার ইঙ্গিত পাওয়া যায় বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আদি ব্রাহ্ম সমাজ ও “নব হিন্দু সম্প্রদায়”’ প্রবন্ধে। শ্রাবণ ১২৯১-তে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় ‘নবজীবন’ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যার ‘সূচনা’-তে অক্ষয়চন্দ্র বাংলা সাময়িকপত্রের বিবর্তনের ইতিহাস বর্ণনা-প্রসঙ্গে তত্ত্ববোধিনী ও বঙ্গদর্শন-এর ভূমিকা আলোচনা করে শেষোক্ত পত্রিকা সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত মন্তব্য করেন। এর প্রতিবাদ করে সঞ্জীবনী পত্রিকাতে বিনা স্বাক্ষরে একটি প্রেরিত পত্র প্রকাশিত হয় [বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, ‘আদি ব্রাহ্ম সমাজের এক জন প্রধান লেখক, ঐ পত্রের প্রণেতা’[৩৬]]। অক্ষয়চন্দ্র এই পত্রের কোনো উত্তর না দিলেও চন্দ্রনাথ বসু ‘ঐ পত্রের উত্তর দিয়াছিলেন; এবং গালাগালির রকমটা দেখিয়া “ইতর” শব্দটা লইয়া একটু নাড়া চাড়া করিয়াছিলেন।’/তদুত্তরে সঞ্জীবনীতে আর একখানি বেনামি পত্র প্রকাশিত হইল। নাম নাই বটে, কিন্তু নামের আদ্য অক্ষর ছিল, —“র”। লোকে কাজেই বলিল পত্রখানি রবীন্দ্র বাবুর লেখা। রবীন্দ্র বাবুর ইতর শব্দটা চন্দ্র বাবুকে পাল্‌টাইয়া বলিলেন।’[৩৭] পত্রটি যে তাঁরই লেখা রবীন্দ্রনাথ তা স্বীকার করে লিখেছেন, ‘চন্দ্রনাথ বাবুতে আর আমাতে যে কিঞ্চিৎ কথাকাটাকাটি হইয়াছিল সে তাঁহাতে আমাতে বোঝাপড়া।’[৩৮] এই বাক্যটির মধ্যেই ইঙ্গিত আছে চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে তখনও তাঁর হার্দ্য-সম্পর্ক বজায় ছিল। চন্দ্রনাথ ১ কার্তিক [বৃহ 6 Oct] রবীন্দ্রনাথকে যে পত্র লেখেন, সেটির মধ্যে মতের পার্থক্য লক্ষিত হলেও পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির ভাবটি যথেষ্ট স্পষ্ট। এটিও রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রের উত্তর। তাঁর পত্রটি পাওয়া যায় নি, কিন্তু চন্দ্রনাথের পত্র থেকে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিঠিতে বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ’ ও ‘দেবী চৌধুরাণী’ উপন্যাস দুটির সাহিত্য-শিল্পগত কতকগুলি ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। আনন্দমঠ সম্পর্কে সম্ভবত তাঁর অভিযোগ ছিল যে, চরিত্রগুলির স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট হয় নি তারা কেবলমাত্র নাম ও নম্বরে পর্যবসিত, ফলে উপন্যাসের human interest ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং শান্তিকে নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র মাত্রাধিক বাড়াবাড়ি করেছেন। বহুদিন পরে বিপিনবিহারী গুপ্ত রবীন্দ্রনাথকে এ-বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, “আনন্দমঠে সমস্ত ‘আনন্দ’গুলিই যেন একরকমেরই। একটা প্রকাণ্ড idea-য় যে বিচিত্র মানব প্রকৃতিকে revolution-এর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত ও কেন্দ্রীভূত করিয়াছে; তাহাদের প্রকৃতিগত পার্থক্য তাহাদের বিচিত্র কর্মপ্রবাহ, বিচিত্র ভাবপ্রবাহ, নব নব শক্তির উন্মেষ, যে একটা প্রকাণ্ড idea-র আবর্তে পড়িয়া একটা দিকে চলিয়াছে, বঙ্কিমবাবু তাহা দেখাইলেন কই?’[৩৯] অনুরূপ মন্তব্য-সংবলিত এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা ছিল সাহিত্যরসের দিক দিয়ে, চন্দ্রনাথ উত্তর দেন স্বদেশানুরাগের পরিপ্রেক্ষিতে। তিনি রবীন্দ্রনাথের চিঠি বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখাবার অনুমতি চেয়েছিলেন —‘বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে যে চিঠি লেখালেখি হইতেছে বঙ্কিমবাবুকে তাহা দেখাইতে বা শুনাইতে পারি কি?’—রবীন্দ্রনাথ তার কি উত্তর দিয়েছিলেন এবং চন্দ্রনাথ এ-সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রকে অবহিত করেছিলেন কি না আমরা জানি না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই তাঁর মত পরিবর্তন করেন নি, সত্তর বৎসর

বয়সেও তিনি লিখেছিলেন, 'তারপরে এলেন প্রচারক বঙ্কিম। আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম, একে একে আসরে এসে উপস্থিত, গল্প বলবার জন্যে নয়, উপদেশ দেবার জন্যে।'[৪০]

বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রচারক ভূমিকা অন্য দিক থেকেও রবীন্দ্রনাথকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল, যা শেষ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে একটি স্বল্পস্থায়ী, কিন্তু তিক্ত বিতর্কের কারণ হয়ে ওঠে। 17 Sep 1882 [রবি ২ আশ্বিন ১২৮৯] শোভাবাজার রাজবাড়ির মহারাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব মহাসমারোহে তাঁর পিতামহীর যে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন তাতে অনেকের সঙ্গে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কৃষ্ণদাস পাল, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতো প্রখ্যাত ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। জেনারেল অ্যাসেম্বলি'স ইন্‌স্টিটিউশনের [বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ] অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড হেস্টি [Revd. W. Hastie] এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে 23 Sep তারিখের *The Statesman* পত্রিকায় হিন্দু পৌত্তলিকতাকে তীব্র আক্রমণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'রামচন্দ্র' ছদ্মনামে তার জবাব দিতে গিয়ে হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্ব অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। এর আগে বঙ্গদর্শন-এ 'সাংখ্যদর্শন' প্রভৃতি প্রবন্ধে তাঁর হিন্দু-ধর্মশাস্ত্র চর্চার নিদর্শন থাকলেও তখন তিনি প্রধানত মিল-বেন্থাম-কোম্‌ত প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের ব্যাখ্যাত ধর্মতত্ত্বের প্রতিই অধিক আকর্ষণ অনুভব করেছেন। কিন্তু বর্তমান পর্বে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে প্রাচীন হিন্দুধর্মের আধুনিক যুগোপযোগী একটি সংস্করণ রচনায় তাঁর আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। গীতায় যে নিষ্কাম কর্ম ও ভক্তির মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানত তাকেই ভিত্তি করে তাঁর 'অনুশীলন তত্ত্ব' রচনা করেন। আনন্দমঠ [15 Dec 1882] ও দেবী চৌধুরাণী [20 May 1884] উপন্যাসে কাহিনীর আশ্রয়ে তিনি এই অনুশীলনতত্ত্বের রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। এর অত্যল্প কাল পরেই শ্রাবণ ১২৯১-তে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় 'নবজীবন' এবং বঙ্কিমচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় 'প্রচার' মাসিক পত্র প্রকাশিত হলে বঙ্কিম উভয় পত্রিকাতেই তাঁর নব্য হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন ['ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' : নবজীবন। ৬-২৬; 'হিন্দুধর্ম' : প্রচার। ১৫-২৩]। থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির প্রচেষ্টায় ক্ষেত্র ইতিমধ্যেই প্রস্তুত ছিল এবং কিছুদিন পূর্বে শশধর তর্কচূড়ামণি হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রই তাঁকে কলকাতার শিক্ষিত সমাজে পরিচিত করিয়ে দেন।* কিন্তু তাঁর মোহ দীর্ঘস্থায়ী হয় নি—'হিন্দুধর্ম্ম' প্রবন্ধেই তিনি লেখেন, 'পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়, যে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতে নিযুক্ত, তাহা আমাদের মতে কখনই টিকিবে না, এবং তাঁহার যত্ন সফল হইবে না।' এই কারণেই তর্কচূড়ামণির মতামতের প্রতিবাদ করার জন্য কোনো বিখ্যাত লেখককে এগিয়ে আসতে দেখা যায় না। কিন্তু নবজীবন ও প্রচার-এ বঙ্কিম ও তাঁর সহযোগী লেখকগণ যখন পৌরাণিক হিন্দুধর্মের আধুনিক যুগোপযোগী ব্যাখ্যা শুরু করলেন, তখন ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্যক্তিরা ছাড়াও অন্য কিছু কিছু লেখক তার প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেন।'* এঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বাধিক খ্যাতিমান বলে স্বভাবতই তাঁর উপর আক্রমণ হয়েছে সবচেয়ে বেশি। অন্যথায় তাঁর শিষ্যবর্গের মধ্যে অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি যেমন নির্বিচারে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম ও প্রচলিত হিন্দু আচারাদির সমর্থন করে লেখনী চালনা করছিলেন, সে-তুলনায় কৃষ্ণকে ঈশ্বর রূপে গ্রহণ করা ও কিছু পরিমাণ বিদেশী দার্শনিক মতের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাখ্যাত ধর্মতত্ত্ব ও কৃষ্ণচরিত্র পর্যালোচনার বিরুদ্ধে অন্তত আদি ব্রাহ্মসমাজের খড়্গহস্ত হওয়ার বিশেষ কোনো কারণ ছিল না।

কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁর উক্ত দুই প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে আদি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত লেখকদের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বিরোধ দেখা দিল। নবজীবন-এর সূচনাকে আক্রমণ করে সঞ্জীবনী-তে প্রেরিত পত্র এবং চন্দ্রনাথ বসু ও রবীন্দ্রনাথের উত্তর-প্রত্যুত্তরের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। সঞ্জীবনী-র উক্ত সংখ্যাগুলি আমরা দেখি নি, সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র-বর্ণিত 'গালাগালির রকম' সম্বন্ধে কিছু বলা সম্ভব নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'নবজীবনের সূচনা নামক প্রবন্ধে যে নবযুগ-প্রতিষ্ঠার কিঞ্চিৎ আড়ম্বর করা হইয়াছিল সঞ্জীবনীতে তাহারই প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছিল।' তত্ত্ববোধিনী-র ভাদ্র সংখ্যায় [পৃ ৮৮-৯১] মুদ্রিত রাজনারায়ণ বসুর 'নূতন ধর্ম্মমত' প্রবন্ধেরও অন্যতম লক্ষ্য নবজীবন-এর 'সূচনা' প্রবন্ধটি এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' প্রবন্ধের মতামত সেখানে সমালোচিত হলেও 'হিন্দুধর্ম্ম' প্রবন্ধের বক্তব্য মোটামুটি সমর্থিত হয়েছে। [বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, 'উহাতে "নাস্তিক" "জঘন্য কোম্‌ত মতাবলম্বী" ইত্যাদি ভাষায় অভিহিত হইয়াছিলাম।'—কিন্তু লেখক 'নাস্তিকতা' 'ঘৃণিত কোম্‌তবাদ' শব্দ-দুটি ব্যবহার করলেও বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে সেগুলি প্রযুক্ত হয় নি; তাছাড়া উক্ত প্রবন্ধে তাঁর মত 'সমালোচিত নহে—তিরস্কৃত হয়' এ কথাও যথার্থ নয়।] তত্ত্ববোধিনী-র উক্ত সংখ্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথ 'নব্য হিন্দু সম্প্রদায়' নামে একটি রচনায় 'ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধটির সমালোচনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই লিখেছেন, 'সমালোচনা আক্রমণ নহে।....আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা সব শুনিয়া, যদি প্রথম সংখ্যার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া, তিনি সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন, তবে তাঁহার কোন দোষই দিতে পারিতাম না। তিনি যদি অকারণে আমার উপর নিরীশ্বরবাদ প্রভৃতি দোষ আরোপিত না করিতেন তবে আজ তাঁহার প্রবন্ধ এই গণনার ভিতর ধরিতে পারিতাম না।' [এই একই যুক্তিতে তিনি রাজনারায়ণ বসুর প্রবন্ধটিও গণ্য না করতে পারতেন।]

তৃতীয় যে আক্রমণের কথা বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ করেছেন, সেটি হল নব্যভারত ভাদ্র সংখ্যায় [পৃ ২১৯-২৬] মুদ্রিত কৈলাসচন্দ্র সিংহের 'বাঙ্গালার কলঙ্ক।/(প্রতিবাদ)' প্রবন্ধটি। এটি প্রচার-এর প্রথম সংখ্যায় [পৃ ৬-১৪] প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' প্রবন্ধে অবলম্বনে লিখিত। সন্দেহ নেই, লেখকের প্রতিবাদের ভাষা অনেক জায়গাতেই অত্যন্ত অসংযত রূপ ধারণ করেছে। আমাদের মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র যে তাঁর স্বাভাবিক মর্যাদাবোধ থেকে সাময়িকভাবে বিচ্যুত হয়েছিলেন তার অন্যতম কারণ এই রচনাটি।

রবীন্দ্রনাথও এই বিতর্কে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। সম্ভবত কার্তিক মাসের কোনো এক তারিখে তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের লাইব্রেরি হলে* 'একটি পুরাতন কথা' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করেন ও সেটি ভারতী-র অগ্রহায়ণ সংখ্যায় [পৃ ৩৪০-৫০] মুদ্রিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র প্রচার-এ প্রকাশিত 'হিন্দুধর্ম' প্রবন্ধে একজন আচারপরায়ণ অথচ পরের অনিষ্টকারী হিন্দু জমিদারের দৃষ্টান্ত দিয়ে তদ্বিপরীত এক আচারভ্রষ্ট কিন্তু যথার্থ ধার্মিক হিন্দুর কথা-প্রসঙ্গে লেখেন, সন্ধ্যা আহ্নিক ক্রিয়া কর্ম কিছু না করলেও তিনি 'কখন মিথ্যা কথা কহেন না। যদি মিথ্যা কথা কহেন, তবে মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তি স্মরণ পূর্ব্বক যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয়—অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেইখানেই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন।' রবীন্দ্রনাথ প্রধানত এই উক্তিটিকে অবলম্বন করে তাঁর ভাষণে বলেন, 'আমাদের দেশের প্রধান লেখক প্রকাশ্য ভাবে অসঙ্কোচে নির্ভয়ে অসত্যকে সত্যের সহিত একাসনে বসাইয়াছেন, সত্যের পূর্ণ সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন, এবং দেশের সমস্ত পাঠক নীরবে নিস্তব্ধভাবে শ্রবণ করিয়া গিয়াছেন। সাকার নিরাকারের উপাসনা ভেদ লইয়াই সকলে কোলাহল করিতেছেন, কিন্তু অলক্ষ্যে ধর্ম্মের ভিত্তিমূলে যে আঘাত পড়িতেছে, সেই আঘাত হইতে ধর্ম্মকে ও সমাজকে

রক্ষা করিবার জন্য কেহ দণ্ডায়মান হইতেছেন না।....আমাদের শিরার মধ্যে মিথ্যাচরণ ও কাপুরুষতা যদি রক্তের সহিত সঞ্চারিত না হইত তাহা হইলে কি আমাদের দেশের মুখ্য লেখক পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া স্পর্ধা সহকারে সত্যের বিরুদ্ধে একটি কথা কহিতে সাহস করিতেন!' এরপর তিনি বলেন, 'কোনখানেই মিথ্যা সত্য হয় না; শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু বলিলেও হয় না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও হয় না।'

বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানত এই সমালোচনার বিরুদ্ধে প্রচার-এর অগ্রহায়ণ সংখ্যায় [পৃ ১৬৯-৮৪] 'আদি ব্রাহ্ম সমাজ ও "নব হিন্দু সম্প্রদায়" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি লেখেন, 'আমার বিরুদ্ধে কেহ কখন কোন কথা লিখিলে বা বক্তৃতায় বলিলে এ পর্যন্ত কোন উত্তর করি নাই।····তবে যে এ কয় পাতা লিখিলাম, তাহার কারণ, এই রবির পিছনে একটা বড় ছায়া দেখিতেছি।' বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, এই ছায়া আদি ব্রাহ্মসমাজের —কারণ 'হিন্দুধর্ম্ম' প্রবন্ধ প্রকাশের পর চার মাসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর 'অনেকবার' দেখা ও 'সাহিত্য বিষয়ে অনেক আলাপ' হয়েছে, কিন্তু তিনি উক্ত প্রবন্ধের প্রসঙ্গ উত্থাপন না করে 'চারি মাস বাদে সহসা পরোক্ষে বাগ্মিতার উৎস খুলিয়া দিবেন, ইহা আমার অসম্ভব বোধ হয়। তাই মনে করি, এ উৎস তিনি নিজে খুলেন নাই, আর কেহ খুলিয়া দিয়াছে।' প্রবন্ধের শুরুতেই বঙ্কিমচন্দ্র নবজীবন ও প্রচার-এর প্রবন্ধ প্রকাশের পর আদি ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত লেখকদের দ্বারা তিনি কি ভাবে কতবার আক্রান্ত হয়েছেন তার দীর্ঘ বিবরণ দিয়েছেন, সুতরাং আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের 'চতুর্থ' আক্রমণ একই ধারার অন্তর্গত বলেই তিনি মনে করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের এই অভিযোগের প্রত্যুত্তরে 'কৈফিয়ৎ' [ভারতী, পৌষ। ৪০০-০৮] প্রবন্ধে লেখেন, 'আমি যে লেখা লিখিয়াছি তাহা সমস্ত বঙ্গসমাজের হইয়া লিখিয়াছি বিশেষরূপে আদি ব্রাহ্মসমাজের হইয়া লিখি নাই।'* বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে চার-পাঁচ বার দেখা হওয়া সত্ত্বেও তিনি কেন উক্ত প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নি এই অভিযোগের প্রত্যুত্তরে লেখেন, 'না করিবার অনেক কারণ থাকিতে পারে।····দুর্ব্বলস্বভাববশতঃ আমার চক্ষুলজ্জা হইতে পারে। বঙ্কিম বাবু পাছে বিরোধী মত সহিতে না পারিয়া আমাকে ভুল বুঝেন এমন আশঙ্কা মনে উদয় হইতে পারে।' রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা যে নির্ভরযোগ্য তার প্রমাণ আছে দীর্ঘদিন পরে লিখিত জীবনস্মৃতি-তে : 'বঙ্কিমবাবুর কাছে যাইতাম বটে কিন্তু বেশিকিছু কথাবার্তা হইত না। আমার তখন শুনিবার বয়স, কথা বলিবার বয়স নহে। ইচ্ছা করিত আলাপ জমিয়া উঠুক, কিন্তু সংকোচে কথা সরিত না।'[৪১] আমরা আগেই দেখেছি, রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথ বসুর কাছে লিখিত পত্রে আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরাণী সম্বন্ধে যে সমালোচনা করেছিলেন, চন্দ্রনাথ তা বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখাবার বা শোনাবার অনুমতি চেয়েছিলেন অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ নিজে এ-সম্পর্কে নিশ্চয়ই বঙ্কিমকে কিছু বলেন নি—যদি বলতেন তাহলে দেবী চৌধুরাণী-র অনুশীলন-তত্ত্ব প্রসঙ্গে তাঁর হিন্দুধর্ম-সম্পর্কিত মতামতের আলোচনা অপরিহার্য ছিল বলে মনে হয়। তাছাড়া কেবল আদি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্যক্তিদের প্ররোচনায় রবীন্দ্রনাথ সামান্য অজুহাতে বঙ্কিম বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন একথা আমরা মানতে পারি না। স্বদেশ ও সমাজ সম্পর্কে তাঁর ভাবনার পরিচয় ভারতী-তে মুদ্রিত বহু প্রবন্ধেই ব্যক্ত হয়েছে। বর্তমানে ধর্ম নিয়েও তিনি ভাবতে শুরু করেছিলেন তার আভাস পাওয়া যায় চন্দ্রনাথ বসুর ১৭ আশ্বিনে লিখিত পত্রে : 'পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে আমি আর একটি প্রবন্ধ লিখিব। কার্তিক মাসের সংখ্যায় যদি স্থান হয় তবে ঐ সংখ্যায় নচেৎ তাহার পরের সংখ্যায় ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে। আমার

বোধ হয় যে দ্বিতীয় প্রবন্ধটি পড়িয়া আপনার যদি আরো কোন কথা বলা আবশ্যক হয় তবে সেই কথাগুলি শুদ্ধ লইয়া সমস্ত কথাগুলির একত্রে আলোচনা করাই সুবিধাজনক হইবে। অতএব আমার মত যে দ্বিতীয় প্রবন্ধ প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত ঐ বিষয়ের আলোচনা ক্ষান্ত রাখা যায়।' অর্থাৎ নবজীবন-এর আশ্বিন সংখ্যায় মুদ্রিত চন্দ্রনাথ বসুর 'যোড়শোপচারে পূজা [অস্বাক্ষরিত, আভ্যন্তরীণ প্রমাণে আমাদের অনুমান] প্রবন্ধে পৌত্তলিকতা সম্পর্কে যে মতামত ব্যক্ত হয়, রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত তার প্রতিবাদ করতে চেয়েছিলেন, চন্দ্রনাথ সেটি স্থগিত রাখতে অনুরোধ করেন [উল্লেখ্য যে, চন্দ্রনাথ কার্তিক সংখ্যায় 'তেত্রিশকোটি দেবতা' ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'প্রতিমা' নামে একই বিষয়ে দুটি প্রবন্ধ লেখেন]। সুতরাং নিছক বঙ্কিম-বিরোধিতার জন্য রবীন্দ্রনাথ লেখনী ধারণ করেছিলেন, একথা মেনে নেওয়া শক্ত। সরলা দেবীর বক্তব্য অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ এ-ব্যাপারে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সমর্থনও লাভ করেন নি : 'রবীন্দ্রনাথের দুই অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এ বিষয়ে শাস্ত্রকারদের ও বঙ্কিমের পক্ষাবলম্বী হলেন, তাঁরা বক্তৃতা-সভায় যোগদান করলেন না।'[৪২] এই তথ্য সঠিক হলে বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনার ভিত্তিটিই দুর্বল হয়ে পড়ে।

দুর্বলতা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের অন্যত্রও লক্ষিত হয়—কৈলাসচন্দ্র সিংহ সম্বন্ধে অমার্জিত মন্তব্য, 'সত্য' শব্দের কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা, সাধারণ্যে অপ্রচারিত কৃষ্ণোক্তির উল্লেখ [যাকে তিনি নিজেই 'উপন্যাস মাত্র' বলে বর্ণনা করেছেন], রবীন্দ্রনাথ-কথিত 'একটি হিন্দুর আদর্শ কল্পনা' শব্দগুলিকে 'একটি আদর্শ হিন্দুর কল্পনা'-তে রূপান্তর ও তদনুযায়ী যুক্তিপ্রয়োগ, অনুচিত ইঙ্গিত ['মুখ্য' শব্দটির পাদটীকা-নির্দেশ—'বক্তৃতার সময়ে শ্রোতারা এই শব্দটা কিরূপে শুনিয়াছিলেন?'] তাঁর মর্যাদাবোধের সঙ্গে যথেষ্ট সংগতিপূর্ণ বলে মনে হয় না।* বস্তুত এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের পিছনেও একটি 'বড় ছায়া' দেখা যায় এবং সেইজন্যই আগে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো কথা লিখিত বা পঠিত হলে উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ না করলেও 'এবার উত্তর করিবার একটু প্রয়োজন পড়িয়াছে। না করিলে যাহারা আমার কথায় বিশ্বাস করে, (এমন কেহ থাকিলে থাকিতে পারে) তাহাদের অনিষ্ট ঘটিবে।' গুরু ও প্রচারকের ভূমিকা গ্রহণ করলে এই ভবিতব্য এড়ানো প্রায়শই সম্ভব হয় না!

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যুত্তরে 'কৈফিয়ৎ' রচনা করেন, একথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। এখানে তিনি উপসংহারে লেখেন, 'বঙ্কিম বাবুর প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি আছে তিনি তাহা জানেন। যদি তরুণ বয়সের চপলতাবশতঃ বিচলিত হইয়া তাঁহাকে কোন অন্যায় কথা বলিয়া থাকি তবে তিনি তাঁহার বয়সের ও প্রতিভার উদারতাগুণে সে সমস্ত মার্জ্জনা করিয়া এখনো আমাকে তাঁহার স্নেহের পাত্র বলিয়া মনে রাখিবেন। আমার সবিনয় নিবেদন এই যে আমি সরল ভাবে যে সকল কথা বলিয়াছি, আমাকে ভুল বুঝিয়া তাহার অন্য ভাব গ্রহণ না করেন।' সৌভাগ্যক্রমে এই বিতর্ক আর বেশি দূর অগ্রসর হয় নি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'এই বিরোধের অবসানে বঙ্কিমবাবু আমাকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হারাইয়া গিয়াছে—যদি থাকিত তবে পাঠকেরা দেখিতে পাইতেন, বঙ্কিমবাবু কেমন ক্ষমার সহিত এই বিরোধের কাঁটাটুকু উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।'[৪৩] কণ্টক উৎপাটনে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িও একটি ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ক্যাশবহি-তে ২৯ ফাল্গুনের [বুধ 11 Mar 1885] হিসাবে দেখি : 'জায়/বঙ্কিমবাবু দিগকে খাওয়ানর হিঃ ১৭৫'—হিসাবটি সম্পূর্ণ হয় ১৮ চৈত্র তারিখে : 'দং ১৫ চৈত্রর খরচ/....দং বাবু

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দিগকে খাওয়ান ব্যয়....১৩৬   ল ৬'; সম্ভবত ১৫ চৈত্র [শুক্র 27 Mar] তারিখেই উক্ত আহারাদির আয়োজন করা হয়েছিল।

কিন্তু বঙ্কিম-ভক্তরা রবীন্দ্রনাথকে অত সহজে মুক্তি দেন নি। নবজীবন-এর মাঘ সংখ্যায় ভাই হাততালি' নামে অক্ষয়চন্দ্র সরকার-লিখিত একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হয় [পৃ ৪২৮-৩২]। হাততালির মোহে কেশবচন্দ্র, রমাবাঈ ও সুরেন্দ্রনাথের অধঃপতনের বর্ণনা দিয়ে লেখক সুকৌশলে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে লিখলেন : 'আর এক দিকে, আর এক পথে আমাদের আশার স্থল, ভরসার সম্বল, রবীন্দ্রনাথ। বিদ্যাসাগর মহাশয়, বঙ্কিম বাবু বা অন্যান্য খ্যাতনামা বর্ষীয়ানগণের কথা ধরি না। তোমার অসার আস্ফালনে উদাসীনতা প্রদর্শনের উপহাসে হাস্য করিবার অধিকার অনেক দিন হইল তাঁহাদের হইয়াছে। বয়স বিগুণে রবীন্দ্রনাথের সে অধিকার এখনও হয় নাই;—তাই হাততালি তাঁহার জন্য, আমাদের রবীন্দ্রনাথের জন্য, আজি তোমার কাছে আমাদের এই উপাসনা।

'রবীন্দ্রনাথ প্রতিভার দীপশিখা; ধীরে ধীরে জ্বলিলে এই শিখা স্বীয় বর্দ্ধমান আলোকে চারি দিক্ আলোকিত করিবে; প্রাচীন হিন্দু সুগন্ধি তৈল নিষেবিত দীপের ন্যায় সেই অমল আলোকের সঙ্গে সঙ্গে সুগন্ধে চারি দিক্ আমোদিত করিবে। সেই অমল, কোমল, কমলশোভাসমন্বিত মুখশ্রী—সেই উজ্জ্বল, সলজ্জ ভাসা ভাসা, ভ্রমর-ভর-স্পন্দিত-পদ্ম-পলাশ-লোচন—সেই ঝামর-চামর-নিন্দিত, গুচ্ছে গুচ্ছে স্বভাব-বেণীবিনায়িত চিকুর ঝলমল মুখমণ্ডল,—সেই রহস্যে আনন্দে মাখান, হাসি খুসী ভরা অধরপ্রান্ত—সেই সৎচিন্তার প্রসর ক্ষেত্র, সুন্দর শুভ্র, পরিষ্কার দর্পণোপম ললাট—ভগবানের এরূপ অতুল সৃষ্টি কখন বৃথা হইবার নহে। না, এখনও রবীন্দ্রনাথ আমাদের আশার স্থল, ভরসার সম্বল; তুমি না লাগিলে—আর তুমি লাগিলে? তোমার সেই লক্ষ হস্তের দশ লক্ষ চটচটি একবার প্রতিনিয়ত ধ্বনি করিলে, বীরের বীরাসন টলে, তা কোমল বঙ্গসন্তানের কি আর স্থৈর্য্য থাকিবে? ভাই স্বীকার করিলাম তুমি বাহাদুর,—তুমি মনে করিলে বীরপাত করিতে পার, কিন্তু তোমার হাতে ধরি, বিনয় করি,—তুমি দিন কতক ক্ষান্ত থাকিবে না কি?' লেখকের লিপি-নৈপুণ্যের প্রশংসা করতেই হয়, কিন্তু বঙ্কিম-রবীন্দ্র-বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে রচনাটিকে দেখলে তাঁর রবীন্দ্রানুরাগের ছদ্মবেশটি আর নিঁখুত বলে মনে হয় না।

এখানে একটি জিনিস লক্ষণীয় যে, ভাদ্র ১২৯১ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র ও নবজীবন-এর সঙ্গে আদি ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত লেখকদের বিরোধ শুরু হওয়ার পরও প্রচার ও নবজীবন-এ রবীন্দ্রনাথের রচনা প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু উপরোক্ত প্রবন্ধটি প্রকাশের পর তাঁর আর কোনো রচনা পত্রিকা দুটিতে মুদ্রিত হয় নি [মাঘ ১২৯১-সংখ্যা প্রচার-এ 'মথুরায়' কবিতাটি প্রকাশিত হয়, কিন্তু সেটি নিশ্চয় পূর্বেই প্রেরিত হয়েছিল]।

এই বিতর্কের ইতিহাস পরিক্রমা করতে গিয়ে আমরা ধারাবাহিকতা থেকে কিছুটা বিচ্যুত হয়েছি। সেইজন্য পুনরায় রবীন্দ্র-রচনার সাময়িক পত্রে প্রকাশ-সূচীতে ফিরে যাচ্ছি।

নবজীবন, কার্তিক ১২৯১ [১।৪] :

২৫২-৫৬ 'বৈষ্ণব কবির গান' দ্র আলোচনা অ-২।৪৬-৫১

আলোচনা কার্তিক ১৮০৬ শক [১।৩] :

৯৫ 'জীবন মরণ।' ['ওরা যায়, এরা করে বাস']/'Victor Hugo হইতে অনুবাদিত।'

দ্র র° র° ৪ [শতবার্ষিক সং]। ৮৭০ ['বিদেশী ফুলের গুচ্ছ']

অনুবাদটি অস্বাক্ষরিত হলেও সূচীতে রবীন্দ্রনাথের নাম আছে। কিন্তু কড়ি ও কোমল [১২৯৩] গ্রন্থে 'বিদেশী ফুলের গুচ্ছ' বিভাগে য়্যুগোর একটি কবিতার অনুবাদ স্থান পেলেও বর্তমান অনুবাদটি অন্তর্ভুক্ত হয় নি। পূর্ববর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত Robert Buchanan-এর কবিতার অনুবাদ 'সুখী প্রাণ'-ও একই ভাগ্য লাভ করেছিল। সজনীকান্ত দাস বহুদিন পরে এ দুটিকে উদ্ধার করে শনিবারের চিঠি-তে পুনর্মুদ্রিত করেন। [রবীন্দ্রনাথ কি অনুবাদ-দুটির কথা বিস্মৃত হয়েছিলেন?] রবীন্দ্রনাথের ফরাসী কবিতার অনুবাদ সম্পর্কে আমরা পূর্বেই কিছু আলোচনা করেছি। এই কবিতাটিও পূর্বোক্ত *Les Contemplations* গ্রন্থের ২২৭-২৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত QUIA PULVISES ['Ceux-ci partent, ceux-la demeurent'] কবিতার পাশে পাশে অনুবাদ করা হয়। ২২৬ ও ২২৭ পৃষ্ঠার সাদা অংশে দুবার অনুবাদ করে কেটে দেওয়ার পর প্রচুর কাটাকুটি-সহ খসড়াটি রূপ লাভ করে।*

'(তাঁহারে) আরতি করে চন্দ্র তপন' ও 'তাঁহার আনন্দধারা জগতে যেতেছে বয়ে' গান দুটি রবীন্দ্রনাথ স্বাক্ষরে এই সংখ্যার ৯৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছিল। আমরা আগেই উল্লেখ করছি যে, গান-দুটি তত্ত্ববোধিনী-র কার্তিক সংখ্যাতেও মুদ্রিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরিত 'আয়-ব্যয়'-এর হিসাব উক্ত সংখ্যাতেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রচার, কার্তিক ১২৯১ [১।৪] :

১২০-২৩ 'কাঙালিনী' দ্র কড়ি ও কোমল ২/৩৯-৪১

ভারতী, কার্তিক ১২৯১ [৮।৭] :

৩০০-০৯ 'ঘাটের কথা' দ্র গল্পগুচ্ছ ১৪।২৪৫-৫৪

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম ছোটোগল্প-জাতীয় রচনা 'ভিখারিনী'কে কোনো গল্প-সংগ্রহে স্থান না দিলেও বর্তমান রচনাটি তাঁর প্রথম গল্প-সংকলন 'ছোট গল্প'-তে [ফাল্গুন ১৩০০] অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল; যদিও পরবর্তীকালে 'গল্পগুচ্ছ' [আশ্বিন ১৩০৭] থেকে বর্জিত হয়। অগ্র°-সংখ্যা নবজীবন-এ মুদ্রিত 'রাজপথের কথা' গল্পটির ভাগ্যও একই পথ অনুসরণ করে। বস্তুত গল্প-দুটির মধ্যে ছোটোগল্পের অল্পস্বল্প আভাস দেখা গেলেও এগুলি তাঁর সমকালীন ভাবুকতামূলক রচনারই সমধর্মী।

৩২১-২২ 'যোগিয়া' দ্র কড়ি ও কোমল ২।৩৭-৩৮

কার্তিক মাসের ২৩ তারিখে [শুক্র 7 Nov] আমরা রবীন্দ্রনাথকে একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে দেখি। ওই দিন পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ির মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ভ্রাতা শৌরীন্দ্রমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র প্রদ্যোৎকুমারকে দত্তক গ্রহণ করেন। ২৭ কার্তিক ক্যাশবহি-র হিসাবে লিখিত হয় : 'দং মহারাজা জ্যোতিন্দ্রমোহন ঠাকুর পোষ্যপুত্র লওয়ায় রবীবাবু মহাশয় যৌতুক দেন মোহর ১ থান....১৮।৫°'। পূর্বে অনুরূপ অনুষ্ঠানে সামাজিকতার দায়িত্ব পালনের ভার ছিল দ্বিজেন্দ্রনাথের উপর। মহর্ষি কবিস্বভাব কনিষ্ঠ পুত্রকে যে নানা ভাবে সাংসারিক বন্ধনে আবদ্ধ করার প্রয়াসী ছিলেন, এটি তার একটি অন্যতম দৃষ্টান্ত।

অগ্রহায়ণ ১২৯১-তে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার সূচী :

তত্ত্ববোধিনী, অগ্র° ১৮০৬ শক [৪৯৬ সংখ্যা] :

[১] ১৪৩ বিভাস-চৌতাল। ওঠরে—বিফলে প্রভাত বয়ে যায় যে দ্র গীতবিতান ১।১২১; স্বর ২৪; ইন্দিরা দেবী গানটিকে হিন্দি-ভাঙা বলে মনে করেন, কিন্তু মূলগানের সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নি দ্র রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম। ২৩ [পরে গ্রন্থটি 'ত্রিবেণীসংগম' নামে অভিহিত হবে।]

[২] ১৪৮ আসাবরি টোড়ি-তেওট। দিন ত চলি গেল প্রভু বৃথা দ্র গীতবিতান ৩।৮৩৬; স্বরলিপি নেই।

[৩] ১৬২ টোড়ি—ঢিমাতেতালা। ভব কোলাহল ছাড়িয়ে বিরলে এসেছি হে দ্র গীতবিতান ৩।৮৩৬; স্বর ৮; মূলগান : দরবারি টোড়ি—ঢিমাতেতালা। কাহু ন কর মোসে, দ্র ত্রিবেণীসংগম। ৩১

[৪] ১৬২ খট্—একতালা। আঁধার রজনী পোহাল দ্র গীতবিতান ১।১৩৮; স্বর ৮।

[৫] ১৬৬ রামকেলি-কাওয়ালি। আঁখিজল মুছাইলে জননী দ্র গীতবিতান ১।১৯৭-৯৮; স্বর ২৪; মূলগান : রামকেলি-ত্রিতাল। জিন ছুঁয়া মোরি বৈঁয়া নগরওয়া, দ্র প্রফুল্লকুমার দাস, রবীন্দ্রসংগীত-গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩ [১৩৮১]। ৭৯-৮০ [পরে এই গ্রন্থটি 'গবেষণা-গ্রন্থমালা' নামে উল্লিখিত হবে।]

[৬] ১৬৬ ললিত—চৌতাল। ডুবি অমৃত পাথারে দ্র গীতবিতান ১। ১৫৪; স্বর ৮; ইন্দিরা দেবীর মতে গানটি হিন্দি-ভাঙা, কিন্তু মূলগানের সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নি, দ্র ত্রিবেণীসংগম। ২৬

[৭] ১৬৬ ভৈরবী-ঝাঁপতাল। অসীম কাল সাগরে ভুবন ভেসে চলেছে দ্র গীতবিতান ১।১৭৮; স্বর ৮; মূলগান : সারদা বিদ্যাদেনী দ্র ত্রিবেণীসংগম। ২০

[৮] ১৬৬ আসাবরি—চৌতাল। এখনো আঁধার রয়েছে, হে নাথ দ্র গীতবিতান ১।১৭৫; স্বর ৮

[৯] ১৬৭ বেলাবেলী—কাওয়ালি। দেখা যদি দিলে ছেড়ো না আর দ্র গীতবিতান ৩। ৮৩৬; স্বর ৪৫; মূলগান : পিয়া বিনা কৈসে দ্র ত্রিবেণীসংগম। ২৭।

মনে হয়, এর মধ্যে কয়েকটি বা সবগুলি গানই ৪ কার্তিক [রবি 19 Oct] মাসিক ব্রাহ্মসমাজে গীত হয়েছিল। লক্ষণীয়, অধিকাংশ [সম্ভবত সব-ক'টি] গানই-হিন্দী ধ্রুপদের আদর্শে রচিত।

ভারতী, অগ্র° ১২৯১ [৮।৮] :

৩৪০-৫০ 'একটি পুরাতন কথা'

প্রবন্ধটি সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। বিতর্কমূলক অংশগুলি বাদ দিয়ে রচনাটি সমালোচনা [১২৯৪] গ্রন্থে সংকলিত হয়, দ্র অ-২। ১৫০-৫৭। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত একখণ্ড ভারতী-তে [Ms. 435] দেখা যায়, নীল পেনসিলে উক্ত বর্জিত অংশগুলি কেটে দেওয়া হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধটির জন্য দ্র বঙ্কিমচন্দ্র [১৩৮৪]। ৫৮-৭৩।

৩৫৪-৫৫ 'শরতের শুকতারা' দ্র কড়ি ও কোমল, র°র°১ [প. ব. ১৩৮৭]। ২৮৩-৮৪, সংযোজন

কবিতাটি কড়ি ও কোমল-এর প্রথম সংস্করণে [১২৯৩] মুদ্রিত [পৃ ১৯-২৩] হলেও, দ্বিতীয় সংস্করণ [১৩০১] থেকে বর্জিত হয়।

৩৬৮-৭৪ 'সরোজিনী প্রয়াণ' দ্র বিচিত্র প্রবন্ধ ৪ |৪৯৩-৯৭

রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত ভারতী-তে কিছু অংশ পেনসিলে বর্জন-চিহ্নিত।

নবজীবন, অগ্র° ১২৯১ [১।৫] :

২৯৭-৩০২ 'রাজপথের কথা' দ্র গল্পগুচ্ছ ১৪।২৫৫-৫৮

গল্পটি সম্পর্কে কিছু তথ্য আমরা 'ঘাটের কথা'-প্রসঙ্গে দিয়েছি।

প্রচার, অগ্র° ১২৯১ [১।৫] :

১৬৫-৬৮ 'ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি' দ্র কড়ি ও কোমল ২।৪২-৪৪

১৬ অগ্র° [রবি 30 Nov] অপরাহ্ণ ৪।৷টায় রাজারাম মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে আদি ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষদের একটি বিশেষ অধিবেশন হয়; সম্পাদক ও অন্যতম অধ্যক্ষ হিসেবে রবীন্দ্রনাথও উপস্থিত ছিলেন। সভায় গৃহীত দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে তাঁর উপর একটি বিশেষ দায়িত্ব অর্পিত হয় : 'সমাজ সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্যে অধ্যক্ষদিগের অধিকার আছে, অবগত হইয়া, তদনুসারে কিরূপ কার্য্য করিতে হইবে, তাহার একটী বিজ্ঞাপনী প্রস্তুত করিয়া আগামী অধ্যক্ষ সভার অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপস্থিত করিবেন।' প্রতিবেদনটি সভাপতি রাজারাম মুখোপাধ্যায় ও সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের যুগ্ম-স্বাক্ষরে তত্ত্ববোধিনী-তে মুদ্রিত হয় [পৌষ। ১৮৮]। অন্যতম অধ্যক্ষ দ্বিপেন্দ্রনাথ প্রস্তাব করেন, 'আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে দুঃখী অনাথদিগকে কোন রূপ দান সাহায্য করা হয় না, এক্ষণে তদ্বিষয়ে মনোযোগ করা উচিত' ও অনাথা হিন্দু বিধবাদের সাহায্য বাবদে প্রতি মাসে ২৫ টাকা দান করার প্রতিশ্রুতি দেন। এই ধরনের কাজ আদি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে ইতিপূর্বে কখনও করা হয় নি। আমরা কিছুদিন পরেই দেখব, তাঁরা বীরভূমের দুর্ভিক্ষের সাহায্যে ত্রাণকার্যে অবতীর্ণ হয়েছেন। তরুণ সম্পাদকের আগ্রহাতিশয্যেই আদি ব্রাহ্মসমাজ অনুরূপ কার্যে আত্মনিয়োগ করেছিল।

এই সময়েই রবীন্দ্রনাথের প্রথম সংগীত-সংকলন 'রবিচ্ছায়া' মুদ্রণের আয়োজন হচ্ছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার সভ্য ও সিটি কলেজের অধ্যাপক যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র রবীন্দ্রনাথের সংগীত-প্রতিভার অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন এবং তাঁরই আগ্রহে ও অর্থব্যয়ে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। 20 Dec [শনি ৬ পৌষ] তিনি গ্রন্থটির নামকরণ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে লেখেন, "....বোধহয়, আবার 'ছায়া-আলোক' ভাল শুনায় না। কি করিব অনুগ্রহ করিয়া লিখিয়া দিন। 'ছায়া' মানে হৃদয়ের প্রতিবিম্ব বুঝাইতে পারে, তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ের ছায়া না বুঝাইতেও পারে, ঐ এক কথার মধ্যে আলোক আঁধার দুই থাকিতে পারে। যে নামটি ভাল বোধ হয় এই লোকের নিকট অনুগ্রহ করিয়া লিখিয়া দিবেন। নামটি একটু poetic হওয়া আবশ্যক।' রবীন্দ্রনাথ এই পত্রের শীর্ষে লেখেন, 'আলোছায়া বল্লে কেমন হয়? আর, "রবিচ্ছায়া" যদি বলেন সে আপনাদের অনুগ্রহ। নামকরণের ভার আপনার উপরে—যখন আপনি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছেন তখন তার গোত্র ও নাম আপনারি দাতব্য—আমার সঙ্গে ওর আর কোন সম্পর্ক নেই—'।[৪৪]

—উপরে উদ্ধৃত পত্রে 'তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ের ছায়া' শব্দগুলির দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আলোচ্য গ্রন্থে কি কেবল প্রেমমূলক সংগীতগুলিই সংকলন করার কথা ভাবা হয়েছিল?

এই সময়ে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়-সংকলিত 'ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী' নামক একটি গীতি-সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি গান মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্রনাথের পরিচিতি-প্রসঙ্গে গ্রন্থটিতে লিখিত হয় : 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।—এই যুবক কবি; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি বঙ্গীয় কবিদিগের মধ্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন। সঙ্গীত রচনাতে কলিকাতার ঠাকুর বংশ বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধ। ইঁহার ব্রহ্মসঙ্গীত, জাতীয়

সঙ্গীত এবং প্রণয় সঙ্গীত শিক্ষিত বঙ্গবাসীর ঘরে ঘরে গীত হয়। ইঁহার সঙ্গীতে অনেক রকম নূতন সুর ও নূতন ভাব সন্নিবিষ্ট দেখা যায়। ধন্য রবীন্দ্রনাথের লেখনী! কত যে সুন্দর জিনিষ ইহা হইতে বাহির হইয়াছে, এবং আরো কত যে বাহির হইবে কে বলিতে পারে। বিশুদ্ধ প্রণয় সঙ্গীত রচনা করিয়া রবীন্দ্র বাবু দেশের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ উত্তম সঙ্গীত রচয়িতা বলিয়াই বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ এমত নহে; সুগায়ক বলিয়াও বিলক্ষণ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।' সজনীকান্ত দাস লিখেছেন, 'সম্ভবত ইহাই ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের আদিমতম পরিচয়।'[৪৫]

আদি ব্রাহ্মসমাজের কাজে ও পারিবারিক বিভিন্ন প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথকে এই সময়ে প্রায়ই চুঁচুড়ায় মহর্ষির কাছে যাতায়াত করতে দেখা যায়। ক্যাশবহি-তে ২৪ পৌষের হিসাব : 'শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের নিকট চুঁচুড়ায় রবীবাবু মহাশয়ের যাতায়াতের ট্রেণ ভাড়া প্রভৃতি ব্যয় ২১ অগ্রহায়ণের [শুক্র 5 Dec] ১ বৌ° ২॥ ল০' এবং 'শ্রীযুক্ত ছোটবাবু মহাশয়ের [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ] ও রবীবাবু মহাশয়ের ও ইন্দিরা দেবী প্রভৃতির চুঁচুড়ার বাটীতে শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের নিকট যাতায়াতের ট্রেণ ভাড়া ও গাড়ি ভাড়া প্রভৃতি ব্যয় ৫ পৌষ [শুক্র 19 Dec] ৯॥০' । ৮ পৌষ [সোম 22 Dec] মহর্ষি রবীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'একটি ভাল হারমোনিয়াম ক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছ—[প্রিয়নাথ] শাস্ত্রীর নিকট হইতে শুনিলাম—অতএব তাহা ক্রয় করিবে। কিন্তু যে হারমোনিয়াম মেরামত করিতে দিয়াছ, তাহা তবে কি উপকারে আসিবে?[৪৬] পত্রটি থেকে আদি ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনগুলিতে সাংগীতিক আকর্ষণ সৃষ্টির জন্য রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ এবং কনিষ্ঠ পুত্রের কার্যকলাপের প্রতি মহর্ষির অকুণ্ঠ সমর্থন অথচ সূক্ষ্ম হিসাববুদ্ধির সুন্দর নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত ক্যাশবহি থেকে উক্ত হারমোনিয়াম কেনা ও মেরামত সম্পর্কে দুটি হিসাব উদ্ধৃত করি :'ব° হ্যারল্ড কো° দং সরকারি একটা হারমনিয়ম হার্প বাজ ক্রয়ের ৫০০্ টাকার এক বিলের মধ্যে...১০০্' [২ ফাল্গুন] ও 'ব° নবীনচন্দ্র বন্দ্যো° দং আদিব্রাহ্মসমাজে যে হারমনিয়ম ছিল তাহা আনিয়া মেরামত করান ব্যয়....১০১॥০' [১৯ ফাল্গুন]।

পৌষ মাসে সাময়িকপত্রে রবীন্দ্র-রচনার প্রকাশ-সূচীটি এইরূপ :

তত্ত্ববোধিনী, পৌষ ১৮০৬ শক [৪৯৭ সংখ্যা] :

১৮৬ বেহাগ—একতালা। আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি দ্র গীতবিতান। ১। ১৬৬; স্বর ২৪। কীর্তনের সুরে রচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে সম্ভবত এইটিই প্রথমতম। ভারতবর্ষীয় ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে কীর্তনাঙ্গ সুরে ব্রহ্মসংগীতের ব্যাপক সমাদর থাকলেও আদি ব্রাহ্মসমাজে এতদিন ধ্রুপদাঙ্গ সুরেরই প্রাধান্য ছিল। কিন্তু বৈষ্ণব কবিতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে আগ্রহের পরিচয় এর আগে আমরা পেয়েছি, সম্ভবত সেই আকর্ষণের সূত্রেই তিনি কীর্তনাঙ্গ সুরের প্রতি আকৃষ্ট হন। এমন-কি তত্ত্ববোধিনী-তে রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরিত মাঘোৎসবের বিজ্ঞপ্তিতেও লেখা হয় : 'ঐ দিবস মধাহ্ন হইতে শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনের বহিঃপ্রাঙ্গণে পাঠ, আলোচনা ও সংকীর্ত্তন হইয়া ৩টার সময়ে উপাসনা আরম্ভ হইবে।' পরিবর্তনটি অন্যদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল; *The Indian Messenge*r [Vol. II, No. 8, Jan 4, p. 140] উৎসবের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে লেখে : 'It is gratifying to see that the Adi Brahma Samaj has at last come to see the importance of *Sankirtans*'; ধর্ম্মতত্ত্ব [20।২, ১৬ ফাল্গুন। ৪৪] লেখে : 'গত মাঘোৎসবে প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে

খোল করতাল সহ মহা উৎসাহে তুমুল সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। আমরা জানিতাম প্রধান আচার্য্য মহাশয় ও তাঁহার পুত্রগণ খোল করতাল ও সঙ্কীর্তনের মহাবিরোধী ছিলেন মাঘোৎসবে তাঁহার বাড়ীতে খোল করতাল সহ ব্রহ্মসঙ্কীর্ত্তন হওয়া আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিতে হইবে।' এই কারণেই আদি ব্রাহ্মসমাজকে কৈফিয়ৎ দিতে হয় [তত্ত্ববোধিনী, ফাল্গুন।২২০] : 'আমরা কীর্ত্তনের বিলক্ষণ পক্ষপাতী কিন্তু বর্তমানে কীর্ত্তন সুরুচিসঙ্গত হয় না বলিয়া এত দিন তাহাতে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু ধর্ম্মপ্রচারের এই প্রাচীন প্রথা রক্ষা করা এবং তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করা আবশ্যক। বলিতে কি, আমরা তদ্বিষয়ে সম্যক্ কৃতকার্য্য হইয়াছি। এক জন সুপ্রসিদ্ধ প্রধান কবি পদ রচনা করিয়াছেন এবং এক জন উৎকৃষ্ট গায়ক তাহা গান করিয়াছিল। ফলত শ্রোতৃগণের মধ্যে কেহই এই হৃদয়হারী সুমধুর কীর্ত্তন শুনিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই।' উক্ত 'সুপ্রসিদ্ধ প্রধান কবি' হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ এবং আমাদের ধারণা, তাঁর আগ্রহেই আদি ব্রাহ্মসমাজ কীর্তন সম্বন্ধে তাঁদের এতদিনের বিরূপতা প্রত্যাহার করেন। গোঁড়ামির বশবর্তী না হয়ে যা-কিছু ভালো তাকে গ্রহণ করতে এবং সৃষ্টিশীল প্রতিভার স্পর্শে তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যকে বিচিত্ররূপে বিকশিত ও সমৃদ্ধ করে তুলতে রবীন্দ্রনাথ কখনোই ক্লান্তি অনুভব করেন নি, এটি তাঁর চরিত্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উল্লেখ্য যে, মাঘোৎসবে কীর্তনের সুরে রচিত রবীন্দ্রনাথের আর একটি গান '(আমার) হৃদয় সমুদ্র তীরে কে তুমি দাঁড়ায়ে' গীত হয়, আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে গানটির সুর রক্ষিত হয় নি।

ভারতী, পৌষ ১২৯১ [৮।৯] :

৪০০-০৮ 'কৈফিয়ৎ', দ্র বঙ্কিমচন্দ্র। ৭৪-৮৫

প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আদি ব্রাহ্ম সমাজ ও "নব হিন্দু সম্প্রদায়" প্রবন্ধের প্রত্যুত্তরে লিখিত, এটি সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। [উল্লেখ্য যে, পৌষ সংখ্যা নব্যভারত-এর ৪৩২-৩৪ পৃষ্ঠায় কৈলাসচন্দ্র সিংহ 'হদ্দ জবাব'-শীর্ষক রচনায় তাঁর সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন।]

৪০৮ 'কোথায়' দ্র কড়ি ও কোমল ২।৪৬-৪৮

কাদম্বরী দেবীর স্মৃতি-সুরভিত পুষ্পাঞ্জলি-র পাণ্ডুলিপিতে কবিতাটি পাওয়া যায়। পাণ্ডুলিপির ৯টি স্তবকের মধ্যে পঞ্চমটি ভারতী-তে ও গ্রন্থে বর্জিত হয়েছে :

> যারা তব আদরের ধন
> বড় যারা ছিল রে আপন,
> যদিরে তাদের কাছে প্রাণ মন যেতে চায়,
> আর নাহি পাবে!
> হায়, কোথা যাবে!

মূল ও ভারতী-র প্রথম ৪টি স্তবকের বিন্যাস গ্রন্থে ১, ৩, ৪, ২,-রূপে পরিবর্তিত।[৪৭] রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত ভারতী-তে কিছু কিছু সংশোধনের চিহ্ন দেখা যায়।

৬ মাঘ রবিবার [18 Jan 1885][*] সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চপঞ্চাশত্তম মাঘোৎসবের অঙ্গ হিসেবে রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভার আয়োজন করা হয়; রবীন্দ্রনাথ সেখানে 'রামমোহন রায়' শীর্ষক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। তত্ত্বকৌমুদী [৭।২০, ১৬ মাঘ ১৮০৬ শক। ২৩৪-৩৫] অনুষ্ঠানটির বিবরণ দিতে গিয়ে লেখে : 'অদ্য [৬ মাঘ রবিবার] অপরাহ্নে মহাত্মা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা। সিটী কলেজের নবনির্ম্মিত

বাড়ীতে এই সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এবারের মত জনতা কোন বারে হয় নাই এবং অদ্যকার দিনের ন্যায় আনন্দ কোনবারে অনুভব করা যায় নাই। এবারের বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে অদ্যকার সভাতে ব্রাহ্মসমাজের সকল বিভাগের লোক আনন্দের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। আদি সমাজের সম্পাদক খ্যাতনামা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়, শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়, শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ও রামমোহন রায়ের গ্রন্থ প্রকাশকর্ত্তা শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয় অদ্য বক্তৃতার ভার লইয়াছিলেন। সমাগত লোকের সংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল, যে সিটী কলেজের ত্রিতলস্থিত সুবিস্তীর্ণ হলে, লোকের সমাবেশ না হওয়াতে নিম্নতলের হলে, আর একটী সভা করিতে হইল। উপরকার সভায় আমাদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শিবচন্দ্র দেব মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিম্নতলে শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু মহাশয় উক্ত আসনে আসীন ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এতদুপলক্ষে একটী সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি যখন তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন তাহার কবিত্ব পরিপূর্ণ ভাষায়, ও চমৎকার ভাব প্রকাশ প্রণালীতে শ্রোতাগণ মুগ্ধ হইয়া গেলেন। এক সময়ে দুই স্থানে দুই সভা চলিতেছে সুতরাং রবীন্দ্র বাবুকে ও ঈশান বাবুকে উপরকার তালায় তাঁহাদের প্রবন্ধ এক একবার পাঠ করিয়া নিম্নতালায় আসিয়া আবার পাঠ করিতে হইল।' শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর দীর্ঘ মৌখিক ভাষণে [দ্র তত্ত্বকৌমুদী। ২৩৫-৩৬] রবীন্দ্রনাথ-উল্লিখিত রামমোহনের 'আত্ম-বিলোপ' গুণ ও জাতীয় ভাবের প্রকৃতি সম্বন্ধে উদাহরণ-সহ আলোচনা করেন। পরে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ভাষণ দেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি 'রামমোহন রায়' শিরোনামে ভারতী-র মাঘ সংখ্যায় [পৃ ৪৫৮-৭০] প্রকাশিত ও চৈত্র সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-তে [পৃ ২৩৩-৪৩] পুনর্মুদ্রিত হয়। চৈত্র মাসেই প্রবন্ধটি পুস্তিকাকারেও প্রকাশিত হয়।

পুস্তিকাটির আখ্যাপত্র নেই। মলাটের উপরে লেখা : 'রামমোহন রায়/রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভায় ১২৯১ সালের/৫ মাঘে সিটি কলেজ গৃহে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক/এই প্রবন্ধটী পঠিত হয়।' পৃষ্ঠাসংখ্যা : [ল০]+৩৪

মলাটের পিছনে লেখা : 'কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।/আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।/মূল্য ল০ আনা।'

বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তকতালিকা অনুসারে পুস্তিকাটি 18 Mar 1885 [বুধ ৬ চৈত্র] প্রকাশিত হয়, মুদ্রণ সংখ্যা ১০০০।

পুস্তিকার 'ভূমিকা'য় রবীন্দ্রনাথ লেখেন : 'রামমোহন রায়ের মতের উদারতা সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা অনেকে ভুল বুঝিয়াছেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মত যে অত্যন্ত উদার ছিল তাহা লেখক স্বীকারই করিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা প্রতিবাদকারিগণ পুনর্ব্বার মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন।'

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস-সংকলিত 'রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী'তে [শনিবারের চিঠি, পৌষ ১৩৪৬।৪৫৫] লিখিত হয় : "১২৯১ সালের 'প্রচার' ও 'নবজীবনে' ভূমিকায় উল্লিখিত প্রতিবাদগুলি বাহির হইয়াছিল।" কিন্তু আমরা প্রচার, নবজীবন, নব্যভারত, আর্য্যদর্শন, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি যে-ক'টি পত্রিকা দেখেছি, তাতে এ-ধরনের কোনো প্রতিবাদ চোখে পড়ে নি।

বস্তুত প্রতিবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল ফাল্গুন ১২৯১-সংখ্যা 'প্রবাহ' পত্রিকায় মহেন্দ্রনাথ রায়-রচিত "ভারতী পত্রিকায় প্রচারিত শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রামমোহন রায়' প্রস্তাবের সমালোচনা" প্রবন্ধে। রচনাটি সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব।

চারিত্রপূজা [১৩১৪] গ্রন্থে প্রবন্ধটি যথেষ্ট পরিমাণে সম্পাদিত আকারে গৃহীত হয়, ভারতপথিক রামমোহন রায় [১৩৪০] গ্রন্থে এই পাঠই মুদ্রিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত ভারতী-তে দেখা যায় প্রবন্ধটির কিছু অংশ নীল পেনসিলে কাটা। চারিত্রপূজা সংকলনের সময়েই এই সম্পাদনা হয়েছিল বলে মনে হয়। দুটি পাঠের [মূল পাঠের জন্য দ্র চারিত্রপূজা ৪। ৫১১-২৪] তুলনামূলক আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের ধর্মবিষয়ক মতের বিবর্তনের একটি চেহারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

৯ মাঘ [বুধ 21 Jan] প্রাতে মহর্ষিভবনের বহিঃপ্রাঙ্গণে তিন ব্রাহ্মসমাজের সমবেত উপাসনার মাধ্যমে 'ব্রাহ্মসম্মিলন' হয়। রবীন্দ্রনাথ সভার সূচনায় ও সমাপ্তিতে দুটি সংগীত পরিবেশন করেন। সোমপ্রকাশ [২৯। ১১, ১৪ মাঘ] পত্রিকায় শ্রীরাম পালিত-লিখিত একটি বিবরণে দেখি : '....৯ই মাঘ প্রাতে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে, সুরচিত সুসজ্জিত আটচালার মধ্যে, শ্রদ্ধাস্পদ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, পণ্ডিতবর শিবনাথ শাস্ত্রী, আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং জ্ঞানাচার্য্য দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর উপাসনাকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। বীণা-বিনিন্দিত সুকণ্ঠ রবীন্দ্র বাবু স্বরচিত প্রভাতী গান গাহিয়াছিলেন। ত্রৈলোক্য বাবুর সময়োচিত সুমিষ্ট ভজন-সংগীত শ্রবণে সভাস্থ সকলে প্রেমে ও আনন্দে পুলকিত হইয়াছিলেন।' রবীন্দ্রনাথ কোন্ গান-দুটি গেয়েছিলেন কোনো বিবরণেই তার উল্লেখ নেই।*

১১ মাঘ [শুক্র 23 Jan] আদি ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চপঞ্চাশ সাংবৎসরিক উদ্‌যাপিত হল। তত্ত্ববোধিনী-র [ফাল্গুন। ২১৩-৩০] বিবরণ অনুযায়ী প্রাতঃকালীন ও সায়ংকালীন উপাসনায় এবং অন্তঃপুরিকাদের ব্রহ্মোৎসবে রবীন্দ্রনাথ-রচিত মোট ২৪টি ব্রহ্মসংগীত গীত হয়, এ ছাড়াও অপরাহ্নকালীন উপাসনায় সম্ভবত তাঁর লেখা কীর্তনও পরিবেশিত হয়েছিল—তিনটি গান অবশ্য পূর্ব-রচিত ও—প্রকাশিত। উল্লেখযোগ্য যে, দেবেন্দ্রনাথ-রচিত 'দেহ জ্ঞান দিব্যজ্ঞান' ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রচিত 'ডাকি তোমারে কাতরে, দয়া কর দীনে' গান-দুটি ছাড়া আর সবগুলিই রবীন্দ্রনাথের লেখা।

আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে প্রাতঃকালীন উপাসনায় রবীন্দ্রনাথ-রচিত ১০টি ব্রহ্মসংগীত পরিবেশিত হয় :

[১] মিশ্র বেলাবতী-কাওয়ালি। ওহে দয়াময় নিখিল আশ্রয় দ্র তত্ত্ববোধিনী, ফাল্গুন।২১৭; গীতবিতান ৩। ৯৪৭-৪৮; স্বর ৪৫। মূল গান : 'Go where glory waits thee'; উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্রনাথ পূর্বেই এই সুরে 'মরি ও কাহার বাছা' [বাল্মীকি প্রতিভা] ও 'মানা না মানিলি' [কালমৃগয়া] গান দুটি রচনা করেছিলেন।

[২] ললিত—চৌতাল। ডুবি অমৃতপাথারে দ্র তত্ত্ব°, অগ্র°

[৩] ভৈরোঁ—একতালা। তাঁহার প্রেমে কে ডুবে আছে। দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২১৭; গীতবিতান ৩ |৮৩৬; স্বরলিপি নেই। ইন্দিরা দেবীর মতে, গানটি ভারতীয় রাগসংগীতের আদর্শে রচিত দ্র ত্রিবেণীসংগম।২৬

[8] দেশী টোড়ি—ঢিমা তেতালা। তবে কি ফিরিব ম্লান মুখে সখা দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন।২১৮; গীতবিতান ৩। ৮৩৬; স্বর ৮। ইন্দিরা দেবীর মতে গানটি হিন্দিভাঙা, দ্র ত্রিবেণীসংগম।২৬

[৫] ভৈরবী—ঝাঁপতাল। অসীম কাল সাগরে ভুবন ভেসে চলেছে দ্র তত্ত্ব°, অগ্র°

[৬] রামকেলী—ঝাঁপতাল। দুখ দূর করিলে, দরশন দিয়ে দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২১৯; গীতবিতান ৩।৮৩৭; স্বর ২৫। মূল গান : সঙ্গীতমঞ্জরী-ধৃত জ্ঞানরঙ্গ-রচিত ‘বাজত বীণ প্রবীণ রবাব’, দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩।৫০

[৭] বেলাবেলী—কাওয়ালি। দেখা যদি দিলে ছেড়োনা আর দ্র তত্ত্ব°, অগ্র°

[৮] রামকেলী—কাওয়ালি। দাও হে হৃদয় ভরে দাও দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২১৯; গীতবিতান ৩।৮৩৭; স্বর ৪৫; মূল গান : সঙ্গীতমঞ্জরী-ধৃত অচপল-রচিত ‘প্যালা মুঝে ভরি দেবে মতবারি মোর’, দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ৮০

[৯] ভৈরবী—একতালা। সখা, মোদের বেঁধে রাখ প্রেম ডোরে দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২১৯; গীতবিতান ৩।৯৫০; স্বরলিপি নেই। প্রথম সংস্করণ গীতবিতান-এ গানটি রবীন্দ্রনাথের ‘স্বরচিত নহে’ বলে চিহ্নিত। রবিচ্ছায়া-তেও গানটি নেই, কিন্তু গানের বহি [১৩০০], কাব্যগ্রন্থাবলী [১৩০৩] প্রভৃতি সংকলনে গৃহীত হয়েছে।

[১০] প্রভাতী—একতালা। এ কি অন্ধকার এ ভারতভূমি দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২১৯-২০; গীতবিতান ৩।৮১৭; স্বর ৪৭। গানটি গুজরাটি ভজনের সুরে গ্রথিত।

সায়ংকালীন উপাসনা হয় মহর্ষিভবনে; এই অধিবেশনে গীত রবীন্দ্রনাথ-রচিত গানের সংখ্যা ১১টি :

[১] হাম্বীর—চৌতাল। এসেছে সকলে কত আশে, দেখ চেয়ে দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২২৪; গীতবিতান ১।১২৭; স্বর ২৬। মূলগান : ‘বুঁদ পবণ পুরবাই গরজ গরজ বরখত ঘন’ দ্র গবেষণাগ্রন্থমালা ৩।২১

[২] ইমন—আড়াঠেকা। এ মোহ আবরণ খুলে দাও, দাও হে দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২২৪; গীতবিতান ১।১৭২; স্বর ৮। মূল গান : ‘ঘুঁঘট পট খোলি’ দ্র ত্রিবেণীসংগম। ২২

[৩] সাহানা—ঝাঁপতাল। ডেকেছেন প্রিয়তম, কে রহিবে ঘরে দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২২৪-২৫; গীতবিতান ৩। ৮৩৭; স্বর ২৬

[৪] মিশ্র মল্লার—রূপক। চলেছে তরণী প্রসাদ পবনে দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২২৫; গীতবিতান ৩।৮৩৮; স্বর ৮। বিদ্যাপতির ‘এ ভরা বাদর মাহ ভাদর’ গানটিতে রবীন্দ্রনাথ যে-সুর দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

[৫] সিন্ধু—মধ্যমান। এ পরবাসে রবে কে হায় দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২২৫; গীতবিতান ১।১৭৫; স্বর ৮। মূল গান : ‘হোমীয়া জানেবালে তানু অল্লাদি কসম’ দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩।৯০

[৬] কেদারা—ঝাঁপতাল। তুমি ধন্য ধন্য হে, ধন্য তব প্রেম দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২২৫; গীতবিতান ১।১৮৭; স্বর ৪

[৭] কামোদ—ধামার। দুয়ারে বসে আছি প্রভু সারা বেলা দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২২৫; গীতবিতান ৩।৮৩৭; স্বরলিপি নেই। মূল গান : ‘মৈতো ন জাঁউঁ’—সঙ্গীতমঞ্জরী, দ্র ত্রিবেণীসংগম।২৭

[৮] কাফি কানাড়া—ঢিমা তেতালা। বেঁধেছ প্রেমের পাশে ওহে দয়াময় দ্র তত্ত্ব° ফাল্গুন। ২২৭; গীতবিতান ১।১৫৭-৫৮; স্বর ২৩। মূল গান : বাংলা খেয়াল-ঢঙের ‘চাঁচর চিকুর আধো, আধো জটাজাল’, দ্র গবেষণা গ্রন্থমালা ৩।৯৮-৯৯, অপিচ রবীন্দ্রসংগীত-প্রসঙ্গ ২।৭০-৭১

[৯] দেশ খাম্বাজ—ঝাঁপতাল। তোমায়, যতনে রাখিব হে দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২২৭; গীতবিতান ৩।৮৩৮-৩৯; স্বর ৪। ইন্দিরা দেবীর মতে গানটি ভারতীয় রাগসংগীতের আদর্শে রচিত, দ্র ত্রিবেণীসংগম। ২৭

[১০] দেশ সিন্ধু—ঠুংরি। সংশয় তিমির মাঝে না হেরি দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২২৭; গীতবিতান ১।১৭১; স্বর ৪৫। মূল গান : রামশঙ্কর ভট্টাচার্য-রচিত 'অজ্ঞান তম নিকরে গাঢ় ময়ি পতিতে'—রাজবিজয়-তেওরা, দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩।৫৯

[১১] বাহার—একতালা। পিতার দুয়ারে দাঁড়াইয়া সবে দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২২৭-২৮; গীতবিতান ৩।৮৩৮; স্বর ২৪

মহর্ষিভবনের অন্তঃপুরে মহিলাদের ব্রহ্মোৎসবেও রবীন্দ্রনাথের তিনটি গান গীত হয় :

[১] কেদারা—আড়াঠেকা। আইল আজি প্রাণসখা দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২৩০; গীতবিতান ৩।৮৩৯; স্বরলিপি নেই। মূল গান : 'খোল অব ঘুঁঘুট পট' দ্র ত্রিবেণীসংগম। ২০

[২] কীর্তনের সুর। (আমার) হৃদয় সমুদ্র তীরে দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২৩০; গীতবিতান ১।১৮৩; স্বরলিপি নেই।

[৩] মিশ্র দেশ খাম্বাজ—ঝাঁপতাল। শোন শোন আমাদের ব্যথা দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ২৩০; গীতবিতান ৩। ৮১৬-১৭; স্বর ৪৭।

পূর্ব-রচিত তিনটি গান ছাড়া মাঘোৎসব [সাধারণভাবে শব্দটি বহুলপ্রচলিত হলেও মুদ্রিত আকারে বিজ্ঞপ্তির মধ্যে এই বৎসরই এর প্রথম ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়] উপলক্ষে মোট ২১টি নূতন গান রচনা করা রবীন্দ্রনাথের বিপুল সৃজনশীলতার পরিচায়ক। তিন ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রচারবিমুখ ও কর্মবৈচিত্র্যের অভাবহেতু কিছুটা অনাকর্ষণীয় আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হয়েই রবীন্দ্রনাথ প্রধানত সংগীতের মাধ্যমেই জনগণকে আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছেন এবং এই অনুষ্ঠানে গীত রবীন্দ্রনাথের গান তৎকালে ভিন্ন-পথযাত্রী রামকৃষ্ণ-ভক্ত নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে মাত্র দেড় মাসের মধ্যে আশ্রয় নেওয়া তাঁর সাফল্যের একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ। রবীন্দ্রমানসের দিক দিয়ে গানগুলির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য এদের অন্তর্লীন বিষাদময়তা ও তাকে অতিক্রম করার প্রয়াস, যা কাদম্বরী দেবীর শোচনীয় আত্মহননের পরিপ্রেক্ষিতে একটি অতিরিক্ত তাৎপর্য লাভ করে। গানগুলিকে কবিতা হিসেবে পাঠ করলে এমন কথা মনে হতে পারে।*

বর্তমান বৎসরের মাঘোৎসব প্রসঙ্গে একটি তথ্য উল্লেখযোগ্য। মন্মথনাথ ঘোষ লিখেছেন, "শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভবনে ১১ই মাঘ মাঘোৎসব হইয়া যাইবার পর তিনি ও পরিবারস্থ অপর কয়েকজন বালক পরদিন ভাঙ্গা আসরে "১২ই মাঘ" করিতেন। বালকবালিকারা মিলিয়া নানাপ্রকার আবৃত্তি, সঙ্গীত প্রভৃতি নির্দোষ আমোদ করিতেন। এইরূপ এক ১২ই মাঘের সম্মিলনীতে ঁহিতেন্দ্রনাথ প্রমুখ তাঁহারা কয়েকজন স্থির করেন একটা বালক-বালিকা পরিচালিত মাসিকপত্র বাহির করিতে হইবে। বোধ হয় এই প্রস্তাব হইতেই রবীন্দ্রনাথের মনে 'বালক' প্রকাশের ইচ্ছা উদিত হইয়া থাকিবে।"[৪৮] বালক বৈশাখ ১২৯২-এ জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

২৫ মাঘ* [শুক্র 6 Feb] চন্দননগরে মহর্ষি তাঁর শেষজীবনের অন্তরঙ্গ পার্শ্বচর প্রিয়নাথ শাস্ত্রীকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করেন, রবীন্দ্রনাথ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এ-প্রসঙ্গে ক্যাশবহি-র ৬ চৈত্রের হিসাব : 'দ° পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় দীক্ষা হওয়ায় ফরাশডাঙ্গার বাটীতে বড়বাবু ও দ্বিপুবাবুর ও রবীবাবুর ও যদুবাবুর ও অরুবাবুর ও সতীশবাবুর ও হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রভৃতি মহাশয়গণের ১১ জনের উক্ত ফরাশডাঙ্গার বাটীতে যাওয়া আশার ট্রেণ ভাড়া ও গাড়ি ভাড়া আদি ব্যয় বিঃ ২৫ মাঘের ২ বৌচর-২০।।৩।' উল্লেখ্য যে,

মহর্ষি চন্দননগরে হাটখোলায় সত্যপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িটি ভাড়া নিয়ে মাঘ থেকে চৈত্র পর্যন্ত অবস্থান করেন।

মাঘ ও ফাল্গুন মাসে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার সূচী :

তত্ত্ববোধিনী, মাঘ ১৮০৬ শক [৪৯৮ সংখ্যা] :

১৯৪ 'গান। দেশ-একতালা। তুমি ছেড়ে ছিলে ভুলে ছিলে বলে' দ্র গীতবিতান ১।১৬৩-৬৪

২০৪ 'গান। কাফি-একতালা। মাঝে মাঝে তব দেখা পাই' দ্র ঐ ১।১৬২-৬৩

এই গানটিতে রবীন্দ্রনাথ পরে আখর যুক্ত করেন।

ভারতী, মাঘ ১২৯১ [৮।১০] :

৪৫৮-৭০ 'রামমোহন রায়' দ্র চারিত্রপূজা ৪। ৫১১-২৪

প্রচার, মাঘ ১২৯১ [১।৭] :

২৫৫-৫৬ 'মিশ্র কাফি-একতালা।/'মথুরায়' ['বাঁশরি বাজাতে চাই'] দ্র কড়ি ও কোমল ২।৪৪-৪৫; গীতবিতান ২।৩৯২; স্বর ১০। গানটি রবীন্দ্রনাথের সমকালীন বৈষ্ণবপদ ও কীর্তন-চর্চার সঙ্গে সম্পর্কান্বিত বলে মনে হয়।

তত্ত্ববোধিনী, ফাল্গুন ১৮০৬ শক [৪৯৯ সংখ্যা] :

মাঘোৎসবে গীত রবীন্দ্রসংগীতগুলি এই সংখ্যার ২১৭-৩০ পৃষ্ঠার মধ্যে মুদ্রিত হয়েছিল।

ভারতী, ফাল্গুন ১২৯১ [৮।১১] :

৪৯৩-৫০০ 'সমস্যা' দ্র সমালোচনা অ-২।১৩৭-৪৪

এতদিন পর্যন্ত উন্নতিশীল ব্রাহ্মেরা স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তার, জাতিভেদ-বর্জন, বাল্যবিবাহ-রোধ, বিধবাবিবাহ-প্রবর্তন প্রভৃতি যে-সমস্ত সামাজিক সংস্কারের জন্য আন্দোলন করে আসছিলেন, হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানবাদীরা এই সময়ে তার প্রায় সব-ক'টিরই বিরোধিতা শুরু করেন। এই নিয়ে পত্রপত্রিকায় যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি তারই পরিপ্রেক্ষিতে পঠনীয়। আদি ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক মতামত মোটামুটি রক্ষণশীল ছিল, একথা আমরা জানি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এখানে কোনো পক্ষ অবলম্বন না করে সমস্যার বিভিন্ন দিক ও তার জটিলতা দেখাবার চেষ্টা করেছেন। সবশেষে তাঁর পরামর্শ—'এই সকল সমস্যার প্রতি মনোযোগ করিয়া এক প্রকার গোঁয়ার্ত্তমি গোঁড়ামি পরিত্যাগ কর। শান্ত সংযতভাবে সমাজ সংস্কারের প্রতি মন দাও। অথচ বাঁধন ছিঁড়িবার উপলক্ষে তুচ্ছতর সাম্প্রদায়িক বাঁধনে সমাজের পঙ্গুদেহ জড়াইও না'—[৪৯] তাঁর অপ্রমত্ত সমাজচেতনতার পরিচায়ক। উল্লেখ্য যে, ভারতী-র বর্তমান সংখ্যাতেই রসিকলাল সেনের 'বাল্যবিবাহ' [পৃ ৪৮০-৯৩] ও ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'সামাজিক শাসন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা' [প ৫০০-০৫] প্রবন্ধ দুটি প্রকাশিত হয়—তিনটি প্রবন্ধের একত্র প্রকাশ কাকতালীয় নয় বলেই মনে করি।

আমরা আগেই বলেছি, ফাল্গুন ১২৯১-সংখ্যা প্রবাহ-তে মহেন্দ্রনাথ রায় রবীন্দ্রনাথের 'রামমোহন রায়' প্রবন্ধের একটি সমালোচনা প্রকাশ করেন। ইনি পরে নানাসূত্রে রবীন্দ্র-বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছেন, বর্তমান রচনাটি তার প্রথম কিস্তি। তিনি প্রথমেই লিখলেন : 'আজকাল অনেকেরই মুখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যশঃকীর্ত্তন শুনিতে পাওয়া যায়। সুতরাং তাঁহার কোনো ত্রুটি বা দোষের উল্লেখ করিতে গেলে, তাঁহার

স্তুতিবাদকদিগের নিকট দোষপ্রদর্শককে অপ্রিয় হইতে হয় এবং তদ্দ্বারা রবীন্দ্রবাবুরও দুঃখিত ও বিরক্ত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এই সকল বুঝিয়াও যে আমি এই অপ্রীতিকর কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম, তাহার কারণ, বঙ্গসমাজকে দোষ হইতে মুক্ত করিবার ইচ্ছা ভিন্ন আর কিছুই নহে।' ভবিষ্যতে আরও অনেকে এই মহৎকার্যে অবতীর্ণ হবেন, মহেন্দ্রনাথ তার সূচনা করলেন রবীন্দ্রনাথের তিনটি 'দুষ্প্রবৃত্তি'র প্রতি বঙ্গসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি প্রথমেই তাঁর কীর্তিনাশা প্রবৃত্তির উল্লেখ করলেন, যার বশে রবীন্দ্রনাথ রামমোহনের চরিত্রহননে লিপ্ত হয়ে তাঁকে অনুদার মতাবলম্বী বলেছেন ও 'চতুরতাপূর্ব্বক জগৎবিখ্যাত রামমোহনের নাম লোপ' করতে উদ্যত হয়েছেন। কুম্ভিলবৃত্তিকে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় দুষ্প্রবৃত্তি বলে উল্লেখ করে মহেন্দ্রনাথ লিখলেন, রবীন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' থেকে ভাব ও ভাষা চুরি করেছেন; অক্ষয়কুমার লিখেছিলেন : 'তোমার উপাধি রাজা। জড়ময় ভূমিখণ্ড তোমার নয়। তুমি একটি সুস্থির মনোরাজ্য অধিকার করিয়া রাখিয়াছ অতএব তুমি রাজার রাজা', রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'দিল্লীর সম্রাট তাঁহাকে রাজোপাধি দিয়াছেন কিন্তু দিল্লীর সম্রাটের সম্রাট তাঁহাকে রাজা করিয়া পাঠাইয়াছেন। ভারতবর্ষে বঙ্গসমাজের মধ্যে তিনি তাঁহার রাজসিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন'—অতএব 'সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত হইল'!

মহেন্দ্রনাথ-আবিষ্কৃত রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় দুষ্প্রবৃত্তি হল বাংলাভাষাকে কিম্ভূতকিমাকার করে তোলা; তিনি লিখেছেন : 'কবি রবি সুসংস্কৃত পদাবলীর সহিত গ্রাম্যতা দোষপূর্ণ শব্দ একত্র ব্যবহারপূর্ব্বক বঙ্গভাষাকে কিরূপ অদ্ভুত পদার্থ করিবার চেষ্টায় আছেন তাহা দেখুন।' এই বলে তিনি দৃষ্টান্তস্বরূপ 'ঢের' 'খুঁটিনাটি' 'হাঁসফাঁস' 'গড়িয়া পিটিয়া' 'বানাইতে' প্রভৃতি শব্দ উদ্ধৃত করেছেন। পরবর্তীকালে এইরূপ অভিযোগ রবীন্দ্রনাথকে আরও সহ্য করতে হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ 'রামমোহন রায়' পুস্তিকা 'ভূমিকা'য় প্রথম অভিযোগটির উল্লেখ করলেও অপর দুটি অভিযোগ সম্বন্ধে স্বাভাবিকভাবেই নীরব ছিলেন। কিন্তু জনৈক রবীন্দ্র-'স্তুতিবাদক' চুপ করে থাকেননি, তিনি 'শ্রীশিঃ' ছদ্মনামে 'পাক্ষিক সমালোচক' [১ম খণ্ড ২৩ সংখ্যা, চৈত্র, প্রথম পক্ষ ১২৯১] পত্রিকায় 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহেন্দ্রনাথ রায়' [পৃ ৭২৫-২৮] প্রবন্ধ লিখে অভিযোগগুলির সমুচিত প্রত্যুত্তর দিয়ে লেখেন : 'মহেন্দ্র বাবু!...আপনি যতই চেষ্টা করুন না—রবীর কীর্ত্তি ছটা কখনই গ্রাস করিতে পারিবেন না, কখনই তাহাতে ছায়ামাত্রও পড়িবে না ও আপনি ওপ্রকারে প্রবাহ মধ্যে নিজের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপনের চেষ্টা করিলে তাহা কালসাগরে কোথায় ভাসিয়া যাইবে চিহ্নমাত্রও রহিবে না।'*

বঙ্কিমচন্দ্রের বৈবাহিক দামোদর মুখোপাধ্যায় [১২৫৯-১৩১৪]-সম্পাদিত মাসিক 'প্রবাহ' বিশেষভাবে রবীন্দ্র-বিরোধী ছিল। আষাঢ় ১২৯১-সংখ্যায় 'অকাল কুষ্মাণ্ড।/ (ভাষ্য ও পরিভাষা।)' [পৃ ১১৯-২৭] এবং অগ্র° ১২৯১-সংখ্যায় 'শ্রীমুল্লুকচাঁদ শর্ম্মা মল্লিনবীশ'-রচিত '"হাতেকলমে।"/ (সটীক দ্বিতীয় সংস্করণ)' [পৃ ৩৬৬-৭২] প্রবন্ধে সাবিত্রী লাইব্রেরিতে প্রদত্ত ও ভারতী-তে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের ভাষণ-দুটিকে ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়। প্রথমোক্ত রচনাটি থেকে কিঞ্চিৎ উদাহরণ দেওয়া হল :

> ...কুষ্মাণ্ডকার কলিকাতীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারের একটী অমূল্য রত্ন। তিনি সুলেখক, সুকবি ও সুসমালোচক। তার উপর আবার স্বাধীন চিন্তার 'চাষ' করেন।...তার উপর আবার সুগায়ক। একাধারে এত 'সু'...
>
> ...সাহিত্যটার সবই যাবে। কিছু থাকিবে। থাকিবে কেবল 'বৌ ঠাকুরাণীর হাট' আর 'ছোট ঠাকুরের ঠাট'।

এর পরেই ফাল্গুন ১২৯১ [৩।১১]-সংখ্যায় মহেন্দ্রনাথ রায়-কৃত দীর্ঘ সমালোচনাটি [পৃ ৪৯৫-৫০৭] মুদ্রিত হয়।

আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হবার পর পিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ অনেক বৃদ্ধি পায়। প্রায় প্রতিমাসেই এক বা একাধিকবার তিনি পিতার সঙ্গে দেখা করতে যেতেন, চিঠিপত্রে যোগাযোগও অব্যাহত ছিল। পিতাকে লেখা রবীন্দ্রনাথের কোনো চিঠিই রক্ষিত হয় নি, পুত্রকে লেখা মহর্ষির চিঠির একটি ক্ষুদ্র অংশই আমাদের হাতে পৌঁছেছে। ফলে তাঁদের সম্পর্কের দিগ্‌দর্শন করার জন্য আমাদের কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের উক্তির উপরেই নির্ভর করতে হয়। কিন্তু তার অতিরিক্ত কিছু তথ্যের সন্ধান আমরা পাই ক্যাশবহি-র হিসাব থেকে : 'শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের নিকট চন্দন নগরের বাটীতে রবীন্দ্র বাবু মহাশয়ের যাতায়াতের দ্বিতীয় শ্রেণীর রিটারণ টিকিট ১৷৹ ও গাড়িভাড়া ১ল০ একুনে ১০ ফাল্গুনের [শুক্র 20 Feb] ১ বৌচর' ও 'শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীমতী প্রতীভা সুন্দরী দেবী চন্দন নগরের বাটীতে শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের নিকট গমনাগমনের ট্রেণ ভাড়া ও গাড়ি ভাড়া প্রভৃতি ব্যয় বিঃ ১৫ চৈত্রের [শুক্র 27 Mar] ১ বৌচর-৬৷৹'—এর আগে তিনি ইন্দিরা দেবীকেও একবার [৫ পৌষ] চন্দননগরে নিয়ে গিয়েছিলেন সেকথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। প্রতিভা দেবী দেশী ও বিদেশী সংগীতে যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। চন্দননগরে পিতামহকে তিনি নিশ্চয়ই তাঁর সাংগীতিক দক্ষতায় মুগ্ধ করেন, তার পুরস্কারও পান প্রায় হাতে হাতে; ২৭ চৈত্রের হিসাবে দেখি : 'ব° হ্যারল্ড কো° দং শ্রীমতী প্রতিভা সুন্দরী দেবীর জন্য পিয়ান বাজা একটা ক্রয়ের মূল্য শোধ বিঃ ১৯৯৪ ন° বাঙ্গাল বেঙ্কের এক চেক—৮৫০্'।

পর পর দু-বৎসর অনাবৃষ্টির ফলে ১২৯১-র শেষ দিকে বাঁকুড়া, বীরভূম ও বর্ধমান জেলার কিয়দংশ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়। সরকারী সাহায্যের অপ্রতুলতার জন্য সেখানকার দরিদ্র জনসাধারণের দুর্দশার অন্ত ছিল না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক অক্লান্তকর্মী রামকুমার বিদ্যারত্ন ধর্মপ্রচারার্থে বীরভূমের নলহাটিতে গিয়ে এই অবস্থার কথা জানতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই উক্ত সমাজ থেকে ব্যাপক ত্রাণ ও সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়। সঞ্জীবনী এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

এই অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে আদি ব্রাহ্মসমাজও নিশ্চেষ্ট থাকে নি। ৩১ চৈত্র [রবি 12 Apr] আদি ব্রাহ্মসমাজগৃহে বর্ষশেষ উপাসনার দিনে 'বীরভূম অঞ্চলে দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ' দান সংগ্রহের জন্য একটি সভার আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ একটি গান রচনা করেন ও সেটি সম্ভবত এই সভায় গীত হয় :

বেহাগ-একতালা। আজি কাঁদে কা'রা ওই শুনা যায় দ্র গীতবিতান ৩।৮৬১; স্বরলিপি নেই। [রবিচ্ছায়া-তে গানটির পরিচিতি-প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে : '(বর্দ্ধমান দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে রচিত)'—এখানে 'বর্ত্তমান' শব্দটি সম্ভবত মুদ্রণপ্রমাদের জন্য 'বর্দ্ধমান'-রূপে মুদ্রিত হয়েছে।]*

এই সভায় রবীন্দ্রনাথ 'দুর্ভিক্ষের সাহায্য প্রার্থী হইয়া' 'একটী সুন্দর প্রবন্ধ' পাঠ করেন, যার কিয়দংশ তত্ত্ব-কৌমুদী-তে [৮।৩, ১ জ্যৈষ্ঠ। ৩৪] মুদ্রিত হয়। এতাবৎ-অজ্ঞাত এই রচনাংশটি আমরা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করছি :

'অধিক দূরে নয়, তোমাদের দ্বারের নিকট ক্ষুধিতেরা দাঁড়াইয়া আছে। তোমরা দুই বেলা যে উচ্ছিষ্ট অন্ন কুক্কুর বিড়ালদের ফেলিয়া দিতেছ, তাহার প্রতি তাহারা কি কাতরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে! তোমাদের

নবকুমারের জন্মোপলক্ষে গৃহে কত আনন্দ পড়িয়াছে—আহারাভাবে তাহাদের কোলের ছেলেটির কাঁদিবার শক্তিও নাই—তোমাদের গৃহে বিবাহের বাঁশি বাজিতেছে, কেবল একমুষ্টি অন্নের অভাবে তাহাদের গৃহে বিবাহ-বন্ধন চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে—স্ত্রীর মুখে অন্ন দিয়া স্বামী তাহার শেষ কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারিতেছে না। তোমরা গৃহে বসিয়া নিশ্চিন্তমনে কত কথা লইয়া আলাপ করিতেছ, কত হাস্য-পরিহাস করিতেছ, সংসারের কত শত কাজে মন দিতেছ—তাহাদের আর কোন কথা নাই, কোন ভাবনা নাই, কোন কাজ নাই—তাহাদের জীবনের সমস্ত চিন্তা, তাহাদের হৃদয়ের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা, তাহাদের দিন রাত্রির সমস্ত আশা কেবল একটী মুষ্টি অন্নের উপরে বদ্ধ রহিয়াছে। তাহাদের চক্ষে এক্ষণে সমস্ত জগতে একমুষ্টি অন্নের চেয়ে বাঞ্ছনীয় আর কিছুই নাই—একমুষ্টি অন্ন উপার্জ্জনের চেয়ে আর মহত্তর উদ্দেশ্য নাই—এমন কি, সমস্ত জগতে অন্নের অতীত আর কোন কিছুই নাই।

'ক্ষুধা যে কি ভয়ানক বিপদ, তাহা আমরা অনেকে কল্পনা করিতে পারি না। অন্যান্য অনেক বিপদে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব জাগাইয়া তুলে—কিন্তু ক্ষুধায় মনুষ্যত্ব দূর করিয়া দেয়। ক্ষুধার সময় মনুষ্য অত্যন্ত ক্ষুদ্র। আত্মরক্ষার জন্য যখন একমুষ্টি অন্নাভাবের সহিত মনুষ্যকে যুদ্ধ করিতে হয়, তখন মনুষ্য একটি পিপীলিকার সমতুল্য। সে যুদ্ধেও যখন মনুষ্যের পরাজয় হয়—একমুষ্টি তণ্ডুলের অভাবেও যখন মনুষ্যজীবনের শত সহস্র মহৎ আশা উদ্দেশ্য ধরাশায়ী হয়, তখন মনুষ্যজাতির দীনতা দেখিয়া হৃদয় হাহাকার করিতে থাকে। ক্ষুধার জ্বালায় বড় ভাই ছোট ভাইয়ের মুখ হইতে তাহার বহু কষ্টের গ্রাস কাড়িয়া লইতে সঙ্কুচিত হয় না—ক্ষুধায় মানুষ অত্যন্ত হীন, ক্ষুধায় কোন মহত্ত্ব নাই। এই ক্ষুধার হাত হইতে কাতরদিগকে পরিত্রাণ কর—এই ক্ষুধায় মানুষদের—আপনার ভাইদের মরিতে দিও না—সে মানুষের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার কথা।

'তোমার যদি আপনার ভাই থাকে, তবে যাহার ভাই আজ অনাহারে মরিতেছে, তাহার প্রতি একবার মুখ তুলিয়া চাও—তোমার যদি আপনার মা থাকে, তবে অন্নাভাবে মরণাপন্ন মায়ের মুখের দিকে হতাশ হইয়া যে তাকাইয়া আছে, তাহাকে কিছু সাহায্য কর—তোমার যদি নিজের সন্তান থাকে তবে কোলের উপর বসাইয়া যাহার শিশু-সন্তান প্রতিমুহূর্ত্তে শীর্ণ হইয়া মরিতেছে, তোমার উদ্ধৃত [উদ্বৃত্ত] অন্নের কিছু অংশ তাহাকে দাও। সত্যসত্যই তোমার কি কিছুই নাই? যে আজ কয় দিন ধরিয়া কেবল তেঁতুল বীজের শস্য সিদ্ধ করিয়া খাইয়াছে, তাহার চেয়েও কি তুমি নিঃসম্বল? যে আজ তিন দিন ধরিয়া কেবল শুষ্ক ইক্ষুমূল জলে ভিজাইয়া অল্প অল্প চর্ব্বণ করিতেছে, তাহাকেও কি তুমি সাহায্য করিতে পার না? তুমি হয়ত মনে মনে বলিতেছ—"এত শত ধনী আছে তাহারাই যদি দুঃখিদের সাহায্য না করিল ত আমরা আর কি করিব!" এমন কথা বলিও না। যে নিষ্ঠুর সে আপনাকে আপনি বঞ্চিত করিতেছে। যে পাষাণ কোন বেদনাই অনুভব করে না সে নিজের জড়ত্বসুখ লইয়া স্বচ্ছন্দে থাকুক, তাই বলিয়া তাহার দেখাদেখি আপনাকে পাষাণ করিও না! বিলাসসুখ প্রতিদিবসের অন্নপানের ন্যায় যাহার অভ্যাস হইয়াছে যে নিজের সামান্য অনাবশ্যক সুখকে পরের অত্যাবশ্যক অভাবের চেয়ে গুরুতর জ্ঞান করে, সে দুঃখীর মুখের দিকে চায় নাই বলিয়া সকলেই যদি দুঃখীর প্রতি বিমুখ হয়, তবে ত মানবসমাজ রাক্ষসপুরী হইয়া উঠে। হৃদয়হীন বিলাসের ক্রোড়ে যে নিদ্রিত আছে, মহেশ্বরের বজ্রশব্দে যদি একদিন সে জাগিয়া উঠে তবেই তাহার চেতনা হইবে, নতুবা দুঃখী-অনাথের ক্রন্দন ধ্বনিতে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইবে না।'

ঠাকুরবাড়ির পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথ এই তহবিলে ৫০০ টাকা দান করেন [৩০ চৈত্রের হিসাব : 'ব° বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দং দুর্ভিক্ষের সাহার্য্য জন্য আদি ব্রাহ্ম সমাজে দান বিঃ ৭১২ ন° বাঙ্গাল বেঙ্কের এক চেক ৫০০্']—নগদে ও দ্রব্যসামগ্রীতে মোট ৯৭৩ ল ৯ পাওয়া যায় এবং ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৯২ মহর্ষির ৬৮তম জন্মদিন থেকে বীরভূমের রামনগর গ্রামে ত্রাণকার্য আরম্ভ হয়।[৫০]

রবীন্দ্রনাথ অন্য ধরনের সাহায্য করার প্রস্তাবও করেছিলেন; ১১ জ্যৈষ্ঠ ১২৯২ [23 May 1885] সঞ্জীবনী-তে [৩।৬।২২] লেখা হয় : 'যোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ জমিদার ঠাকুর বংশের বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহাদের সুন্দরবনের আবাদী জমিতে কৃষকদিগকে সপরিবারে ঘর-বাড়ী, কৃষির উপকরণ প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি দিয়া বসাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন। যে কেহ তাঁহাদের সাহায্য চাহিবে তাঁহারা মুক্ত-হস্তে তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন। বীরভূম, বাঁকুড়া ও বৰ্দ্ধমানের নিরক্ষর কৃষকদিগের গৃহে গৃহে এ সংবাদ প্রচার হওয়া কর্ত্তব্য।' অবশ্য এ-প্রস্তাব কার্যকরী হয়েছিল বলে মনে হয় না। গগনচন্দ্র হোম লেখেন, 'আমরা এ অঞ্চলের লোকদিগের সহিত কথোপকথন করিয়া যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে ইহাই উপলব্ধি হইয়াছে যে, তাহারা বরং নিজ গৃহে পড়িয়া অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিবে, তথাপি এস্থান ছাড়িয়া অন্যত্র উঠিয়া যাইবে না। কাসীমবাজারের মহারাণী শ্রীমতী স্বর্ণময়ী তথায় গেলে দুই হাজার লোককে প্রতিদিন আহার দিতে প্রস্তুত আছেন, আমরা পাথেয় দিয়া এপর্য্যন্ত একটী লোককেও সেখানে পাঠাইতে পারিলাম না। যাহারা এত নিকটবর্ত্তী স্থানেই যাইতে প্রস্তুত নয়, তাহারা কোন দূরবর্ত্তী উর্ব্বর স্থানে যাইয়া বাস করিবে, এরূপ প্রত্যাশা করা নিরাশা।'[৫১]

চৈত্র মাসের তত্ত্ববোধিনী-তে 'রামমোহন রায়' প্রবন্ধটির পুনর্মুদ্রণ [পৃ ২৩৩-৪৩] ছাড়া রবীন্দ্রনাথের মাত্র একটি রচনা ভারতী-তে [৮।১২] মুদ্রিত হয় :

৫৪৪-৪৫ 'বিদায়' দ্র কড়ি ও কোমল ২।৩১-৩৩ ['পুরাতন']

কবিতাটি কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পটভূমিকায় রচিত। সেই মৃত্যুর বর্ষপূর্তির মুখে এসে জীবনের সঙ্গে তার সামঞ্জস্যবিধানের প্রয়াস এতে লক্ষণীয়। পরের মাসে প্রকাশিত 'নূতন' কবিতাটি এরই পরিপূরক এবং সেইজন্যই ভারতী-তে 'বিদায়' নামে মুদ্রিত কবিতাটি গ্রন্থে 'পুরাতন' অভিধায় চিহ্নিত হয়েছে।

চৈত্র মাসের শেষাংশ রবীন্দ্রনাথের খুবই ব্যস্ততার মধ্যে কাটে। 'বালক' পত্রিকার কার্যাধ্যক্ষ রূপে পত্রিকার জন্য লেখা ছাড়াও মুদ্রণ ও প্রকাশের আয়োজন তাঁকেই করতে হয়েছিল। পদরত্নাবলী, আলোচনা ও রবিচ্ছায়া গ্রন্থগুলি মুদ্রণের ব্যাপারেও তাঁর কিছু ব্যস্ত থাকার কথা। আদি ব্রাহ্মসমাজের নববর্ষ উৎসবের জন্য তিনটি গানও তিনি রচনা করেন :

[১] আসাবরি—ঝাঁপতাল। দীর্ঘ জীবনপথ, কত দুঃখতাপ দ্র তত্ত্ব°, বৈশাখ ১৮০৭ শক [১২৯২] । ১৮; গীতবিতান ১।১০৯; স্বর ৮। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, সম্ভবত কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুদিন স্মরণ করে গানটি লেখা।[৫২]

[২] গৌড় সারং—একতালা। দুখের কথা তোমায় বলিব না দ্র তত্ত্ব°, বৈশাখ। ১৮-১৯; গীতবিতান ৩।৮৩৯; স্বর ৪

[৩] টোড়ি—একতালা। গাও বীণা, বীণা গাওরে দ্র তত্ত্ব°, বৈশাখ। ১৯; গীতবিতান ১।১৮১-৮২; স্বর ৪

উল্লেখযোগ্য যে, এই তিনটি গানই [বর্ষশেষে গীত দুর্ভিক্ষের জন্য রচিত গানটি সহ] রবিচ্ছায়া-য় 'পরিশিষ্ট' অংশে [পৃ ১৬৭-৭১] মুদ্রিত হয়েছে। গ্রন্থের মূল অংশটি ছাপা হয়ে যাওয়ার পর গানগুলি লেখা হয়েছিল, এমন অনুমান অযৌক্তিক নয়।

চৈত্র মাসের মাঝামাঝি রবীন্দ্রনাথ একটি স্বল্পস্থায়ী ভ্রমণে বহির্গত হলেন। পাঠকেরা জানেন, ইন্দিরা দেবী লোরেটো ও সুরেন্দ্রনাথ সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে পড়তেন। স্বভাবতই খৃস্টীয় পর্বোপলক্ষে সেখানে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ ছুটি মিলত। সেইরূপ একটি ছুটির সময় [ইস্টারের ছুটি; গুড ফ্রাইডে : 3 Apr 1885, ২২ চৈত্র] প্রধানত ইন্দিরা দেবীর আগ্রহাতিশয্যে এই দুই ভাইবোনকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ হাজারিবাগে বেড়াতে যান। ইন্দিরা দেবী তাঁর অপ্রকাশিত স্মৃতিকথায় লিখেছেন : 'আর একবার বিশেষ করে' আমার আবদারে আমাদের সঙ্গে করে' রবিকাকা হাজারিবাগে নিয়ে যান। তখন কন্‌ভেন্টে এক একজন মেয়ের এক একজন সিস্টরের প্রেমে পড়ার রেওয়াজ ছিল—...। আমার ও প্রতিভাদিদির প্রেয়সী ছিলেন সিস্টর অ্যালইসা ['Sister Aloysia'], তাঁকে হাজারিবাগের কন্‌ভেন্টে বদ্‌লি করা হয়েছিল ব'লেই আমাদের এই অভিযান বা অভিসার।...কোন্ একজন যাদুগোপালবাবুর বাড়ীতে গিয়ে উঠেছিলুম। তাঁর পুরো নামটা মনে পড়ছেনা। হঠাৎ মনে হচ্ছে আমাদের স্বদেশী যুগের খ্যাতনামা ডাঃ যাদুগোপাল মুখুয্যে নয়ত?'[৫৩] এই অভিযানের কৌতুকপূর্ণ বিবরণ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'দশ দিনের ছুটি' [বালক, আষাঢ় ১২৯২। ১১৩-১৮] নামক ভ্রমণকাহিনীতে। ঠিক কবে তাঁরা যাত্রা শুরু করেছিলেন এবং কবে ফিরে এসেছিলেন, তা নির্ণয় করা দুরূহ হলেও কিছুটা সম্ভাব্য ও যুক্তিসংগত অনুমান করা চলে। আমরা জানি, ৩১ চৈত্র [রবি 13 Apr] বর্ষশেষ উপাসনায় ও দুর্ভিক্ষপীড়িতদের জন্য দান সংগ্রহের সভায় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন এবং তার আগে ২৬ চৈত্র [মঙ্গল 7 Apr] তিনি কবি নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যকে একটি চিঠি লেখেন [দ্র সা-সা-চ ৮৫।৩৪], যা সম্ভবত জোড়াসাঁকো থেকেই লিখিত হয়েছিল। আবার ক্যাশবহি-র হিসাব—'শ্রীমতী ছোট বধূ ঠাকুরাণীর বাদামতলীর স্কুলে যাতায়াতের গাড়ি ভাড়া ব্যয়....১৫।১৬ চৈত্রের ২ বৌচর'—থেকে জানা যায় ১৬ চৈত্র [শনি 28 Mar] লোরেটো কনভেন্ট খোলা ছিল। সুতরাং এই দশদিনের ছুটি ১৭-২৬ চৈত্র হওয়াই সম্ভব—রবীন্দ্রনাথ সদলবলে ১৬ চৈত্র রাত্রে 'হাবড়ার রেলগাড়িতে' চেপে যাত্রা করেন ও ২৫ বা ২৬ চৈত্র ফিরে আসেন। দুটি বালক-বালিকা ছাড়াও অপর একটি সঙ্গীর কথা রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'ইনি একটি মোটাসোটা, গোলগাল, সাদাসিধে মানুষ। আমাদের সকলের চেয়ে বয়সে বড় কিন্তু ছেলেদের চেয়ে ছেলেমানুষ। ইঁহার হৃষ্টপুষ্ট গৌরমূর্তিখানি হাস্যরসের প্রাচুর্যে পাকা জামরুল ফলের মত স্ফূর্তি পাইতেছে। মস্ত হাঁড়ির মধ্যে ভাতের ফেন যেমন টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটে আমাদের সঙ্গীটির পেটে হাস্যরস তেমনি যেন টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতেছে; কথায় কথায় বুগ্‌বুগ্ করিয়া নাকে চোখে মুখে উথলিয়া উঠে। এককেটি মানুষ আছে যেন সন্দেশের মত, তাহার ছাল নাই, আঁটি নাই, কাঁটা নাই, ছানায় চিনিতে মাখামাখি হইয়া থলথল করিতেছে, আমাদের নির্বিবাদী নিষ্কণ্টক নিরীহ সঙ্গীটি সেই ধরনের পরম উপাদেয় মানুষ।'[৫৪] আমাদের দৃঢ় ধারণা, এই সঙ্গীটি অক্ষয় চৌধুরী ছাড়া কেউ নন। অসমবয়সী বন্ধুত্ব ইনি কিভাবে গড়ে তুলতে পারতেন, রবীন্দ্রনাথের কৈশোর জীবনে তার যথেষ্ট উদাহরণ আছে। ইন্দিরা দেবীও তাঁর বন্ধু-পর্যায়ভুক্ত ছিলেন : 'তাঁর সঙ্গে বছর নয়েক বয়স থেকে আমার পদ্যপত্র বিনিময় চল্‌ত,...আমাদের "ওথেলো" পড়াতে গিয়ে কিরকম নিজেই কেঁদে ভাসিয়ে দিতেন; মস্ত বড় বই টেনে নিয়ে তা'তে তবলার ঠেকা গানের সঙ্গে বাজাতেন; তাঁদের বাড়ী গেলে আমাকে Golden Treasury থেকে কবিতা পড়াতেন'।[৫৫]

এইরূপ ভ্রমণসঙ্গী হওয়া তাঁর পক্ষে কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সম্ভবত 'সরোজিনী' জাহাজেও তিনি সহযাত্রী ছিলেন। সত্যপ্রসাদের 'দার্জিলিং-যাত্রা' [বালক, বৈশাখ ১২৯২। ৯-১৩] ভ্রমণকাহিনীতেও এই 'বন্ধু'টিকে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না : 'এম্-এ বন্ধুটি জয়জয়ন্তি সুরে "ভাসিয়ে দে তরী" গানটি চীৎকার কোরে গাইতে লাগ্‌লেন, আর হাতে একটা বই ছিল সেটাকে বাঁয়া তাব্‌লার মত করে নিয়ে কাওয়ালি বাজাতে লাগ্‌লেন।....বন্ধুবর যখন ভাবে মগ্ন হয়ে গান জোড়েন তখন হাতে-পায়ে ধরে বা চাপাচুপি দিয়ে তাঁর গান থামান যায় না।'[৫৬]

রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহভুক্ত ছোটো একটি নোটবুকে [Ms. 370; 10×6.8 c. m.] এই রচনাটির পেন্‌সিলে লেখা প্রাথমিক খসড়া পাওয়া যায়—'৮ দিনে বেশি কি হবে। একবার প্রকৃতির মধ্যে উঁকি মারা, পৃথিবীটা যে ইঁট সুরকীতে গড়া নয় তার প্রমাণ পাওয়া'—এই স্কেচ অবলম্বনেই রবীন্দ্রনাথ সুপাঠ্য ভ্রমণকাহিনীটি রচনা করেন। গদ্যগ্রন্থাবলী-র অন্তর্ভুক্ত হয়ে 'বিচিত্র প্রবন্ধ' [বৈশাখ ১৩১৪] প্রকাশকালে তিনি রচনাটি বহুল পরিমাণে সংক্ষেপিত করে নতুন নামকরণ করেন—'ছোটনাগপুর', এই পাঠটিই রচনাবলীতে গৃহীত। কোনো সন্দেহ নেই যে, এই সংস্কারে রচনাটির স্বাদুতা অনেক পরিমাণেই হ্রাস পেয়েছে। ড অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য 'রবীন্দ্রনাথ রচিত ভ্রমণ কাহিনী' প্রবন্ধে [দেশ, ৯ শ্রাবণ ১৩৭৭ । ১৩৭১-৭৬] মূল পাঠটি সংকলন করে দিয়েছেন।

হাজারিবাগ-নিবাসী ডাকবিভাগের কর্মী ও বিশিষ্ট রবীন্দ্র-গবেষক অমল সেনগুপ্ত 'ছত্রাক' পত্রিকায় 'রবীন্দ্রনাথ ও হাজারীবাগ' [পৃ ১৬-২২] প্রবন্ধে এই ভ্রমণ সম্পর্কে কিছু উল্লেখযোগ্য তথ্য প্রদান করেছেন। তিনি লিখেছেন : 'হাজারীবাগ কনভেন্টের সেই বাড়িটাতে এখন সরকারী পুলিশ ট্রেনিং কলেজ (P. T. c.) চলছে।....এখনকার ডাকবাঙলো শহরের প্রায় প্রান্তসীমায় সেন্ট কলম্বস কলেজের সন্নিকট। সে-সময় ডাকবাঙলো ছিল কাছারির কাছাকাছি।' ইন্দিরা দেবী হাজারিবাগ রোড স্টেশনে নেমে পুশপুশে করে হাজারিবাগে আসার কথা লিখেছেন; কিন্তু অমলবাবুর বক্তব্য, তখনও গ্র্যাণ্ড কর্ড লাইনের হাজারিবাগ রোড স্টেশন হয়নি, তাঁরা 'সদলে মধুপুরে গাড়ি বদল ক'রে গিরিডি হ'য়ে মানুষঠেলা পুশপুশে ক'রে হাজারীবাগে এসে পৌঁছেছিলেন।' ইন্দিরা দেবী স্মৃতিবিভ্রমবশত যাঁকে ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় বলে সন্দেহ করেছেন, শ্রীসেনগুপ্ত তাঁর প্রকৃত পরিচয় উদ্ধার করে লিখেছেন : 'তিনি প্রকৃতপক্ষে রায়বাহাদুর যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, হাজারীবাগের তৎকালীন বাঙালী সমাজের অগ্রণী এবং হাজারীবাগের বিভিন্ন কালজয়ী কার্যোদ্যমের সঙ্গে যাঁর অচ্ছেদ্য সংযোগ ছিল। যদুনাথবাবুর সুবৃহৎ বাসভবন তৎকালীন বহু শ্রেষ্ঠ বাঙালী এবং দেশবরেণ্য মনীষীর আগমনে ধন্য হ'য়ে আছে।....রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনুমান, সদলে ডাকবাঙলোয় অবস্থানকালে তিনিও যদুনাথবাবুর বাড়িতে কোন সময়ে এসে থাকবেন।'

প্রাসঙ্গিক তথ্য :১

জোড়াসাঁকো ঠাকুরপরিবারকে বৎসরের শুরুতেই দুটি মৃত্যুর আঘাত সহ্য করতে হয়। তার মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যা সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। দ্বিতীয়টি হল মহর্ষির তৃতীয়পুত্র

হেমেন্দ্রনাথের মৃত্যু। এটিও অকালমৃত্যু, কারণ তখন তাঁর বয়স কিঞ্চিদধিক ৪০ বৎসর মাত্র। তিনি কোন্ রোগে ও কোন্ তারিখে মারা যান নিশ্চিত করে বলার মতো তথ্যের অভাব আছে। রবীন্দ্রজীবনী-কারের মতে, তাঁর মৃত্যুর তারিখ ২৪ জ্যৈষ্ঠ[৫৭] [বৃহ 5 Jun]। অপরপক্ষে, বলেন্দ্রনাথের রাশিচক্রের খাতায় লেখা : 'মৃত্যু— ১৮৮৪ খৃস্টাব্দ। জুন ১২' [বৃহ ৩১ জ্যৈষ্ঠ]। আবার ক্যাশবহি-র ২৫ জ্যৈষ্ঠের হিসাবে দেখি : 'ব° ডাক্তার সণ্ডার [Dr. Sanders] সাহেব দং সেজবাবু মহাশয়ের চিকিৎসা করায় সার্টিফিকিট লওয়ার জন্য উক্ত ডাক্তারের ফি শোধ গুঃ নিলমাধব হালদার দং ২১ জ্যৈষ্ঠের খরচ ৩২', অন্য একটি হিসাবে [১৩ আষাঢ়] : 'দং সেজবাবু মহাশয়ের পীড়া হওয়ায় চিকিৎসার ব্যয় ১৭ না° ২১ জ্যৈষ্ঠের খরচ মাহেন্দ্রলাল সরকার ডাক্তারের ফি ২ বারের—৩২ বিহারীলাল ভাদুড়ির ৮৲ ...'। এই হিসাব দুটি থেকে কারোর মনে হতে পারে হেমেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় ২১ জ্যৈষ্ঠ সোম 2 Jun—কিন্তু Debendranath Vs. Gaganendranath Suit No. 585 of 1987-**এ [দ্র** Tagore Family Papers No. 70] 12 June 1884-**ই তাঁর মৃত্যুর তারিখ বলে উল্লিখিত হয়েছে, সুতরাং এই তারিখটিকেই সঠিক বলে গ্রহণ করতে হবে। তাঁর মৃত্যুর কারণ** সম্পর্কে 'ঠাকুর পরিবারের স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধে লিখিত হয় : 'হেমেন্দ্রনাথ পূর্ব্বপ্রদেশে অবস্থিত জমিদারী পর্য্যবেক্ষণে যাইয়া প্রায় তিনমাসকাল শারীরিক ব্যায়ামের অভ্যাস সম্পূর্ণ পরিত্যাগে বাধ্য হইয়া অবিশ্রান্তভাবে পরিশ্রম না করিলে বাতরোগাক্রান্ত হইয়া অল্প বয়সে ইহলোক হইতে অবসৃত হইতেন না'[৫৮], জ্ঞানদানন্দিনী দেবীও অনুরূপ কথা বলেছেন :'সেজঠাকুরপোই বেশি কুস্তি করতেন। বোধ হয় ছেড়ে দেবার পর যে বাতে ধরল তাতেই অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে মারা গেলেন'[৫৯]। তত্ত্ব-কৌমুদী, [৭।৫, ১ আষাঢ়। ৫৮-৫৯] লেখে : 'আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র বাবু হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। হেমেন্দ্র বাবুই বিশেষ পরিশ্রম করিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সারগর্ভ উপদেশগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন।....তিনি অত্যন্ত নম্র এবং সর্ব্বতোভাবে অহমিকাশূন্য ছিলেন। তাঁহার এইরূপ অকস্মাৎ মৃত্যু এবং এই প্রকার অন্যান্য বিপদ একটীর পর আর একটী এত শীঘ্র শীঘ্র তাঁহাদের পরিবারের মধ্যে ঘটিতেছে [এইটিই সম্ভবত সাময়িকপত্রে কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু সম্পর্কে একমাত্র পরোক্ষ উল্লেখ] যে ইহাতে তাঁহার বৃদ্ধ পিতার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবে।'

হেমেন্দ্রনাথ মৃত্যুকালে তিন পুত্র ও আট কন্যা রেখে যান। স্বভাবতই মহর্ষিকে তাঁদের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করতে হয়। ৫ শ্রাবণের হিসাবে দেখি : 'বাবু হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর দ° উইল প্রবেট ও আবাদের খরচ জন্য শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের ৩ শ্রাবণের আদেশ লিপি গুঃ শ্রীমতী সেজবধুঠাকুরাণী....রোক ১০০৲'।* পরে মহর্ষি উড়িষ্যার জমিদারি ও আলাদা বাসস্থানের জন্য ঠাকুরবাড়ির পূর্বাংশে অবস্থিত ভূমি হেমেন্দ্রনাথের পরিবারের জন্য নির্দিষ্ট করে দেন।

সংসারে দুঃখ ও আনন্দ হাত ধরাধরি করেই চলে। এই জ্যৈষ্ঠ মাসেই দ্বিপেন্দ্রনাথের কন্যা নলিনীর জন্ম হয়। শ্রাবণের প্রথমেই* [Jul 1884] দ্বিজেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা ঊষাবতীর বিবাহ হয় রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। উল্লেখ্য, এঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মোহিনীমোহনের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা সরোজার বিবাহ হয়েছিল। বাড়িতে পর পর দুটি মৃত্যু ঘটে যাওয়ার স্বল্পকাল পরেই এই বিবাহানুষ্ঠান একটু অস্বাভাবিক

লাগে—কিন্তু পিরালী-কন্যারা প্রায় কুলীন-কন্যাদেরই সমগোত্রীয়া ছিলেন, উপযুক্ত পাত্র পেলে অবিলম্বে শুভকার্য সম্পন্ন করে ফেলাই বাঞ্ছনীয় মনে করা হত!

২৬ মাঘ [শনি 7 Feb 1885] এলাহাবাদ-নিবাসী মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের কন্যা প্রমোদকুমারীর [৯] সঙ্গে গগনেন্দ্রনাথের [১৭] বিবাহ হয়। বিবাহটি হয়েছিল অবশ্য হিন্দুরীতি অনুসরণ করে। এঁরই মেজো মেয়ে নরেন্দ্রবালার বিয়ে হয় সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। এই মাসেই সত্যপ্রসাদের জ্যেষ্ঠপুত্র সুপ্রকাশের অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠিত হয়।

চৈত্র মাসের গোড়ায় মহর্ষির মেজ জামাতা সুকুমারী দেবীর স্বামী হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ২

বর্তমান বৎসরে আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রায় প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন, সুতরাং তাঁর জীবন-বর্ণনার সঙ্গেই এই অনুষ্ঠানগুলির বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। তাই এখানে আমরা অপর দুই ব্রাহ্মসমাজের প্রাসঙ্গিক ইতিবৃত্ত ও আদি সমাজের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

নববিধান সমাজের কেন্দ্র-পুরুষ কেশবচন্দ্রের জীবনাবসানের পর উক্ত সমাজের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা চরম আকার ধারণ করে। কেশবচন্দ্র নিজ প্রাধান্য অব্যাহত রাখার জন্য কোনোদিনই সমাজের সাংবিধানিক ভিত্তি সুদৃঢ় করার চেষ্টা করেন নি, এমন-কি ব্রহ্মমন্দিরের জন্য ট্রাস্টী নিয়োগের মতো গুরুতর প্রশ্নও নানাভাবে এড়িয়ে গেছেন। ফলে তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁর ক্ষমতালিপ্সু অনুগামীরা নানা ধরনের চক্রান্তে লিপ্ত হন। কেশবচন্দ্রের বন্ধু ও একনিষ্ঠ শিষ্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সমাজের সহকারী সম্পাদক ছিলেন, সুতরাং আচার্যের আসনের অধিকার তিনি সহজেই দাবি করতে পারতেন। কিন্তু কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর সময়ে তিনি আমেরিকা-ভ্রমণান্তে ভারতাভিমুখী জাহাজে ছিলেন। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে কেশবভক্ত কয়েকজন অনুগামী তাঁর স্মৃতির সম্মানার্থে আচার্যের বেদী শূন্য রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 'স্বভাবতই' প্রতাপচন্দ্র এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেন নি। ফলে উক্ত সমাজে একের পর এক এমন-সব ঘটনা ঘটতে থাকে, যা ব্রাহ্মসমাজ-বিরোধীদের উৎসাহের কারণ হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নব্যহিন্দুসমাজের উত্থান এই-সব ঘটনারই সমসাময়িক।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা প্রতাপচন্দ্রকে তিন ব্রাহ্মসমাজের মিলন-প্রয়াসে সচেষ্ট হয়ে উঠতে দেখি। রাজনারায়ণ বসুর ডায়ারি থেকে জানতে পারি যে, তিনি ৩১ শ্রাবণ [14 Aug] চুঁচুড়ায় মহর্ষির কাছে ব্রাহ্মদের মধ্যে ঐক্যসাধনের জন্য একটি পত্র লেখেন ও পরদিন তাঁর সমীপে উপস্থিত হন [৯ ফাল্গুনও তিনি মহর্ষির কাছে গিয়েছিলেন]। রাজনারায়ণ লিখেছেন, "মিল হইবার কোন সম্ভাবনা দেখি না, যেহেতু তিনি 'নববিধান' শব্দ ছাড়িতে প্রস্তুত নহেন"।[৬০] কিন্তু সর্বাঙ্গীণ ঐক্য স্থাপিত না হলেও সীমিত ক্ষেত্রে তিন সমাজের যোগাযোগ যে ঘটেছিল, তার প্রমাণ ৬ মাঘ রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভায় ও ৯ মাঘ ব্রাহ্মসম্মিলনে প্রতাপচন্দ্রের উপস্থিতি—দ্বিতীয় অনুষ্ঠানে ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালও অংশগ্রহণ করেছিলেন। উপবীতধারী

আচার্য, অসবর্ণ-বিবাহ, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় নিয়ে বিরোধ থাকলেও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠাকাল অবধি আদি সমাজের সঙ্গে নানাভাবে আন্তরিক যোগাযোগ রেখেছে এবং মহর্ষিও বিভিন্ন উপলক্ষে তাঁদের অর্থ ও উপদেশ দিয়ে সাহায্য করেছেন। সুতরাং তাঁদের ঐক্যের ক্ষেত্র অনেকটা প্রস্তুত হয়েই ছিল। কিন্তু কেশবচন্দ্র-প্রভাবিত নববিধান সমাজ তাঁদের বিচিত্র কার্যকলাপ ও ব্যক্তিপ্রাধান্য-মূলক মনোভাবের জন্য সর্বধর্মসমন্বয়ের আদর্শে ব্রতী হলেও ব্রাহ্মধর্মের অপর দুই শাখার নিকটবর্তী হতে আগ্রহী ছিল না। তাই প্রতাপচন্দ্র যখন ঐক্যপ্রয়াসে সচেষ্ট হলেন [অনেকটা আত্মরক্ষার তাগিদেই], তখন নববিধান সমাজের ক্ষমতাসীন অংশ তার প্রবল বিরোধিতা করেছেন। ধর্ম্মতত্ত্ব [২০।১৭, ১ আশ্বিন ১৮০৭ শক। ১৯৯-২০০] পত্রিকায় মুদ্রিত একটি অস্বাক্ষরিত 'প্রাপ্ত' প্রবন্ধে ['তিন সমাজ কি এক?'] তাঁদের মনোভাব খুব স্পষ্ট আকারেই ধরা পড়েছে : 'নববিধান সম্পূর্ণ স্বর্গের ব্যাপার, কেন না প্রত্যাদেশ ইহার জীবন।....কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ প্রত্যাদেশবিষয়ে অনভিজ্ঞ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রত্যাদেশকে বলিদান করিয়াছেন, নববিধান বুদ্ধিকে বলিদান করিয়াছেন এবং প্রত্যাদেশকে একমাত্র নেতা করিয়াছেন। এ তিন পদার্থকে কে তবে এক বলিয়া স্বীকার করিবে?....কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ নববিধানের মিত্র না হউক ইহার পরম শত্রু নহে; নববিধান এবং কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ দুইই এক সময়ে বর্ত্তমান থাকিতে পারে, অর্থাৎ নববিধানের জয়ে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ স্থিতি করিলেও করিতে পারে। কিন্তু নববিধানের জয়ে সাধারণ ব্রাহ্মমাজের নিশ্চয় মৃত্যু এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পূর্ণ জয়ে নববিধানের নিশ্চয় মৃত্যু।....আমাদিগের সূক্ষ্মদর্শী আচার্য্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত ভাব জানিতেন বলিয়াই তাহাকে সর্পবিষ অপেক্ষা ভয়ানক জানিয়া দূরে পরিহার করিতেন।' এই কারণেই লেখক তিন সমাজের ঐক্যপ্রয়াসী প্রতাপচন্দ্রকে অনুরোধ করেছেন, 'তিনি অন্ধকার আলোক, সত্য মিথ্যার মিলনে মিথ্যা যত্নবান্ হইবেন না।'

অথচ নব্যহিন্দুসমাজের আক্রমণের মুখে ব্রাহ্মদের তনটি শাখার ঐক্যের প্রয়োজন এই সময়েই ছিল সবচেয়ে বেশি। খৃস্টান মিশনারীদের প্রচারাভিযান যেমন সার্থকভাবে প্রতিহত করা সম্ভব হয়েছিল, এর অভাবে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানবাদীদের প্রয়াসকে তেমনভাবে বাধা দেওয়া সম্ভব হয় নি। পরিণামে ব্রাহ্মধর্মের বেগবান স্রোতোধারার দুটি শাখা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে কেবলমাত্র সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংকীর্ণ খাতে কোনোরকমে তার অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

প্রসঙ্গত হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান আন্দোলনের ইতিহাস কিছুটা পর্যালোচনা করা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে 'পুনরুত্থান' শব্দটি এক্ষেত্রে একটু বিভ্রান্তিকর। কেননা খৃস্টধর্ম বা ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া প্রধানত ইংরেজি-শিক্ষিত নাগরিক সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, এর বাইরে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা ছাড়া অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত জনমণ্ডলী হিন্দুধর্মের পৌরাণিক পৌত্তলিক পূজার্চনা ও আচার পালনেই ব্রতী ছিল। নব্যহিন্দুদের বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁরা আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে প্রাচীন পৌরাণিক হিন্দুধর্মকে ব্যাখ্যা করতে শুরু করেন। এঁদের মধ্যে প্রথম স্থান দেওয়া যায় কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনকে [1849-1902]। তিনি ১২৮২ বঙ্গাব্দে [1875] মুঙ্গেরে আর্যধর্মপ্রচারিণী সভা স্থাপন করে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে যত্নবান্ হন। ১২৮৪ বঙ্গাব্দের কার্তিক পূর্ণিমায় সভার মুখপত্র 'ধর্ম্মপ্রচারক' বাংলা ও হিন্দি ভাষায় প্রকাশিত হয়। ১২ মাঘ ১২৮৬ [25 Jan 1880] সভার নাম হয় ভারতবর্ষীয় আর্যধর্ম প্রচারিণী সভা, যদিও প্রকৃত প্রচারকার্যের শুরু হয় পৌষ ১২৮৯ [Jan1882] থেকে। শশধর তর্কচূড়ামণি সভার প্রচারক নিযুক্ত হন বৈশাখ ১২৯০-তে। বেদব্যাস-এর ১৮০৫

শকের [1883] বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা সংখ্যায় [৬।১-২] বিজ্ঞাপন দেখি : 'গত আশ্বিন মাসের বিজ্ঞাপনানুসারে পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় অত্র সভার কার্য্যার্থ 'ধর্ম্মাচার্য্য' রূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। ইনি শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শনাদিতে বিচক্ষণ, শাস্ত্রের নিগূঢ় বৈজ্ঞানিক রহস্যভেদে পরম পটু, প্রকৃতি অতি শান্ত, ভক্তিবিনম্র ও ধর্ম্মোত্তেজনা পূর্ণ। ইনি আপাততঃ বঙ্গবিভাগে কার্য্য করিতে থাকিবেন।' তাঁর জন্য ৩০ টাকা মাসিক বৃত্তি নির্ধারিত হয়। শশধর তর্কচূড়ামণির কলকাতায় আবির্ভাব ঘটে ১২৯১-এর বৈশাখের শেষে বা জ্যৈষ্ঠের শুরুতে; সাধারণী [২২।৬, ১২ জ্যৈষ্ঠ। ৭০] লেখে : 'বারাণসীর আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার প্রতিনিধি স্বরূপ পণ্ডিত প্রবর শশধর তর্কচূড়ামণি কলিকাতায় আসিয়াছেন, তিনি প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে ব্যাখ্যা এবং বক্তৃতা করিবেন। আমরা ভরসা করি কলিকাতার ভদ্রলোকে এই বিষয় তর্কচূড়ামণিকে সাহায্য করিবেন।' সাহায্য তিনি যথেষ্টই পেয়েছিলেন, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁর অনুগামী অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি শশধরের প্রচারে প্রচুর আনুকূল্য প্রদর্শন করেছিলেন, সাধারণী-তে শশধরের বক্তৃতার স্থান-কাল, বক্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কিত সংবাদ প্রায়শঃই পরিবেশিত হয়েছে। এমন-কি শ্রীরামকৃষ্ণও ১২ আষাঢ় [বুধ 25 Jun] প্রায় অনাহূতভাবে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।[৬১] শশধরের এই জনপ্রিয়তার সুযোগ সর্বাধিকরূপে গ্রহণ করে বঙ্গবাসী পত্রিকা। 'কুমার পরিব্রাজক' গ্রন্থে লিখিত হয়েছে : 'চূড়ামণি মহাশয়ের শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিয়া শিক্ষিত সমাজ ধর্ম্মালোচনায় অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া ব্যবসায়ী বঙ্গবাসী স্বার্থসাধনে তৎপর হইলেন। তিনি প্রথমেই চূড়ামণি মহাশয়ের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাকে আপনার অনুকূল করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নকে তাঁহার শিষ্য বলিয়া উল্লেখ করিলেন, এবং চূড়ামণি মহাশয় যে ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার বেতনভোগী ধর্ম্মাচার্য্য তাহার নামও করিলেন না।'[৬২] বঙ্গবাসী-র প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রনাথ বসুর পুত্র মহেন্দ্রকুমার বসুও তাঁর 'যোগেন্দ্র-স্মরণী'-তে লিখেছেন : 'যেখানেই তাঁহার ধর্মব্যাখ্যা হইত, তাহার সারমর্ম "বঙ্গবাসীতে" প্রকাশিত হইত এবং কোথায় কোথায় তাঁহার ব্যখ্যা হইবে তাহার সাপ্তাহিক তালিকা "বঙ্গবাসী"তে প্রকাশিত হইত। এইভাবে অতি অল্পদিনের মধ্যেই শশধর প্রখ্যাত ধর্মব্যাখ্যাকার হইয়া উঠেন।'[৬৩] সুতরাং বঙ্গবাসী মেশিন প্রেসে মুদ্রিত 'পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি কৃত ধর্ম্মব্যাখ্যা। ১ম খণ্ড। ধর্ম্মের প্রয়োজন' [শক ১৮০৬]-এ প্রকাশক শশধর-শিষ্য ভূধর চট্টোপাধ্যায় যখন লেখেন : '....বহুযুগ ধরিয়া নিদ্রাভিভূত ভারত-সন্তান, আর্য-সন্তান পুনরায় দেখি চক্ষুরুন্মীলন করিতেছেন।....পুনরায় আর্য্যসন্তানের হৃদয়ে প্রবল ধর্ম্মানুরাগ, উদ্যম ও উৎসাহ অল্পে অল্পে সঞ্চারিত হইতেছে দেখিয়া কার প্রাণ আনন্দে না মাতিয়া উঠে'—তখন 'ভারত-সন্তান' 'আর্য্য-সন্তান' প্রভৃতি নিয়ে প্রবন্ধে, হেঁয়ালি নাট্যে, কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গমুখর হয়ে ওঠার যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতটি বোঝা সহজ হয়ে ওঠে। বর্তমান আলোচনার সার্থকতা সেইখানেই।

উল্লেখপঞ্জী

১ 'ভারতীর ভিটা', শরৎকুমারী চৌধুরাণীর রচনাবলী [১৩৫৭]। ৩৭৫

২ রবীন্দ্রজীবনী ১ [১৩৬৭]। ১৭৮, পাদটীকা ৩

৩ ঐ [১৩৭৭/১৩৯২]। ১৯৭

৪ কাজী আবদুল ওদুদ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ [1962]। ৭৩

৫ কবিমানসী ১। ২৭৫-৭৬; শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘের উদ্যোগে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকী উৎসবে সভানেত্রী ভাষণ : 'রবিকার জন্মদিনে'—ঐ। ৩২৯, উল্লেখ-পঞ্জী ৪

৬ জীবনস্মৃতি ১৭। ৪২১-২৩

৭ ঐ, গ্রন্থপরিচয় ১৭। ৪৮৮

৮ ঐ ১৭। ৪০৯-১০

৯ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ : 'পঞ্চাশৎবর্ষ-পরিক্রমা' [১৩৮১]। ১৩

১০ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ১। ১৯৮

১১ ভারতী, শ্রাবণ। ১৫৪

১২ ঐ, ভাদ্র। ১৮৫

১৩ বিচিত্র প্রবন্ধ ৫। ৪৯২

১৪ চিঠিপত্র ৮। ৯, পত্র ১৪

১৫ জীবনস্মৃতি ১৭। ৪১৫

১৬ ছিন্নপত্র [১৩৬২]। ১০, পত্র ৩

১৭ চিঠিপত্র ৮। ২, পত্র ২

১৮ 'বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ' : সাধনা, শ্রাবণ ১৩০১। ২৪০

১৯ রবীন্দ্র-সাহিত্যে পদাবলীর স্থান [১৩৬৮]। ৪৪

২০ দ্র 'রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী'; শনিবারের চিঠি, পৌষ ১৩৪৬। ৪৫৫

২১ কবিমানসী ১। ২৮৯

২২ ঐ ১। ২৮২

২৩ দ্র 'রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী' : শনিবারের চিঠি, পৌষ ১৩৪৬। ৪৫৫

২৪ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৪৯৬-৯৭

২৫ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রচিত

২৬ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। ১৯৯, পত্র ৭

২৭ দ্র আশুতোষ চৌধুরী প্রবন্ধ সঙ্কলন [১৩৮০]। ১৪২

২৮ দ্র গীতবিতান : কালানুক্রমিক সূচী ১। ৩৬-৩৭

২৯ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। ১৯৮, পত্র ৫

৩০ ঐ। ১৯৮, পত্র ৬

৩১ জীবনের ঝরাপাতা। ১৭

৩২ রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী। ১৫৯

৩৩ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। ১৯৯, পত্র ৭

৩৪ দ্র জীবনস্মৃতি ১৭। ৪২৫

৩৫ বি. ভা. প., বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫১। ৪২০

৩৬ 'আদি ব্রাহ্মসমাজ ও "নব হিন্দু সম্প্রদায়"'; প্রচার, অগ্র°। ১৭০

৩৭ ঐ। ১৭০-৭১

৩৮ 'কৈফিয়ৎ' : ভারতী, পৌষ। ৪০৭

৩৯ দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বঙ্কিমচন্দ্র' [অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য-সংকলিত, ১৩৮৪]। ৯৫

৪০ 'শরৎচন্দ্র' : প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৩৮। ৮০৭; অপিচ, বঙ্কিমচন্দ্র। ১০৪

৪১ জীবনস্মৃতি ১৭। ৪১৮

৪২ জীবনের ঝরাপাতা। ৩৫

৪৩ জীবনস্মৃতি ১৭। ৪১৯

৪৪ দ্র পাণ্ডুলিপিচিত্র, রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী। ১৬৫

৪৫ 'রবীন্দ্র-জীবনীর নূতন উপকরণ', রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য। ৬৪

৪৬ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। ২০০

৪৭ দ্র কানাই সামন্ত, 'রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি-বিবরণ/পুষ্পাঞ্জলি' : বি. ভা, প., শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৫। ৭২

৪৮ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। ১৩৫

৪৯ সমালোচনা অ-২। ১৪৪

৫০ দ্র তত্ত্ববোধিনী, পৌষ ১৮০৭ শক [১২৯২]। ১৮৮

৫১ 'বীরভূমে অন্নকষ্ট' : আলোচনা, চৈত্র। ২৭১-৭২

৫২ দ্র গীতবিতান : কালানুক্রমিক সূচী ১। ৪৭

৫৩ বিস্তৃত তথ্যের জন্য দ্র রবীন্দ্রস্মৃতি। ৫০

৫৪ বালক, আষাঢ় ১২৯২। ১১৪

৫৫ শ্রুতি ও স্মৃতি [অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা]

৫৬ 'দার্জিলিং-যাত্রা' : বালক, বৈশাখ ১২৯২। ৯

৫৭ রবীন্দ্রজীবনী ১।

৫৮ পুণ্য, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩০৬। ৪৬০

৫৯ পুরাতনী । ২৮

৬০ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৪৯৭

৬১ দ্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ১।১৩৭-৪৫

৬২ কুমার পরিব্রাজক/পরমহংস শ্রীমৎ পূর্ণানন্দস্বরূপ স্বামি-মহোদয় সঙ্কলিত [১৩৪৬]। ৪২৫

৬৩ ‘যোগেন্দ্র-স্মরণী’, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু রচনাবলী ১ [1976]। সাতচল্লিশ

---

*১ প্রবন্ধটি ভারতী-র পৌষ ১২৯০ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল।

*২ হিন্দু পেট্রিয়ট-এর 9 Jun [২৮ জ্যৈষ্ঠ] সংখ্যায় এই যুগ্ম-সংখ্যার প্রাপ্তিস্বীকার করা হয়।

*১ জ্যোতিন্দ্রনাথ-সংকলিত ‘স্বরলিপি-গীতমালা’-য় [১৩০৪] গানটি প্রসঙ্গে লেখা আছে, ‘কথা:— শ্রী অ—’।

*২ চন্দ্রনাথ বসু বইটির কাব্যগুণ-সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন: ‘...It may be questioned whether a purely mental struggle can be a fit subject for dramatic composition. But there can be no doubt that it may be made the subject of the best and highest poetry. The description of the mental struggle in this book is in the highest degree poetical, and the manner in which its different stages are proportioned to each other is really dramatic. The mind of the ascetic in all its phases is one of the noblest creations of the poetry in Bengali literature, and there are...passages of remarkable power, beauty, and grandeur’—দ্র বি. ভা. প., মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯।২৮৭-৮৮

*১ চন্দ্রনাথ বসু গ্রন্থটি সম্পর্কে তাঁর রিপোর্টে লিখেছেন : ‘The sentiment of love is expressed in these sonnets in forms which are at once so deep, delicate, fine, fervid, and in verses so full of the luxuriance of music and melody that it is difficult to decide who is the better Sonneteer, the imitator Bhanusinha Thakur, or his model the great Baisnaba poet.’ দ্র বি. ভা. প., মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯।২৮৭

*২ পরবর্তীকালে এই প্রতিষ্ঠানের নাম হয় ‘গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স’।

* রবীন্দ্রনাথ এই রচনায় ‘তিনটি বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষমানুষ’-এর যাওয়ার কথা লিখেছেন, এই তৃতীয় জন সম্ভবত অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী।

* এঁর কথা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন ছেলেবেলা-য় [২৬।৬১৭] : “উমেশ ছিল চালাক লোক। বিলিতি দরজির দোকান থেকে যত-সব ছাঁটাকাটা নানা রঙের রেশমের ফালি জলের দরে কিনে আনত, তার সঙ্গে নেটের টুকরো আর খেলো লেস মিলিয়ে মেয়েদের জামা বানানো হত। কাগজের প্যাকেট খুলে সাবধানে মেলে ধরত মেয়েদের চোখে, বলত ‘এই হচ্ছে আজকের দিনের ফ্যাশন’। ঐ মন্ত্রটার টান মেয়েরা সামলাতে পারত না।”

* এই বিজ্ঞাপন তিনটি আমরা নৈহাটি ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় গোপালচন্দ্র রায়ের সৌজন্যে ব্যবহার করতে পেরেছি।

* অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় এই মাসিক পত্রিকাটি বর্তমান মাস থেকেই প্রকাশিত হতে শুরু করে।

* প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই বক্তৃতার তারিখ ১১ ভাদ্র বলে উল্লেখ করেছেন, দ্র রবীন্দ্রজীবনী ১ [১৩৬৭]।১৮৩; কিন্তু সাবিত্রী লাইব্রেরির ‘৬ষ্ঠ ও ৭ম বার্ষিক বিবরণী’র ৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে : ‘নিয়মিত ছুটি ব্যতীত ৯ই ভাদ্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের “হাতে কলমে” নামক বক্তৃতার দিন...লাইব্রেরী বন্ধ ছিল।’ রবিবার বক্তৃতানুষ্ঠানের উপযুক্ত দিন বলে এই তারিখটিই গ্রহণযোগ্য। ‘সাবিত্রী’ [১২৯৩] প্রবন্ধ-সংকলন গ্রন্থের উল্লেখ থেকে এই ভুলটির উদ্ভব।

* গগনচন্দ্র হোমের সম্পাদনায় ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন তরুণের উদ্যোগে এই ক্ষণজীবী পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। গগনচন্দ্র তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন : ‘রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার পর, জোড়াসাঁকোস্থ ঠাকুর ভবনে, তাঁহার সাহিত্য-আলোচনায় ও সঙ্গীতচর্চায় যোগ দিবার সুযোগ আমার বিশেষ ভাবে ঘটিয়াছিল। সেই সব দিনের সুখসমুজ্জ্বল স্মৃতি হৃদয়ে আঁকা রহিয়াছে। . সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ আমাদের “আলোচনা” পত্রিকার লেখক ও বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন।’—তত্ত্বকৌমুদী, ১ পৌষ ১৮৫১ শক [৫২।১৭]।২০৩

* দ্র আর্য্যদর্শন, ভাদ্র ১২৯১ [পৃ ২১৮-৩৩] সংখ্যায় পূর্ণচন্দ্র বসু-লিখিত ‘ধর্ম্ম সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবুর মত’ ও পৌষ ১২৯১ [পৃ ৪২৭-৩২] সংখ্যায় সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ-লিখিত ‘নবজীবন ও প্রচার এবং নব হিন্দুধর্ম্ম’। যোগেন্দ্রনাথ লেখেন, ‘আজকাল হিন্দুধর্ম্ম লইয়া যে গুরুতর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে একেবারে স্থির থাকা অসম্ভব। ‘নবজীবন’ পাইয়া সমস্ত বঙ্গদেশ যেন নিদ্রোত্থিত হইয়াছে এবং সকলেরই মুখে এখন ‘নবজীবন’ ও ‘প্রচার’ বই আর কিছুই শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না। সকলে ঘটীবাটী বেচিয়াও যেন ‘নবজীবন’ ও ‘প্রচারের’ মূল্যপ্রাপ্তির স্তম্ভ পূরণ করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন। এ নবজীবনের নূতন উৎসাহে বঙ্গসমাজ আজ উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। হারান ধন পুনঃপ্রাপ্ত হইলে কাঙ্গালের মন যেরূপ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, লুপ্তপ্রায় ও পদদলিত হিন্দুধর্ম্মের পুনঃপ্রচারে হিন্দুসমাজের আজ সেই আনন্দোচ্ছ্বাস!’—শ্লেষ ও ব্যঙ্গের সুরটি গোপন করার কোনো চেষ্টাই লেখক করেন নি।

* ‘বঙ্কিমবাবুর মুখেই তাঁহার কথা প্রথম শুনিলাম। আমার মনে হইতেছে, প্রথমটা বঙ্কিমবাবুই সাধারণের কাছে তাঁহার পরিচয়ের সূত্রপাত করিয়া দেন।’—জীবনস্মৃতি ১৭। ৪১৮

* প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, ‘সিটি কলেজের হলে উহা পঠিত হয়।’—রবীন্দ্রজীবনী ১ [১৩৬৭]। ১৮৭; কিন্তু তথ্যটি ঠিক নয়। সরলা দেবী লিখেছেন, ‘সভাটি আদি ব্রাহ্মসমাজের হলে আহূত।’—জীবনের ঝরাপাতা। ৩৪; সোমপ্রকাশ [২৯।৭, ১৫ পৌষ। ১২৬] পত্রিকাতেও লিখিত হয়; ‘এই প্রবন্ধটি রবীন্দ্র বাবু আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয় গৃহে প্রকাশ্য সভায় পাঠ করিয়াছিলেন।’

* এই জন্যই বিতর্কমূলক অংশগুলি বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি সমালোচনা [১২৯৪] গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, যেক্ষেত্রে ‘সাকার ও নিরাকার উপাসনা’র [ভারতী, শ্রাবণ ১২৯২। ১৮৮-৯৮] মতো গুরুতর প্রবন্ধ তিনি কোনো গ্রন্থভুক্ত করেন নি।

* সোমপ্রকাশ [২৯৭, ১৫ পৌষ। ১২৬] এই প্রবন্ধের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে সমালোচনা করে লেখে, ‘...বর্ত্তমান সময়ে এদেশের লেখক ও পাঠকগণের যে ঘোর রুচিবিকার উপস্থিত হইয়াছে, অল্পদিন হইল সোমপ্রকাশে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছিল। কিন্তু এই রুচিবিকার যে ছোট বড় সকল শ্রেণীর লেখককেই আক্রমণ করিয়াছে গত সংখ্যার প্রচার পড়িবার পূর্বে আমরা তাহা জানিতে পারি নাই। বঙ্কিম বাবুর মত সুবিজ্ঞ ও চিন্তাশীল লেখক যখন এইরূপ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তখন অন্যে পরে কা কথা।’

* বহুকাল পরে সমালোচনী পত্রিকার প্রথম বর্ষের [১৩০৮] ৩য়-৪র্থ সংখ্যায় [পৃ ১৬৯-৭০] ‘আসলে জীবিত’ [‘এই এরা রহে হেথা—ওরা চলি যায়’] নামে বর্তমান কবিতাটির জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কৃত একটি অনুবাদ মুদ্রিত হয়।

* তারিখটি ৫ মাঘ বলে সকলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সেটি ভুল; ‘রামমোহন রায়’ নামক পুস্তিকায় মুদ্রিত ভুল তারিখ বা মুদ্রণপ্রমাদ থেকে এই ভ্রান্তির উদ্ভব।

* ইন্দিরা দেবী লিখেছেন, ‘একবার মনে আছে, আদি নববিধান সাধারণ—এই তিন সমাজের মিলিত উৎসব উপলক্ষে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে একটি ধর্মসভা হয়। সেই সভার জন্য রবিকাকা ‘পিতার দুয়ারে দাঁড়াইয়া সবে ভুলে যাও অভিমান’ গানটি রচনা করেন।’ রবীন্দ্রস্মৃতি। ১৯

* গীতবিতান-এর গানগুলিকে কালানুক্রমিক ভাবে মুদ্রিত করার একটি প্রস্তাব কোনো কোনো রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞের মুখে যে শোনা যাচ্ছে, এই কারণেই তা সমর্থনযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী চতুর্থ খণ্ডে [১৩৯৪] গানগুলি কালানুক্রমিক রীতিতে সজ্জিত হয়ে মুদ্রিত হয়েছে। কাল-বিন্যাস অবশ্য খুবই ত্রুটিপূর্ণ।

* তত্ত্ব°, চৈত্র সংখ্যায় [পৃ ২৪৩] ‘২৩ মাঘ শুক্রবারে’ দীক্ষা হয় বলে উল্লিখিত হয়েছে, তারিখটি সম্ভবত ভুল—কারণ ২৩ মাঘ বুধবার ছিল।

* এই বিষয়টির আলোচনায় আমরা ড আদিত্য ওহদেদার-এর কাছে ঋণী দ্র রবীন্দ্র-বিদূষণ ইতিবৃত্ত [১৩৯২]।২-৪

* এরূপ অনুমানের যুক্তি গানটির ভাষাতেই আছে; তাছাড়া রবিচ্ছায়া-র ‘বিজ্ঞাপন’-এ লেখা হয় : ‘বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে রবীবাবু যে শোক সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন তাহাও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ তিনি বিগত চৈত্র মাসের শেষ দিন পর্য্যন্ত যতগুলি সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন তাহার প্রায় সকল গুলিই ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে।’—সঞ্জীবনী [৩।৪], ২৭ বৈশাখ ১২৯২।১৪

* হেমেন্দ্রনাথ 6 Oct 1882 [২১ আশ্বিন ১২৮৯] তারিখে কলুটোলার সাগর দত্ত ও সত্যদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে বারুইপুর থানা এলাকার আড়াপাঁচ ও ঝুজির বিল এবং গ্লাণ্ডর সাহেবের চক অন্তর্গত মেছোভেড়ির ৫০০ বিঘা জমির পাট্টা রেজিষ্ট্রি করেন। এই জমির দখল নিতে গেলে হাঙ্গামা উপস্থিত হয়, দ্র সোমপ্রকাশ, ৬ অগ্র° ১২৮৯ [২৭।৪]। রবীন্দ্রনাথ এই জমিতেই বীরভূমের দুর্ভিক্ষপীড়িত কৃষকদের আশ্রয়দানের প্রস্তাব করেছিলেন।

* ৯ শ্রাবণের হিসাব : ‘দং শ্রীমতী উষাবতী দেবীর শুভবিবাহ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয় চুঁচুড়ার বাটী হইতে যৌতুক দেন ৫০০’ [মহর্ষির ‘নিজ স্বতন্ত্র কেশ বহি’]।

নির্দেশিকা

ব্যক্তি

গ্রন্থ ও পত্রিকা

[পত্রিকার নাম বক্রাক্ষরে]

শিরোনাম

উদ্ধৃত কবিতা বা গানের প্রথম ছত্র

বিবিধ

ভ্রম সংশোধন

পৃ ৫০ ছত্র ১৭ : 'দ্র গীতবিতান ৩।৮৭১;' বাদ যাবে। এর পরের ছত্রটি হবে :

৩১৮-১৯ 'গিয়াছে সেদিন, যে দিন হৃদয়' ['Moore's Irish Melodies'] দ্র গীতবিতান ৩।৮৭১;